

নাট্যকর্মী বাদল সরকার: একটি মূল্যায়ন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে
পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক
অমর চন্দ্র রায়
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : Ph.D/Beng (1291)/688/R-2019

তত্ত্বাবধায়ক
ড. বিকাশ চন্দ্র পাল

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারি ২০২৩

Declaration

I declare that the thesis entitled “নাট্যকর্মী বাদল সরকার : একটি মূল্যায়ন” has been (Natyakarmi Badal Sarkar : Ekti Mulyayan) prepared by me under the guidance of Dr. Bikash Chandra Paul, Department of Bengali, University of North Bengal. No part of this thesis has formed the basis for the award of any degree or fellowship previously.

Date : 18-01-2023

Amar Chandra Roy

(Amar Chandra Roy)

Department of Bengali

University of North Bengal

Dr. Bikash Chandra Paul M.A., Ph.D.

Professor

Department of Bengali

Bankura University

Puarandarpur main campus

PIN 722155

Former Faculty member

Tripura Central University

& University of North Bengal

Residence:

Professor's Colony

Bolpur

Birbhum

Contact: 9434348793

& 8371061238

e-mail: bikashcpaul@gmail.com

Ref. No.

Date:

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Sri Amar Chandra Roy [Reg. No. Ph.D/Beng(1291/688/R-2019)] has prepared the thesis entitled “নাট্যকর্মী বাদল সরকার: একটি মূল্যায়ন” (Natyakarmi Badal Sarkar : Ekti Mulyayan) for the award of Ph.D. degree of the University of North Bengal, under my guidance. He has fulfilled the requirements of the University rules and regulations in preparing the said thesis. I further certify that his thesis has not been submitted in this form to any other University or institution previously for any scholarly degree. To the best of my knowledge, it is an original work with sufficient academic merit and fit to be adjudicated for the Ph.D. Degree by the University of North Bengal. I wish him all successes.

Bikash Paul 15.01.2023

(Dr. Bikash Chandra Paul)

Supervisor

Dr. B. C. Paul

Professor

Department of Bengali

Bankura University

Document Information

Analyzed document	Amar Chandra Roy_Bengali.pdf (D155673316)
Submitted	2023-01-13 06:32:00
Submitted by	University of North Bengal
Submitter email	nbuplg@nbu.ac.in
Similarity	0%
Analysis address	nbuplg.nbu@analysis.arkund.com

Sources included in the report

W	URL: https://ir.nbu.ac.in/bitstream/123456789/2668/16/Full%20Thesis%20of%20Namita%20Chakraborty%20.pdf Fetched: 2022-04-18 10:13:31	13
W	URL: https://www.researchgate.net/publication/346106710_BRD_Dharmasabha_Sep_2020 Fetched: 2022-05-04 09:24:15	22
W	URL: https://wbchse.nic.in/books/Arts/H.S._Model_Question_History.pdf Fetched: 2021-12-22 19:10:28	3
W	URL: https://ir.nbu.ac.in/bitstream/123456789/2821/18/Full%20thesis%20of%20Aninda%20Ghosh.pdf Fetched: 2021-08-13 14:28:05	3
J	10_chapter_4.pdf URL: 7aa59ed9-e731-4143-a05b-f53a5965f99e Fetched: 2022-08-19 14:55:08	3
W	URL: https://ir.nbu.ac.in/bitstream/123456789/2726/14/14_chapter%207.pdf Fetched: 2021-11-04 05:22:31	10
J	07_chapter_3.pdf URL: 33868120-23fe-4913-90c8-b48e0a4745a8 Fetched: 2022-08-20 02:58:57	12
J	08_chapter_2.pdf URL: 9ead0f20-e70f-48f4-9a8d-8e225ef2f920 Fetched: 2022-08-19 14:55:08	1
W	URL: http://www.bethunecollege.ac.in/publications/downloads/Prohor-Punthi-Dostabej.pdf Fetched: 2021-08-13 14:28:06	1
J	09_chapter_3.pdf URL: 6306bf56-43d6-4629-85d9-b4771200e229 Fetched: 2022-08-19 14:55:08	1

Entire Document

Bikash Paul

15.01.2027

Amar chandra Roy

18.01.2027

Dr. B. C. Paul
Professor

95%

MATCHING BLOCKS

Department of Bengali
Bankura University

w

vpz_iuID IIU»!fAyceöieüü iy.öey !i!pyöitü x.#öi !pTM~Ez%p.lvp.vpzbTMy!iü <~Ä p2!_ töliji'y x!lpc il!Ap tölii.l.p

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	:	i-iii
গবেষণার সারসংক্ষেপ :		iv-x
ভূমিকা	:	১-৫
প্রথম অধ্যায়	:	নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত ৬-২৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	নাট্যকর্মী বাদল সরকার : প্রসেনিয়াম থিয়েটার পর্ব ২৯-৫৮
তৃতীয় অধ্যায়	:	বাদল সরকারের নাট্যভাবনা : তৃতীয় ধারার থিয়েটার ৫৯-১৬৪
চতুর্থ অধ্যায়	:	সমকালীন নাট্যকর্মী ও বাদল সরকার ১৬৫-২১৫
পঞ্চম অধ্যায়	:	নাট্যকর্মী বাদল সরকার ২১৬-৩৩৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	পরবর্তীকালীন নাট্যচর্চায় বাদল সরকারের প্রভাব ৩৩৬-৩৫৩
উপসংহার	:	৩৫৪-৩৬৩
গ্রন্থপঞ্জি	:	৩৬৪-৩৭৫
নির্ঘণ্ট	:	৩৭৬-৩৮১

মুখবন্ধ

আমার গবেষণার বিষয়, “নাট্যকর্মী বাদল সরকার: একটি মূল্যায়ন”। নাটকের প্রতি আমার ভালোবাসা দীর্ঘদিনের। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, ছোটবেলায় পাড়ার অনুষ্ঠানে একবার শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’ গল্প অবলম্বনে আমার মেজদার নাট্যরূপকৃত ‘গফুর মিঞার সংসার’ নাটকে ছোট্ট একটি চরিত্রে অভিনয় করি। তখন জানতামও না যে নাটক কি, তবে অভিনয় আমার বরাবরই প্রিয় ছিল। স্কুল-কলেজের গণ্ডি অতিক্রম করে যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হলাম, তখন ধীরে ধীরে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার পাশাপাশি নাট্যসাহিত্য নিয়েও একটা আগ্রহ তৈরি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সময় যাঁরা আমার মাস্টারমশাই ছিলেন এবং এখনও আছেন, প্রতিনিয়ত তাঁরা গবেষণা কর্মে উৎসাহ দিতেন। তখন থেকেই একটু একটু করে ভবিষ্যতে গবেষণা করার একটা প্রবল ইচ্ছা মনের মধ্যে তৈরি হয়। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করার পর যখন স্থির করলাম গবেষণা করব, তখন নাটককেই বেছে নিলাম। কথা বলেছিলাম অধ্যাপক অক্ষুণ্ণ ভট্ট মহাশয়ের সঙ্গে। নাটক নিয়ে কাজ করতে চাই, জেনে স্যার আমাকে কিছু বিষয় নির্দেশ করলেন, আর সেই অনুযায়ী কয়েকজন নাট্যকারকে নিয়ে তখন পড়া শুরু করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় নানা কারণে তখন গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে প্রফেসর ভট্ট অবসর গ্রহণ করলেন। তখন আর কাজ আরম্ভ করা হয়ে উঠল না। তারপর যখন কোর্স-ওয়ার্ক করা বাধ্যতামূলক হলো, সেই সময় আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে কোর্স-ওয়ার্ক করি। মনে পড়ছে, একদিন কোর্স-ওয়ার্ক ক্লাস নিচ্ছেন ড. অধ্যাপক তপন মণ্ডল। স্যার জানতে চাইলেন, আমি কি নিয়ে কাজ করতে চাই। তপন মণ্ডল স্যার আমাকে বাদল সরকারের থিয়েটার নিয়ে গবেষণা করার উৎসাহ দান করেন। ইতিমধ্যে বাদল সরকারের থিয়েটার নিয়ে কিছুটা পড়াশুনাও করেছি। আমি তখনই স্থির করলাম, বাদল সরকারকে নিয়েই কাজ করবো। পরবর্তীকালে আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. বিকাশ চন্দ্র পাল মহাশয়ের সঙ্গে কথা হয়। শেষ পর্যন্ত আমার তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ, উৎসাহে গবেষণা অভিসন্দর্ভ-এর চূড়ান্ত পরিকল্পনা করা হয়। তাঁরই পরামর্শে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণার শিরোনাম স্থির করা হয়।

বাদল সরকারের ব্যক্তি জীবন, তাঁর পঠন-পাঠন এবং থিয়েটার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে দেখি বাদল সরকারকে নিয়ে সেই অর্থে ব্যাপক কোনো গবেষণা হয়নি। মোটামুটি জানতে পারি, বাদল সরকারের থিয়েটার নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগ থেকে ড. বিভাসকান্তি মণ্ডল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে ড. উত্তরা

চৌধুরী 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাদল সরকারের নাট্যকর্ম' এই শিরোনামে গবেষণা করেছেন। এর বাইরে আরও বেশ কিছু কাজ হয়েছে। যেমন বিশ্বভারতীর ইংরেজি ও ওএমইএল বিভাগ থেকে ড. শুভঙ্কর রায় চৌধুরী ঘোষ-এর 'Badal Sircar third theatre understanding performance through translation', বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগ থেকে সৌমেন জানা-র 'The idea of theatre in Badal Sircar a study of select plays'। এছাড়াও প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরীর 'নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার' গ্রন্থটি পাঠক সমাজে সুপরিচিত। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তাদের 'নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৬' বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এই সমস্ত গবেষণাকর্ম এবং পত্র-পত্রিকায় বাদল সরকারের নাট্যকর্ম স্থান করে নিলেও তাতে বাদল সরকারের নাট্যকর্মী সত্তার অনুসন্ধান অনুপস্থিত। ফলে নাট্যকর্মী বাদল সরকারের মূল্যায়ন বিষয়ে গবেষণা করার উৎসাহ বোধ করি।

আমাদের এই গবেষণায় বাদল সরকারের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত, তাঁর থিয়েটার চর্চার ক্রমবিবর্তনের ধারাটি অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাদল সরকার প্রবর্তিত থার্ড থিয়েটার একটা সময় বাংলা তথা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক চর্চিত হয়। সেই থার্ড থিয়েটারের স্বরূপ এবং থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাদল সরকারের নাট্যদর্শন কতটা প্রাসঙ্গিক তারও উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব হত না তাঁদের কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। প্রথমেই আমার তত্ত্বাবধায়ক, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর বিকাশ চন্দ্র পাল মহাশয়কে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একটা সময় আমি ধরেই নিয়েছিলাম আমার গবেষণা কর্মটি করে ওঠা সম্ভব হবে না। হঠাৎই একদিন স্যারের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলি এবং তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। যে কাজটি আমার দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পড়েছিল, স্যারের এই অকুপণ সহযোগিতা না পেলে তা আজ সম্পূর্ণ করে উঠতে পারতাম না। এজন্য ড. বিকাশ চন্দ্র পাল মহাশয়কে আবাবো আমার বিনম্র প্রণাম জানাচ্ছি। স্যারের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে আমার পিএইচ. ডি.-এর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়। বর্তমানে তিনি বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। স্যারের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে গবেষণার প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিয়ে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করি। আরেক জনের কথা এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার, তিনি হলেন পুরুলিয়া জেলার কাশিপুর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষ ড. বিভাসকান্তি মণ্ডল মহাশয়। তথ্য সংগ্রহের কাজের সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ। ওঁর কাছে সঞ্চিত প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থাদি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। ওঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কৃতজ্ঞতা জানাই অভিনেতা নাট্যকার ও অধ্যাপক শিবব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। বাদল সরকার সম্পর্কে

আমার অনেক প্রশ্নের সমাধান পেয়েছি। দূরভাসের মাধ্যমেই তিনি তাঁর মূল্যবান সময় থেকে আমাকে অনেক সুপারামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা শেষ নেই। তাঁকে আমার বিনম্র প্রণাম। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই নাট্যব্যক্তিত্ব দেবশিশ চক্রবর্তী মহাশয়কে। তিনিও তাঁর মূল্যবান সময় থেকে আমাকে বাদল সরকারের থিয়েটার সম্পর্কে, বাদল সরকারের থিয়েটারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমার RAC -র এক্সটার্নাল এক্সপার্ট উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড.জিনিয়া মিত্র-র প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তাঁর মূল্যবান পরামর্শ আমার গবেষণা কর্মে আলাদা মাত্রা দান করেছে। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধানসহ বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপক, বিভাগীয় শিক্ষাকর্মীর প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এবার বলতে হয় আমার সহধর্মিনী ফাল্গুনী মণ্ডলের কথা। ও বারংবার আমাকে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার উৎসাহ দিত। সংসারের সবকিছু নিজে হাতে সামলে আমাকে গবেষণা কাজে মনোনিবেশ করার সুযোগ করে না দিলে একাজ করা সম্ভব হত না। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাহুল্য মাত্র। আর আমার ছোট্ট মেয়েটি, সেও ঠিক বুঝত। বাবাকে পড়তে দেখলে চুপটি করে বসে থাকত। ওদের দুজনের প্রতি রইল আমার গভীর ভালোবাসা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ঋণস্বীকার করছি পশ্চিমবঙ্গ নাট্যশোধ সংস্থান, গোগুল সার্চ, শোধগঙ্গা-র। এসব প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যম থেকে নানা ভাবে সাহায্য পেয়েছি। আমার কলেজের সহকর্মীদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে বলতে হয়, অধ্যাপক ড. রঞ্জিত কুমার বর্মণ, অধ্যাপক ড. ডলি দে, অধ্যাপক ড. দেবদীপ ভট্টাচার্য-র কথা। নানা পরামর্শ দিয়ে গবেষণাকর্মে যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। কৃতজ্ঞতা জানাই ভ্রাতৃপ্রতিম সুজিত রায়কে। আমার গবেষণাকর্মের মুদ্রণের কঠিন দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ধন্যবাদার্থ।

তারিখ: ১৬.০১.২০২৬



(অমর চন্দ্র রায়)

গবেষক,

বঙ্গভাষা সাহিত্য বিভাগ,

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং-৭৩৪০১৩

গবেষণার সারসংক্ষেপ

বাংলা থিয়েটারে বাদল সরকারের আবির্ভাব ষাটের দশকে। তখন সদ্য দেশ স্বাধীন হয়েছে। একদিকে দেশ গঠনের ব্যর্থতা আর অন্যদিকে খাদ্য, বাসস্থান আর কর্মসংস্থানের হাহাকার, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও হতাশায় নিমজ্জিত করে। ষাট থেকে সত্তর-এই দুই দশক জুড়ে বাংলায় এক ভয়ঙ্কর অস্থিরতা গ্রাস করে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, প্রতিহিংসা, রাষ্ট্রীয় জুলুম মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। সেই সময় মার্কসবাদী চিন্তা চেতনা ছাত্র থেকে যুবক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। যার অনিবার্য অভিঘাত পড়েছিল তদানীন্তন বাংলার নানান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে— গল্পে, কবিতায়, গানে, চলচ্চিত্রে এবং নাটকে। সেই সময়কার মানুষের যন্ত্রণার কথা বেশ কয়েকজন নাট্যকর্মী তাঁদের নাট্য প্রযোজনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। প্রসঙ্গত শম্ভু মিত্রের বহুরূপী প্রযোজিত ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনার কথাও এখানে উল্লেখ্য। ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মুক্তির সংগ্রাম এবং শাসক-শ্রমিকের সংঘর্ষ ও আন্দোলন ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনার মধ্য দিয়ে সেদিন শম্ভু মিত্র দর্শককে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন। উৎপল দত্ত কিংবা তারও পরে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁরাও তাঁদের মতো করে থিয়েটারের আরেকটা ভিন্নমুখী ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তিন প্রবল এই নাট্য ব্যক্তিত্বের সমান্তরালে বাংলা থিয়েটারের জগতে উঠে এলেন বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটার নিয়ে। দল গঠন, নাটক লেখা, পরিচালনা করা, তারপর আঙ্গিক-ছক তৈরি এবং অভিনয় সব ক্ষেত্রেই বাদল সরকার বাংলা থিয়েটারে এক নতুন নাট্যচিন্তার উদ্ভাবক, যা সমকাল তো বটেই বর্তমান সময়েও বহু আলোচিত বিষয়। বাদল সরকারের নাট্যকর্ম তথা তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটার নিয়ে, নাট্যকর্মী বাদল সরকারকে নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। আসলে বাদল সরকার সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন না হওয়ার দরুন তাঁর সম্পর্কে একটা সরলীকরণ করা হয়। আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে নাট্যকর্মী বাদল সরকার সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণা কর্মটি বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে বাদল সরকারের যথার্থ স্থানটি নির্মাণ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা রাখি।

প্রথম অধ্যায় নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত

যে কোন শিল্পীর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নানা ঘটনা, জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত থাকে। সেইসব ঘটনা বা ঘাত প্রতিঘাত আমাদের চিনিয়ে দেয় সেই মানুষটিকে যিনি প্রতিনিয়ত নিজেকে একটু একটু করে গড়ে তোলেন। একজন শিল্পী তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবন তথা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আবহ থেকে জীবনের পাঠ নেন। দৃশ্যত এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মধুর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিক্ত অভিজ্ঞতাও। আর এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। ছোটবেলায় বাদল সরকার নাটক পড়তে খুব ভালোবাসতেন। যখন ইংরেজি পড়তে শিখলেন একটু-আধটু তখন নাটক দিয়ে শুরু করলেন। নাটক তাঁর প্রথম ভালোবাসা। ১/A পিয়ারি রোড-এর বাড়ির তিনতলার তাঁর বাবার পড়বার ছোট ঘরটি ছিল বাদলের প্রিয়। এই ঘরেই বাদল সরকার কোনো একটা বাংলা নাটক নিয়ে একাই সব ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরোক্ষ প্রভাবিত করেছেন তখনকার দিনের ক্রিস্ট্যাল-সেট রেডিও নাটক। সে সময়কার জনপ্রিয় সাধারণ পেশাদারি মঞ্চ স্টার, রঙমহল-মিনার্ভা'র মতো মঞ্চের সফল প্রযোজনাগুলো সরাসরি রেডিওতে প্রচার হত। ফলে সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই নাট্যজগতের বিখ্যাত সব মানুষজন যেমন শিশির ভাদুড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহিন্দ্র চৌধুরী, প্রভাদেবী এঁদের কণ্ঠস্বর বাদলের পরিচিত ছিল রেডিওর কল্যাণে।

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা হল দ্বিতীয় বীজ। পাশাপাশি থিয়েটার দেখার ছোটোখাটো কিছু অভিজ্ঞতাও পরোক্ষ থিয়েটারের প্রতি তাঁকে অনুরক্ত করেছিল। স্কুলের হস্টেলে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছোটো-খাটো নাটক হতো যা ছিল ছাত্রদের নিজস্ব অনুষ্ঠান। তখনকার মতো এইসব অভিনয় দেখা ছিল বাদল সরকারের একমাত্র সম্বল। এভাবেই তিনি আরো বেশি করে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এভাবেই থিয়েটারের বীজানুর প্রকাশ ঘটেছিল বাদল সরকারের জীবনে।

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার মূলে তাঁর ক্লাস সিক্সের বাংলার শিক্ষক সরসীবাবুর প্রভাবও পরোক্ষভাবে রয়েছে। বাদল সরকার শিক্ষক সরসীবাবুর পরামর্শে একদিন লিখে ফেললেন সপ্তম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তকের পিভারী যুদ্ধ অবলম্বনে ‘পিভারীর যুদ্ধ’ নাটক। নাটকে হাতেখড়ি এই প্রথম। আর একেবারে নাট্যকার, পরিচালক এবং প্রধান অভিনেতা হিসেবে বাদলের আত্মপ্রকাশ ঘটল ইংরেজি ‘স্লিপার্স অফ সিভিলারেল’ নামে একটি নাটকে। এরপর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বাদলকে যেতে হয়, কিন্তু থিয়েটার নিয়ে, নাটক তিনি নানা ভাবনা চিন্তা করেছেন এবং

নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। আর এভাবেই একদিন নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র এক থিয়েটার দর্শন। নিজেই গড়েছেন তাঁর নিজস্ব নাটকের দল ‘শতাব্দী’। করেছেন অসংখ্য নাট্য ওয়ার্কশপ। একজন নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা ও নাট্য সংগঠক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার এই যে দীর্ঘ ইতিবৃত্ত, কীভাবে নানা ঘটনা, অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনি একজন নাট্যকর্মী হয়ে উঠলেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় নাট্যকর্মী বাদল সরকার

নাট্যকর্মী বাদল সরকারের নাট্যজীবনের প্রসেনিয়াম পর্ব সম্পর্কে এই অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর স্বাতন্ত্র্য কোথায় এবং কীভাবে ধীরে ধীরে তিনি প্রসেনিয়াম থিয়েটারে নাট্যকর্ম শুরু করেও তাকে অতিক্রম করে থার্ড থিয়েটারে যাত্রা করলেন তা আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টিতে দুটি ভিন্ন শিরোনাম বিভাগ রেখে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রসেনিয়াম থিয়েটার প্রথম পর্ব

বাদল সরকারের নাট্য জীবনের আদি পর্বটি হল প্রসেনিয়াম থিয়েটার পর্ব। ‘সলিউশন এক্স’ (১৯৫৬) থেকে ‘শেষ নেই’ (১৯৭০) পর্যন্ত লিখিত নাটকগুলি এই পর্বের অন্তর্গত। প্রসেনিয়াম পর্বের নাটকগুলির মধ্যে দুই ধরনের বিষয় ও নাট্যবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে বেশ কিছু নাটক লেখা হয়েছে সিন্টিয়েশনাল কমেডি’র আঙ্গিকে। হাসি দিয়ে, মজা দিয়ে, জীবনের যত অসম্মতি ও বাহুল্যকে নাট্যকার সামনে তুলে এনেছেন। গভীরতর জীবন ব্যঞ্জনার কথাও তিনি এই পর্বে হালকা সুরে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। ‘কবিকাহিনী’, ‘বিচিত্রানুষ্ঠান’, ‘বড়ো পিসীমা’, ‘সলিউশন এক্স’, ‘শনিবার’, ‘রাম শ্যাম যদু’, ‘যদি আর একবার’ প্রভৃতি নাটকগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই পর্বটিকে আমরা প্রসেনিয়াম থিয়েটার কর্মের অন্তর্গত প্রথম পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এই পর্বে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি নিছক নাটকের প্রতি, থিয়েটারের প্রতি একটা ভালো লাগার জায়গা থেকেই বাদল সরকার নাট্য জগতে প্রবেশ করেন। মাধ্যমিক পড়ার সময় তাঁর মেজদির পাঠ্যবই থেকে ‘স্লিপার্স অফ সিভিলিটি’ নাটক লিখলেন। আর শুধু লেখাই নয়, অভিনয় করা থেকে নাট্য পরিচালন সবটাই বাদল সরকার করলেন যা তাঁর নাট্যকর্মী হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের লেকচারার পদে থাকার সময় কয়েকজন

উৎসাহিকে নিয়ে তৈরি করেছেন “Entally Novice Artistes Cultural Association” বা ‘এনাকা’ গোষ্ঠী। ‘এনাকা’-র গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে বাদল সরকার প্রযোজনা করেছেন সুবোধ বসুর ‘অতিথি’, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লাল পাঞ্জা’। মাইথনে থাকার সময় মাইথন রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে অভিনয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের ‘মানময়ী গার্লস্ স্কুল’ নাটক। আবার ‘চক্র’ (১৯৬০) নামে একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছেন তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেলের কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে। ‘চক্র’-এর সদস্যদের সহযোগিতায় বাদল সরকার তাঁর একের পর এক উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা করেছেন এই পর্বে। এই পর্বটিই আমরা প্রসেনিয়াম পর্বের প্রথম পর্ব হিসেবে বেছে নিয়েছি। এই পরিচ্ছেদে আমরা বাদল সরকারের নাট্য জীবনের ভিত্তি অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছি।

প্রসেনিয়াম থিয়েটার : দ্বিতীয় পর্ব

প্রসেনিয়াম থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্বের লিখিত নাটক এবং নাট্যায়নের মধ্যে বাদল সরকারের থিয়েটার ভাবনা ক্রমশ একটা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। আমরা লক্ষ্য করি বাদল সরকারের ব্যক্তিগত জীবনে এই সময় একটা অস্থিরতা তাঁকে গ্রাস করে। এই পর্বে লেখা ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর হতাশ, ‘পাগলা ঘোড়া’-র অস্তিত্বহীনতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বুর্জোয়া অবক্ষয় এবং বিচ্ছিন্নতা এই সময়কার বেশ কিছু নাটকে লক্ষ্য করা যায়। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, ‘ত্রিশ শতাব্দী’, ‘বাকি ইতিহাস’, ‘সারারাত্তির’, ‘পাগলা ঘোড়া’ প্রভৃতি নাটকে ব্যক্তির হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, অবসাদ প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়।

এই পর্বে বাদল সরকারের নাট্যজীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শম্ভু মিত্রের ‘বহুরূপী’ নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। একেবারে নিজের দায়িত্বে নিজের নাট্যদল তৈরি করে নাট্য প্রযোজনা করবার প্রাথমিক সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। তাই বহুরূপীতে কাজ করার যখন সুযোগ তাঁর কাছে এলো তখন তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন বহুরূপীর সঙ্গে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বহুরূপী ত্যাগ করে তাঁর নিজস্ব নাট্যভাবনার প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন এই পর্ব। আর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন থার্ড থিয়েটারের দিকে। বাদল সরকার প্রসেনিয়ামের গতানুগতিকতা স্বীকার করে নিয়েও সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। কীভাবে নাটককে আরো বেশি দর্শকের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া তার চেষ্টা করেছেন। এই পর্বান্তরের অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে পর্বে।

তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় ধারার থিয়েটার

১৯৭০-এর দশকের গোড়া থেকেই বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটার মঞ্চের যে ঘেরাটোপ ও সীমাবদ্ধতা সেটিকে ভেঙে দিয়ে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বিকল্প থিয়েটারের সন্ধান শুরু করেন। যাকে থার্ড থিয়েটার বলা হয়। এই সময় থেকেই বাদল সরকার তাঁর নাটকের বিষয়ের পরিবর্তন ঘটাতে থাকেন এবং বুঝতে পারেন, পুরোনো নাট্যভঙ্গি দিয়ে এই পরিবর্তিত নাট্যভাবনাকে ধরা যাবে না। তাই তিনি বিষয় অনুযায়ী নাট্যাঙ্গিক বেছে নেন এবার। প্রথম দিকে ‘সিচুয়েশনাল কমেডি’-র মজা ও হাসি দিয়ে জীবনকে দেখার একটা চেষ্টা করতে করতে তিনি ক্রমে গভীরতর জীবনব্যঞ্জনার কথা বলেছিলেন। এবারে সেইসব প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নতুন ধরনের নাট্য প্রয়াসে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। বাস্তব জগৎ তাঁকে এবার নাটকের তত্ত্বের চেয়েও জীবন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। এইখান থেকেই তাঁর নাট্যরচনার ও পরিচালনার প্রয়োগ পদ্ধতি পালটে গেল। ‘শতাব্দী’ নাট্যদলকে নিয়ে বাদল সরকার অঙ্গনমঞ্চের অভিনয় শুরু করলেন— ক্রমে সেখান থেকে তিনি আরও অগ্রসর হয়ে পৌঁছে গেলেন মুক্তমঞ্চের অভিনয়ের দিকে। অঙ্গনমঞ্চ থেকে মুক্তমঞ্চ এই হলো থার্ড থিয়েটার। থার্ড থিয়েটারের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে বাদল সরকার জানিয়েছেন— ‘বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের তাগিদে তৃতীয় থিয়েটারের জন্ম। সুতরাং স্বভাবতই এই থিয়েটারের উৎস কী বলতে চাইছি, অর্থাৎ মন। তার থেকে আসছে কাকে বলতে চাইছি এবং এই দুটি থেকে আসছে কীভাবে বলব। বিষয়বস্তু তৃতীয় থিয়েটারের মূল, নতুন নাট্যশৈলী আবিষ্কার ও প্রবর্তন তৃতীয় থিয়েটারের উদ্দেশ্য নয়।’ অর্থাৎ আঙ্গিক কিংবা নাট্যগঠন প্রক্রিয়া তৈরি করে নিয়ে সেই উপযোগী নাট্যবিষয় অনুসন্ধান তিনি করেননি। থার্ড থিয়েটারের মূল হচ্ছে বিষয়বস্তু। তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের তাগিদেই নাট্যাঙ্গিক নির্মাণ করে নিতে হয়েছে তাকে। ‘সার্কাস’ (১৯৭০) থেকে ‘নদীতে’ (২০০২) পর্যন্ত লিখিত নাটকগুলি বাদল সরকারের এই নতুনতর নাট্যদর্শনের নিদর্শন। এই পর্বে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক হলো; ‘সাগিনা মাহাতো’, ‘স্পার্টাকুস’, ‘মিছিল’, ‘ভোমা’, ‘লক্ষীছাড়ার পাঁচালী’, ‘পাগলা ঘোড়া’, ‘বাকি ইতিহাস’, ‘সাদা-কালো’ প্রভৃতি। ১৯৭১-এ ‘সাগিনা মাহাতো’ অভিনয়ের সময় থেকে তাঁর অঙ্গনমঞ্চ ভাবনা রূপলাভ করতে থাকে। ১৯৭২-এ ‘স্পার্টাকুস’ নাট্যায়নের মধ্যে দিয়ে পুরোপুরি নেমে এলেন অঙ্গনমঞ্চে। স্বভাবতই বোঝা যায়, অন্য নাটকগুলির সঙ্গে বাদল সরকারের এই পর্বের নাটকের স্পষ্টত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য যেমন প্রয়োগের দিক থেকে তেমনি নাট্যগঠন ও নির্মাণের দিক থেকেও। এইসব নাটকে থাকে না কোনো সুনির্দিষ্ট নাট্যগঠন এবং নিয়ন্ত্রিত কোনো নাট্যকাহিনি। ছোট ছোট বিভিন্ন এপিসোড তৈরি

করে সেইমতো সিচুয়েশন নির্মাণ করা হয়। আর এই ছোট ছোট বৃত্তের নির্মিতির মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে সমগ্র নাটকের পরিধি। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জন্য লেখা নাটক বাদল সরকারকে নাট্যকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু তাঁর যা কিছু খ্যাতি বা সাফল্য তার সবই এই বিকল্প বা থার্ড থিয়েটারের জন্য। এই পরিচ্ছেদে আমরা বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার তথা তাঁর নাট্যভাবনার যাবতীয় বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায় সমকালীন নাট্যকর্মী ও বাদল সরকার

বাদল সরকারের সমকালে বাংলা থিয়েটার জগতে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রবল জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাঁদের নাট্যকর্ম অব্যাহত রেখেছেন। শম্ভু মিত্র ও তাঁর বহুরূপী নাট্যদল সূক্ষ্ম শিল্পরস ও মানব সম্পর্কের জটিল আখ্যান তুলে ধরে প্রবলতম খ্যাতির শীর্ষে। অভিনয় ও উপস্থাপনার সর্বসঙ্গীন গুণে তিনি তাঁর নাট্যকর্মকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। অন্যদিকে উৎপল দত্ত ও তাঁর ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’ নাট্যদলও নাটকের বিষয়ের বিস্তারে, ভাবনার প্রকাশে এবং উপস্থাপনার মুগিয়ানায় বাংলা থিয়েটারে তখন খ্যাতির শীর্ষে। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের পাশাপাশি বাংলা থিয়েটারে আর এক নতুন প্রাণাবেগ সঞ্চার করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ‘নান্দীকার’ নাট্য দল এক ভিন্নমুখী ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত কিংবা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও আগে বাংলা থিয়েটারের আধুনিক পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্মও এই প্রসঙ্গে সমান আলোচ্য। এই অধ্যায়ে বাংলা থিয়েটারের এই চারজন প্রবল নাট্য ব্যক্তিত্বের নাট্যকর্মের স্বরূপ অন্বেষণের সূত্রে বাদল সরকারের নাট্যকর্মের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায় নাট্যকার বাদল সরকার

বাদল সরকার প্রসেনিয়াম আর অঙ্গনমঞ্চ দুটি মিলিয়ে ছোট-বড় ৫০ এর বেশি নাটক লেখেছেন। আর তার বেশিরভাগই নিজের সংস্থা ‘চক্র’ বা ‘শতাব্দী’-র জন্য মঞ্চায়ন করেছেন। ‘সলিউশন এক্স’ (১৯৫৬), ‘বড়ো পিসীমা’ (১৯৫৯), ‘শনিবার’ (১৯৫১), ‘কবি কাহিনী’ (১৯৬৪) প্রভৃতি হাসির নাটকের পাশাপাশি সিরিয়াস নাটকও লিখেছেন। যেমন— ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ (১৯৬৩) ‘বাকি ইতিহাস’ (১৯৬৫), ‘ত্রিশ শতাব্দী’ (১৯৬৬), ‘সাগিনা মাহাতো’ (১৯৭১), ‘স্পার্টাকুস’ (১৯৭২),

‘ভোমা’ (১৯৭৫) প্রভৃতি। একজন সম্পূর্ণ সমাজসচেতন মানুষ ছিলেন বাদল সরকার। নিজের বিশ্বাসের জায়গায় থেকে কোনো দিনও সরে আসেননি। সমাজের ছোট-ছোট ত্রুটি যা এক সময় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন তাঁর নাটকের মাধ্যমে। নিজে কোন বিশেষ দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত না থাকলেও একটা শোষণ মুক্ত সমাজের তিনি স্বপ্ন দেখেছেন। আর এসবই উঠে এসেছে তাঁর লিখিত নাটকে। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁর প্রধান প্রধান কয়েকটি নাটকের আলোচনাসূত্রে এই সামগ্রিক বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একই সঙ্গে তাঁর নাটকের আঙ্গিকের স্বরূপ অন্বেষণেরও চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরবর্তীকালীন নাট্যচর্চায় বাদল সরকারের প্রভাব

সমকালীন বাংলা থিয়েটারেই শুধু নয়, ভারতীয় থিয়েটারেও বাদল সরকার একটা নতুন মাত্রা দান করেছেন। প্রসেনিয়াম মঞ্চে সফল হয়েও সেখান থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে অঙ্গনমঞ্চ এবং পরে অঙ্গনমঞ্চ থেকে মুক্তমঞ্চে চলে আসেন। নির্মাণ করলেন এদেশে নতুন ধরনের এক থিয়েটার-থার্ড থিয়েটার। তাঁর প্রবর্তিত থার্ড থিয়েটারের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও। বিভিন্ন নাট্যদল বাদল সরকারের নাট্যদর্শকেই পাথেয় করে এখনও তাঁদের নাট্যচর্চার দ্বারা অব্যাহত রেখে চলেছেন। এই অধ্যায়ে নাট্যকর্মী বাদল সরকারের নাট্যচিন্তা, তথা তাঁর থিয়েটার দর্শন পরবর্তীকালীন নাট্যচর্চায় কতখানি প্রভাব ফেলেছে তা অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

উপসংহার

বাদল সরকারের নাট্যকর্ম নিয়ে একটা সময় নানা বিতর্ক হয়েছিল, এমনকি এখনও হয়। অনেকেই তাঁর নাটক এবং থিয়েটার নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার কতটা প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নও ওঠে। এটা ঠিক যে একটা সময় পর্বে এসে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার তার গৌরব হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে নব্বই-এর দশকের পর বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার অনেকটাই বিস্মৃত হয়ে যায়। এ বঙ্গের অনেকেই উদাসীনতা দেখিয়েছেন। আমরা উপসংহারে এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাদল সরকারের নাট্যকর্মের প্রাসঙ্গিকতা তথা তাঁর সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি।

ভূমিকা

২০২২-এর ৭ ডিসেম্বর বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার দেড়শো বছর। এই দেড়শ বছরের ইতিহাসে বাংলা থিয়েটার নানা ঘটনা পরম্পরার মধ্যে দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। বারবার তার গতি পরিবর্তিত হয়েছে। আবির্ভাব ঘটেছে বহু খ্যাতনামা নাট্য ব্যক্তিত্বের। এদেশে উনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকেই অপেশাদার ও শৌখিন থিয়েটারের প্রচলন শুরু হয়। বাঙালির থিয়েটার চর্চা শুরু হয় নিতান্ত শখ-শৌখিনতার প্রয়োজনে। সাহেবদের বিলেতি থিয়েটারে নাটক দেখেই যে বাঙালির নাট্যাভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ও নাট্যবোধ গড়ে ওঠে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। এ প্রসঙ্গে আমরা একজন বিদেশীর নাম করতে পারি যিনি সর্বপ্রথম বাংলার নিজস্ব একটি রঙ্গালয় স্থাপন করে মঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় করেছিলেন। তিনি হলেন রুশ দেশীয় হেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ। তাঁর ‘বেঙ্গলী থিয়েটার’ (১৭৯৫) প্রথম বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার। এরপর কলকাতার ধনী ও মান্যগণ্য ব্যক্তিদের উৎসাহে ও আনুকূল্যে নাট্যমঞ্চ তৈরি করে নির্মিত হল বাঙালির নিজস্ব থিয়েটার। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারকেলডাঙ্গার ‘হিন্দু থিয়েটার’ (১৮৩১), শ্যামবাজারের ‘নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটার’ (১৮৩৩), পাইক পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের ‘বেলগাছিয়া থিয়েটার’ (১৮৫৮)। সেইসময় এই রকম অসংখ্য নাট্যশালা গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত এই সব থিয়েটারের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমোদ-প্রমোদ। একটা আভিজাত্যপূর্ণ শৌখিনতা এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। তবে শখ-শৌখিনতার কথা বাদ দিলেও বাঙালির নাট্যবোধ নির্মাণে এই ধরনের থিয়েটারের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। বাঙালির নাট্যচর্চার ইতিহাসে এই পর্বটির ইতিবাচক ভূমিকা আছে বৈকি।

বাঙালি নির্মিত এই সব শৌখিন থিয়েটারে অভিনীত নাটকের নাট্যরস গ্রহণ থেকে সাধারণ বাঙালি দর্শক দীর্ঘদিন পর্যন্ত কিন্তু বঞ্চিতই ছিল। আর ঠিক এই কারণেই আজ থেকে দেড়শ বছর পূর্বে ১৮৭২ সালে কয়েকজন নাট্যোৎসাহী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করলেন সাধারণ রঙ্গালয় বা ন্যাশনাল থিয়েটার। উদ্দেশ্য রাজা, জমিদার, মুৎসুদ্দি পরিবারের বাঁধা মঞ্চের আওতা থেকে বের করে থিয়েটারকে জনতার উপভোগ্য করে তোলা, তাকে সার্বজনীন করে তোলা। প্রথম দিকে সেই অনুযায়ী সাধারণ রঙ্গালয়ে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সাধারণের জন্য থিয়েটারের দ্বার উন্মুক্ত হলো যখন, তখন পেশাদারিত্বের বিষয়টি অনিবার্য ভাবে এসে গেল। ফলে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। গড়ে উঠল একেরপর এক বাণিজ্যিক থিয়েটার। দর্শকের চাহিদা-রুচি অনুযায়ী বাণিজ্যিক থিয়েটারগুলিতে নাট্যাভিনয় চলতে থাকে। কখনো পৌরাণিক, কখনো ঐতিহাসিক, কখনো সামাজিক, কখনো পারিবারিক আবেগ প্রধান কাহিনির মধ্যেই তখন

থিয়েটার ছিল আবর্তিত। এই ধরনের থিয়েটারের পরিমণ্ডলেই আবির্ভাব ঘটেছিল অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী এবং আরও পরবর্তীকালে শিশির কুমার ভাদুড়ীর মতন নাট্যব্যক্তিত্বের। আবির্ভাব ঘটে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, কিংবা ত্রিশের দশকের মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখের মতো নাট্যকারদের। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে বাণিজ্যিক থিয়েটারের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও তাঁরা নাটক রচনা এবং নাট্যায়ন সবদিক থেকেই বাংলা থিয়েটারের অগ্রগতিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। এঁদের আত্মত্যাগ ও সাধনার পথ বেয়েই বাংলা থিয়েটার পরবর্তী স্তরে পৌঁছোয়। দেখা যাচ্ছে চল্লিশের দশকে এসে বাংলা থিয়েটার এবার তার গতি পরিবর্তন করে নতুন পথে বাঁক নিলো। ১৯৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত হলো ‘ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ’, শুরু হল গণনাট্য আন্দোলন। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নতুন সমাজতান্ত্রিক চেতনা, পঞ্চাশের মধ্যস্তরের করাল গ্রাস, স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বীর জোয়ার সেই পুরোনো ভাবধারা ও সাহিত্য চেতনার সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়ে বাংলা মধ্যে যে অপ্রত্যাশিত অথচ প্রার্থিত পালাবদল নিয়ে এলো তারই নাম গণনাট্য আন্দোলন। বাংলায় এই প্রথম পেশাদার বাণিজ্যিক থিয়েটারের বিকল্প একটি থিয়েটারের উঠে এলো। থিয়েটার আর শুধু ব্যবসায়িক প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। থিয়েটার হয়ে উঠলো জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার অন্যতম হাতিয়ার। এই থিয়েটার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের যাবতীয় বৈভব থেকে অনেকটাই সরে এসে হয়ে উঠলো সহজলভ্য। এমন নয় যে বাণিজ্যিক থিয়েটার উঠে গেল। তবে পেশাদার বাণিজ্যিক থিয়েটারের সমান্তরালে গণনাট্য সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত অবাণিজ্যিক থিয়েটারের একটা কনসেপ্ট বাংলা নাট্যজগতে প্রবল জনপ্রিয়তার সঙ্গে উঠে এলো।

স্বাধীনতার পর দেশগঠনের ব্যর্থতা, উদ্বাস্ত সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন, কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা মানুষের মনে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার করে। শুরু হয় একের পর এক রাজনৈতিক আন্দোলন। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। চলে শাসকের দমন-পীড়ন। এই আবহেই জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বামপন্থী মতাদর্শ প্রসারিত হতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ইতিমধ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। মার্কসবাদীচিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী ছাত্র-যুব, শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত, শহর ও গ্রাম এককথায় সমস্ত স্তরের মানুষ তখন সেই আন্দোলনে উজ্জীবিত। সেই সময়কার সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ, জ্বালা-যন্ত্রণা কিংবা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বাণিজ্যিক থিয়েটারগুলির অভিনয়ের মধ্যে পাওয়া সম্ভব ছিল না, বরং বাণিজ্যিক থিয়েটারে সামগ্রিক নাট্য পরিচালনায় গতানুগতিকতা ও একঘেঁয়েমি দর্শক সাধারণের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল। শিশির ভাদুড়ী অবশ্য এর ব্যতিক্রম ছিলেন। একদিকে তিনি যেমন পুরনো নাটক

দিয়েই বাংলা থিয়েটারকে আকর্ষণীয় করে তোলেন, তেমনি বাস্তববাদী অভিনয়ের নতুন ধারার ইঙ্গিত দেন ‘জীবনরঙ্গ’, ‘দুঃখীর ইমান’ প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে। নতুন যুগে নতুন ভাবনায় ও পদ্ধতিতে নাটক পরিচালনায় তিনি যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁর একক প্রচেষ্টায় বাণিজ্যিক থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। আসলে সামগ্রিক ভাবে বাণিজ্যিক থিয়েটারগুলি সমকালীন বাস্তব অভিঘাত থেকে ছিল দূরে। এই প্রেক্ষাপটেই বাংলা থিয়েটারে উঠে এলো গণনাট্য সঙ্ঘ। গণনাট্য সঙ্ঘ যে সেদিন বাংলা থিয়েটারের শরীরে এক ভিন্নমুখী গতি সঞ্চার করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গণনাট্য আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত এই সঙ্ঘ শেষ পর্যন্ত সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারল না। নানা মত ও মতের পার্থক্য এতো প্রবল হয়ে উঠল যে একটা সময় গণনাট্য সঙ্ঘ ভেঙে যায়। গড়ে ওঠে একটির পর একটি গ্রুপ থিয়েটার। মোটামুটি ১৯৫০-এর মাঝামাঝি সময় থেকেই বাংলা থিয়েটারে গ্রুপ থিয়েটারের ধারণা নতুন মাত্রা পায়। থিয়েটারকে রাজনৈতিক ভাবে প্রভাব মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ মিলে গঠন করলেন ‘বহুরূপী’ নাট্যগ্রুপ। বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন ‘ক্যালকাটা থিয়েটার’। উৎপল দত্ত প্রতিষ্ঠা করলেন ‘এল টি জি’ (১৯৪৯), এবং পরবর্তীতে ‘পি এল টি জি’। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় খুললেন, ‘নান্দীকার’ (১৯৬০)। এর বাইরেও আত্মপ্রকাশ করে এরকম অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটার। এইসব গ্রুপ থিয়েটারগুলি একটা সময় অভিনয় ও উপস্থাপনায় থিয়েটারের মানকে উতুঙ্গ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। বিশেষ করে বলতে হয় শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত কিংবা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নাট্য ব্যক্তিত্বদের নাট্যকর্মের কথা। এঁদের নাট্যপ্রতিভার স্পর্শে গ্রুপ থিয়েটারগুলি তখন থিয়েটারের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল। দর্শন চৌধুরী গ্রুপ থিয়েটারের সেই গৌরবময় ইতিহাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

“কতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কতো বর্ণময় উপস্থাপনা, ভাব ও ভাবনার কতো সংঘাতের চড়াই-উৎরাই, কতো আঘাত-প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটার মানুষের শিল্পভাবনার স্তরকে উন্নত করে চলেছে। মানুষের চেতনার স্তরকে বিস্তৃত করে চলেছে। বাংলা গ্রুপ থিয়েটার সেদিন মানুষকে জাগানোর দৃঢ় শপথ নিয়ে তারই শিল্পসম্মত মন্তোচ্চারণ করে চলেছে। বাংলা থিয়েটারের সে এক মহাসমারোহের কাল।”

বাংলা থিয়েটারের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গ্রুপ থিয়েটারের সেই গৌরবময়

পর্বে পেশাদার বাণিজ্যিক থিয়েটার তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। সেই জায়গায় স্থানান্তর ঘটে গ্রুপ থিয়েটারের। পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটারগুলি আদর্শচ্যুত হয়ে ধীরে ধীরে প্রফেশন্যাল তথা পেশাদার থিয়েটারের পরিণত হয়। ষাট-সত্তরের দশকের অপেশাদার গ্রুপ থিয়েটার আশির দশকে এসে পেশাদার থিয়েটারে পরিণত হয়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নাট্য ব্যক্তিত্বকেও গ্রুপ থিয়েটারে পেশাদারিত্বের পক্ষে সওয়াল করতে শোনা যায়। আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দেখা যায় গ্রুপ থিয়েটার শুধুমাত্র একটা সাইনবোর্ড মাত্র। তাঁদের নিজস্ব কোন দল নেই। দেবশঙ্কর হালদারের মতো নাট্য ব্যক্তিত্বও তাঁর প্রতিভাকে পুঁজি করে যখন যে দলে সম্ভব হচ্ছে থিয়েটার করে যাচ্ছেন। ঠিক এই জায়গা থেকেই নাট্যকর্মী বাদল সরকার ও তাঁর থিয়েটার কর্ম নিয়ে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা। বাদল সরকার আর পাঁচজন সাধারণ নাট্যকর্মীর মতই বাণিজ্যিক থিয়েটারের পরিমণ্ডলে তাঁর থিয়েটার কর্ম শুরু করেন। নাটক রচনা থেকে শুরু করে তার মঞ্চায়ন, সবটাই করেছেন বাণিজ্যিক থিয়েটারের চাহিদা মেনে। কিন্তু বাদল সরকার শেষ পর্যন্ত বাণিজ্যিক থিয়েটারের যাবতীয় প্রলোভনকে উপেক্ষা করে বাংলা থিয়েটারে নির্মাণ করেছেন একটি স্বতন্ত্র পথ। গণনাট্য সঙ্ঘ-এর মতো কোন পার্টি পলিটিক্যাল থিয়েটার নয়, কিংবা গ্রুপ থিয়েটারগুলির মতো শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নয়, সম্পূর্ণ ভিন্নপথ ও পদ্ধতিতে বাদল সরকার তাঁর থিয়েটার কর্মকে একটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছেন। নির্মাণ করেছেন বিকল্প তথা থার্ড থিয়েটার। যার মূল আদর্শ থিয়েটারকে যাবতীয় শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। তিনি বিশ্বাস করতেন, থিয়েটার কোন পণ্য নয় যে বিক্রি করা যায়। থিয়েটার সাধারণ মানুষের, থিয়েটার সর্বসাধারণের। তাই থিয়েটারকে তিনি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, থিয়েটার করতে কারো কাছে হাত পাতবার প্রয়োজন হয় না, কিংবা অনুদানেরও প্রয়োজন নেই। গ্রুপ থিয়েটারগুলির অস্তিত্ব যখন আজ সংকটের মুখে, তখন আজকের দিনে দাঁড়িয়েও বাদল সরকারের থিয়েটার ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। বাদল সরকার কীভাবে একটু একটু করে নিজেকে নির্মাণ করলেন, কীভাবে পৌঁছলেন থিয়েটারের একটি বিশেষ দর্শনে— এককথায় নাট্যকর্মী বাদল সরকারের সম্পর্কে একটা নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করাই আমার এই গবেষণা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

নাটক লেখা, মঞ্চায়ন, অভিনয়, পরিচালনা করা— এই হল বাদল সরকারের পরিচয়। আমার গবেষণা প্রকল্পে তাই বাদল সরকারকে ‘নাট্যকর্মী’ শব্দবন্ধে অভিহিত করা হয়েছে। বাদল সরকার নিজেকে নাট্যকর্মী পরিচয় দিতেই বেশি পছন্দ করতেন। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

“আমি কিন্তু নাট্যকার নয়, প্রধানত নাট্যকর্মী। নাটক লেখা, পরিচালনা করা আর অভিনয় করা— এইটে হচ্ছে আমার সত্যিকারের পরিচয়।”^২

আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পে নাট্যকর্মী বাদল সরকারের নাট্যাদর্শের স্বরূপ আমি নিম্নলিখিত অধ্যায় বিভাজন করেছি।

প্রথম অধ্যায় : নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত

দ্বিতীয় অধ্যায় : নাট্যকর্মী বাদল সরকার

প্রসেনিয়াম থিয়েটার: প্রথম পর্ব

প্রসেনিয়াম থিয়েটার: দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় অধ্যায় : বাদল সরকারের নাট্যভাবনা : তৃতীয় ধারার থিয়েটার

চতুর্থ অধ্যায় : সমকালীন নাট্যকর্মী ও বাদল সরকার

পঞ্চম অধ্যায় : নাট্যকার বাদল সরকার

ষষ্ঠ অধ্যায় : পরবর্তীকালীন নাট্যচর্চায় বাদল সরকারের প্রভাব

আমার গবেষণা প্রকল্পে উক্ত অধ্যায়গুলির শিরোনামের দিকে লক্ষ্য রেখে নাট্যকর্মী বাদল সরকারের নাট্যাদর্শের অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছি। আমার গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে নাট্যকর্মী বাদল সরকারের থিয়েটার প্রীতি, থিয়েটার নিয়ে তাঁর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তাঁর আগ্রহ পূর্ণাঙ্গ রূপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সেইসঙ্গে বাংলা থিয়েটারের জগতে তিনি যে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিলেন সেই বিষয়টিও এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে। এই গবেষণা কর্মের অগ্রগতিতে প্রধানত তথ্যসংগ্রহ ও তথ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করছি আমার এই গবেষণা কর্ম নাট্যকর্মী বাদল সরকার সম্পর্কে নতুন দিশা দেখাবে।

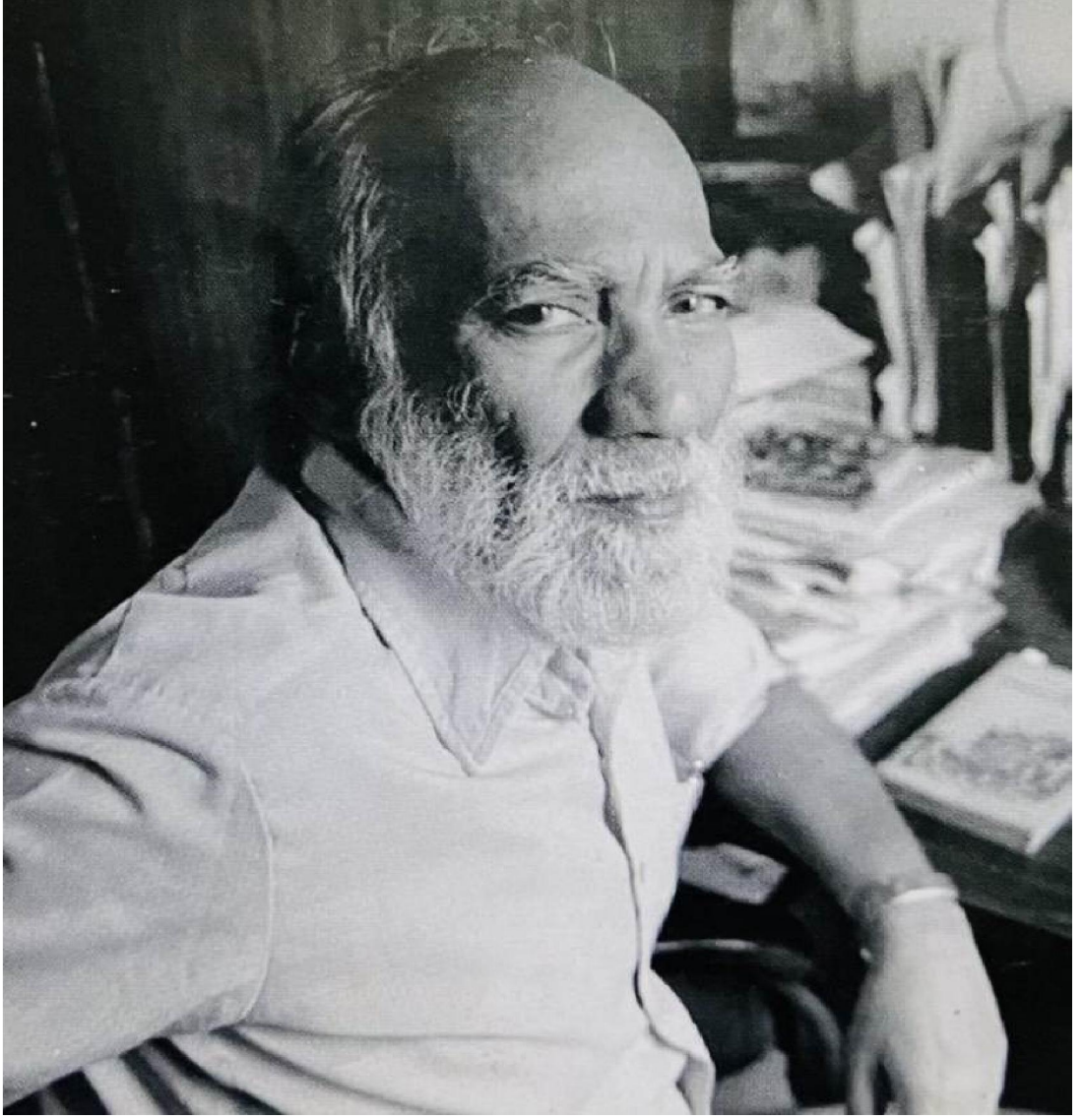
তথ্য সূত্র:

১. চৌধুরী, দর্শন : নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃ-১১
২. বাদল সরকার-এর সাক্ষাৎকার: বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২ পৃষ্ঠা-৯৯

প্রথম অধ্যায় নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা তথা সমগ্র ভারতে নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা বাদল সরকার একাই এক প্রতিষ্ঠান। পেশায় টাউন-প্ল্যানার বাদল সরকার পাঁচ-এর দশকের গোড়া থেকেই আস্তে আস্তে থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ছোট বড়ো মিলিয়ে বিভিন্ন শ্রেণির ৫০টিরও বেশি নাটক লিখেছেন। লঘু কমেডি থেকে গভীর জীবনবেদ-বিপুল বৈচিত্র্যের সম্ভারে ঋদ্ধ তাঁর নাটক। কিন্তু নাট্যকার বাদল সরকারকেও ছাপিয়ে থাকেন একজন পুরো নাট্যকর্মী বাদল সরকার। প্রসেনিয়াম মঞ্চ থেকে দর্শকের সমস্তুরে নিজেকে নামিয়ে এনে, বাড়তি উপাদানগুলিকে কেটেছেটে বাদ দিয়ে, নাটকে তিনি করে তুলতে চেয়েছেন নমনীয়, বহনীয় ও সুলভ। তাঁর প্রবর্তিত অঙ্গন মঞ্চের নাট্যরীতি শুধু নাটক নয়— এক পরিপূর্ণ দর্শন। শহর থেকে গ্রামে সর্বত্রই সচল নির্মদ থিয়েটার নিয়ে বাদল সরকার ও তাঁর দল ‘শতাব্দী’ আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের এক প্রধান পথিকৃৎ। অথচ থিয়েটারের সঙ্গে কোনো নাড়ীর যোগ তাঁর ছিল না। এমনকি চারপাশের পরিবেশ থেকেও তিনি থিয়েটার সম্বন্ধে কিছুই পাননি। “— তবু সেই বেপরোয়া মানুষটি কোন মায়াবি আলোর মধ্যে যে থিয়েটারকে তাঁর ‘জীবনের ধ্রুবতারা’ হিসেবে আবিষ্কার করেছিলেন সে এক রহস্য।” সত্যি রহস্য বটে। থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর পরিবার বা নিকট আত্মীয়ের কারুরই আদৌ কোনো যোগাযোগ ছিল না। তথাপি বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার পিছনে কোন্ রহস্য কাজ করেছে অর্থাৎ কোন্ কোন্ ঘটনা, অভিজ্ঞতা, কোন্ পরিসর তাঁকে নাট্যকর্মী হয়ে ওঠতে সাহায্য করেছে, তা আমরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো। আমরা তাঁর জীবনের সেই দিকগুলিকে উন্মোচন করতে চেষ্টা করবো যা তাঁকে নাটকের প্রতি, থিয়েটারের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল।

বাদল সরকার স্কুল-কলেজের সার্টিফিকেটে সুধীন্দ্র সরকার নামে পরিচিত। সুধীন্দ্র অর্থাৎ আশা। বাদল সরকারের বাবা মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। পরবর্তীকালে ওই কলেজেরই অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। মা সরলামোনা সরকার ছিলেন সাধারণ গৃহবধূ। তাঁর পিতা চরম দারিদ্র্যের জন্য এম.এ.-তে ফাস্ট ক্লাস পেয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর পিতার আশা ছিলো ছেলে হবে সেই ইন্দ্র। সেই আশায় সুধীন্দ্র নাম রাখা হয়। কিন্তু জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর জন্ম এবং কালীতলার কাছে তাঁর ডাক্তার দাদামশাইয়ের বাড়িতে যেখানে অল্পতেই জল জমে যায়। সেই কোমর জল ভেঙে দেখতে এসে তাঁর কাকা সতীন্দ্রলাল সরকার রাগ করে নাম রাখেন বাদল। এই বাদল নামটাই তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। আর



বাদল সরকার : জন্ম ১৫ জুলাই ১৯২৫। মৃত্যু: ১৩ ই মে, ২০১১।

সংগ্রহ: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা '১৬

তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

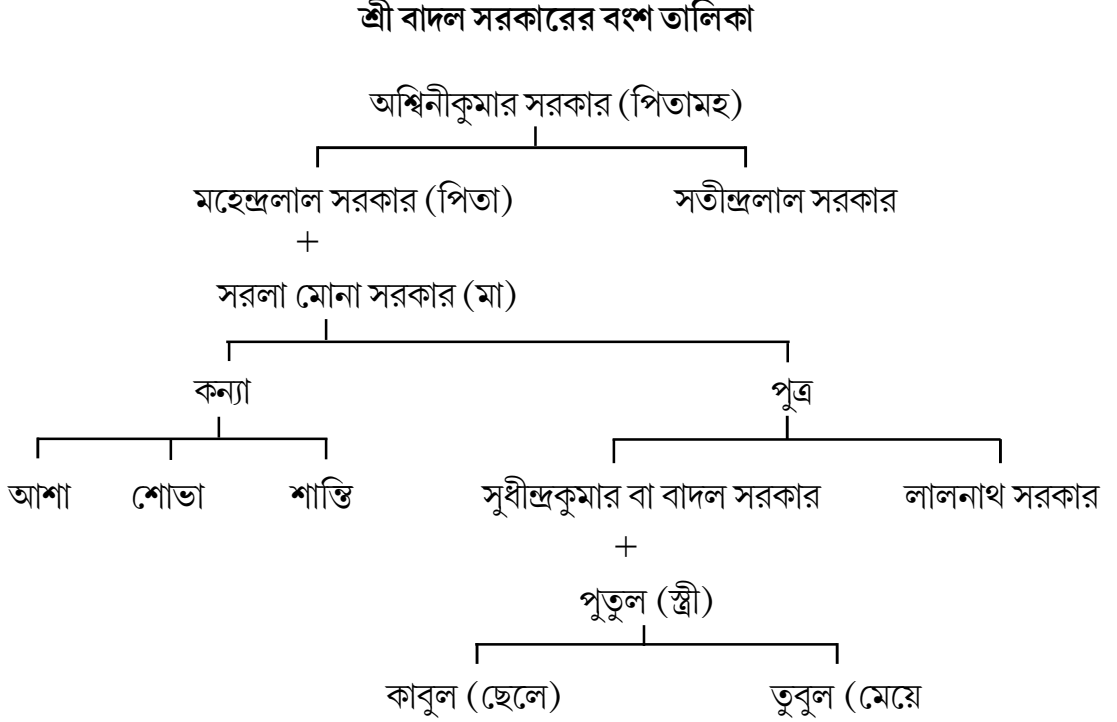
বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা,

সম্পাদক— সত্য ভাদুড়ি

২ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

সুধীন্দ্র নামটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট আর চাকরির কাগজ পত্রের থেকে গেছে। পারিবারিক সূত্রে বাদল সরকার ছিলেন খ্রিস্টান। ঠাকুরদা অশ্বিনীকুমার কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দুই ছিলেন। বরিশালের বাঙাল-কায়েত। মায়ের বংশ সুবর্ণবণিক। বাবা বরিশালের বাঙাল, মা হুগলি জেলার 'ঘটি'। শোনা যায় তাঁর ঠাকুরদা অশ্বিনীকুমারের ছোট ভাই, অর্থাৎ বাদল সরকারের বাবার কাকা বিপিন চন্দ্র সরকারই নাকি প্রথম খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন 'নিঃস্বার্থ বিশ্বাসের কারণে'। আর তারই প্রভাবে তাঁর দুই ভাইপো মহেন্দ্রলাল আর সতীন্দ্রলাল ধর্মান্তরিত হয়েছেন। বাবার মত বাদলও খ্রিস্টান

ধর্মটাকে প্রথম দিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিল এবং এ কারণেই বছর তিন পরে যুক্তিসঙ্গতভাবে তিনি নাস্তিক হয়ে যান।



একেবারে আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মতোই ছিল তাঁদের পরিবার। কোনো নাট্য ঘরানার মধ্যে তিনি মানুষ হননি। এমনকী থিয়েটার দেখবার রেওয়াজও ছিল না পিতা মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়িতে। এ বিষয়ে এ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “... নাটক নিয়ে কাজ করা বা চিন্তাভাবনা করার মতো আবহাওয়ার মধ্যে কিন্তু আমি বড় হয়ে উঠিনি। আমাদের পরিবারে নাট্যমোদী মানুষ ছিল বলে আমার জানা নেই।”^{২২} তাহলে কীভাবে তিনি থিয়েটারে এলেন?

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় তার পঠন-পাঠনের কথা। এক্ষেত্রে পারিবারিক দিকটি তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। বাড়িতে পঠন-পাঠনের একটা পরিবেশ ছিল। শিক্ষকতা তাঁর বাবার দিক থেকে বংশগত। তাঁর ঠাকুরদা অশ্বিনীকুমার স্কুল শিক্ষক, বাবা কাকা দু’জনেই ইতিহাসের অধ্যাপক। তাঁর বাবার ঘরে বাইবেলের মতো দু-চার খানা ধর্মগ্রন্থ থাকলেও বেশিরভাগই ছিল ইতিহাসের বই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে স্বদেশী-বিদেশী ইতিহাসের বই-ঠাসা ছিল বাড়িতে। তাঁর মাতৃকুলেও ছিল পঠন-পাঠনের অনুকূল পরিবেশ। মায়ের পরিবার ছিল সেকালের বনেদি খ্রিস্টান। মা সরলামোনা আর দিদিমা ভার্জিনিয়া মেরি নন্দী সেকালের বিখ্যাত ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র নন্দীর স্ত্রী। দিদিমাও ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তার হলেও

ডাক্তারী করেননি। দিনরাত অনর্গল বই পড়েই কাটিয়ে দিয়েছেন সারাটা জীবন। বাংলা জানতেন না বলে বাড়িতে নানা ধরনের ইংরেজি বই থাকত। পাশাপাশি তাঁর মা-মাসিদের দৌলতে বাড়িতে বিস্তর প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী ইত্যাদির বাঁধানো সংকলনও ছিল, যা কিশোর বাদলকে দারুণভাবে টানত। বাদল সরকারের পঠন-পাঠনের দিকটি পারিবারিক এই পরিবেশ থেকে গড়ে ওঠে। বাংলা বইয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি, ইংরেজি বই পড়তে পারতেন না। ইংরেজি বই পড়ার প্রতি আগ্রহ বাদল সরকারের তৈরি করেছিল তাঁর মা। তাঁর জীবনস্মৃতিমূলক গ্রন্থ ‘পুরোনো কাসুন্দি’ থেকে আমরা জানতে পারি অধ্যায় পিছু এক আনা ঘুষের প্রলোভন দেখিয়ে লুইসা এম্ অ্যালকটের ‘জ্যাক অ্যাণ্ড জিল’ বই প্রথম পড়তে দিয়েছিলেন তাঁর মা। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজির প্রতি এভাবেই আগ্রহ তৈরি হয়। তাঁর পড়ার মধ্যে নাটকের বই ছিল সবচেয়ে প্রিয়। নাটক অনেকে পড়ে না, বাদল সরকার ছোটবেলা থেকেই নাটকের বই পড়তে ভালো বাসতেন। তিনি জানিয়েছেন—

“নাটক পড়তে আমার স্কুলজীবন থেকেই ভালো লাগত; অনেকে নাটক পড়তে ভালোবাসে না, খালি দেখে। আমি বাংলা ইংরেজি নাটক যা হাতের কাছে পেয়েছি, স্কুলজীবন থেকেই পড়ে গেছি।”^৭

নাটক পড়ার ইচ্ছেটা প্রবল, কিন্তু বাড়িতে বেশি নাটকের বই ছিল না। তাঁর মেজদির পাঠ্য অন্তর্ভুক্ত কিছু ইংরেজি নাটক যেমন— এইট মর্ডান প্লেজ নামে ইংরেজি নাটকের একটা বই থেকে ‘স্লিপার্স অফ সিভিলারেল’, বার্নার্ড শ-এর ‘আর্ম্‌স্ অ্যান্ড দ্যা ম্যান’ পড়েছেন। আর বাংলা দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্রের কিছু নাটক; এগুলিই ছিল ছোটবেলার নাটক পড়ার সম্বল। অবশ্য স্কটিশ চার্চ কলেজে আই.এস.সি পড়বার সময় কলেজের লাইব্রেরি, রামমোহন রায় গ্রন্থাগার আর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে প্রচুর নাটকের বই পড়েছেন। নিজেই জানিয়েছেন সেকথা—

“...বার্নার্ড শ প্রায় শেষ, শেক্সপীয়ার শেরিডান চেষ্টা করছি, দাঁত বসছে না, মলিয়েরকে আবিষ্কার করছি, গল্‌সওয়ার্ডিকে, ডি.এইচ. লরেন্সকে।”^৮

বাল্যকালের এই যে বাংলা-ইংরেজি নানা ধরনের নাটক পাঠ—এটাই তাঁর নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ‘প্রথম বীজ’। পড়তে পড়তে নাটকের প্রতি একটা আগ্রহ তৈরি হয়। নাটক পড়ার সময় নাটকের দৃশ্যগুলির অভিনয় দেখতে পেতেন। কল্পনায় তলিয়ে যেতেন তার ঘটনাবলির মধ্যে। এইভাবে একটা ভালোলাগার জায়গা তৈরি হয়। আর সেই ভালোলাগার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটা অংশগ্রহণ। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—

“আমাদের এক একটা জিনিস ভালো লাগে; ভালো লাগে বলে সেটা বেশি করে

চর্চা করি, চর্চা করি বলে সেটা আয়ত্ত হয় এবং ভালো করে করতে পারলে উৎসাহ বাড়ে, এইভাবে আস্তে আস্তে একটা ইনভলভমেন্ট এসে যায়। এইভাবে জিনিসটা শুরু হয়।”^{৭৫}

নাটকের প্রতি আগ্রহ থেকেই একদিন বাদল সরকার তাঁর পিতার তিনতলার ঘরটি দখল করে কোনো এক রবিবারের দিন কোনো একটা বাংলা নাটক নিয়ে একাই সব ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। এইভাবে নাটকের সঙ্গে তাঁর একটা ‘ইনভলভমেন্ট’ এসে যায়। নাটকের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা— অধিক থেকে অধিকতর নাটক পাঠ তাঁর ভূমিকে সযত্নে নির্মাণ করেছে।

ছোটো বেলায় নাটক পড়ার পাশাপাশি রেডিও নাটক শোনাও ছিল বাদলের নেশা। বাড়িতে এভাবেই পূরণ করতেন অভাবটা। যেহেতু থিয়েটার দেখার রেওয়াজ ছিল না তাই রেডিওতে নাটক শুনে নাটক দেখার সাধপূরণ করতেন। সেকালে সপ্তাহে একদিন রেডিওতে টানা তিন ঘণ্টার নাটক হতো। সাধারণ পেশাদারি মঞ্চ-স্টার রঙমহল-মিনাভার মত কিছু মঞ্চের সফল প্রযোজনাগুলোই রেডিওতে সরাসরি প্রচার হত। রেকর্ড রাখার যন্ত্র ছিল না। ফলে ভুল হলে শ্রোতা শুনতেন সরাসরি। কিছু ছিল আকাশবাণীর নিজস্ব প্রযোজনা। সেই রেডিওর কল্যাণে ছাত্রাবস্থা থেকেই নাট্যজগতের তখনকার বঙ্গীয় মহারথীদের অভিনয়, কণ্ঠস্বর তাঁর সব পরিচিত ছিল। যেমন শিশির ভাদুড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহিন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ভূমেন রায়, রবি রায় ইত্যাদি। মহিলাদের মধ্যে নিভাননী, রাণীবালা, সরযুবালা, প্রভাদেবী। এইসব অভিনেতা-অভিনেত্রী বাদল সরকারের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি জানিয়েছেন:

“এক একটা নাটকে এক একজন অভিনেতা জম্পেশ হয়ে বসে যেতেন, সে চরিত্রে আর কাউকে ভাবাই যেতো না। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান অহিন্দ্র চৌধুরীর একচেটে, শচীন সেনগুপ্তর সিরাজুদৌল্লা বরাবর নির্মলেন্দু লাহিড়ি, কদার রায়ের শ্রীমন্ত নরেশ মিত্র, কার্ভালো ভূমেন রায়।”^{৭৬}

এভাবে নাটক শুনতে শুনতে নাটকের তথ্য থিয়েটারের প্রতি একটা ভালো লাগা তৈরি হয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, চক্রান্ত কিংবা স্বদেশ প্রেমের জন্য আত্মবলিদান এ সমস্ত বেশ উদ্দীপ্ত করত বালক বাদল সরকারকে।

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নানা জনের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় তাঁর ক্লাস সিক্সের বাংলার শিক্ষক সরসীবাবুর কথা। সরসীবাবু তাঁকে লেখালেখির ক্ষেত্রে বারবার উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতে কিভাবে একটা লেখাকে উন্নত করা যায়। এ প্রসঙ্গে বাদল বলেছেন:

“একটা হোলো— ওরে লেখ লেখ, আমরা বলি লেখাপড়া, পড়ালেখা বলি কি?
আর একটা হোলো— কিছু লিখে মাসখানেক ফেলে রাখবি, তার পরে যদি পড়ে ভালো
লাগে লেখাটা, তবে বুঝবি এক ফোঁটাও উন্নতি হয়নি। যদি কাঁচা মনে হয়, তবে
বুঝবি একটু এগিয়েছিস।”^৭

এই উপদেশ বাদল সরকারের নাট্যবোধ তৈরিতে গভীর প্রভাব ফেলে। একদিন সরসীবাবুর উপদেশ
শিরোধার্য করে নিয়ে নাটক পাঠের পাশাপাশি এবার নাটক রচনার চেষ্টা করলেন। সপ্তম শ্রেণির
ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকের পিণ্ডারী যুদ্ধকে নাটকে রূপান্তরিত করলেন। দুর্দান্ত ডাকাত পিণ্ডারীরা,
তারা ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হন। যারা তখন ভারতের মানচিত্রে টেনে লাল রং লাগাচ্ছে
যা দেখে শিখ বীর রঞ্জিৎ সিংহ নিশ্বাস ফেলে বলেছিল ‘সব লাল হো যায়গা’^৮। পিণ্ডারীদের তিন
সর্দারের একজন লড়াইয়ে মরলো, একজন লাপাতা হয়ে গেলো, তৃতীয়জন আত্মহত্যা করলো—
ব্যস্ এর চেয়ে নাটকীয় উপাদান-সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে আর কি হতে পারে। এই ঘটনা নিয়েই
জীবনের প্রথম নাটকটি লিখে ফেললেন বাদল। নাম দিলেন ‘পিণ্ডারীর যুদ্ধ’। এ নাটক প্রসঙ্গে তিনি
জানিয়েছেন—

“গোটা পাঁচ ছয় তিন-চার পাতার দৃশ্য। সব বিভিন্ন পটভূমিকায় এবং কী কারণে
জানি না— ঐ স্বল্পদৈর্ঘ্য দৃশ্যেরই কয়েকটায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার ছিল, অর্থাৎ
প্রয়োজনা অসম্ভব। সে ব্যাপারটাই তো সম্পূর্ণ অজানা তখন। তবু এটাই আমার
প্রথম নাট্যরচনা, সৌভাগ্যক্রমে নিঃশেষে অবলুপ্ত।”^৯

নাটকের হাতেখড়ি এই প্রথম। নাট্যবীজের পরিচয় ঐ হারিয়ে যাওয়া নাটক। কোনো নাট্যঘরানায়
তিনি মানুষ না হলেও বালক বয়সে নাটক রচনার এই প্রচেষ্টা বেশ বিস্ময়কর। নিতান্ত ভালোলাগা
থেকে চর্চা করার বিষয়টি এভাবেই যুক্ত হয়েছে।

বাদল সরকারের নাট্যকর্মকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল তাঁর মেজদিদি শোভা
সরকার। বাদল সরকারের নাটকের সাথী বরাবরই তার মেজদি। মেজদির সঙ্গে সপ্তাহে একদিন
রেডিও নাটক শুনতেন বাদল। হয়তো নিয়ম করে নাটক শুনতে শুনতে কখন যেন নিজের অজান্তেই
নাটকের চোরকুঠুরিতে ঢুকে পড়েছিলেন। তাই বাদল যখন তাঁর পাঠ্যবই থেকে ‘স্পিয়ার্স অফ
সিভারেল্লা’ নিয়ে একখানা নাটক লিখে ফেললেন প্রবেশিকা পরীক্ষার ছুটিতে। তা পড়ে তাঁর মেজদি
ভীষণ আপ্লুত। প্রবল উৎসাহে নিজেই বাড়ির ছোটোদের নিয়ে সে নাটক মঞ্চস্থ করলেন। সেই
নাটকের পরিচালক ও অভিনেতা বাদল সরকার। সেই সদ্যোজাত নাটকের প্রয়োগ এবং তার সাফল্য,
অর্থাৎ বড়োদের প্রশংসা বিশেষত মেজদির উৎসাহ বাদলের ভিতরে নাটককার এবং নাট্যকার হয়ে

ওঠার বুনট তৈরিতে সহায়ক হয়েছিল। এখানেই প্রথম তিনি একই সঙ্গে নাট্যকার-নির্দেশক-নায়ক।
এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

“অভিনয় জগতে আমার প্রবেশ অতএব একাধারে নাট্যকার-পরিচালক-নায়ক
হয়ে, কজনের ভাগ্যে জোটে এমন?”^{১০}

বাদল সরকারের মেজদির সহপাঠিনী সুকুমারী দেবীও তাঁকে নানাভাবে নাটক রচনায় উৎসাহিত
করেছেন। মায়ের পর সুকুমারী দেবীই তাঁকে ইংরেজি পড়তে অনুপ্রাণিত করেছেন। সুকুমারী দেবীর
দৌলতে মার্কিন নাট্যকার ইউজিন গ্ল্যাডস্টোন ওনিল এর নাম প্রথম জানতে পারেন বাদল। পাশাপাশি
অ্যালডাস লিওনার্ড হাক্সলি, রোম্যাঁ রোলাঁ, জেমস্ জয়েসের রচনা সুকুমারী দেবীই তাঁকে পড়িয়েছেন।
শুধু পড়া নয় বাদলের লেখা-লেখির ব্যাপারেও সুকুমারী দেবীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বি.ই কলেজে
পড়ার সময় বাদল সরকার গলস্‌ওর্যাদির ‘দ্য রুফ’ (The Roof) নাটকের কাঠামোর আদলে
‘আগুন’ নাটক লেখেন। এই নাটক লিখে বাদল সরকার বেশ উৎফুল্ল ছিলেন। কারণ অনুবাদ হলেও
অনুকরণ করেন নি। বিভিন্ন ঘরের চরিত্র আর তাদের কাহিনিগুলো নাট্যকারের নিজস্ব। তাঁর মনে
হয়েছে তিনি প্রায় মৌলিক একটা নাটক লিখতে পেরেছেন। প্রবল উৎসাহে নাটকটি সুকুমারী দেবীকে
দেখতে দিয়েছেন এই আশায় যে কিছু প্রশংসা পাবেন। কিন্তু হায়! বদলে জোটে অটেল লাঞ্ছনা।
তাঁর লিখিত নাটক পড়ে সুকুমারী দেবীর প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে বাদল সরকার লিখেছেন—

“ফালা ফালা করে চিড়ে সমালোচনা করেছেন। কী খুঁটিয়ে যে পড়েছেন মহিলা,
একটা দোষ নজর এড়ায় নি। আর এতো দোষও ছিল! সবচেয়ে বড়ো দোষ—
ওটা নাটকই হয়নি, যা হয়েছে সেটা বদহজম।”^{১১}

তবে সেদিনের এই গঠনমূলক সমালোচনা কিন্তু বাদল সরকারের নাট্যপ্রতিভার উন্মেষে বিশেষ
সহায়ক হয়েছিল। বাদল সরকার জানিয়েছেন—

“সেদিন আমার যাই মনে হোক না কেন, আমার বহু রোগ ঐ এক দিনে সুকুমারীদি
ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নাটকটা অবহেলায় হারিয়ে গেছে, তার পরে বছর বারো
নাটক লেখার চেষ্টা কখনো করি নি। অবশেষে যখন লিখেছি, একটা সমালোচকের
কড়া চোখ খোলা থেকেছে ভিতরে, পাহারা রেখেছে— স্বাধীন জেনানা যেন আর না
বেরোয়। সেদিনকার সমালোচনার ধাক্কা না খেলে ও চোখ তৈরি হতে অনেক
দেরি হতো। সুকুমারীদির প্রত্যেকটি যুক্তি আমি মানতে বাধ্য হয়েছিলাম।”^{১২}

বাদল সরকার পরবর্তী জীবনে দেশী-বিদেশী অনেকের নাটক, গল্প, উপন্যাস, সিনেমা থেকে নাট্যরূপ
দিয়েছেন, অনুবাদ করেছেন কিন্তু সুকুমারী দেবীর ঐ সমালোচনার কারণেই হয়তো আর

স্বাধীন-‘জেনানার’ প্রকাশ দেখা যায়নি।

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল তমলুক পর্ব। বাদলের সরকার কলেজ জীবনের প্রথমবর্ষে এলো জীবনের এক বিরাট বিপর্যয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে। আগ্রাসী জাপানি বাহিনীর আক্রমণের ভয়ে সারা কলকাতা দ্রুত। কলকাতাবাসী যথাসম্ভব সম্মল নিয়ে বা অনেক কিছু ফেলে পলায়ন শুরু করে। হাতিবাগান, খিদিরপুরে বোমা পড়তেই তাঁর বাবা বাড়িভাড়া করে পরিবারের বাকিদের সঙ্গে বাদলকে তমলুক পাঠিয়ে দেন। অতীতের তাল্লিগু বর্তমানের তমলুক সংস্কৃতি সম্পন্ন জনপদ। তমলুক এসে দেখলেন থিয়েটারের জমজমাট ব্যাপার। তাই দেখে ভিতরে জমে থাকা থিয়েটারের নেশা তাঁকে প্রবলভাবে উত্তেজিত করে। প্রতিবেশী বন্ধু অরুণ, তপন এবং আরো কয়েকজন মিলে বাদলের উৎসাহে শুরু হলো শরদিন্দুর ‘ডিটেকটিভ’ নাটকের মহড়া। এখানে উল্লেখ্য ছোটবেলায় বাদলের প্রিয় কয়েকটি নাটকের মধ্যে শরদিন্দুর ‘বন্ধু’, ‘লাল পাঞ্জা’ আর ‘ডিটেকটিভ’ ছিল অন্যতম। তাই এবার যখন অভিনয় করার সুযোগ এলো, খুব স্বাভাবিক ভাবেই ‘ডিটেকটিভ’ নাটকটিই অভিনয়ের জন্য মনোনীত করলেন। বাদলের পছন্দ তোংলা সমরেশের ভূমিকায় অভিনয় করা। এ বাসনা তাঁর স্কুল জীবন থেকেই সুগু ছিল। কলকাতায় তাঁর পিতার তে-তলার ঘরে বসে বাদল বহুবার পড়েছেন ঐ নাটক এবং জোর করে তোংলা সমরেশের সংলাপ তোংলাতে তোংলাতে পড়তেন। নাটকের মহড়া দিলেন ঠিকই কিন্তু বড়োদের এই নাটক পছন্দ হওয়ায় তারাই নাটকটার দখল নিয়ে নেয়। তাই শেষ পর্যন্ত সমরেশ চরিত্রটা বাদলের করা হয়ে ওঠেনি। বাদলকে নায়কের দিদি সুরমার চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। থিয়েটারের নেশা তখন এমন চেপে বসেছে যে মন খারাপ করা সত্ত্বেও নারী চরিত্রে অভিনয় করতে তিনি রাজি হয়ে যান। বাদল সরকার সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন—

“ফিমেল পার্ট? কিন্তু নেশা এমন প্রবল যে তাতেই রাজি হলাম। নায়ক অনন্ত বড়োদের একজন, ...।”^{১৩}

এতদিন নাটক ছিল ভালো লাগার বিষয়। তমলুকে এসে সেটাই এবার নেশার দিকে এগোলো। অর্থাৎ বাদল সরকার ক্রমশ এগিয়ে চলেছেন থিয়েটারের দিকে। স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা বাদলকে ভবিষ্যতের একজন দক্ষ অভিনেতা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ‘স্লিপার্স অফ সিঙারেলা’র পর প্রকাশ্য মধ্যে বাদলের এটাই প্রথম অভিনয়। শুধু অভিনয় নয়, তমলুকেই প্রথম পেশাদার থিয়েটারের সঙ্গে বাদলের পরিচয়। এই তমলুক পর্ব তাঁর মনে কী গভীর প্রভাব ফেলেছিল সেকথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

“হাজার তিনেক দর্শকের জমায়েৎ। নাটকের কোনো লাইন কাটা হয় না, সখীনৃত্য বাউলের গান—সব থাকে, রাত কাবার করতে হবে তো? কেদার রায় দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে ঢুলে পড়েছি, কিন্তু যেটুকু দেখেছি অপূর্ব লেগেছে। অতোগুলো বাঘা বাঘা অভিনেতা একসঙ্গে কখনো দেখি নি। অবশ্য কোনো পেশাদার থিয়েটারই দেখি নি তখন পর্যন্ত ...।”^{১৪}

তমলুকের এইসব অভিজ্ঞতা তাঁর নাট্যবোধ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তমলুকেই প্রথম পেশাদার থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুস পরিচয়, সেই সঙ্গে তাঁর সৌভাগ্য হলো প্রথম শ্রেণির অভিনেতাদের চাক্ষুস অভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা। যেখানে পঠন-পাঠনই ছিল এতদিন একমাত্র সম্বল, এবার যুক্ত হলো সরাসরি নাটকের নাট্যায়ন দেখার নতুন অভিজ্ঞতা। নাট্যমোহিত বাদল সরকারের ভবিষ্যতের ভিত এই ভাবেই নির্মিত হয়। তমলুক থেকে ফিরে এসে বাদল আবার মেতে উঠলেন থিয়েটার নিয়ে। তবে এবারে অনেক বেশি পরিণত বাদল সরকারকে আমরা দেখতে পেলাম। নট-নাট্যকার- পরিচালক রূপে আবার আবির্ভাব বাদল সরকারের। এবার তিনি নায়ক। অভিনয় বাড়ির বৈঠকখানায়। শিবরাম চক্রবর্তীর একটি গল্পকে নাট্যরূপ দিলেন। এখানে বাদল একাই নির্দেশনার ভার নিয়ে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকটিরও অস্তিত্ব নেই। এ নাটকের বৈশিষ্ট্য এই যে নাটকের প্রয়োজনে চাকর ভজহরি চরিত্রটি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া বন্ধু-বান্ধব জাতীয় কিছু চরিত্রও নাটকে সংযোজন করেছিলেন। নাটক অভিনয় করতে গিয়ে হয়েছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। মৌলিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে বাদল সরকারের প্রথম পদক্ষেপ এভাবেই— অন্যের সৃষ্টির মধ্যে নিজস্ব নির্মাণে।

বাল্যকালে বাদল সরকার রেডিও নাটক শুনেই থিয়েটারের দেখার অভাব পূরণ করতেন। কিন্তু থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা যে একেবারেই হয়নি এমনটা নয়। বিভিন্ন সময় ছোটোখাটো থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতাও বাদলের হয়েছিল। সেইসব থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। ক্লাস টেনে পড়ার সময় ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত সিরাজুদ্দৌল্লা নাটকের অভিনয় দেখেছেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ হস্টেলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের পরিচালিত নাটক দেখেছেন। সেখানে দেখেছেন পরশুরামের গল্প অবলম্বনে নাটক ‘বিরিঞ্চিবাবা’, ‘লম্বকর্ণ’, ‘চিকিৎসাবিশ্রাট’ ও ‘রাতারাতি’। তারপর শিবপুর বি.ই. কলেজে পড়ার সময় দীর্ঘ চার বছর সেখানে থিয়েটার দেখেছেন। কয়েকজন নাট্যোৎসাহী বন্ধু মিলে চণ্ডীচরণ সেনের ‘মহারাজ নন্দকুমার’ গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত ‘মহারাজ নন্দকুমার’ নামে স্বদেশমূলক একটি নাটকে অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও বাদল দমে গিয়েছেন বড়োদের কাছ থেকে ফিমেল পার্টের প্রস্তাব পেয়ে। এরপর আর

অভিনয় করার কথা ভাবেন নি শুধু থিয়েটার দেখে গেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

“...চারটে বছর কেটেছে এখানে, খুব উৎসাহ নিয়ে থিয়েটার দেখেছি কিন্তু এগোই নি কখনো।”^{১৫}

কিন্তু এইসব ছোটোখাটো থিয়েটার দেখেই থিয়েটার করার প্রবল আগ্রহ তৈরি হয় বাদল সরকারের মনে। তাঁর নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এইসব অভিজ্ঞতাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাঁর রাজনৈতিক জীবন। রাজনীতিতে আসা প্রসঙ্গে বাদল সরকার বলেছেন—

“ঠিক যেমন আমি নাস্তিক হয়েছি নিজের যুক্তি আর বোধবুদ্ধির ঠেলায়, কোনো গুরু প্রভাবে নয়, তেমনি রাজনীতিতেও কোনো দাদা বা গুরু আমাকে আনে নি। চারপাশের যে চাপ বোধ করতাম, সে বোধটা ছিল অন্ধ, অর্থাৎ কোনো প্রতিকার নেই, মেনে নিতেই হবে। লিওনটিয়েভের বইয়ে সমাজ বিবর্তনের আলোচনা আমাকে প্রথম সচেতন করলো— এ চাপ আমার ব্যক্তিগত সমস্যা নয় শুধু, এটা বর্তমান সমাজের ব্যাপার। সমাজটা আগেও বদলেছে, আবার বদলানো যায় এবং বদলাতেই হবে— সেটাই একমাত্র কাজ।”^{১৬}

শিবপুর বি.ই কলেজে পড়ার সময় থেকেই বাদল সরকার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। সে সময়ের রাজনৈতিক উত্তাপ ভালো ভাবেই তিনি অনুভব করেছেন। তাঁর কলেজ জীবনে ফাস্ট ইয়ার শেষ হতে না হতেই ১৯৪২-এ গান্ধীজীর ‘কুইট ইণ্ডিয়া’ ধ্বনি ভারতে চরম উন্মাদনা তৈরি করে। কলকাতায় তখন চরম অরাজকতা। আবার ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাপান অতর্কিতে পার্স হারবারের মার্কিন ঘাঁটি আক্রমণ করার পর আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়। হিটলারের নাৎসি বাহিনী যখন সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করলো, তখন কমিউনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করলো। বহু বছরের নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলো, ফলে কমিউনিস্ট পার্টি মাটির নীচ থেকে বাইরে বেরোলো। আবার এই নীতি গ্রহণের ফলে অনেকের চোখে অপ্রিয় হয়ে পড়লো।

এদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়নের বীভৎসতা, শাসক গোষ্ঠীর খাদ্য সংগ্রহের নীতি, মজুতদার ও কালোবাজারিদের সীমাহীন অর্থতৃষ্ণা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ ১৯৪৩ সালের দেশব্যাপী মন্বন্তর। গ্রাম থেকে দলে দলে উপবাসী মানুষের ভীড়ে কলকাতা তখন মৃত্যু নগরী; তাদের কেউ লঙ্গর খানায় খিচুড়ি খেয়ে বেঁচেছে, কেউ ফুটপাতে না খেয়ে মরছে। অন্যদিকে কলকাতায় ব্ল্যাক আউট মধ্যরাত্রে সাইরেন, জাপানি বোমার সর্বগ্রাসী ত্রাসে কলকাতা ছেড়ে দলে দলে পলায়ন। এইসব ভয়ংকর অভিঘাত সমাজ সচেতন বাদল সরকারকে রাজনীতি থেকে দূরে

সরিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি শুধু পার্টিতে যোগ দেওয়াই নয়, দলের সংগঠনের প্রচারে দিনের পর দিন বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেরিয়েছেন সভা-মিটিং-মিছিল-ধর্মঘট করেছেন। একটা সময় ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু নানা কারণে দলের সঙ্গে বাদল সরকারের দূরত্ব তৈরি হয়। দু' বছরের রাজনৈতিক সম্পর্ক শেষ হয় ১৯৪৯-এ, এবং পাকাপাকি ভাবে ১৯৫০।

আসলে বাদল সরকারের রাজনীতিতে আসার মূলে রয়েছে তাঁর জীবনাদর্শগত প্রবণতা। একজন প্রকৃত শিল্পীর চেতনাই তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর শৈল্পিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক চেতনা। সেই চেতনাই তাঁকে এক সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। মানুষ তাঁকে ভাবিয়েছে তিনি মানুষের জন্য ভেবেছেন। মহামারী ও দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের জন্য চাঁদা তুলেছেন। লঙ্গর খানায় খিচুড়ি পরিবেশন করেছেন। শিল্পীর শুভবোধ তাঁকে এদিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই এই পর্বটিও তাঁর নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কাছে বাঁচার অর্থ প্রকৃত অর্থে বাঁচা — বিপরীতে মরা। পরবর্তীকালে তাঁর নাটকের ভেতর সে বক্তব্য দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যে মানুষ একসময় মানুষে মানুষে ভালোবাসার বন্ধনে বিশ্বাসী হয়েই রাজনীতির জগতে গিয়েছিলেন, যিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই চিন্তাদর্শনই তাঁকে ভবিষ্যতে অন্য ধরনের এক নাট্যদর্শন নির্মাণে উৎসাহিত করেছে। তিনি ভালো ভাবেই উপলব্ধি করেছেন রাজনীতির পাশাপাশি থিয়েটারও মানুষের সংযুক্তির একটা প্ল্যাটফর্ম। তিনি অনুভব করেছেন যে এই মাধ্যমেও মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান ঘোচানো যায়। ভবিষ্যতে তিনি যে এক নতুন নাট্যদর্শন নির্মাণ করেছেন সেটার মূলে তাঁর এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও তাঁকে অনেকাংশে ভাবিয়েছে। রাজনৈতিক জীবনের পাঠ থেকেই তিনি থিয়েটারের রসদ পেয়েছেন। এ বিষয়ে বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন:

“— আমি বুঝতে পারলাম এইবার আমি গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের কাছে চলে যেতে পারি, যা আগে করতে পারতাম না। প্রায় বিনে পয়সায়, শুধু অভিনয়ের পরে ওদের দান সংগ্রহ করে, নাটক দেখাতে পারি আমরা। ... তখন একটা ফিলোজফি মাথায় এল, খালি চিত্তবিনোদনের জন্য নাটক নয়, চিত্তবিনোদন নিশ্চয়ই করব, কিন্তু তার সঙ্গেই থাকবে সমাজচেতনা, রাজনীতি। এইটাই নাটকের পর নাটকে প্রকাশ করলাম। এখানেই বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল।”^{১৭}

রাজনৈতিক নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সদ্য বি.ই. পাশ করা বাদল চাকরি সূত্রে চলে যান নাগপুরের একটি অজগ্রাম খাপড়খেড়া। জীবনে প্রথম চাকরি এখানেই। অবসর সময়ে শেক্সপীয়রের ‘জুলিয়াস সিজার’, কিং লিয়ার’, ‘ক্লিওপেট্রা’ পড়ে নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রেখেছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেখান থেকে ফিরে এসে বাদল সরকার ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সহকারী অধ্যাপক

পদে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে ধর্মীয় সংস্কার অগ্রাহ্য করে বাড়ির অমতেই ১৯৪৯ সালে বিয়ে করেন। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই আর থাকল না। আবার চাকরি বদল করলেন। যোগ দিলেন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে লেকচারার পদে। এরই মাঝে শিবপুর বি.ই. কলেজে আবার ছাত্র হয়ে ভর্তি হলেন পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন টাউন অ্যান্ড রিজিওন্যাল প্ল্যানিং কোর্সে। তখন দিনের বেলায় যাদবপুরে ছাত্র পড়ানো আর সন্ধ্যাবেলায় শিবপুরে ছাত্র হয়ে পড়তে বসা। সাংসারিক নানা কারণেও তিনি কিছুটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এতকিছুর মধ্যেও থিয়েটারের প্রতি তাঁর আগ্রহ বিন্দুমাত্র কমেনি। শ্রী অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত ‘কেদার রায়’ নাটকে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক সমাবর্তন উৎসবে লেকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অভিনয় করেন। এ প্রসঙ্গে বাদল লিখেছেন—

“এতোদিনের ফাঁকে ধরে নিয়েছিলাম ও পাট শেষ, কিন্তু দেখা গেলো ও বীজ মরবার নয়।”^{১৮}

থিয়েটারের নেশা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে এন্টালির অধ্যাপক আবাসন এবং পাড়ার কয়েকজন নাট্যোৎসাহী মিলে ‘Entally Novice Artiste’s Cultural Association’ সংক্ষেপে ‘ENACA’ নামে একটি থিয়েটারের দলই গঠন করে ফেললেন। মূলত: আবাসনের গৌরবাবু বলে এক নাট্যোৎসাহী আর আবাসনের অরুণ বাবু, প্রতীপবাবু এবং বাদল সরকার মিলে ‘এনাকা’-র প্রতিষ্ঠা করলেন। এ প্রসঙ্গে বাদল জানিয়েছেন—

“তখন থাকতাম এন্টালিতে অর্থাৎ কলকাতা জেলায়, চাকরি করতে যেতাম যাদবপুরে, তখনও যা চব্বিশ পরগনা আর সন্ধ্যাবেলা বি.ই. কলেজে, সপ্তাহে তিনদিন, সেটা হাওড়া জেলা — দিনে তিনটে জেলা পরিক্রমা করে আমার হাতে সময় বা শরীরে দম্ব একেবারেই বেশি থাকত না। তা সত্ত্বেও পাড়াতে তখন একটা থিয়েটারের দল তৈরি হচ্ছিল, সেই দলে ঢুকে পড়েছিলাম।”^{১৯}

এই প্রথম বাদল সরকার কোনো নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। এনাকার বেশ কিছু নাট্যপ্রযোজনা খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। তাদের প্রথম প্রচেষ্টা সুবোধ বসুর ‘অতিথি’ নাটক। কলেজ স্ট্রিটের ওয়াই-এম-সি-র পেছন দিকের একটি ছোট্ট হল ঘর ভাড়া নিয়েই সেখানে নাটকটি অভিনীত হয়। বাদল সরকার একটি ছোট্টপার্ট (মনুবাবু) করেন। কারণ যাদবপুর শিবপুর ঘুরে এসে সময় পেতেন না। ‘এনাকা’ নাট্যসংস্থা অনেকটা সৌখিন নাট্যসংস্থার মতই পরিচালিত হত। বন্ধু বান্ধবদের কাছে চাঁদা তুলে, নিজেরা চাঁদা দিয়ে এবং নিমন্ত্রণ করে দর্শক আমদানি করে অভিনয়ের যাবতীয় খরচ চালানো হতো। ‘এনাকা’র দ্বিতীয় প্রযোজনা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লাল পাঞ্জা’। ওভারটুন

হলে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে তিনি ছোটো ভূমিকায়— মুত্রঞ্জি চরিত্রে অভিনয় করেন। তৃতীয় প্রযোজনা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়েরই ‘বন্ধু’ নাটক। সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোডে ওয়াই ডব্লিউ সি-র অভিজাত হলে অভিনয় হয়। এখানে প্রেমকুমারের পাটে অভিনয় করেন। এরপর ‘চিরকুমার সভা’ নাটকে রসিকের পাট করেন। এই পর্বে ‘এনাকা’র মাধ্যমে এভাবেই থিয়েটারের সঙ্গে বাদলের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে গেছে। নিজের হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাদল তাই বলেছেন—

“... আমার ক্ষেত্রে জমি অল্প অল্প করে, টুকরো টুকরো করে হলেও তৈরি হয়েছিল, খানিকটা টাউন প্ল্যানিং, খানিকটা থিয়েটার। লেখার তাগিদটা উপলব্ধি করেছি, অভিনয় করার জন্য করেছি— করতে করতে খানিকটা জিনিস তো হয়। খানিকটা আয়ত্ব হয়।”^{২০}

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর কর্মজীবনের মাইথন পর্বটি। ১৯৫৩ তে যাদপবপুর পলিটেকনিক কলেজের চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন মাইথনে। সেখানে ডিভিসি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি মাইথনে থিয়েটারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বাদল সরকার কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে অবসর যাপনের জন্য একটা ‘রিহাসাল ক্লাব’ তৈরি করে থিয়েটার চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন। নাটকের শুধু রিহাসাল হবে, এই জন্যই রাখা হয়েছিল ‘রিহাসাল ক্লাব’। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁরা মঞ্চাভিনয়-এ নেমে পড়েন। এখানেও বাদলের সেই প্রিয় ‘ডিটেকটিভ’ নাটক দিয়ে অভিনয় শুরু হয়। তারপর ‘বন্ধু’, ‘অতিথি’, ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’, ‘বিরিঞ্চিবাবা’ প্রভৃতি প্রযোজনা খুব সাফল্যের সঙ্গে হয়। এখানে ‘এনাকা’র মতোই চাঁদা তুলে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় তিন বছর মাইথনে কাটিয়েছেন। এই তিন বছর থিয়েটার চর্চায় সক্রিয়ভাবেই তিনি যুক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকারের বক্তব্য—

“ঠিক ওইখানেই আমার বলতে পারেন থিয়েটার করার ব্যাপার, যাকে থিয়েটার প্র্যাকটিশ বলে, সেইটাতে প্রথম ইন্ডলভমেন্ট শুরু হয়েছিল, ওই মাইথনে।”^{২১}

এই পর্বে তাই নাটক রচনা অপেক্ষা, নাট্যাভিনয়ের প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছেন বাদল সরকার। নাটক রচনার প্রচেষ্টা এই পর্বে দেখি না। কিন্তু এই পর্ব তাঁকে পরবর্তী পর্বে নাটক রচনার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সে কারণে মাইথন পর্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। পাশাপাশি মঞ্চ প্রযোজনার নানা কৌশলও এ পর্বেই বাদল সরকার প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। এককথায় থিয়েটার নিয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তার একটা প্রতিফলন এই পর্ব থেকেই দেখা যায়। ভবিষ্যতের একজন নাট্যকার অভিনেতা, মঞ্চপরিচালক এবং সংগঠকের যথার্থ আবির্ভাব ঘটে এই পর্বে।

১৯৫৪ সালের শেষে ফিরে এলেন কলকাতায়। টাউন প্ল্যানিং ডিপ্লোমা থাকায় কলকাতা পৌরসভার সার্ভে বিভাগে— ডেপুটি চিফ ভ্যালুয়ার অ্যাণ্ড সার্ভেয়ারের চাকরিও পেয়ে যান। এবার অভিনয়ের পাশাপাশি নিয়মিত নাটক লেখার মধ্যে নিজের থিয়েটার চর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। শিবপুর যাদপপুরের কিছু পাস করা ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কল করে নিয়েছিলেন। এছাড়াও ‘এনাকা’র পুরনো কয়েকজন নাট্যোৎসাহী বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ‘এ্যাড-হক বেসিস-এ থিয়েটার’^{২২} করেছেন। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার জানিয়েছেন—

“— বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কাস্টিং করে একদিন রিহর্সাল হল বন্ধুবান্ধবদেরই বাড়িতে। রিহর্সালটা দিয়ে যখন অভিনয়টা হবে তখন বন্ধুবান্ধবদের কাছে চাঁদা তুলে একটা হল ভাড়া নিয়ে, কার্ড সিস্টেম-এ, একটাই শো। তাড়াতাড়ি করে গ্রুপের একটা নাম দেওয়া হল। ... তা অভিনয়টা হল, গ্রুপটাও ফুরিয়ে গেল। তার দু-বছর পরে আর একটা নাটক যখন হল আবার একটা নাম দেওয়া হল, থিয়েটার হল, সেটা ফুরিয়ে গেল।”^{২৩}

অর্থাৎ সেই অর্থে কোনো গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে বাদল যুক্ত না থেকেও এই পর্বে তাঁর থিয়েটার চর্চা করে গেছেন। ইঞ্জিনিয়ার সার্কল-এর ব্যানারে করেছেন রবীন্দ্রনাথের ‘গৃহপ্রবেশ’ নাটক। করেছেন শরৎচন্দ্রের ‘দেনা-পাওনা’। এই ‘দেনা-পাওনা’ শরৎচন্দ্রের করা ‘ষোড়শী’ নাটক নয়, বাদল নিজেই তার নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করেছেন। তাই নাটকের নাম ‘দেনা-পাওনা’। এরপর করেছেন রবীন্দ্রনাথের ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’। এখানে তিনি তিনকড়ির ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাটক লেখা, অভিনয় করা এবং পরিচালনা করা সবটাই—এই সময় তিনি করেছেন। অর্থাৎ একজন নিয়মিত নাট্যকার হিসেবে তাঁকে আমরা এই সময়ে পাচ্ছি। যদিও এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য একটু অন্যরকম:

“... নাটক খুঁজছি বলে নাট্যকার হওয়ার চেষ্টাটা চলছে। নাট্যকার হওয়ার চেষ্টা— এই টার্মটাই অবশ্য ভুল, নাটক দরকার, সেই কারণে নাটক লিখবার চেষ্টা করছি, প্রোডিউস করবার চেষ্টা করছি। নাট্যকার হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।”^{২৪}

নাটক দরকার তাই নাটক লিখছেন। অবশ্য সেই অর্থে কোনো মৌলিক নাটক না লিখে উপন্যাস গল্পকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। আবার বিদেশী ছবি ‘মাক্সি বিজনেস’ দেখে লিখলেন ‘সলিউশন এক্স’ নাটক। আগের লেখা নাটকগুলো বাদ দিলে বলা যায় এটাই বাদল সরকারের লেখা প্রথম নাটক। তিনি জানিয়েছেন সেকথা—

“... বলা চলে এইটাই আমার প্রথম নাটক। সিগুরেলা, শিবরামের গল্প, বিরিধিগাবা, আগুন— এগুলোকে ধরছি না।”^{২৫}

এইভাবে নাট্যলেখার চর্চা করতে করতে একজন নিয়মিত নাট্যকার হয়ে উঠেছেন বাদল সরকার।

দুই

বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারের জগতে বাদল সরকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন আরো কয়েক বছর পর। মধ্যকালীন এই সময়ে তিনি দেশে-বিদেশে কখনো ছাত্র, কখনো চাকরিরত। আর সেই সুযোগে পৃথিবীর নানা দেশ-দেশান্তরের অসংখ্য থিয়েটার দেখেছেন— থিয়েটারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছেন। সেই সব থিয়েটার, থিয়েটারের মানুষজনের সংস্পর্শে আসার ফলে বাদল সরকারের মধ্যে তাঁর নিজস্ব থিয়েটারের রূপটি একটু একটু করে গড়ে উঠতে থাকে।

১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত টাউন প্ল্যানিং-এর ছাত্র হিসেবে তিনি লণ্ডনে। এই পর্বটি বাদল সরকারের নাট্য জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লণ্ডনে থাকার সূত্রে সেখানকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর পরিচয় গড়ে ওঠে। সেখানকার একটি ফিল্ম ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রচুর সিনেমা দেখার সুযোগ হয় তাঁর; যার মধ্যে মার্কিন পরিচালক বাস্টার কিটনের নির্বাক চলচ্চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরই পাশাপাশি লণ্ডনের ঐতিহ্যশালী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় গড়ে উঠে। স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভেনে রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানির ‘রোমিয়ো অ্যান্ড জুলিয়েট’, পারিতে ফোলি বার্জের নাচ, লণ্ডনের ইস্ট এণ্ড পাড়ায় ব্রেগান রেহানের ‘দ্য হস্টেজ’ প্রভৃতি থিয়েটার তাঁকে ভীষণ ভাবে উৎসাহিত করছে। এই সময় টাউন প্ল্যানিং-এর পাশাপাশি অসংখ্য থিয়েটার দেখেছেন। তিনি বলেছেন—

“এই সময়ে লণ্ডনে বেশ কয়েকটা ভালো থিয়েটার দেখি। বস্তুত এই

প্রথম আমি সত্যিকার থিয়েটার দেখলাম।”^{২৬}

থিয়েটারের সূত্রেই সেখানকার রঙ্গমঞ্চের মহান ব্যক্তিত্বদের মুখোমুখি দেখবার অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর। যেমন ভিভিয়ান লী (Vivian Leigh), চার্লস লটন (Charles Laughton), মাইকেল রডরেথ, মার্গারিটে রলিনস প্রমুখের অভিনয় তাঁকে মুগ্ধ করে। এর মধ্যে সেখানকার এরিনা মঞ্চে ‘থিয়েটার ইন দ্য রাউণ্ড’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ‘থিয়েটার ইন দ্য রাউণ্ড’-আমাদের দেশের যাত্রার মতো মাঝখানে চত্বরে হয়, চারিদিকে দর্শকরা বসে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকদের অত্যন্ত কাছে। পর্দা নেই, দৃশ্যপট নেই। থিয়েটারের এই আঙ্গিক বাদল সরকারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারের জগতে তিনি যে নতুন থিয়েটার দর্শনের উদ্ভাবন করেছেন তার মূলে এই অভিজ্ঞতার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তিনি নিজেই সেকথা জানিয়েছেন লিখেছেন—

“থিয়েটার ইন দ্য রাউণ্ডে অভিনয় সেই প্রথম দেখি, কিন্তু মনে এমন দাগ রেখেছিল,

যা আমার কলকাতার অভিনয় জীবনে মূল পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছিল।”^{২৭}

বস্তুত লগুন বাসকালের থিয়েটার সংক্রান্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে; থিয়েটার নিয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনায় নাড়া দিয়েছে। তার প্রমাণ পাই ৫.১১.১৯৬৩-তে মনুকে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন:

“আমাদের মঞ্চ বড়ো শিশু রয়ে গেছে। আর একটু বড়ো হবার সময় এসেছে মনে হয়।”^{২৮}

থিয়েটার নিয়ে এই ধরনের চিন্তা-ভাবনাই পরবর্তীকালে তাঁকে একজন স্বতন্ত্র ধারার থিয়েটারকর্মী রূপে হয়ে ওঠতে সাহায্য করেছে।

এই পর্বে নাটক লেখাও চালিয়ে গেছেন বাদল সরকার। তাঁর ‘বড়ো পিসীমা’ নাটক লগুনে বসেই লেখা। আর যে নাটক বাংলা তথা সর্বভারতীয় থিয়েটার জগতে বাদল সরকারকে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়, সেই ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকও লগুনে বাসকালেই লেখা শুরু হয়। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

“১৯৫৭ থেকে ’৫৯ আমি লগুনে ছিলাম। ‘প্রবাসের হিজিবিজি’তে ডায়েরির অংশ, কবিতা, চিঠি ইত্যাদি দেওয়া আছে। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর প্রথমংশটা কিন্তু লেখা হয়ে গেছে ’৫৭-’৫৮ সালেই।”^{২৯}

একদিকে সেখানকার থিয়েটারের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন অন্যদিকে নিজেকে নাটকের মধ্যে আরো বেশি যুক্ত করে নাটক রচনার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন এইপর্বে। চেষ্টা করেছেন কী করে একটি ভালো নাটক রচনা করা যায়, কীভাবে আমাদের বাংলা থিয়েটারকে নতুন করে গড়ে তোলা যায়। নাট্যকর্মী বাদল সরকারের হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে তাই এই লগুন পর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৫৯-এ নির্ধারিত সময়েই পেয়ে গেলেন টাউন প্ল্যানিং-এ লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা। এরপর ফিরে এলেন কলকাতায়। লগুন যাবার আগে ‘এঞ্জিনিয়ার্স’ সার্কেল’ নামে যে সংস্থাটি বাদল চালু করে গিয়েছিলেন তার সদস্যবৃন্দ এবং আরো কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের উদ্যোগে আবার প্রবর্তন করলেন ‘চক্র’ নামে একটি সংস্থা। ‘চক্র’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালে। ১৯৬৩ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে বাদল সরকার ‘চক্র’-র মাধ্যমেই থিয়েটার চর্চা করে গেছেন। এতদিনের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার পর চক্র’কে কেন্দ্র করেই তিনি ধারাবাহিক নাটক লেখার দিকে ঝুঁকেছেন। পাশাপাশি চক্রকে কেন্দ্র করে এই সময় থেকে মঞ্চের একজন নিয়মিতা অভিনেতাও হয়ে উঠেছেন। চক্র’র প্রথম প্রচেষ্টা লগুনে লেখা তাঁর ‘বড়ো পিসীমা’ নাটক, ১৯৬০, ১১ই সেপ্টেম্বর। প্রথমদিকে অনেকটা ‘এনাকা’র পদ্ধতিতে চাঁদা তুলে আমন্ত্রণ পত্র বিতরণ করা হত। ‘বড়ো পিসীমা’র প্রচুর সাফল্যের ফলে উত্তেজনায় তাঁর পরবর্তী নাটক ‘শনিবার’ মঞ্চস্থ হয়। অতঃপর ‘রাম শ্যাম যদু’, ‘কবি কাহিনী’,

‘সলিউশন এক্স’ এবং সবশেষে ‘সমাবৃত’ নামের এক রহস্য নাটক মঞ্চস্থ হয়। এখানে তাঁর নিজের নাটক ছাড়াও অন্যদের নাটক অভিনীত হয়েছে। জে.বি. প্রিস্টলের ‘অ্যান ইনস্পেকটর কলস’-এর বঙ্গীকরণ ‘থানা থেকে আসছি’ অভিনীত হয়। আর লণ্ডনে বসে লেখা অসমাপ্ত ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের রচনা সমাপ্ত করে তা এই চক্রের বৈঠকে বন্ধু-বান্ধবদের পড়ে শুনিয়েছেন। চক্রকে কেন্দ্র করে তাঁর নিয়মিত নাট্যচর্চার সুবাদেই বাংলা থিয়েটারের জগতে বাদল সরকার ধীরে ধীরে একটা প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেন।

১৯৬৩ খ্রি: পর্যন্ত চক্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার পর ঐ বছরেই ফরাসি সরকারের টাউন প্ল্যানিং বিষয়ক একটি বৃত্তি পেয়ে ন-মাসের জন্য তিনি ফ্রান্সে যান। প্রথম তিন মাস সুইজারল্যান্ড। পরের ছ-মাস প্যারিস। ফ্রান্সে বাসকালে থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা সেরকম হয়নি। এর একটা কারণ ফরাসি ভাষা বাদল সরকারের ততটা আয়ত্ত ছিল না। তবে মলিয়রের নাটক দেখেছেন। আর অবসর সময়ে লিখে ফেললেন পরপর চারটি নাটক, ‘সারারাত্তির’, ‘বল্লভপুরের রূপকথা’, ‘বিচিত্রানুষ্ঠান’ এবং ‘কবি কাহিনী’। থিয়েটার দেখার সুযোগ না থাকলেও এই সময় তিনি নাটক নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা চিন্তা করে গেছেন, কীভাবে থিয়েটার করবেন তার পরিকল্পনা করে গেছেন। ২৮.১১.১৯৬৩ তে লেখা একটি চিঠিতে তিনি মনুকে লিখেছেন—

“থিয়েটার করার কথা, থিয়েটারের প্রোজেক্টের কথা মাঝে মাঝে সাংঘাতিকভাবে মাথায় চেপে বসে। সেদিন আর অন্য কিছু ভাবতে পারি না। সমস্ত বুদ্ধি সমস্ত লজিকের বিরুদ্ধে থিয়েটারের অসম্ভব সব পরিকল্পনা নিয়ে সন্ধে কেটে যায়। হিসেব করি। সেটের ছবি আঁকি। প্রোডাকশনের রূপ দিই মনে মনে। আলোর কথা ভাবি। স্টেজের কথা ভাবি।”^{১০}

অন্যত্র বলেছেন—

“ফ্রান্সে থাকাকালীন আমি বুঝতে পারলাম যে, থিয়েটার আমার ব্যক্তিত্বের এক অপরিহার্য অংশ।”^{১১}

এভাবেই ধীরে ধীরে থিয়েটার তাঁর ব্যক্তিত্বের এক অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে।

ফ্রান্সের ন-মাস কাটিয়ে কিছু দিনের জন্য কলকাতায় ফিরে এসে, ১৯৬৪ সালের ১২-ই জুলাই আবার চলে যান নাইজিরিয়ায়। এখানে প্রায় তিন বছর চাকরিসূত্রে থেকেছেন। লণ্ডনের পর বাদল সরকারের এটাই দীর্ঘ প্রবাসজীবন। এখানেও কাজের অবসরে থিয়েটার নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। নাট্যমঞ্চের সেট তৈরি করেছেন নানাভাবে। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-নাটকের সেটের মডেল তৈরির পরিকল্পনা করেছেন। ১০.১০.১৯৬৪-তারিখে লেখা মনুকে একটি চিঠিতে

সেই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে লিখেছেন—

“...একটা পুরো বিবির বসে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর একটা সেটের মডেল করে সবটা work করিয়ে দেখলাম। চেষ্টা ছিল কতো ছোট সেটে হয়। ... বোঝা যাচ্ছে, থিয়েটারের ভূতটা ঘাড় থেকে নামে নি।”^{৩২}

অর্থাৎ থিয়েটার চর্চা তাঁর কোনো সময়েই থেমে থাকে নি। এই সময় বাদল সরকার আরো বেশি করে নাটক করার কথা ভেবেছেন। আর সেইমতো নাটক লেখার দিকে মনোযোগী হয়েছেন। এখানে বসে লিখেছেন ‘যদি আর একবার’, ত্রিশ শতাব্দী’, ‘পাগলা ঘোড়া’, সমরেশ বসুর ‘বিবর’ উপন্যাসের নাট্যরূপ, ‘প্রলাপ’, ‘বাকি ইতিহাস’, ‘সমাবৃত’ ইত্যাদি। আর ছুটিতে কলকাতায় এসে লিখেছেন ‘বাঘ’ নামের একটি একাঙ্ক নাটক। নাইজিরিয়াতে বসেই নিজস্ব নাট্যদল গড়বার কথা ভেবেছেন। এরই মাঝে ১৯৬৫ সালের ‘বহুরূপী’ পত্রিকার ২২ নম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হল তাঁর বহুচর্চিত ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটক। আর এই নাটকের সূত্র ধরেই সর্বভারতীয় থিয়েটারে বাদল সরকার বিপুল পরিচিতি পেয়ে গেলেন। শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে বাংলা থিয়েটারের একজন নতুন নাটককার হিসেবে বাদল সরকার প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলেন।

তিন বছর একটানা কাটিয়ে নাইজিরিয়া থেকে আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় ফিরে এসে আপাতত নিজস্ব দল গঠনের চিন্তা থেকে সরে এসে কোনো একটা ভালো নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থেকে নাট্যকর্ম চালিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। যুক্ত হয়ে পড়লেন শম্ভুমিত্রের ‘বহুরূপী’র সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকারের ভাবনা ছিল—

“শম্ভুবাবুর কাছে অভিনয় আর নির্দেশনার অনেক কিছু শেখবার আছে আমার। আর বহুরূপীকে আমি নাটকের জোগান দিতে পারি তারা যখন পছন্দ করছে। অতএব নিজস্ব নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করার যে স্বপ্ন ফ্রান্সে আর নাইজেরিয়ায় দেখেছি, সেটা বাস্তবায়িত করা আপাতত মূলতুবি রেখে বহুরূপী-তে যোগ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।”^{৩৩}

বহুরূপীর সঙ্গে তাঁর বেশ কয়েকটি নাটকের চুক্তি হল— ‘সারারাত্তির’, ‘রাম শ্যাম যদু’, ‘বাঘ’। অবশ্য অভিনয় হয় শুধু ‘বাকি ইতিহাস’ এবং ‘পাগলা ঘোড়া’র। প্রথম দিকে শম্ভু মিত্র এবং তৃপ্তি মিত্র, দু’জনের সঙ্গেই বাদল সরকারের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। তাঁদের প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি সেই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

“শম্ভু মিত্র আমার নাটক করছেন, তৃপ্তি মিত্র অভিনয় করছেন— এ তো ভাগ্যের কথা।”^{৩৪}

বেশ কিছুদিন বহুরূপীতে যুক্ত থেকে বাদল তাঁর নাট্যকর্ম-এর ধারা অব্যাহত রেখেছেন। শম্ভু মিত্রের অনুপস্থিতিতে তাঁর নিজের নাটক ‘প্রলাপ’-এর নির্দেশনার কাজেও করেছেন। কিন্তু বাদল যে ধরনের থিয়েটার করতে চান সেই পরিসর বহুরূপীতে তিনি পাননি। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই বহুরূপী ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন ‘বহুরূপী’ তাঁর জন্য নয়। বহুরূপীর সঙ্গে খুব অল্পদিনই কাজ করেছেন। কিন্তু সেই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেটাও তাঁর নাট্যজীবনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাদল সরকার জানিয়েছেন —

“বহুরূপীর ডিসপ্লিন আমাকে মুগ্ধ করেছে অবশ্যই। কুমার রায়ের মতো নাট্যব্যক্তিত্বও

বাইরে যাওয়ার সময় আমার অনুমতি নিয়েছেন, তাঁর তখন পাট নেই কিন্তু।”^{৩৫}

বহুরূপী থেকে বের হয়ে এতদিন যে নিজস্ব নাট্যদল তৈরির কথা ভেবে এসেছিলেন, সেই নিজস্ব দল তৈরি করলেন— ‘শতাব্দী’। প্রথম দিকে আর পাঁচটা নাট্যদলের মতোই গতানুগতিক মঞ্চব্যবস্থা অর্থাৎ প্রসেনিয়াম থিয়েটারেই ‘শতাব্দী’র তার প্রযোজনাগুলো করে। ‘কবি কাহিনী’, ‘বাকি ইতিহাস’, ‘বাঘ’, ‘বিচিত্রানুষ্ঠান’, ‘প্রলাপ’, ‘সারারাত্তির’, ‘শেষ নেই’ ইত্যাদি নাটকগুলি সবই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মঞ্চের জন্যই লেখা এবং ‘শতাব্দী’ সেইভাবেই অভিনয় করে। শতাব্দীর প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৬৭ সাল) থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রসেনিয়াম মঞ্চব্যবস্থার মধ্যেই বাদল সরকার তাঁর নাট্যকর্মের ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

ততদিনে বাদল সরকার সর্বভারতীয় বিপুল পরিচিতি পেয়ে গেছেন। ১৯৬৮ সালে পেয়েছেন ভারত সরকারের সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার। ১৯৬৯ সালে পি.এস.সি.-র মাধ্যমে আবার পেলেন শীর্ষনগর পরিকল্পকের চাকরি। ঐ বছরেই দু’মাসের জন্য সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রকল্পে পূর্ব ইউরোপের তিনটি দেশ রাশিয়া, পোল্যান্ড আর চেকোস্লোভাকিয়া ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছেন। এই দু’মাসেই সেই সব দেশের প্রচুর থিয়েটার দেখেছেন। পরিচিত হয়েছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বের সঙ্গে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল গ্রোটোস্কির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। এখানকার মূল আকর্ষণ ছিল ‘থিয়েটার ল্যাবরেটরি’-য়ার পরিচালক ছিলেন গ্রোটোস্কি। তাঁর ‘Towards a Poor Theatre’ গ্রন্থটির সঙ্গে বাদলের আগেই পরিচয় হয়েছিল; এবার সামনাসামনি তাঁর কাজ দেখলেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হল। গ্রোটোস্কির থিয়েটার কর্ম দেখে তিনি ভীষণ আপ্ত। থিয়েটারের এক ভিন্ন ভাষার সন্ধান পেলেন তিনি। কলকাতায় ফিরে এসে নতুন উদ্যমে শুরু করলেন ‘শতাব্দী’। কম খরচে থিয়েটার করার দিকে তিনি জোর দিলেন। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার জানিয়েছেন—

“তখন একটা নীতি আমাদের ছিল, যে সেট, প্রপ্স আর কস্টিউম মিলিয়ে একশ

টাকার বেশি খরচ করা হবে না, ‘বল্লভপুরের রূপকথা’র টোটাল সেট খরচ পড়েছিল

৬৫ টাকা। বলতে পারেন পুণ্ডর থিয়েটারের দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা তখনই দেখা দেয়।”^{৩৬}

প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মধ্যে কম খরচে ‘শতাব্দী’র একটার পর একটা মঞ্চ সফল প্রযোজনা বাদল সরকারকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। ঠিক এই সময় ১৯৭১-১৯৭৩ সাল পর্যন্ত জওহরলাল নেহেরু ফেলোশিপ নিয়ে আবার গেলেন আমেরিকায়। সেখানে দেখলেন প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বাইরেও থিয়েটার করার অসম্ভব সংকল্প। বিশেষ করে সেখানকার নিউ থিয়েটার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তি রিচার্ড শেখনারের থিয়েটার দেখে তিনি ভীষণ উৎসাহিত হন। আবার নতুন করে ‘শতাব্দী’-শুরু করলেন। গত দু’দশক ধরে রাসিনের যে ‘ফি ড্রে’ এবং ফ্রান্সের স্থায়ী ‘গোলাকৃতি মঞ্চ’ তাঁকে তাড়া করছিল এবার তার রূপায়ণ করলেন। প্রসেনিয়াম মঞ্চ ছেড়ে চলে এলেন অঙ্গন মঞ্চে। ১৯৭১-এ ‘সাগিনা মাহাতো’ নাটক অঙ্গন মঞ্চে পরীক্ষামূলক অভিনয়ের পর ১৯৭২-এর ১২ নভেম্বর ‘স্পার্টাকুস’ নাটক থেকে পুরোপুরি চলে এলেন অঙ্গন মঞ্চে। এই অঙ্গন মঞ্চের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

“আমরা ঘরের সাধারণ আলোয়, কোন সাজসজ্জা ও সামগ্রী ছাড়াই নাটক করলাম। দর্শকদের সামনে রেখে নয়, বরং তাদের চারিদিকে তাদের সঙ্গে জায়গা ভাগ করে নাট্যপ্রযোজনা শুরু করলাম।”^{৩৭}

এই অঙ্গন মঞ্চে এসে নাট্যরচনা ও পরিচালনার প্রয়োগ পদ্ধতি পালটে গেল। থিয়েটার হয়ে উঠল নমনীয়-যেখানে ইচ্ছে করা যায়, বহনীয়— সেট, ফ্লাডলাইট এসবের কোনো দরকার থাকলো না ফলে তা হয়ে উঠল সুলভ। নির্মিত হল এক নতুন থিয়েটার দর্শন, যা ‘তৃতীয় ধারার থিয়েটার’ নামে পরিচিত। এইখানে এসেই যেন নাট্যকর্মী বাদল সরকারের বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল। থিয়েটার হয়ে উঠল সব মানুষের, সর্বসাধারণের। থিয়েটারকে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে না রেখে নিয়ে গেলেন গ্রাম-গ্রামান্তরে। ১৯৮৬-তে থার্ড থিয়েটার -এর কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করেন ‘গ্রাম পরিক্রমা’। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—

“আমাদের মাধ্যমটির প্রাণশক্তির কথা ভেবে আমরা আর নিজেদের বন্দি রাখলাম না। কখনও বিনা পয়সায় নাটক করেছি। কখনও বা সামান্য ট্রেন ভাড়ার বিনিময়ে। কখনও বা স্থানীয় কোনও সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতা নিয়ে আমাদের সাহায্য করেছে। কখনও বা সামান্য আহারের বিনিময়েও নাটক করে গেছি।”^{৩৮}

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ইতিবৃত্তটি এইভাবেই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল, এই অধ্যায়ে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

তথ্যসূত্র:

১. সরকার, বাদল : বাদল সরকার, স্মারক সংখ্যা: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-১৬,
২, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ.-১।
২. সরকার, বাদল : নাট্য বিষয়ক সংখ্যা, ‘নির্মাতার মুখোমুখি’ নাম দিয়ে
অনুষ্ঠান পত্রিকার পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছিল।
সে প্রশ্নগুলি না তুলে ধারাবাহিক কথাগুলি সাজিয়ে
দিয়েছে এই পত্রিকা।’ সেটিই এখানে তুলে দেওয়া
হয়েছে। অনুষ্ঠান চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় যুগ্ম সংখ্যা
২০০০, পৃ. ২১৯।
৩. সরকার, বাদল-এর সাক্ষাৎকার : দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, বর্ষ ৬০ সংখ্যা ৩, পৃ. ৩৭
৪. সরকার, বাদল : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা, প্রথম
প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১২
৫. সরকার, বাদল-এর সাক্ষাৎকার : দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, বর্ষ ৬০ সংখ্যা ৩, পৃ. ৩৭
৬. সরকার বাদল : পুরোনো কাসুন্দি (১ম), লেখনী, মে ২০০৬, পৃ. ২৯
৭. তদেব : পৃ. ৩৯
৮. তদেব : পৃ. ৩৯
৯. তদেব : পৃ. ৩৯
১০. তদেব : পৃ. ৪৭
১১. তদেব : পৃ. ৭৯
১২. তদেব : পৃ. ৮০
১৩. তদেব : পৃ. ৫১
১৪. তদেব : পৃ. ৫২
১৫. তদেব : পৃ. ৭৩
১৬. তদেব : পৃ. ৭৪
১৭. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২,
পৃ. ১০৪

১৮. সরকার বাদল : পুরোনো কাসুন্দি (১ম), লেখনী, মে ২০০৬, পৃ. ১৪৭
১৯. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ১৯৯৯, পৃ. ২৪৬
এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন বিভাস চক্রবর্তী,
সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়— ১.৯.৯১-এ। পরে স্যাস্
-এর পক্ষ থেকে সেটি প্রায় অবিকৃত রেখে ১৯৯৯-এর
সংকলন ১৬ তে প্রকাশিত হয়। এটি এখানে তুলে দেওয়া
হয়েছে।
২০. তদেব : পৃ. ২৫২
২১. সরকার, বাদল-এর সাক্ষাৎকার : দেশ, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৩, পৃ. ৩৭।
২২. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ১৯৯৯, পৃ. ২৪৭
২৩. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ১৯৯৯, পৃ. ২৪৭
এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন বিভাস চক্রবর্তী,
সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়— ১.৯.৯১-এ। পরে স্যাস্
-এর পক্ষ থেকে সেটি প্রায় অবিকৃত রেখে ১৯৯৯-এর
সংকলন ১৬ তে প্রকাশিত হয়।
২৪. তদেব : পৃ. ২৪৯
২৫. সরকার বাদল : পুরোনো কাসুন্দি (১ম), লেখনী, মে ২০০৬, পৃ. ১৮৫
২৬. আচার্য অনিল (সম্পাদক) : নাট্য বিষয়ক সংখ্যা, 'নির্মাতার মুখোমুখি' নাম দিয়ে
অনুষ্ঠাপ পত্রিকার পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছিল।
সে প্রশ্নগুলি না তুলে ধারাবাহিক কথাগুলি সাজিয়ে
দিয়েছে এই পত্রিকা।' সেটিই এখানে তুলে দেওয়া
হয়েছে। অনুষ্ঠাপ চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় যুগ্ম সংখ্যা
২০০০, পৃ. ২২০
২৭. সরকার বাদল : পুরোনো কাসুন্দি, দ্বিতীয় খণ্ড, লেখনী, মে ২০০৬,
পৃ. ১৯
২৮. সরকার বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ২০৫
২৯. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২,
পৃ. ১০৭

৩০. সরকার বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ২১৫
৩১. সরকার, বাদল : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, অমৃতলোক, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ২৩। ‘দি স্টেটসম্যান’-এ প্রকাশিত অশোক নাগকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার, ঐ কথা বলেছেন। অনুবাদক: দিব্যাংশু মিশ্র।
৩২. সরকার বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ২৫৮-৫৯
৩৩. সরকার বাদল : স্মারক সংখ্যা : পশ্চিমবঙ্গনাট্য অকাদেমি (১৬) ২সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১২-১৩। এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন: শ্যামল ঘোষ। সেটিই এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে।
৩৪. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, পৃ. ১০৮
৩৫. তদেব : পৃ. ১০৯
৩৬. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: নাট্যপত্র স্যাস, সংকলন ১৬, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৪
৩৭. সরকার বাদল : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, অমৃতলোক, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ২৪
৩৮. তদেব : পৃ. ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাট্যকর্মী বাদল সরকার : প্রসেনিয়াম থিয়েটার পর্ব

বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রচলিত মঞ্চব্যবস্থার মধ্যেই তাঁর নাট্যজীবন শুরু করেন। আলোচনার শুরুতে তাই বুঝে নিতে হয় প্রসেনিয়াম থিয়েটার সংক্রান্ত মূল সূত্রগুলি। এদেশের অভিনয় শিল্প মূলত দু’ধরনের মঞ্চব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। এক, এদেশের দেশজ মঞ্চব্যবস্থা অর্থাৎ লোকনাট্য কিংবা যাত্রার মুক্তমঞ্চ। আরেকটি হলো বাঁধামঞ্চ অর্থাৎ প্রসেনিয়াম মঞ্চব্যবস্থা। লোকনাট্য-যাত্রার মঞ্চ ব্যবস্থাই এদেশের আদি রূপ। এক্ষেত্রে মঞ্চ বলতে একেবারে খোলা আকাশের নিচে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অনাড়ম্বরভাবে আয়োজিত একটি অস্থায়ী অভিনয়ক্ষেত্র। মঞ্চের চারিদিকটা খোলা, মাঝখানের অভিনয় ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বসে দর্শক। দীর্ঘদিন ধরে এই অভিনয়রীতিই আমাদের দেশে চলে আসছে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই ধরনের মঞ্চব্যবস্থার পাশাপাশি নতুন একটি মঞ্চ ব্যবস্থার সঙ্গে বাঙালি পরিচয় ঘটে। যাকে আমরা বলি প্রসেনিয়াম থিয়েটার মঞ্চ। অবশ্য প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সংস্কৃত নাটক এবং নাট্যশালার ঐতিহ্যের কথা সর্বজন বিদিত। ভারতমুনির ‘নাট্যশাস্ত্রে’ ভারতীয় নাট্যশালার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে। তিনি নাট্যশালা, মঞ্চব্যবস্থা, নেপথ্য-বিধান, তার প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে ভারতীয় নাট্যশালার ঐতিহ্য কত সুপ্রাচীন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের রাজত্বকালে এদেশীয় নাট্যব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটে। কেননা মুসলমানদের কাছে নাট্যাভিনয় ছিল না-পাক। কিন্তু সাধারণ মানুষ নগর জীবনের বাইরে সুদূর গ্রামঞ্চলে, শাসকের রক্তচক্ষুর আড়ালে পূজা-পার্বণে, উৎসবে বা শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উঠোনে বা মন্দির প্রাঙ্গণে সামিয়ানা খাটিয়ে ঠাকুর-দেবতার কথা গান বা পালা আকারে পরিবেশন করত। গানের সঙ্গে থাকত কিছুটা অভিনয়। গ্রাম্য শ্রোতা ও দর্শকরা সমবেত হতেন ভক্তি ভরে ঠাকুর দেবতার কথা শুনতেন। এই ভাবেই হয়তো গ্রামীণ নাট্যাভিনয়ের ধারাটি কিছুটা রক্ষা পেয়েছিল। ফলে এদেশের অভিনয় ধারা বলতে তখন আমাদের দেশজ অভিনয়ের লোকনাটকের ধারা এবং যাত্রার ধারা। আর উনিশ শতকে এসে সেই ধারায় নতুন সংযোজন ঘটলো বিদেশি আমদানিকৃত রঙ্গালয়— প্রসেনিয়াম থিয়েটার। বলাবাহুল্য প্রসেনিয়াম থিয়েটার বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই সমাদৃত এবং বহুল ব্যবহৃত থিয়েটার। খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে মধ্যযুগের ইউরোপে প্রসেনিয়াম থিয়েটার একটা নির্দিষ্ট রূপ পেতে থাকে। এই ধরনের থিয়েটার গড়ে ওঠার ইতিবৃত্তটি সমালোচক দর্শন চৌধুরী সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি

লিখেছেন:

“গ্রিক শব্দ Skene, গ্রিক রঙ্গমঞ্চের যে জায়গাটায় দেবতা ডায়নিসাসের আরাধনার পর নাটকের অভিনয় হত, তাকে বলতো Skene. এই Skene-এর সামনের দিকে গোলাকৃতি জায়গায় থাকত Orchestra, তার সামনে বিশাল পাহাড়ের ঢালু জমিতে গ্যালারির মতো করে দর্শকাসন...

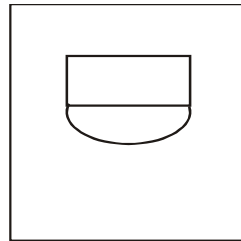
রোমান যুগে থিয়েটারে অভিনয়ের সুবিধার জন্য Skene -এর সামনে খানিকটা জায়গা বাড়িয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম মতো করা হয়েছিল। Orchestra ও Skene-এর মাঝখানে এই বাড়তি অংশটুকু জড়ো হলো। Skene-এর সামনে (Pro) এই অংশ জোড়ার ফলে এর নাম হয়ে গেল Proskenion, পরবর্তীকালে সামনের Orchestra-র গোলাকৃতি জায়গা তুলে দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার ভাবে তার অংশটি Skene-এর সামনে জুড়ে দাওয়া হলো। ক্রমে সেই অংশটি Arch (ধনুক)-এর আকারে Skene-এর সামনের অংশে যুক্ত হয়ে গেল। ...

এই থিয়েটার ইংল্যান্ডে এসে ইংরেজি ভাষায় ‘Skene’ হয়ে গেল ‘Scene’। গ্রিক ‘K’-এর বদলে ইংরেজি ‘C’। ইংরেজিতে নাম হলো তাই Proscenium, গ্রিক থেকে রোমান Proskenion ইংরেজিতে হলো Proscenium। এই ধরনের মঞ্চ যে থিয়েটার হয় তাকেই বলে Proscenium Theatre.”

প্রসেনিয়াম থিয়েটারের উদ্ভব নিয়ে এর থেকে ভালো ব্যাখ্যা আর কীই বা হতে পারে, তাই এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি।

বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের উদ্ভবটি একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে—

গ্রিক SKENE রোমান SKENE ইংল্যান্ড SCENE
Pro-skenion Proscenium



Proscenium Theatre

প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই ধরনের থিয়েটারে একটি নিজস্ব বাড়ি বা প্রেক্ষাগৃহ থাকে। সেই প্রেক্ষাগৃহের একদিকে কিছুটা উঁচু জায়গায় থাকে প্রসেনিয়াম মঞ্চ।

মঞ্চের সামনে থাকে দর্শকাসন। মঞ্চের তিনদিক ঘেরা। সামনের দিক খোলা যেখানে একটি পর্দা থাকে। এই পর্দা প্রয়োজন অনুযায়ী উঠানামা করা হয়। পর্দা সরে গেলে মঞ্চের ভেতর দেখা যায়। মঞ্চের দুটিকে অভিনেতা-অভিনেত্রীর যাতায়াতের জন্য উইংস থাকে। পিছনে পর্দায় দৃশ্য আঁকা থাকে যাকে সাধারণভাবে বলা হয় দৃশ্যপট। নাটকের দৃশ্য অনুযায়ী দৃশ্যপট সজ্জিত হয়। মঞ্চ থাকে প্রয়োজনীয় সেট সেটিংস তথা মঞ্চ-ব্যবস্থা। পাশাপাশি আলোর ব্যবস্থা, যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর চরিত্রোপযোগী সাজসজ্জা ও মেকআপের জন্য মঞ্চের পেছনে একটি সাজঘর থাকে, যাকে বলা হয় গ্রিনরুম। দর্শক বসে থাকে মঞ্চ থেকে দূরে, প্রেক্ষাগৃহের নির্দিষ্ট আসনে। মঞ্চটি থাকে উপবিষ্ট দর্শকের আই লেভেল অর্থাৎ দৃষ্টিতলে। আর দর্শক থেকে দূরে উচ্চতলে মঞ্চে অভিনয় চলে। এই সব-টা মিলেই তৈরি হল প্রসেনিয়াম থিয়েটার। বাংলায় নাট্যশালা বা রঙ্গালয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রসেনিয়াম থিয়েটার নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, কিন্তু তার নিজস্ব মডেলটি এখনো অপরিবর্তিত।

ইংল্যান্ডে যেরকম প্রসেনিয়াম থিয়েটার চালু ছিল সেই প্রসেনিয়াম থিয়েটারই ইংরেজ সাহেবরা আমাদের ভারতবর্ষ তথা বাংলায় নিয়ে এলো। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সদ্য গড়ে ওঠা নগর কলকাতায় চালু হলো প্রসেনিয়াম থিয়েটার। ধীরে ধীরে নতুন এই থিয়েটারের প্রতি বাঙালির আকর্ষণ তৈরি হলো। উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকেই বাঙালির বিদেশি রঙ্গালয় নির্মাণের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ‘হিন্দু থিয়েটার’ কিংবা শ্যামবাজারে নবীন বসুর নাট্যশালা (১৮৩৬ সাল), প্যারীমোহন বসুর ‘জোড়াসাঁকোর থিয়েটার’ (১৮৫৪ সাল), কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ’ (১৮৫৭ সাল), পাইকপাড়ার রাজাদের ‘বেলগাছিয়া নাট্যশালা’ (১৮৫৮) প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। বাঙালির নির্মিত এই সব থিয়েটারের প্রয়োজনে বাংলা নাট্যরচনাও শুরু হলো। শুরুতে অবশ্য কখনো ইংরেজি কখনো সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে নাটকাভিনয় হত। কিন্তু অতিক্রম অনুবাদের যুগ অতিক্রম করে লিখিত হতে লাগল একেরপর এক বাংলা মৌলিক নাটক। এভাবে বাংলার মাটিতে ইংরেজি মডেলের প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বাংলা নাটকাভিনয়ের পথচলা শুরু হল।

প্রথমদিকে বাঙালির এই থিয়েটার প্রীতি ছিল নিতান্তই শখ-শৌখিনতার বিষয়। কিন্তু অচিরেই সেই শখ-শৌখিনতার গণ্ডি অতিক্রম করে বাঙালি পৌঁছে গেল পেশাদারি-বাণিজ্যিক থিয়েটার পর্বে। ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলায় এই পেশাদারি থিয়েটারের জয়যাত্রা। থিয়েটার আর ব্যক্তিগত কোন গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে হয়ে উঠলো সর্বসাধারণের। ক্রমে থিয়েটারে এলো মূলধন বিনিয়োগের ধারণা। মূলধন বিনিয়োগ করে নাট্যপ্রযোজনার মধ্য

দিয়ে সেই বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে মুনাফা অর্জন। বাংলা থিয়েটার এইভাবে পরিবর্তিত হলো বাণিজ্যিক থিয়েটারে। এই ধরনের বাণিজ্যিক থিয়েটারের পরিমণ্ডলেই বাংলায় নাট্যাভিনয় চলতে থাকে। বাংলা নাট্যজগতের প্রতিষ্ঠিত প্রায় প্রত্যেক নাট্য ব্যক্তিত্বই এই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ধারণাকে গ্রহণ করেই তাদের নাট্যকর্ম চালিয়ে গেছেন। প্রসেনিয়ামের প্রচলিত মঞ্চ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েই করে গেছেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বাদল সরকারও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি যখন একটু একটু করে নাটক ও নাট্যকাভিনয়ের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছেন, তখন তিনি প্রচলিত প্রসেনিয়াম থিয়েটারকেই বেছে নিয়েছেন। এই অধ্যায়ে আমরা বাদল সরকারের সেই প্রসেনিয়াম থিয়েটার কেন্দ্রিক নাট্যকর্মের পরিচয় তুলে ধরব।

বাদল সরকারের নাট্যজীবনের এই পর্বের দু'টি উপ-পর্ব। একটি তাঁর প্রস্তুতি পর্ব। আরেকটি প্রতিষ্ঠা পর্ব। যে সময় পর্যন্ত বাদল সরকার নিতান্ত থিয়েটারের প্রতি ভালোলাগার জায়গা থেকে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর নাট্যকর্ম চালিয়ে গেছেন সেটাকেই আমরা 'প্রস্তুতি পর্ব' বলে চিহ্নিত করছি। মোটামুটি বাদল সরকারের নাট্যদল 'শতাব্দী' প্রতিষ্ঠার প্রাক্কর্মেই আমরা প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে ধরতে পারি। শতাব্দী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালে। শতাব্দী'র প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের একজন নাট্যকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান বাদল সরকার। আবার প্রসেনিয়াম মঞ্চে যখন তিনি খ্যাতির শীর্ষে তখনই প্রসেনিয়ামের যাবতীয় যশ, খ্যাতির মোহ ত্যাগ করে থিয়েটারকে পরিচালিত করলেন ভিন্ন পথে। সে আলোচনা যথাস্থানে করা হবে। মোটামুটি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারেই তাঁর নাট্যকর্মের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। অতএব ১৯৬৭ সালে শতাব্দী নাট্যদলের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়সীমাকে বাদল সরকারের নাট্য জীবনের প্রতিষ্ঠা পর্ব হিসেবে ধরতে পারি। প্রথমেই বাদল সরকারের নাট্যজীবনের প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথম পর্ব :

পারিবারিক কোন নাট্যপরিমণ্ডল থেকে বাদল সরকার থিয়েটারের জগতে আসেননি সে বিষয়ে আমরা প্রথম অধ্যায়ই আলোচনা করেছি। ফলে প্রথমদিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, বিচ্ছিন্নভাবে যখন যা পেরেছেন ছোটখাটো নাট্যকর্মের মধ্যে নিজে থেকে নিযুক্ত করে তাঁর নাট্যচর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। হয়তো সেগুলি নাট্যকর্মের দিক থেকে তেমন উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু তার মধ্যে একটা প্রাথমিক প্রস্তুতি আমরা লক্ষ্য করছি। একজন নাট্যকার, নাট্যকার হিসেবে বাদল সরকার তাঁর প্রথম প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন নিতান্ত একটি পারিবারিক নাট্যানুষ্ঠানে। সালটা ১৯৪১। 'স্লিপার্স অফ সিভিলেরা' নামক একটি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ করে নিজেই নাটকের পরিচালকের

ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নাটকটা ইংরেজি হলেও নিজের মতো করে বাঙালি চরিত্র এবং বাঙালি পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছেন। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে যে ধরনের মঞ্চ ব্যবস্থা থাকে, বাদল সরকার সেইভাবেই মঞ্চ তৈরি করেছেন। বাড়ির বাইরের একটি ঘরকেই তিনি প্রেক্ষাগৃহের মতো করে তার মধ্যে একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করেন। প্রসেনিয়াম মঞ্চের আদলে দৃশ্যসজ্জা, উইংস, ব্যাক ড্রপ, পর্দা সবকিছু ব্যবহার করেছেন। সেই মঞ্চ ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাদল সরকার লিখেছেন—

“বাইরের ঘরটা বোধ হয় ষোল ফুট লম্বা, ফুট এগারো চওড়া। দুটো তক্তপোষ পেতে তার তিনভাগের দু’ভাগ ভর্তি হয়ে গেল। বাকি একভাগে চেয়ার মোড়া পেতে প্রেক্ষাগৃহ। স্টেজের পেছনে দরজা দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায়, সে ঘরটা সবুজ-অর্থাৎ গ্রিনরুম। শাড়ি ধুতি বিছানার চাদর দিয়ে উইংস ব্যাকড্রপ পর্দা।”^{২২}

এই বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি মঞ্চ ব্যবস্থার উপকরণ সামান্য হলেও তার মধ্য দিয়েই বাদল সরকার যথাসম্ভব প্রচলিত প্রসেনিয়াম থিয়েটারে যে বাস্তবতার কথা বলা হয় সেটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এবং তিনি যে সে কাজে সফল হয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি লিখেছেন—

“... থিয়েটার — দারুণ। দর্শকদের কেমন লেগেছিল মনে নেই কিন্তু আমাদের দারুণ লেগেছিল। পুরুষ চরিত্র একটিই, অতএব আমাকে নায়ক বলা চলে। নাট্যকার, পরিচালক আর নায়ক একাধারে হয়ে আমার থিয়েটারি জীবন শুরু।”^{২৩}

এরকম কিছু ছোটখাটো নাট্যচর্চার মধ্য দিয়েই বাদল সরকারের নাট্যজীবনের শুরু হয়। একটি বিষয় উল্লেখ্য যে বাদল সরকারের তখনও পর্যন্ত কিন্তু পেশাদারি থিয়েটার সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও থিয়েটারকর্মের সঙ্গে তিনি সবসময়ই কমবেশি নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। কখনো এককভাবে, কখনো আবার সহকর্মী, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে এই পর্বে তাঁর নাট্যচর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। যেমন এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি ‘এনাকা’ গোষ্ঠীর কথা। এন্টালির একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকার সময় ফ্ল্যাটের অন্যান্য অধিবাসী এবং পাড়ার কিছু নাটোৎসাহী ব্যক্তিদের নিয়ে বাদল সরকার এই গ্রুপটি তৈরি করেছিলেন। এই গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে পরপর বেশ কয়েকটি নাটক অভিনয় করেন। প্রথম প্রচেষ্টা সুবোধ বসুর ‘অতিথি’ নাটক। এটি মঞ্চস্থ হয় কলেজ স্ট্রিটের YMC -এর পিছনের দিকের ছোট হল ঘরে। এরপর অভিনীত হয় শরদ্দিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লালপাঞ্জা’। মঞ্চস্থ হয় ওভারটুন হল-এ। এই নাটকে বাদল সরকার মুৎকুঞ্জি চরিত্রে অভিনয় করেন। এনাকা-র তৃতীয় প্রচেষ্টা শরদ্দিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বন্ধু’ নাটক। মঞ্চস্থ হলো সুরেন্দ্র

ব্যানার্জি রোডে YWC-এর অভিজাত হল ঘরে। এই নাটকে বাদল সরকার অভিনয় করলেন প্রেমকুমার চরিত্রে। এইসব থিয়েটারের যাবতীয় খরচ করা হতো নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে। বাদল সরকার লিখেছেন—

“— নিজেরা যথাসম্ভব চাঁদা দেওয়া, বন্ধুবান্ধবের কাছে চাঁদাভিক্ষা এবং নিমন্ত্রণ করে দর্শক আমদানি — কলকাতার নতুন সৌখীননাট্য সংস্থার যা চিরাচরিত প্রথা।”^৪

পারিবারিক থিয়েটার চর্চার গণ্ডি অতিক্রম করে বাদল সরকারের থিয়েটার চর্চা এভাবেই একটু একটু করে প্রসারিত হয়েছে।

‘এনাকা’-র মতই এই সময় বাদল সরকার ‘রিহার্সেল ক্লাব’ নামের আরেকটি গ্রুপ তৈরি করেন। কর্মসূত্রে মাইথনে থাকার সময় (১৯৫৩-’৫৫) সেখানকার সহকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তৈরি করেন রিহার্সেল ক্লাব। এই ক্লাবকে কেন্দ্র করে তিনি বেশকিছু নাটকের মঞ্চায়ন করেন। যদিও সবকটি নাটকই ধার করা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ডিটেকটিভ’, ‘বন্ধু’, সুবোধ বসুর ‘অতিথি’, রবীন্দ্র মৈত্র-র ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’ নাটকের মঞ্চায়ন করেন। এর মধ্যে বাদল সরকারের রিহার্সেল ক্লাব এবং সেখানকার রিক্রিয়েশন ক্লাব যৌথভাবে মঞ্চায়ন করেন ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’ নাটক। তথ্য হিসেবে এগুলির হয়তো তেমন গুরুত্ব নেই কিন্তু এইসব ছোটখাটো নাট্যকর্মের মধ্যেই বাদল সরকারের নিজস্ব নাট্যচিন্তার কিছু উল্লেখযোগ্য দিক আমরা লক্ষ্য করি। মঞ্চের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নাট্য জীবনের শুরু থেকেই তিনি যে ভীষণ শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন। তার কিছু কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যায় এইসব প্রযোজনা থেকে। সবকিছু তিনি ঘড়ি ধরে করতে ভালোবাসেন। কোথায় কোন সেট রাখা হবে, কত সময়ের মধ্যে সেট চেঞ্জ করতে হবে, কোন সেট কে বসাবে সবকিছুই তিনি আগে থেকেই ঠিক করে দিতেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বাদল সরকারের দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে; মাইথন পর্বের সেইসব ছোটখাটো নাট্যায়নের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বাদল সরকার বলেছেন:

“...পুরো ডায়াগ্রাম করে প্রতিটি সেট চেঞ্জ, যত কমপ্লিকেটেড-ই হোক না কেন, কোনোটাতে এক মিনিটের বেশি টাইম লাগবে না। ষাট সেকেন্ড। এই যে অরগাইজেশন, সোফাটা কে বার করবে, চেয়ারটা কে ঢোকাবে, সেগুলো সমস্ত একবারে ছবির মতো প্ল্যান করা, ওয়েল প্ল্যান্ড্। কাঁটায় কাঁটায় যে টাইম বলেছি সেই টাইমে আরম্ভ হয়।”^৫

এখানে মঞ্চব্যবস্থায় বাদল সরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রয়োগের প্রতিফলন স্পষ্ট। এই

পর্ব থেকেই নাট্যচর্চায় মঞ্চস্থাপত্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রয়োগে নাট্য গঠনকলায় একটা ধারণা তৈরি হতে শুরু করে। বলা ভালো তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দর্শনই তাঁর সামনে মঞ্চের ‘স্পেস’ বা পরিসরের বোধটা তুলে ধরে সাহায্য করে এই পর্বে।

রিহার্সেল ক্লাবের এইসব নাট্যায়ন থেকে আমরা লক্ষ্য করি বাদল সরকার সমবেত নাট্যনির্মাণে বিশ্বাস করতেন। পরিচালনার ক্ষেত্রে ছিলেন ভীষণভাবে গণতান্ত্রিক। তাই নাটক পরিচালনার সময় আলাদা করে পরিচালকের নাম ব্যবহার করতেন না। পুরোটাই হতো যৌথভাবে, সবার সমান অংশগ্রহণে। তিনি তাই বলেছেন—

“অভিনয় এবং পরিচালনায় খানিকটা দায়িত্ব ছিল, আমরা পরিচালকের নাম-টাম লিখতাম না। আমরা যৌথভাবে পরিচালনায় হেল্প করতাম আর কী।”^৬

এই রিহার্সেল ক্লাবের সময়পর্বে বাদল সরকারের নাট্যায়নের আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হলো থিয়েটার করার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই খরচের ব্যাপারে তিনি ভীষণ সতর্ক ছিলেন। তিনি জানতেন থিয়েটার, বিশেষ করে প্রসেনিয়াম থিয়েটারে নাটক করতে গেলে অর্থ লাগে। কিন্তু সামান্য আয়োজনে কীভাবে ভালো থিয়েটার করা যায় এটা তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়েছিল। তাই মঞ্চ সাজসজ্জার খরচ কমানোর জন্য অনেক সময় সহকর্মীদের কাছ থেকে অভিনয়ের জন্য মঞ্চের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতেও তিনি কোন সংকোচ করতেন না। সে কথা জানিয়ে বাদল সরকার বলেছেন—

“... যাকে সেটের জিনিস বা প্রপ্‌স্‌ বলি, তার জন্য কারুর বাড়িতে গেলে আমাদের চোখ ঘুরত, কোথায় একটা ভালো ফুলদানি আছে, নিয়ে যেতে হবে।”^৭

এই সময় বাদল সরকার যেটুকু থিয়েটার চর্চা করেছেন তা ‘খানিকটা স্পোরেডিকালি। খাপছাড়াভাবে।’^৮ এই সময় নির্দিষ্ট কোন নাট্যদল বা গ্রুপ তৈরি করে নয়, যখন যে রকম মনে হয়েছে অস্থায়ীভাবে গ্রুপ তৈরি করে তাঁর থিয়েটারকর্মকে অব্যাহত রেখেছেন। বাদল সরকার জানিয়েছেন, “থিয়েটারটা যখন অভিনয় হবে, একটাই শো হবে, তখন একটা নাম দিতে হয় বলে গ্রুপের একটা নাম দেওয়া হল। একটা অভিনয়েই থিয়েটারও শেষ, গ্রুপও শেষ।”^৯ আর দলের থিয়েটারের ডাইরেক্টর বলতে বাদল সরকার তখন ‘সাভেন্ট অভ্‌ দ্য গ্রুপ। প্রোডিউসার, ডাইরেক্টর যা বলি, তার পোজিশন-টা খানিকটা তা-ই।’^{১০} যে কয়েক জনের থিয়েটারের প্রতি নেশা ছিল তাদের একেবারে জোরাজুরি করে এই পর্বে থিয়েটার চর্চা চালিয়ে গেছেন তিনি।

এই পর্বে থিয়েটার করতে গিয়ে বাদল সরকার অনুভব করলেন নাটক লেখার প্রয়োজনীয়তা। তাই অন্যের নাটক কিংবা গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে থিয়েটার করার পাশাপাশি শুরু করলেন নাটক

লেখা। একবারের চেষ্ঠাতেই একটা সম্পূর্ণ নাটক লিখে ফেলেছেন এমনটা হয়নি। কিছু দূরে গিয়েই সে লেখা থেমে গেছে, তিনি জানিয়েছেন, “হয়তো খানিকটা এগোলাম, আমার মনে আছে, কোনো নাটকে যেন দুটি চরিত্র খাটের নীচে ঢুকেছিল, অন্য কয়েকজন প্রবেশ করছে— ওইখানে শেষ হয়ে গেছে।”^{১১}

মাইথনে যাওয়ার আগেই তৈরি করেছিলেন ‘এনাকা’ কালচারাল গ্রুপ। মাইথন থেকে ফিরে এসে সেই গ্রুপের কিছু সদস্য এবং কলকাতার পুরোনো কিছু নাট্যমোদী বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের নিয়ে তৈরি করলেন ‘চক্র’ (১৯৬০-৬৩) নামের আরেকটি সাংস্কৃতিক গ্রুপ। এই চক্রকে কেন্দ্র করেই এই সময় আবার বাদল সরকারের নাট্যচর্চা শুরু হয়। এবার শুধু নাট্যাভিনয় নয়, নাটক রচনার অনুশীলনও সমান ভাবে এগোতে থাকে। আর নাটক কতখানি উৎকৃষ্ট হয়ে উঠছে সেটা যাচাই করার জন্য চক্র-র সদস্যদের পড়ে শুনাতেন বাদল সরকার। ‘পুরোনো কাসুন্দি’ বইয়ে এ প্রসঙ্গে একটি মজাদার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন বাদল সরকার। তিনি লিখেছেন—

“খাওয়া দাওয়া এবং গভীর আড্ডার পর বেশি রাতে ঘোষণা করলাম— নাটক পরে শোনাবো। চূড়ান্ত প্রতিবাদ, বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবার আগে কেন বলিস নি, ইত্যাদি। আমি নাছোড়বান্দা, খাটের উপর বসে ‘বড়ো পিসিমা’-র পাণ্ডুলিপি খুলেছি। ... যেই বলেছি— প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, অমনি কানুর মন্তব্য— বেশ লিখেছিস।”^{১২}

কিন্তু বাদল সরকার হাল ছাড়েননি। আর চেষ্ঠা করতে করতেই একদিন লিখে ফেললেন প্রথম নাটক ‘সলিউশন এক্স’। নাটকটির রচনাকাল ১৯৫৬। যদিও ‘মাংকি বিজনেস’ বলে একটি ইংরেজি সিনেমা দেখে তিনি নাটকটি লিখেন কিন্তু রচনা করলেন সম্পূর্ণ নিজের মত করে। এরপরই একে একে লিখে ফেললেন ‘বড়ো পিসিমা’ (১৯৫৯), ‘শনিবার’ (১৯৫৯), ‘রাম শ্যাম যদু’ (১৯৬২) নাটক। আর শুধু তো নাটক লেখা নয়, সেই সঙ্গে চলে লিখিত নাটকগুলির নিয়মিত অভিনও। তাঁর ‘বড়ো পিসীমা’, ‘সলিউশন এক্স’, ‘শনিবার’, ‘রাম শ্যাম যদু’ প্রথম ‘চক্র’ই মঞ্চায়ন করে, যার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন বাদল সরকার নিজে। শুরুর দিকে এ.বি.টি.এ অর্থাৎ অলবেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর দোতলার হলঘর ভাড়া নিয়ে তাঁর নিজের লেখা নাটকের মঞ্চায়ন করতেন। অভিনয় করতেন চক্রের সদস্যরাই। তখনও টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করার জায়গায় বাদল সরকার পৌঁছাননি। চাঁদা তুলে, আমন্ত্রণপত্র বিতরণ করে থিয়েটার করা ছিল একমাত্র উপায়। বাদল সরকারের তখন থিয়েটারের প্রতি প্রবল উৎসাহ। চক্র-র সদস্যদের রাজি করিয়েই এ.বি.টি.এ-এর হল ঘরে একদিন নাট্যোৎসবের আয়োজন করলেন। ১৯৬১ সালের ১৮ই মার্চ, প্রবল উৎসাহে শুরু

হলো সেই নাট্যোৎসব। একে একে অভিনীত হল ‘বড়ো পিসীমা’, ‘শনিবার’, ‘সলিউশন এক্স’, জে.বি.প্রিস্টলীর ‘অ্যান ইনস্পেক্টর কলস্’ এর কাহিনি অবলম্বনে ‘থানা থেকে আসছি’ নাটক। এই নাট্যোৎসবের সৌজন্যে দর্শক মহলে বাদল সরকারের ‘চক্র’র মোটামুটি একটা পরিচিতি হয়। সেই সুবাদে বাদল সরকার ও তাঁর গ্রুপ ‘চক্র’র এবার কলকাতার বাইরেও আমন্ত্রিত নাট্যাভিনয়ের সুযোগ আসে। প্রথম আমন্ত্রিত অভিনয় — এ সীতারামপুরে, সেখানকার রেলকর্মীদের আহ্বানে। এরপর পুরোনো কর্মস্থল ‘মাইথনে’। ১০ই মার্চ ১৯৬২ সেখানে অভিনীত হল বাদল সরকারের ‘সলিউশন এক্স’। সেখান থেকে ফিরে এসে কলকাতার রঙমহল, মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করলেন ‘রাম শ্যাম যদু’ নাটক। ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবার এ.টি.বি.এ-এর হল ঘরে অভিনীত হল বাদল সরকারের নাটক ‘সমাবৃত্ত’।

এই পর্বে এভাবেই বাদল সরকারের থিয়েটার চর্চা চলতে থাকে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, নাটক লেখার ও প্রযোজনা সত্ত্বেও এই আদি পর্বে থিয়েটার তাঁর কাছে তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। তখনও পর্যন্ত থিয়েটার তাঁর কাছে শখ-শৌখিনতার আয়েসী বিলাসের বেশি কিছু নয়। নিজে কোন পেশাদারী থিয়েটারের দল তৈরি করে থিয়েটার করার ভাবনা তখনও পর্যন্ত বাদল সরকারের মাথায় ছিল না। তিনি জানিয়েছেন, “থিয়েটার করছি, কিন্তু তাকে প্রোডিউস করার কথা মনে হয়নি। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবকে শোনাচ্ছি, এই পর্যন্ত।”^{১০}

কখনো ক্লাব বা কখনো অস্থায়ী ভাবে নাটকের দল গঠন করে বাংলা নাট্যজগতে এভাবেই একটু একটু করে বাদল সরকারের একটা পরিচিতি তৈরি হতে থাকে। এরই মধ্যে ১৯৬৫-তে ‘বহুরূপী’ নাট্যপত্রে প্রকাশিত হল তাঁর ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটক। প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনেক নাট্যদল নাটকটি মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ নেয়। প্রথম করে শৌভনিক। ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫, তারা ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ মুক্তাঙ্গন মঞ্চে প্রথম অভিনয় করেন। নির্দেশনায় ছিলেন গোবিন্দ গাঙ্গুলি। এই অভিনয় এতটাই জনপ্রিয় হয় যে হঠাৎ করেই বাদল সরকারকে বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যজগতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

“শৌভনিকে-র এবং ইন্দ্রজিৎ আমাদের অনেকেরই ভালো না লাগলেও তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় নাট্যজগতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলকাতায় অনামিকা কলা সংগম-এর আমন্ত্রণে এসে গিরিশ কারনাড, মোহন রাকেশ, বিজয় তেডুলকর ও অরবিন্দ দেশপাণ্ডে মুক্তাঙ্গন মঞ্চে নাটকটি দেখেই আকৃষ্ট হন। কারনাড পরে বলেছেন: প্রযোজনাটি আমার বেশ ভালোই লেগেছিল, যদিও মনে হয়েছিল ওরা একটু বাড়াবাড়ি করেছিল — অভিনয়েও বাড়াবাড়ি। বি ভি

কারস্থ কলকাতায় ওই প্রযোজনা দেখেই সত্যদেব দুবে-কে নাটকটির কথা বলেন। ... হিন্দিতে, গুজরাটিতে, ইংরেজিতে, মারাঠিতে কল্লড়ে, এবং ইন্দ্রজিৎ অভিনীত হচ্ছে, পরিচালনা করছেন গিরিশ কারনাড, সত্যদেব দুবে, মোহন মহর্ষি, অরবিন্দ দেশপাণ্ডে, বি. ভি কারস্থ রাজিন্দর নাথ, শ্যামানন্দ জালান।”^{১৪}

বহুরূপী-তে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের প্রকাশ এবং পরবর্তীকালে নাট্যজগতে বাদল সরকারকে নিয়ে চর্চার সূত্রেই ইতোমধ্যে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। বহুরূপী দলের সঙ্গে তাঁর তখন যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা। বাদল সরকার লিখেছেন, “বহুরূপী-র রিহাস্যাল রুমে প্রায়ই আমাকে নাটক পাঠ করতে যেতে হতো ... ‘বাকি ইতিহাস’, ‘সারারাত্তির’, ‘বাঘ’, ‘রাম শ্যাম যদু’ লেখাপড়া করে অনুমতি নিয়ে নিলো ওরা।”^{১৫} এতদিন বাদল সরকার তাঁর নিজের মতন করে বিচ্ছিন্নভাবে থিয়েটার চর্চা করছেন ঠিকই কিন্তু সেই অর্থে প্রতিষ্ঠিত কোন গ্রুপ থিয়েটারে কাজ করার কোন সুযোগ হয়নি। এই প্রথম শম্ভু মিত্রের বহুরূপী নাট্যদলের মতো একটি গ্রুপ থিয়েটার দলের সঙ্গে বাদল সরকারের সংযোগ ঘটলো। বহুরূপীকে কেন্দ্র করে এবার শুরু হলো বাদল সরকারের থিয়েটার চর্চা। বাদল সরকার মনে মনে এরকমটাই চেয়েছিলেন। তিনি এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে চক্র বা ওই জাতীয় কোন অস্থায়ী গ্রুপ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি থিয়েটার চর্চা সম্ভব নয়। তাঁর পক্ষে এককভাবে নাট্যদল তৈরি করাও তখন প্রায় অসম্ভব ছিল। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি নাট্যদল যাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি তাঁর থিয়েটারকর্মকে একটা শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে পারেন। তাঁর এই জাতীয় চিন্তাভাবনার সাক্ষ্য পাওয়া যায় প্রতিভা অগ্রবালকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে—

“... বুঝতে পারছি যে চক্র দিয়ে আর হবে না, এবার একটা থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আবার হেজিটেট-ও করছি। আমি ওই ডিসিপ্লিন-এ খুব একটা আকৃষ্ট হতাম না। তার চেয়ে যদি একটা দল পেয়ে যাই, যাদের হয়তো অভিনয়ের বহুদিনের অভিজ্ঞতা আছে, অথচ ভালো নাটকের ব্যাপারে অভাব আছে, সেরকম কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেটাকে স্ট্রং করা বরং বেটার।”^{১৬}

সেই ভাবনা থেকেই বাদল সরকার ‘বহুরূপী’র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। কারণ তখন বাদল সরকারের মনে হয়েছিল শম্ভু মিত্রের কাছে অভিনয় আর নির্দেশনার অনেক কিছু শেখবার আছে। অর্থাৎ তিনি এরকম একটি থিয়েটার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার কথা ভেবেছেন। আর তাই যখন বহুরূপী থেকে তাঁরই লেখা নাটক ‘প্রলাপ’-এর পরিচালনার প্রস্তাব এলো তখন তিনি সেটা সাদরে গ্রহণ করলেন। সময়টা ১৯৬৭-র শেষের দিক। শম্ভু মিত্র তখন ফিলিপিন্স, জাপান, আমেরিকা ও জার্মান

ভ্রমণরত। তাঁর অনুপস্থিতিতে ১৯৬৭-র ৩ অক্টোবর, বাদল সরকারের নির্দেশনায় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে অভিনীত হলো ‘প্রলাপ’ নাটক। বহুরূপী নাট্যপ্রযোজনার ইতিহাসে এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। এই প্রথম শম্ভু মিত্রের পরিবর্তে তাঁরই নাট্যদলে নির্দেশনার কাজ করলেন বাদল সরকার। অভিনয় করেছিলেন কুমার রায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ, দেবতোষ ঘোষ এবং বহু স্মরণীয় চরিত্রের সমর্থ অভিনেত্রী রমলা রায়। যেকোনো কারণেই হোক, দর্শক আনুকূল্য ‘প্রলাপ’ পায়নি। কিন্তু ‘নাউ’-এর মতো মননশীল পত্রিকার ভালো লেগেছিল বাদল সরকারের নাটক এবং নির্দেশনা। তারা লিখেছেন—

“The naturalist manner of playwriting in Bengali has seldom attained greater heights than has in *pralap*. The production is distinctly different from previous Bohurupee plays in its manner as well as temper. Rightly so, because this time the illustrious Sambhu Mitra has made room for a new director, Badal Sarkar. And, in all fairness, it has to be granted that Mr Sarkar does not find the robes of the veteran loosely, hanging on this person. Relying entirely on simple productional methods he achieves as sort of definite slickness in the performance. The choreography is neat and tidy; the stage is spaciouly propped with the barest necessities; the lighting, costume and make-up of the players are controlled with the utmost tidiness.”^{১৭}

বহুরূপীতে ওই একবারই বাদল সরকার নির্দেশনার কাজ করেছেন। কারণ হিসেবে বাদল সরকার জানিয়েছেন— “... আমার টেম্পেরামেন্ট-এর সঙ্গে ওখানকার টেম্পেরামেন্ট মিলল না।”^{১৮} তাই বহুরূপীর সঙ্গে বাদল সরকারের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হলো না। শম্ভু মিত্র নিজে বাদল সরকারের ‘পাগলা ঘোড়া’, ‘বাকি ইতিহাস’-এর মতো নাটক প্রযোজনা করেছেন। কিন্তু নানা কারণে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে বাদল সরকারের সম্পর্কের অবনতি হয়। সম্পর্কের তিক্ততা বাড়ে ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকের প্রোডাকশন নিয়ে। বাদল সরকারের পরিচালনায় ‘প্রলাপ’ নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পূর্বেই ৭ই মে ১৯৬৭, নিউ এম্পায়ার-এ শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় ‘বাকি ইতিহাস’ নাটক মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু সেই প্রযোজনা বাদল সরকারের পছন্দ হয়নি। কারণ শম্ভু মিত্রের ইচ্ছে মতো ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকের বেশ কিছু অংশ অদলবদল করে মঞ্চস্থ করেছিলেন। যেমন ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতাটি শম্ভু মিত্র

সংযোজন করেছিলেন যা বাদল সরকার পছন্দ করেননি। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “ওটা কি ওর মধ্যে ছিল? ... আমার বেসিক আপত্তি কিন্তু ওইখানে। আমি খোলাখুলি বলেছি শম্ভুদাকে, বহুরূপীর সবাইকেই বলেছি আমার কথা।”^{১৯} বাদল সরকার তখনই বুঝেছেন বহুরূপীর সঙ্গে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অচিরেই বহুরূপীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে দিয়ে বাদল সরকার বেরিয়ে আসেন। আর সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন একটি প্রতিষ্ঠিত গ্রুপ থিয়েটারে নাট্য পরিচালনা করার এক বিরাট অভিজ্ঞতা।

এই পর্যন্ত এসে আমরা প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বাদল সরকারের প্রস্তুতি পর্বের ইতি টানতে পারি। তার কারণ বহুরূপী নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া কিংবা তার পূর্ববর্তী কালের বিচ্ছিন্ন কিছু নাট্যকর্মের মধ্যেই বাদল সরকারের যাকে বলে থিয়েটার প্র্যাকটিস সেটি এই পর্বে করেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব:

ইতিমধ্যে বাদল সরকার বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারে একটা পরিচিতি পেয়ে গেছেন। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের প্রচুর খ্যাতি এর একটা অন্যতম কারণ। শৌভনিক, বহুরূপী, অনামিকার মতো নাট্যদল বাদল সরকারের একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করে বাদল সরকারকে যথেষ্ট খ্যাতি এনে দেয়। এই পর্বে এসে আমরা লক্ষ্য করি থিয়েটারের প্রতি তাঁর একটা দায়বদ্ধতার জায়গা তৈরি হতে থাকে। খ্যাতি তাঁকে আর শেখের নাট্যকার থাকতে দেয় না। এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় হলো অন্যদলের তাঁর নাটকের বেশ কয়েকটি প্রযোজনা বাদল সরকারকে হতাশ করে। শৌভনিকের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ তাঁর ভালো লাগেনি। “... সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা”^{২০} বলে মন্তব্য করেছেন। শম্ভু মিত্র পরিচালিত বহুরূপী নাট্যদলের ‘বাকি ইতিহাস’ নিয়ে তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্যের বিষয়টি আমরা তো আগেই বলেছি। নাট্যকারের কল্পনা ও নাট্যনির্দেশকের পাঠ ও প্রয়োগকল্পনার মধ্যে ব্যবধান যতই তাঁর কাছে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে, ততই নিজের মতো করে নিজের লেখা নাটকগুলি প্রযোজনা করার বাসনা প্রবল হতে থাকে। আর সেই বাসনা থেকেই চক্র ভেঙে ১৯৬৭-র ২৯ আগস্ট বাদল সরকার তৈরি করলেন ‘শতাব্দী’ নাট্যদল। শতাব্দী-র রেজিস্ট্রেশন করলেন, নিজেই তার লোগো তৈরি করলেন, নিজেই ডিজাইন করলেন, তৈরি হল দল। এই নাট্যদলের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বাদল সরকার বলেছেন:

“বহুরূপী বা নন্দীকার — এদের প্রথম দিকে একটা ঘোষণা ছিল না — ভালো নাটক ভালো করে করব, আমাদেরও খানিকটা সেই চিন্তা ছিল। তার সঙ্গে অ্যাডেড ফ্যাক্টর হচ্ছে, আমার লিখিত নাটকগুলো যা হাতের সামনে আছে —

যদিও কোনো লিখিত নিয়ম ছিল না যে আমার নাটকই করতে হবে। কিন্তু এটা হাতের কাছে আছে। ওই ধরনের নাটক করতে চাই, সেইজন্য শতাব্দী তৈরি হয়েছিল।”^{২১}

বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মধ্যে থেকেই তিনি তাঁর নাটকগুলির ভালোভাবে মঞ্চস্থ করার কথা ভেবেছিলেন। এর থেকে বেশি কিছু না। শতাব্দীর শুরুটা হয় একেবারে আর পাঁচটা গ্রুপ থিয়েটারের মতোই। খবরের কাগজে রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে শতাব্দী নাট্যদলের জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী চাওয়া হতো। বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,

“... পুরোপুরি প্রোফেশনাল না হলেও খানিকটা ওই ধরনের অ্যাপ্রোচ, অর্থাৎ অ্যাকটর-দের কোঅপারেটিভ, যেখানে লাভ বলে কিছু থাকবে না, একটা অঙ্কের ওপরে বিক্রি হলেই সেটা খানিকটা শেয়ার করে নেওয়া হবে, অর্থাৎ একটা ইনসেন্টিভ থাকবে। ... আনন্দবাজার-এ একটা ক্ল্যাসিফায়েড ইনসারশন-ও দিয়েছিলাম।”^{২২}

এভাবেই শতাব্দী-র যাত্রা শুধু হয়। শতাব্দী-র প্রথম নাটক ‘কবিকাহিনী’। আর প্রথমেই আমন্ত্রিত অভিনয় ২৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮, ফারাক্কায়। মঞ্চ ব্যবস্থা সরল একটি সেটে চারটি দৃশ্যে কাহিনি বিস্তৃত। আবহসঙ্গীত অনুপস্থিত। আলোক সম্পাত যেটুকু একান্ত না হলে নয়। এখানে নাট্যকার জটিল সামাজিক সমস্যাকেও হাসির মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই নাটকে রাজনীতি, শ্লেষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আছে, কিন্তু সবই যেন অনাবিল হাসির মখমলে ঢাকা। ১৭ই মার্চ ১৯৬৮-র আনন্দবাজার পত্রিকায় এই নাটকে বাদল সরকারের নাট্যপ্রযোজনার কথা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়—

“ব্যক্তিগত বা দলগত খোঁচাকে একটু চোখা করলেই একটু খেলো হলেই আরো দেদার হাততালি জুটত কিন্তু নাট্যকার কোন সহজিয়া সুরের প্রলোভনে পড়েননি। তারের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছেন।”^{২৩}

এই নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে ১৯৬৮-র ১৪ মার্চ কালান্তর পত্রিকায় লেখা হয়—

“‘শতাব্দী’ সংস্থা প্রথম আবির্ভাবই যে অপূর্ব দলগত অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। বাদল সরকার যে একজন শক্তিমান অভিনেতাও— এ নাটকে তার পরিচয় পাওয়া গেল।”^{২৪}

এ নাটকে অভিনয় করেছেন বিজয়া সরকার, পুতুল সরকার, শোভন চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ মুন্সী প্রমুখ। এরপর রবীন্দ্র সরোবরের সি আই টি-র ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানেই

শুরু হয় নিয়মিত অভিনয়। তখন শতাব্দী প্রতি রবিবার দু'টি করে শো করতো। ‘কবিকাহিনী’-র পরপর বেশ কয়েকটি শো করা হয় এখানে। ‘কবিকাহিনী’-র পর ঐ একই মঞ্চে শতাব্দী নামায় ‘বাঘ’ (১৯৬৮-র ৯ জুন) এবং ‘বিচিত্রানুষ্ঠান’ নাটক।

একটা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে শতাব্দীর প্রোডাকশন শুরু হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই উৎসাহে ভাটা পড়ে। শখ-শৌখিনতা থেকে থিয়েটার করা, আর এভাবে গ্রুপ থিয়েটার তৈরি করে থিয়েটার করা যে এক জিনিস নয়, এবার বাদল সরকার সেটা উপলব্ধি করতে পারলেন। মনে রাখতে হবে ‘এনাকা’ কিংবা ‘চক্র’ কোন থিয়েটারের দল নয়। ফলে সেই অর্থে এই ধরনের গ্রুপ থিয়েটার করার অভিজ্ঞতা বাদল সরকারের পূর্বে কখনো হয়নি। খুব সীমিত সময়ের জন্য বহুরূপী-তে কাজ করেছেন বটে কিন্তু এইভাবে একটি থিয়েটার গ্রুপ তৈরি করে নাট্যচর্চা করা এই প্রথম। ফলে শুরুতে তাঁকে কিছু কিছু অসুবিধার সন্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমত: অর্থ। এই ধরনের থিয়েটারে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। মঞ্চে সাজসজ্জা, আলো, আসবাবপত্র, অভিনেতাদের পোশাক আর মেকাপ, সর্বোপরি হল ঘরের ভাড়া-এসবের খরচ তুলতে গিয়ে বাদল সরকারের তখন হিমশিম অবস্থা। স্বীকার করতে বাধ্য নেই নাট্য প্রয়োজনায বহুরূপী, নান্দীকার তখন যে মান তৈরি করেছেন, কি সার্বিক শিল্পগুণে, কি অভিনয়ে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া নবগঠিত শতাব্দী-র পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে দর্শকসমাদর থেকে শতাব্দী তখনও বহু দূরে। লাভ তো দূর অস্ত, নিজের গচ্ছিত অর্থও একসময় ফুরিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার নিজেই জানিয়েছেন,

“তিনটের শো-গুলোতে প্রচণ্ডভাবে মার খায়, সন্ধ্যের শো-তে খানিকটা সাড়া পাই। কবিকাহিনী বোধ হয় আমরা যোলোটা রবিবারের জন্য নিয়েছিলাম, পরে চারটে রবিবার আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ... পরের চারটে রবিবার বাঘ ও বিচিত্রানুষ্ঠান ডবল বিল হয়। তারপর ওটা বন্ধ করে দিই।”^{২৫}

‘বাঘ’, ‘বিচিত্রানুষ্ঠান’ বন্ধ করে দেওয়ার পরেও বাদল সরকার শতাব্দী-কে নানা রকমভাবে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন। ‘ত্রিশ শতাব্দী’ নাটকের রিহারসালও দিলেন কিছুদিন। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। একদিকে আর্থিক ক্ষতি, অন্যদিকে দলের সদস্যদের মধ্যেই তৈরি হলো নানারকম মতানৈক্য। বাদল সরকার নিজেও তখনো পর্যন্ত দল পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজস্ব কোন দর্শন গড়ে তুলতে পারেননি। যেভাবে তিনি শতাব্দী শুরু করেছিলেন, সেটা সম্মুখে তাঁর নিজেরও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এইসব নানা কারণে প্রথম শতাব্দী এক বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। শতাব্দীর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই অন্য নাট্যদলে চলে গেলেন। কেন তিনি সেই সময় শতাব্দী-কে টিকিয়ে রাখতে পারলেন না, তার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান—

“...ফিলসফি পরিষ্কার না থাকা; যেভাবে আমি আরম্ভ করেছি, সেটা সম্বন্ধে আমার নিজেরও অসুবিধে; মনে হচ্ছে এটা করতে চাই না। এটা মনে হতে আরম্ভ করলে আমি থিয়েটার করা ছেড়ে দিলাম। শতাব্দী ডিসব্যানডেড হল। তখনকার চুক্তি মতো যেটুকু টাকা ছিল— সামান্যই টাকা - তা ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়ে, সিক্সটি এইট-এ, ... শতাব্দী উঠে গেল।”^{২৬}

শতাব্দী-র এইভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাদল সরকারও যেন খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এবং তখন সিদ্ধান্ত নেন যে আর কোনদিন থিয়েটার করবেন না। কারণ বাদল সরকারের মনে হয়েছে তাঁর পক্ষে এই ধরনের থিয়েটার করা সম্ভব নয়। কিন্তু থিয়েটার তাঁর পিছু ছাড়ে না। শতাব্দী-র কয়েকজন সদস্য — “দেবেন (গঙ্গোপাধ্যায়) একজন, পঙ্কজ মুনশি আরেকজন — এরকম কয়েকজন”^{২৭}—এর উৎসাহে বাদল সরকার থিয়েটার নিয়ে আবার ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন। ১৯৬৯ সালে আবার নতুন করে শতাব্দী শুরু করলেন। প্রথমেই নাটক অভিনয়ে না গিয়ে সপ্তাহে একদিন করে অনেকটা স্টাডি সার্কেলের মতো নাটক পাঠের পাশাপাশি থিয়েটার নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবার বাদল সরকার আগের থেকে অনেক বেশি পরিণত। ইতিমধ্যে ১৯৬৯ সালে তিনি ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের অঙ্গরূপে ঘুরে এসেছেন রাশিয়া পোল্যান্ড আর চেকোস্লোভাকিয়া। সেখানে তিনি দেখেছেন কিভাবে কম খরচে থিয়েটার করা হয়। তাই দেশে ফিরে এসে যখন দ্বিতীয়বার শতাব্দী শুরু করলেন তখন প্রথমেই এই বিষয়টি নিয়ে নানা রকম চিন্তা করলেন। কারণ প্রথম শতাব্দী-র এক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটা অন্যতম কারণ হল অর্থ। এই ধরনের থিয়েটার করতে যে ধরনের অর্থের প্রয়োজন হয় বাদল সরকার তখন তা যেকোনো কারণেই হোক পেরে উঠছিলেন না। এবার যখন নতুন করে শতাব্দী শুরু করলেন তখন প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন এই ধরনের থিয়েটারে খরচ কমাতে না পারলে শুধু টিকিট বিক্রির উপর নির্ভর করে থিয়েটার করা সম্ভব নয়। তাই প্রথমেই যথাসম্ভব খরচ কমানোর দিকে নজর দিলেন। প্রথমত: অল্প টাকায়, ছোটো হল ঘর ভাড়া নিয়ে প্রোডাকশন করাটাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন। শুধু তাই নয়, মঞ্চের ব্যবস্থাপনার জন্য যে যে ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় সেই সবক্ষেত্রে খরচ কমানোর চেষ্টা করলেন, তিনি লিখেছেন—

“আমরা ক্রমেই মঞ্চসজ্জা, আলো, সাজপোশাক ও আবহসংগীত কমাতে লাগলাম। আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, আমরা টেপ রেকর্ডার বা প্রোজেক্টর-এর মতো কোনো যান্ত্রিক উপকরণ ব্যবহার করব না।”^{২৮}

বাদল সরকারের দীর্ঘদিনের সহকর্মী, শতাব্দী-র পুরোনো সদস্য পঙ্কজ মুন্সী সেদিনের স্মৃতিচারণ

করতে গিয়ে বলেছেন—

“... লোকসান কমাবার জন্য বাদলদা তখন বলতেন ‘আমাদের hit & run policy-তে Production করতে হবে। তার কারণ নাটক শুরুর দিকে অনেক টাকা Push করে খানিকটা লোকসান কমানো যায়’।”^{২৯}

প্রসেনিয়াম থিয়েটার অপরিহার্য কিছু উপকরণের জন্যই খরচ বেশি হয়। ফলে তিনি যখন এইসব উপকরণ বাদ দিলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই থিয়েটার করার আর্থিক চাপ থেকে তিনি খানিকটা মুক্ত হলেন। স্বল্প আয়োজনে, শুরু হলো নতুন দ্বিতীয় পর্বের শতাব্দী-কে কেন্দ্র করে তাঁর থিয়েটার চর্চা। শতাব্দী তখন একেবারেই চার-পাঁচ জনের একটা ছোট গ্রুপ। দ্বিতীয় পর্বের শতাব্দী শুরু হলো ‘প্রলাপ’ নাটক দিয়ে। নাটকের প্রস্তুতি নেওয়া হয় মাইথন-এর রিহার্সাল ক্লাবের পদ্ধতি প্রয়োগ করে। অর্থাৎ শুধু রিহার্সাল হবে, শো হবে না, এই পদ্ধতিতে নাটক তৈরি করা হয়। পরে ‘প্রলাপ’-এর অভিনয় হয় রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ ভাড়া নিয়ে। এখানে ‘প্রলাপ’-র দুটি শো হয়। এরপর ‘প্রলাপ’-র অভিনয় হয় প্রতাপ মেমোরিয়াল হল-এ, নাট্যকার নির্দেশক বাদল সরকার। অভিনয়ে ছিলেন বাদল সরকার, পঙ্কজ মুন্সী, দেবেন গাঙ্গুলী, বিজয়া সরকার, বিশ্বেন্দু দাস। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের শতাব্দীর প্রথম প্রচেষ্টায় তেমন সাড়া পেলেন না। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, “অল্প ভাড়ায় ছোটো হল নিয়ে প্রলাপ করেছি। ন্যাচারালি খুব একটা সাড়া পাইনি।”^{৩০}

‘প্রলাপ’-এ সফল না হলেও বাদল সরকার হাল ছাড়লেন না। ‘প্রলাপ’-র পর শুরু হলো ‘শেষ নেই’ নাটকের রিহার্সাল। এ নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে। পরে রবীন্দ্র সরোবর-এ। এই সময় শতাব্দীর আবার নিয়মিত অভিনয় আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে শতাব্দী সদস্য সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এই পর্বে তিনি নাট্যপ্রযোজনা ক্ষেত্রে অনেক বেশি হিসেবি। প্রথম শতাব্দীর সময় তিনি নাট্য প্রযোজনায় যেভাবে সামর্থের অধিক পাবলিসিটির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবার কিন্তু তিনি সেটা করলেন না। কারণ তাতেও অনেক খরচ বাঁচানো যায়। বাদল সরকারের তখন ঘোষিত নীতি হল,

“...লোকসান খেলেও আমি কারও কাছে টাকা নেবও না, কাউকে কিছু টাকা দেবও না। মানে, দর্শকের উপরেই যদি চলে, তবে ওই প্রিন্সিপল-টা ডিভেলপ করে একটা নতুন প্রোডাকশন-এ সেট, কসটিউম আর প্রপ্‌স্‌, তিনটে মিলিয়ে একশো টাকার মধ্যে খরচ রাখব।”^{৩১}

এই সময় প্ল্যাটফর্মকে বাড়িয়ে কমিয়ে, একটা নাটকের সেট-এর মালপত্র পরের নাটকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করতে লাগলেন। কারণ একটাই; আর্থিক খরচ কমিয়ে লোকসান থেকে

শতাব্দীকে বাঁচানো। এই একই পন্থায় করা হয় ‘বল্লভপুরের রূপকথা’। প্রথম অভিনয় হয় ২৮শে নভেম্বর ১৯৭০, প্রতাপ মেমোরিয়াল হল-এ। তারপর অভিনয় হয় রবীন্দ্র সরোবরে। ‘বল্লভপুরের রূপকথা’র টোটাল সেট খরচ পড়েছিল ৬৫ টাকা।^{১১২} ওই সামান্য টাকা খরচ করেই ‘বল্লভপুরের রূপকথা’-র সেট বানিয়েছিলেন। ভগ্নপ্রায় রাজপ্রাসাদের রাজসভার সিংহাসন থেকে শুরু করে অট্টালিকার থাম-সবই ওই টাকাতেই করেছেন।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত শতাব্দী একটি গ্রুপ থিয়েটারের দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে বঞ্চিত। বাদল সরকার যখন ‘বল্লভপুরের রূপকথা’র প্রোডাকশন করেন তখন শতাব্দীর ‘ফিন্যান্সিয়াল অবস্থা কাহিল’।^{১১৩} দ্বিতীয়বার শতাব্দী প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বাদল সরকার জানিয়েছেন,

“... রবীন্দ্র সরোবরের শো-তে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এক তৃতীয়াংশ কি এক চতুর্থাংশ যদি ভর্তি না হয় তা হলে শতাব্দীর এখানেই ইতি। আর থিয়েটার করব না। তার ফলে শতাব্দীর সমস্ত মেম্বার এমনকি আমিও সবাইয়ের কাছে গিয়ে বলতে লাগলাম— তোমরা এবার যদি টিকিট না কাটো আমরা কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছি।”^{১১৪}

সেদিন দর্শক সাধারণ বাদল সরকারকে নিরাশ করেননি। জনপ্রিয় হয়ে উঠলো এই নাটক। তিনি জানিয়েছেন, “সেই প্রথম রবীন্দ্র সরোবরে আমাদের প্রযোজনা ‘হাউস ফুল’ হয়, এমনকি কিছু লোক ফিরেও যায়।”^{১১৫} এক কথায় এই প্রথম বাদল সরকার একটি স্বাধীন গ্রুপ থিয়েটারের দল তৈরি করে সাফল্যের মুখ দেখলেন।

‘বল্লভপুরের রূপকথা’-র পর শুরু হলো গৌরকিশোর ঘোষের গল্প ‘সাগিনা মাহাতো’ অবলম্বনে লেখা নাটক ‘সাগিনা মাহাতো’। ৮ই আগস্ট, ১৯৭১-এ প্রতাপ মেমোরিয়াল হল-এ অভিনীত হলো ‘সাগিনা মাহাতো’। অভিনয়ে ছিলেন দেবেন গাঙ্গুলী, আদিত্য মিশ্র, দিলীপ ভট্টাচার্য, পঙ্কজ মুন্সী, মুরারী চক্রবর্তী, ভারতী সরকার, অপূর্ব বসু, বাদল সরকার। আলোক সম্পাতে ছিলেন তপন দাস। আমরা জানি এই একই নামে পরিচালক তপন সিংহের সিনেমাটি তখন মুক্তি পেয়ে গিয়েছে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়ও হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বাদল সরকার সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনা এবং নাট্যবোধের মিশেল ঘটিয়ে অসাধারণ এক নাট্য নির্মাণ করলেন। পঙ্কজ মুন্সী লিখেছেন—

“এ নাটকে মঞ্চের প্রতিটি অংশকে উনি ব্যবহার করেছিলেন। সামান্য কয়েকটি কাঠের বিভিন্ন আকারের বাক্স দিয়ে দৃশ্য বিভাজন করেছিলেন। যা সে সময়ে অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপই ছিল। অবশ্য তিনি কখনোই দৃশ্যসজ্জার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। বলতেন— আমাদের মতো গরিব দেশে মঞ্চের জন্য

অতিরিক্ত খরচ করা বাহুল্য।”^{৩৬}

‘বল্লভপুরের রূপকথা’র পর শতাব্দীর এটি দ্বিতীয় মঞ্চসফল প্রযোজনা।

‘সাগিনা মাহাতো’-র পর করলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘আবু হোসেন’। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষকে হুবহু অনুসরণ না করে নাটকের বেশ কিছু অংশ তিনি নিজের মতো করে পুনর্নির্মাণ করে নেন। এই নির্মাণকে বাদল সরকার বলেছেন ‘বিকৃতি’। তিনি জানিয়েছেন “আমাদের প্রযোজনার ঘোষণার যেমন ‘রচনা গিরিশ ঘোষ/বিকৃতি : বাদল সরকার’ বলা হত...।”^{৩৭} এবারও তিনি পুরোপুরি সফল। এখানেও ঐতিহাসিক নাটকে অনারম্বরমঞ্চ ও পোশাক ব্যবহার করে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বাদল সরকার লিখেছেন,

“ ‘আবু হোসেন’-এ রাজসভা, বাগান, বৈঠকখানা ও রাস্তার সেট ছিল, আর এই সবকিছুর জন্যে আমাদের খরচ হয়েছিল একশ টাকারও কম। আসলে, আমরা আমাদের ও দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করতে শিখেছিলাম।”^{৩৮}

এইভাবেই শতাব্দী গ্রুপ থিয়েটারের জগতে একটা নিজস্ব জায়গা করে নেয়। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন,

“বল্লভপুরের রূপকথা-র পিঠোপিঠি সাগিনা মাহাতো আর আবু হোসেন, গ্রুপ থিয়েটারে আমাদের প্রথম সাক্সেস, অর্থাৎ কলকাতার শো-তেই কলকাতার কাস্টিং-টা উঠে আসছে, তা থেকেই হল ভাড়া, স্পটলাইট, সব-কিছুর কস্ট উঠে আসছে, এটা সাক্সেস-এর লক্ষণ, কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারে। সেই অবস্থায় আমরা পৌঁছে যাই।”^{৩৯}

অনেকের মতে এই পর্বে বাদল সরকার মূলত একজন নাটককার, থিয়েটারকর্মী হয়ে উঠতে তিনি তখনও পারেননি। এটা ঠিক যে প্রসেনিয়াম পর্বের প্রথমার্ধে বাদল সরকার বাঙলার থিয়েটার প্রেমীর সামনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্মের দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারেননি। অথচ সমকালের বহু নাট্যগোষ্ঠী প্রসেনিয়াম মঞ্চ থিয়েটারের প্রকৃতি নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। বহুরূপী, এল টি জি, নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ এবং আরো অনেক নাট্যদল গুণমানের দিক থেকে তখন অনেক এগিয়ে। তবে সেসময় বাদল সরকার একটার পর একটা নাটক লিখে বাংলাসহ ভারতীয় নাট্যজগতে নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের সুখ্যাতি সর্বজন বিদিত। এই নাটকের জন্য ১৯৬৮ সালে ভারত সরকারের সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কার পান বাদল সরকার। আমাদের মনে হয় এই সব কারণেই বাদল সরকারের থিয়েটার জীবনের এই পর্বের আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে তাঁকে নাটককার হিসেবেই দেখতেই বেশি স্বচ্ছন্দবোধ

করেন। প্রতিভা অগ্রবাল লিখেছেন,

“লোকেরা বলেন, যাদের মধ্যে আমরাও সামিল, বাদলবাবু যাই বলুন না কেন,
নাটককার হিসাবে উনি মূলত প্রসেনিয়াম মঞ্চের নাটককার।”^{৪০}

অর্থাৎ তিনি বাদল সরকারকে যখন একজন নাটককার হিসেবে বিচার করছেন তখন তিনি তাঁর এই প্রসেনিয়াম পর্বকেই বেছে নিয়েছেন।

বিশাখা রায়, যিনি বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের অন্যতম সহযোদ্ধা, তিনি তো বাদল সরকারের এই পর্বের থিয়েটার চর্চাকে গুরুত্ব দিতেই চান না। তাঁর বক্তব্য—

“... ভোমা জাতীয় নাট্যসৃষ্টির পর্ব পর্যন্ত থিয়েটারকর্মী হিসাবে ওঁর কর্মধারা
খুবই সীমিত ছিল। দীর্ঘ থিয়েটার জীবনে নাটক করাটা প্রধানত ব্যক্তিগত শখ
হিসাবেই দেখা হয়েছে।”^{৪১}

কিন্তু এই ধরনের মূল্যায়নের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ সহমত হতে পারছি না। মাইথন থেকে চক্র পর্যন্ত বাদল সরকারের থিয়েটার চর্চা শৌখিনতার স্তরে থাকলেও শতাব্দী গঠনের পর থেকেই বাদল সরকার আর কেবল নাটককার নন। বস্তুত এই পর্ব থেকেই বাংলা থিয়েটারের জগতে একজন নিয়মিত অভিনেতা, নাট্যপরিচালক এবং নির্দেশক হিসেবে বাদল সরকার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রচলিত মঞ্চব্যবস্থা মধ্যেই বাদল সরকার বেশকিছু ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব নাট্যভাবনার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রথমেই যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে তা হল এই পর্বে লিখিত তাঁর নাটকগুলির নাট্যআঙ্গিকের অভিনবত্ব। বাদল সরকার প্রথাগত নাটকের অঙ্ক, দৃশ্য বিভাজন বিষয়টি নিলেও পাঁচ অঙ্কের ধারণা থেকে সরে এসে তিনি তাঁর নাটকগুলি কখনো দুই অঙ্কে, কখনো তিন অঙ্কে আবার কখনো কোনো অঙ্ক, দৃশ্য বিভাজন না রেখে নাটক তৈরি করে নিয়েছেন। ‘সলিউশন এক্স’ একাঙ্কটি তিনি ভেঙেছিলেন চারটি দৃশ্য। ‘শনিবার’ নাটকে কোন অঙ্ক, দৃশ্য, বিভাজন নেই, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ তিনটি অঙ্কে বিন্যস্ত। ‘সারারাত্তির’ নাটকের তিনটি দৃশ্য, ‘বল্লভপুরের রূপকথা’র মোট দৃশ্যের সংখ্যা চার। বেশ কিছু নাটকে তিনি ‘যবনিকা’ দিয়ে নাটক শেষ করার প্রথাগত নাট্যরীতিটি ব্যবহার করেছেন। এটা অনেকটা নাটক শেষে দর্শকের সঙ্গে একটু ভাবের আদান-প্রদান করে নেওয়া। যেমন— ‘বড়ো পিসীমা’ নাটক। নাটকটি শেষ হচ্ছে যবনিকা দিয়ে—

“‘যবনিকা’:

(যবনিকা পড়িবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিতাই বাহির হইয়া নমস্কার করিল)

নিতাই : ভীমাপুকুর ম্যানশন্স নাট্যসংঘের উদ্যোগে অভিনীত ‘কালবৈশাখী’ এইখানেই শেষ হোলো। যাবার আগে আপনাদের কাছে দু’একটি কথা নিবেদন করতে চাই। আমাদের এই প্রথম প্রচেষ্টা। যা কিছু ভুল ভ্রুটি হয়েছে আপনারা নিজগুণে মার্জনা করবেন। আপনারা হয় তো জানেন— একটা নাটক পরিকল্পনা থেকে মঞ্চ পর্যন্ত টেনে আনতে কত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। ... আপনারা সকলে আমাদের যে সাহায্য করেছেন— চাঁদা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, শেষ পর্যন্ত বসে থেকে, এবং— ইয়ে, হাততালি দিয়ে, তার জন্য আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(নিতাইয়ের কথা শেষ হইতে পর্দা সরিল। দেখা গেল মঞ্চের অর্ধচন্দ্রের আকারে দাঁড়াইয়া আছে যথাক্রমে স্মারক, ধ্রুবশ, রাজীব, খোকা-খুকুকে লইয়া বৌদি, অনু, পিসীমা ... ইহাদের সমবেত অভিবাদনের পর বারান্দার দরজা দিয়া অনাথ ও জগৎ শব্দকে টানিয়া সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, এবং অভিবাদন করিয়া জগৎ গেল স্মারকের পাশে, অনাথ অনন্তর পাশে। ইতিমধ্যে নিতাই পিছনে বৌদিদের পাশে গিয়ে দাঁড়াইয়াছে। শব্দ পিছন দিকে পলায়নের চেষ্টা করিবামাত্র নিতাই তাহাকে ধরিয়া নিজের ও অনুর মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিল। অতঃপর সমবেত অভিবাদন ও যবনিকা।)”^{৪২}

অর্থাৎ এখানে ‘যবনিকা’টি নাট্যাংশের সঙ্গেই অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।

লক্ষণীয় বিষয় এই পর্বে বাদল সরকার বাইরের দিক থেকে প্রথাগত নাট্য আঙ্গিক থেকে তিনি খুব একটা সরে আসেননি। প্রথাগত আঙ্গিককে তিনি ভাঙছেন নাটকের ভেতর থেকেই। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’— নাটকে যেমন প্রায় দর্শকাসন থেকেই যেন নাট্যচরিত্রদের ডেকে নিচ্ছেন মঞ্চ।

“লেখক।। কী লিখবো? কাকে নিয়ে লিখবো? ...

মানসী।। (দর্শকদের দেখিয়ে) এই এতো লোক আছে— এদের একজনকেও চেনো না? একজনেরও কথাও জানো না?

....

লেখক।। অনেক চেষ্টা করেছি।

[কাগজের কুচিগুলি ছুঁড়ে ফেলে লেখক ফিরে গেলো টেবিলে। মানসী অলক্ষণ

দাঁড়িয়ে চলে গেলো। হঠাৎ লেখক ফিরে দাঁড়ালো। এগিয়ে এলো সামনের দিকে।
প্রেক্ষাগৃহে ঠিক তখনই দেরি করে আসা চারজন দর্শক আসন খুঁজছে। লেখক
তাদের উদ্দেশ্য করে হাঁক ছাড়লো।]

শুনুন! এই যে শুনছেন?

[দর্শকরা শুনলেও তাদের উদ্দেশ্যে হাঁক ধারণা করতে পারেনি প্রথমে]

শুনছেন— ও মশাই?”^{৪৩}

অবশ্য এই ধরনের নাট্যকৌশলের ব্যবহার একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। তাঁর কারণ এই ধরনের
নাট্যকৌশল আর কোন নাট্যে, অন্তত এই পর্বে তিনি ব্যবহার করেননি।

বাদল সরকারের প্রসেনিয়ম থিয়েটার পর্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো আলো
ব্যবহারে তাঁর অপূর্ব মূল্যায়ন। মঞ্চে আলো-অন্ধকারের পরিবর্তনকে নাট্যচরিত্রের আত্ম-উন্মোচনের
(চরিত্রের রূপান্তর) কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতেন। ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকে শরদিন্দু ও বাসন্তী
থেকে বিজয়, কণা, সীতানাথে রূপান্তরিত করার জন্য মঞ্চে সুকৌশলে আলো-অন্ধকারের ব্যবহার
করেছেন। কীভাবে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, টেক্সট থেকে তার একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে
পারি—

“শরদিন্দু ॥ ... এই বাসন্তী?

[বাসন্তীর সাড়া পাওয়া গেল না।]

শুনছো? বাসন্তী!

[তবু সাড়া নাই। শরদিন্দু ধীরে ধীরে ফিরে এলো টেবিলে। চিন্তিত। একটা বই
তুললো। নামিয়ে রাখলো। একবার পায়চারি করলো। তারপর হঠাৎ বসে লিখতে
শুরু করলো। আলো কমে এলো ক্রমে। অন্ধকারের আড়ালে শরদিন্দু মঞ্চ ছেড়ে
গেলো। শূন্য মঞ্চ আলোকিত হলো আবার। কড়া নাড়ার শব্দ। কণা রান্নাঘর
থেকে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে দরজা খুলে দিলো। বিজয়ের প্রবেশ।]”^{৪৪}

আবার ‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকে যেমন মঞ্চকে স্পষ্টত দুটি অংশে ভাগছেন নাট্যকার— ঘর
আর ঘরের বাইরে। আলো জ্বালিয়ে আর নিভিয়ে দুটো অংশকে নিয়ে এগোচ্ছে নাটক। নাটকের
শুরুতে দেখা যায় ঘরের বাইরের অংশের পেছন দিকটা অন্ধকার। ঘরের ভেতরে তাস খেলছে
সাতু, কার্তিক, শশী আর হিমাদ্রি। বাইরে চিতায় পুড়ছে মেয়েটি। চারজনের সংলাপে এগোতে
থাকে—

“শশী ॥ মেয়েটা কে, কী বৃত্তান্ত-সেসব খবরও রাখেন না বোধ হয়?

সাতু ॥ ওই মেয়ে মানে? ওই মেয়ে কী?

[হঠাৎ অন্ধকার চিরে খিল খিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা। ঘরের বাইরের অন্ধকার অংশটা জ্বলে উঠলো। খোলা চুল, কোমরে আঁচল জড়ানো। মেয়েটা হেসেই চলেছে। ঘরের আলোটা নিভে গিয়ে তিনজনকে ছায়ামূর্তি করে রেখেছে। তাদের দেহ স্থির, তারা হাসি শোনে নি কেউ।]

মেয়েটা ॥ (হাসতে হাসতে) আমি কী! আমি কে! কী বৃত্তান্ত! তোমরা জানো

না? তোমরা জানো না কেউ? আমি কী? আমি কে? কী বৃত্তান্ত?

[আলো কমে অন্ধকার হয়ে গেলো আবার। মেয়েটার চেহারা, মেয়েটার হাসি মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে। ঘরে আবার আলো। কথাবার্তায় কোনো বিরতিই যেন পড়েনি।]”^{৪৫}

এখানেই বাদল সরকারের নাট্যায়নের অভিনবত্ব। প্রচলিত প্রসেনিয়াম থিয়েটার মঞ্চকে এভাবেই তিনি ব্যবহার করেছেন।

একই চরিত্রের বারবার অন্য চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া এই পর্বের নাট্যআঙ্গিকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের মাসিমা আর ইন্দ্রজিতের মা কিংবা ‘মানসী’-র একাধিক ভূমিকায় রূপান্তর। ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকে শরদিন্দুর সীতানাথে, বাসন্তীর কণা-র ভূমিকায় রূপান্তর। আবার ‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকের ‘মেয়েটা’ অনায়াসে ‘মালতী’, ‘মিলি’ কিংবা ‘লছমি’ হয়ে যায়—

ক) “শশী ॥ (ঘুরে দাঁড়িয়ে) মালতী!

[মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে মালতী হয়ে উঠে দাঁড়ালো। শশী এগিয়ে এলো

তার দিকে।]

মালতী!”^{৪৬}

খ) “হিমাদ্রি ॥ (যন্ত্রণায়) মিলি!

.....

[মেয়েটা মিলি হয়ে এগিয়ে এলো]”^{৪৭}

গ) “সাতু ॥ লছমি।

[মেয়েটা লছমি হয়ে দাঁড়ালো। সাতু ঘুরে এগিয়ে এলো তার

কাছে।]”^{৪৮}

চরিত্রের এই রূপান্তর কীভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হবে সে সম্পর্কে বাদল সরকারের একটা

নির্দিষ্ট অভিমত ছিল। শম্ভু মিত্র ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকের প্রযোজনায় শরদিন্দু, সীতানাথ, বাসন্তী, কণার চরিত্রের রূপান্তর দু’জন অভিনেতাকে দিয়েই করিয়েছেন। শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছিল নাটকের বয়ান অনুযায়ী এটাই একমাত্র পদ্ধতি। কিন্তু বাদল সরকার একই চরিত্র দিয়ে এইভাবে অভিনয় করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণটা বাদল সরকার নিজেই জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত তিনি ‘বাকি ইতিহাস নাটকের’ উল্লেখ করে বলেছেন—

“... আমি ওই একই অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে সীতানাথ-কণা, আর শরদিন্দু-বাসন্তী করার পক্ষপাতী নই, ...। ওটা যদি করা হয়, তাহলে থার্ড অ্যাক্ট-এ নতুন একজন অভিনেতাকে সীতানাথ সাজিয়ে আনতে হয়। যেটা ইমিডিয়েটলি থিয়েট্রিকালি দর্শকদের ইমপ্রেশন দেবে যে এইটেই তাহলে রিয়াল কারণ। তা তো নয়, আসলে তো শরদিন্দু, তার চিন্তাটাই রিয়াল কারণ। ... কাজেই এক অভিনেতা অভিনেত্রী দিয়ে করানোটা আমি কোনো মতেই পছন্দ করি না।”^{৪৯}

বাদল সরকার এই পর্বে যেহেতু প্রসেনিয়াম থিয়েটারের কথা মাথায় রেখে নাটক লিখেছেন সেজন্য প্রসেনিয়াম থিয়েটারের দাবি মেনে নাটকের চরিত্রগুলো কীভাবে অভিনয় করবে, কীভাবে নড়াচড়া করবে, কোথায় বসবে, কোথায় দাঁড়াবে সবকিছু আগের থেকেই নির্দিষ্ট করে দিতেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন—

“স্বভাববাদী থিয়েটার ‘মুভমেন্টের’ দিক থেকে ভয়ানক সীমাবদ্ধ। কারণ আধুনিক সভ্যতায় দৈনন্দিন জীবনের ‘মুভমেন্ট’ ভীষণ সীমাবদ্ধ, সেটাকে নকল করাই হচ্ছে স্বভাববাদী থিয়েটার। ... স্বভাববাদী থিয়েটারে কয়েকটি মাত্র বিকল্প মুভমেন্ট-এর বাইরে যাওয়া যায় না।”^{৫০}

অভিনেতা-অভিনেত্রী এই সমস্ত মুভমেন্ট যাতে খুব সহজে রপ্ত করতে পারে, সেই জন্য বাদল সরকার এই পর্বে প্রোডাকশন নোটস-এর ব্যবহার করতেন। বাঁ দিকের পাতা সাদা রেখে তাতে ডাউনস্টেজ লেফট, আপস্টেজ রাইট, ইত্যাদি ছোট ছোট ডায়াগ্রাম তৈরি করে রাখতেন। এর পাশাপাশি সেটের জন্য নানা রকম মডেলও আগের থেকে তৈরি করে রাখতেন। অভিনেতাদের প্রোডাকশন নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে হত না। কারণ সবকিছুই পরিচালক বাদল সরকার ভেবে রাখতেন। তিনি এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,

“... সেই সময় অভিনেতার খুব খুশি ছিল কারণ সবই তো পরিচালক ভেবে রেখে দিয়েছে ওদের জন্য, ওদের চিন্তা করার কোনো দরকার নেই, প্রথমে

অবশ্য একটু অস্বস্তি হচ্ছে, বারবার রিহারসাল থামাচ্ছি, না, এদিকে আসতে হবে, তবু শেষ পর্যন্ত যেহেতু এটা পরিচালকেরই নাটক, সুতরাং সকলেই খুব খুশি, কারণ ওদের চিন্তা করতে হচ্ছে না।”^{৫১}

পরবর্তীকালে অবশ্য বাদল সরকার এই ভাবনা থেকে সরে আসেন। রিহারসালের আগে পরিকল্পনা করার এই রীতি থেকে তিনি পুরোপুরি সরে আসেন। তিনি জানাচ্ছেন,

“... আমাদের থিয়েটারে যখন বিষয়বস্তুটাই প্রাধান্য পেতে শুরু করল, তখন প্রত্যেক অভিনেতার ওই বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত একাত্মতা আবশ্যিক হয়ে উঠল। এখন কিন্তু নির্দেশকের হুকুম মেনে, পুতুল হয়ে, কাজ করা আর সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত: একবার এই প্রক্রিয়ায় এসে পৌঁছোলে নির্দেশকের তো মহা সুবিধে। সব চিন্তা তাকে আর করতে হচ্ছে না। তাছাড়া একজনের চিন্তার সঙ্গে আর পাঁচজনের চিন্তা যুক্ত হলে সেটা সমৃদ্ধ হবে।”^{৫২}

এভাবেই বাদল সরকারের নাট্যনির্মাণ প্রক্রিয়া ক্রমশ একটা পরিণতির দিকে এগিয়েছে।

বলাবাহুল্য বাদল সরকারের এই প্রসেনিয়াম থিয়েটার পর্বের জার্নিটা খুব একটা সুখের ছিল না। আর পাঁচটা থিয়েটার দলের মতোই শতাব্দীকে প্রতি মুহূর্তে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছিল। থিয়েটার হল ভাড়া করা, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট সেট ও জিনিসপত্র, পোশাক আলো-এই সব কিছুর খরচ বহন করে লড়াইয়ে টিকে থাকা শতাব্দীর মত একটি ছোট দলের পক্ষে একটা সময় প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু সেখান থেকে ধীরে ধীরে বাদল সরকার শতাব্দীকে সেসময়ের কলকাতার যেকোনো গ্রুপ থিয়েটারের সমতুল্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কেমন ছিল সেদিনের সেই জার্নি? এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার জানিয়েছেন,

“আমাদের থিয়েটারের দল শতাব্দী-র জন্ম থেকে মোট সাতটা পূর্ণাঙ্গ ও দুটো ছোট নাটকের কাজ করলাম। ক্রমাগত প্রযোজনার খরচ কমানো, নাটক তৈরিতে কঠোর পরিশ্রম, বন্ধুদের টিকিট কেনার জন্য ঝুলোঝুলি করা— এই সবই-যতক্ষণ না পর্যন্ত সফল হলাম অর্থাৎ আমাদের শহরের অভিনয়গুলো নিজের পায়ে দাঁড়াল। শেষ তিনটি প্রযোজনার ক্ষেত্রেই এমনটা হল— ‘সাগিনা মাহাতো’, ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ আর ‘আবু হোসেন’— বিশেষত সেটির ক্ষেত্রে। তখন আমরা আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল; এমনকি আমাদের মূলধন চার অঙ্কের দাগ ছাড়িয়ে গেল।”^{৫৩}

এই সময় প্রসেনিয়াম স্টেজে বাদল সরকার সফলভাবে একটার পর একটা প্রোডাকশন করে চলছেন।

নানা প্রান্ত থেকে ‘কল শো’— আমন্ত্রিত অভিনয়ের ডাকও পাচ্ছেন। আর ঠিক তখনই দ্বিতীয়বার শতাব্দী নাট্যদল পুরোপুরি ভেঙে দিয়ে প্রসেনিয়াম থিয়েটার ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন বাদল সরকার। নেমে এলেন দর্শকের সমতলে— অঙ্গনমঞ্চে। তিনি এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

“... আমরা যে-সময় প্রোসেনিয়াম ছেড়ে দিছি সে সময়টা কিন্তু *সাগিনা মাহাতো*, *বল্লভপুরের রূপকথা*, *আবু হোসেন*, বেশ রমরমায় চলছিল, প্রচুর কল ‘শো’ আসছিল, প্রযোজনাগুলি বেশ ভালো চলছিল। সেই সময়টাতেই আমরা অঙ্গনমঞ্চে নেমে আসি।”^{৫৪}

মোটামুটি ১৯৭০ থেকে ১৯৭১-এই সময় পর্বের মধ্যে বাদল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু মৌলিক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এই সময় থেকে প্রসেনিয়াম থিয়েটার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন বাদল সরকারের মনে দানা বাধে। হঠাৎ একদিন ঠিক করলেন যে নাটকগুলো তিনি প্রসেনিয়ামের বাধা মঞ্চে করছেন সেগুলি অন্যভাবে করা যায় কিনা। এই ভাবনা থেকেই এ.বি.টি.এ-এর হলঘর ভাড়া নিয়ে সেটিকেই অঙ্গন মঞ্চ বানিয়ে ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১ অভিনয় করলেন ‘সাগিনা মাহাতো’। কেমন ছিল সেই মঞ্চ পরিকল্পনা? নাট্যঅভিনেতা, শতাব্দী-র পুরনো নাট্যকর্মী পঙ্কজ মুন্সী স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন—

“... ‘সাগিনা মাহাতো’-র জন্য বাদলদা আসগুনলোকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দর্শকদের বসার জায়গা করে দিলেন এবং বেশ কিছু অংশ বার করলেন অভিনয় করার জন্য। আর মঞ্চটাকে অফিস এবং পার্টি অফিস হিসেবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করলেন। ফলে গোটা হলটা হয়ে উঠল কখনো কারখানার কক্ষ, কখনো ভাটিখানা, কখনো প্রকাশ্য মাঠ, কখনো বা সাগিনার ঘর। দর্শকের দৃষ্টি যখন যে অংশে অভিনয় হয়েছে সেইদিকে। শিল্পীরা বিভিন্ন দিক থেকে দর্শকদের মাঝখান দিয়েই যাতায়াত করছে। নাটক চলতে লাগল। হঠাৎ যে কোনো কারণেই হোক, আলো নিভে গেল। এদিকে নাটক তখন জমে উঠেছে। হঠাৎ দেখলাম, যাদের পকেটে দেশলাই ছিল ‘ফস’ করে তা জ্বলে উঠল। আমরাও অভিনয় চালিয়ে গেলাম। সামান্য সময় পরে আলো এসে গেল। সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম প্রসেনিয়ামে এই ঘটনা ঘটলে হয়তো বা সাময়িক নাটক বন্ধ রাখতে হত। শো-এর পরে একজন দর্শকও আলো নিভে যাওয়ার কথা বলেননি ... এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি আমাদের ভিন্নধারার থিয়েটারের দিকে ভাবনাচিন্তা করানোর চেষ্টা করেছিলেন।”^{৫৫}

এই নতুন ফর্মে নাটক করার পর বাদল সরকার তখন ঠিক করলেন এই ধরনের মঞ্চেই এবার থেকে নাটক করবেন। কিন্তু ‘সাগিনা মাহাতো’র সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রসেনিয়াম মঞ্চের সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে অঙ্গনমঞ্চে নেমে এসেছেন এমনটা নয়। প্রথমদিকে বাদল সরকার ভেবেছিলেন প্রসেনিয়ামও কাজ করবেন এবং সাথে সাথে অঙ্গনমঞ্চেও করবেন। দেখা যায় ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১ অঙ্গনমঞ্চে ‘সাগিনা মাহাতো’ করার পরও তিনি প্রসেনিয়াম মঞ্চেও নাটক করেছেন। এইসময় ‘সাগিনা মাহাতো’, ‘বল্লভপুরের রূপকথা’, ‘আবু হোসেন’ ঘুরেফিরে অঙ্গন মঞ্চ-প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনয় করেছেন। ১৯৭২-র শেষের দিকেও এই দুই ধরনের মঞ্চে তাঁর নাট্যচর্চা চালিয়ে গেছেন। ৩০ শে অক্টোবর ১৯৭২ ইফলে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটক প্রসেনিয়াম মঞ্চ অভিনীত হয়। আসলে সেই সময় শতাব্দীর বেশিরভাগ অভিনেতাই প্রসেনিয়াম ছাড়তে চাননি। শতাব্দী-র সদস্যদের কথা ভেবেই বাদল সরকারকে দুই ধরনের মঞ্চেই অভিনয় চালিয়ে যেতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন,

“কিছুদিন ওইভাবে অঙ্গনমঞ্চ আর প্রোসেনিয়াম, দুটো একসঙ্গে চলার পরে আমি বুঝতে পারি যে, এতে চলবে না। একটা প্রচণ্ড টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে— একদিকে প্রোসেনিয়ামে নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে, আর আমার দিক থেকে অঙ্গনমঞ্চের টান।”^{৫৬}

এইভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত বাদল সরকার একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান। শতাব্দী-কে ভেঙে দিয়ে আবার নতুনভাবে শতাব্দী গড়ে তুললেন। সেই মতো শতাব্দী-র পুরোনো সহকর্মী আর কিছু নতুন সদস্য নিয়ে তৈরি হলো নতুন তথা তৃতীয় পর্বের শতাব্দী। ১২ নভেম্বর, ১৯৭২ ‘স্পার্টাকুস’ নাট্য প্রযোজনা থেকে বাদল সরকার পাকাপাকি চলে আসেন অঙ্গনমঞ্চে। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে সংযোজিত হলো একটি নতুন নাট্যধারা, যার পোশাকি নাম থার্ড থিয়েটার। প্রশ্ন হল প্রসেনিয়াম থিয়েটারের একজন সফল নাট্যকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েও কেন তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্ন পথ বেছে নিলেন? তাঁর প্রবর্তিত থার্ড থিয়েটার স্বরূপ কী, সেই সংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে।

তথ্যসূত্র:

১. চৌধুরী, দর্শন : বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৫, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৭, কল-৭৩, পৃ. ৪১-৪২

২. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ‘থিয়েটারি গল্প: আদিপর্ব’ ঋতদীপ ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিত্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডিডি ১৮/১১ সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ১২
৩. তদেব : পৃ. ১২
৪. সরকার, বাদল : পুরনো কাসুন্দি ১ম পর্যায়, লেখনী, প্রথম প্রকাশ মে, ২০০৬, পৃ. ১৬১
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ৩৪
৬. তদেব : পৃ. ৩৬
৭. তদেব : পৃ. ৩৫
৮. তদেব : পৃ. ৩৭
৯. তদেব : পৃ. ৩৭
১০. তদেব : পৃ. ৩৭
১১. তদেব : পৃ. ৩৮
১২. সরকার, বাদল : পুরনো কাসুন্দি ২য় খণ্ড, লেখনী, প্রথম প্রকাশ মে, ২০০৭, পৃ. ৫৩
১৩. বাদল সরকারের সঙ্গে দেবাশি মজুমদারের সাক্ষাৎকার : বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, ৬ বর্ষ ২ সংখ্যা, পৃ. ১০৮
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র সংকলন, বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ১০ (১৮), ২০১১, প্রকাশ সায়ক, পৃ. ১৩৬-৩৭
১৫. সরকার, বাদল : পুরনো কাসুন্দি ২য় খণ্ড, লেখনী, প্রথম প্রকাশ মে, ২০০৭, পৃ. ৯৯-১০০
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ৫৮

১৭. রায়, কুমার (সম্পাদনা) : বহুরূপী বিশেষ সংখ্যা, বহুরূপী প্রযোজনা ২, সংখ্যা ৭০, ১০ অক্টোবর ১৯৮৮, উক্ত সংখ্যায় সংকলন ২০/প্রলাপ শিরোনামে' ৩ নভেম্বর ১৯৪০-র নাউ' পত্রিকার রিভিউ থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল, পৃ. ৬২
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র সংকলন, বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ১০ (১৮), ২০১১, প্রকাশ সায়ক, পৃ. ৫৯
১৯. তদেব : পৃ. ৬০
২০. সরকার, বাদল : পুরনো কাসুন্দি ২য় খণ্ড, লেখনী, প্রথম প্রকাশ মে, ২০০৭, পৃ. ৯৯
২১. বিভাস চক্রবর্তীকে দেওয়া বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন, ১৬ ১৯৯৯, ৬৮, ফিয়ার্স লেন, কল-৭৩, পৃ. ২৫৩
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র সংকলন, বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ১০ (১৮), ২০১১, প্রকাশ সায়ক, পৃ. ৬১
২৩. দে, সন্ধ্যা : অন্যধারার থিয়েটার : উৎস থেকে উজানে, মৌহরি, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪১৪, ৫১ সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুর, কল-৩২, 'কবিকাহিনী' নাটকের অভিনয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে সন্ধ্যা দে 'আনন্দবাজার পত্রিকায় রিভিউ ব্যবহার করেন। এখানে সেটিই অপরিবর্তিত রেখে তুলে দেওয়া হয়েছে। পৃ. ২০৮
২৪. তদেব : কালান্তর পত্রিকার রিভিউ ব্যবহার করেছেন, পৃ. ২০৮
২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ৬১
২৬. তদেব : পৃ. ৬১-৬২
২৭. তদেব : পৃ. ৬২
২৮. তদেব : পৃ. ১৪
২৯. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা-১৬, পঙ্কজ মুন্সীর লেখা, 'অনবগত বাদল সরকার' শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য ৫৬

- আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ
সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৯৫।
৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র সংকলন,
বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ১০ (১৮), ২০১১, প্রকাশ সায়ক,
পৃ. ৬৪
৩১. তদেব : পৃ. ৬৪
৩২. বিভাস চক্রবর্তীকে দেওয়া বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন, ১৬ ১৯৯৯,
৬৮, ফিয়ার্স লেন, কল-৭৩, পৃ. ২৫৪
৩৩. তদেব : পৃ. ২৫৪
৩৪. তদেব : পৃ. ২৫৪
৩৫. তদেব : পৃ. ২৫৪
৩৬. তদেব : কালান্তর পত্রিকার রিভিউ ব্যবহার করেছেন, পৃ. ৯৫
৩৭. সরকার, বাদল : নাটকসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘আবু হোসেন’-এর মুখবন্ধ, মিত্র
ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৯,
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৬২
৩৮. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঋতদীপ
ঘোষ, নাট্যচিন্তা, প্রথমপ্রকাশ, বইমেলা ৩১ জানুয়ারি
২০১২, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৩৬
৩৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র সংকলন,
বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ১০ (১৮), ২০১১, প্রকাশ সায়ক,
পৃ. ৬৬
৪০. প্রতিভা অগ্রবালের লেখা : ‘প্রসেনিয়ম থিয়েটারের নাট্যকার বাদল সরকার’ শীর্ষক
প্রবন্ধ, পৃ. ৬৭
৪১. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার: অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ২০১৭, কল-২৬, পৃ. ৬১
৪২. সরকার, বাদল : নাটকসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘বড়ো পিসীমা’, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, ১০
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১০৯-১১০।
৪৩. সরকার, বাদল : এবং ইন্ডিজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি

- বসু, পৃ. ২
৪৪. সরকার, বাদল : নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ‘বাকি ইতিহাস’, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, ১০
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৬৪-৬৫
৪৫. তদেব : ‘পাগলা ঘোড়া’ নাটক, পৃ. ৩৮২
৪৬. তদেব : পৃ. ৩৯৩
৪৭. তদেব : পৃ. ৪০১
৪৮. তদেব : পৃ. ৪২৫
৪৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা
২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬,
পৃ. ৫৯-৬০
৫০. তদেব : পৃ. ১২৭
৫১. তদেব : পৃ. ১২৯
৫২. তদেব : পৃ. ১২৯
৫৩. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা স্বাতীদীপ
ঘোষ, নাট্যচিন্তা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ৩১ জানুয়ারি
২০১২, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৩৭
৫৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা
২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬,
পৃ. ১২৪-১২৫
৫৫. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা-১৬, পঙ্কজ মুন্সীর লেখা,
‘অনবগত বাদল সরকার’ শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য
আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ
সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৯৭
৫৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা
২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬,
পৃ. ৬৮

তৃতীয় অধ্যায়

বাদল সরকারের নাট্যভাবনা : তৃতীয় ধারার থিয়েটার

বাদল সরকার তাঁর নাট্য জীবনের প্রথম দিকে প্রসেনিয়াম থিয়েটারকেই মেনে নিয়েছিলেন। শহরের লোক বলে সে সময় প্রসেনিয়াম ছাড়া বাদল সরকারের সামনে অন্যকোন পথ ছিল না। ১৯৬৭ সালে যখন বাদল সরকার ‘শতাব্দী’ নাট্যগোষ্ঠী পত্তন করেন তখন নিজের মতো করে নিজের নাটকগুলি প্রযোজনা করার তাগিদই তাঁর মুখ্য দায় ছিল। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার জানিয়েছেন—

“থিয়েটার সম্পর্কে আমার ধারণায় আমি কোনো ভাবেই ভিন্নধর্মী ছিলাম না, থিয়েটারে সেট ও আলোকসম্পাতসহ প্রোসেনিয়াম মঞ্চ তখন আমি অনিবার্য বলেই মেনে নিয়েছি। শতাব্দী তখন কোনোভাবেই কলকাতার অন্য যেকোনো ‘গ্রুপ থিয়েটার’ নাট্যগোষ্ঠী থেকে পৃথক ছিল না।”

প্রথম দিকে প্রসেনিয়ামে সেই অর্থে সাফল্যের মুখ না দেখতে পেলেও একটা সময় তাঁর নাট্যদল ‘শতাব্দী’ গ্রুপ থিয়েটার হিসাবে সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যায়। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে তাঁর নিজস্ব স্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হন। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে তিনি যখন সাফল্যের শিখরে ঠিক তখনই প্রসেনিয়াম থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে আসার চিন্তাভাবনা শুরু করেন। প্রথমে অঙ্গনমঞ্চ ও পরে মুক্তমঞ্চ নেমে এলেন যার পোশাকি নাম থার্ড থিয়েটার। এইখানেই প্রশ্ন উঠে ঠিক কী কী কারণে, বা কী পরিবেশে বা পরিস্থিতিতে বাদল সরকার এতদিনের প্রচলিত মঞ্চ থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলেন, এর মূলে কোন্ কোন্ ঘটনা বা অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল ছিল? থার্ড থিয়েটার বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন? কীভাবে থার্ড থিয়েটারকে একটি নাট্যআন্দোলনে পরিণত করেছেন?

১

বাদল সরকার খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন— “অঙ্গনমঞ্চ বিশ্বাস আমার রাতারাতি আসেনি। ১৯৫৮ সালে যখন প্রথম Theatre in the round- দেখি বিদেশে তখন থেকেই চিন্তার সূত্রপাত।”^১ ১৯৫৭-৫৯ সাল, এই দু’বছর বাদল সরকার কর্মসূত্রে লগুনে কাটিয়েছেন। সেই সময় তিনি এরিনা মঞ্চে Theatre in the round -দেখেন। এর কয়েক বছর পর প্যারিসে থাকার সময়ও তাঁর theatre in the round-এ থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা হয়। এই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে ১৬.১২.১৯৬৪-তে মনু-কে লেখা একটি চিঠিতে বাদল লিখেছেন:

“...গত রবিবার থিয়েটারে গেলাম। Theatre in the round-এ প্যারিসে একটা এরকম থিয়েটার নিয়মিত চলে। ... লগুনে একটা দেখেছি, আর বইয়ে পড়ছি। মাঝখানে গোল জায়গায় অভিনয় হয়, চারিদিক ঘিরে সার্কাসের মতো দর্শকদের আসন...”^৩

লগুনে একবার দেখে এবং Theatre in the round সম্পর্কে পড়ে থিয়োরিটিক্যালি যে-কটা পয়েন্ট বুঝেছিলেন, প্যারিসে দেখে তা অনেক বেশি স্পষ্ট হয় তাঁর। থিয়েটার যে ঠিক প্রসেনিয়াম মঞ্চে সীমাবদ্ধ নয়, এটা তিনি এই প্রথম বুঝতে পারেন। তিনি অনুভব করলেন প্রচলিত স্টেজের থেকে এই মাধ্যমে দর্শককে অনেক বেশি নাড়া দেওয়া সম্ভব। সেট, সাজসজ্জাহীন অনাড়ম্বরভাবে এমন জীবন্ত নাটক দেখার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে তাঁর থিয়েটার ভাবনাকে পুষ্ট করেছিল। তবে তখনও তিনি প্রসেনিয়াম মঞ্চেই নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে গেছেন। অর্থাৎ তখনও তিনি প্রসেনিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তাভাবনা করেননি। প্রসেনিয়ামে থাকাকালীন এই থিয়েটারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তাঁর মনে উদ্ভূত হয়। প্রসেনিয়াম থিয়েটার সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন উঠলেও এর থেকে বেরিয়ে এসে বিকল্প কিছু করার চিন্তাভাবনা তখনও তাঁর মনে দানা বাঁধেনি। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালে দু’মাসের জন্য বাদল সরকার ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের অঙ্গরূপে পূর্ব ইউরোপের তিনটি দেশ রাশিয়া, পোলাণ্ডা আর চেকোস্লোভাকিয়া ভ্রমণ করে আসেন।

১৯৬৯ সালে পোলাণ্ডা গিয়ে বাদল সরকার জর্জ থোটোস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর নাটক ‘Apocalypsis cum Figuris’-এর অভিনয় দেখেন। থোটোস্কি দেখিয়েছেন, মানুষ তার শরীর দিয়ে কী করতে পারে তার সর্বোচ্চ নিদর্শন। এতোদিন ধরে নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে যেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, সেই মঞ্চসজ্জা, আলো, রূপসজ্জা, দৃশ্য বিন্যাস-এগুলির চাইতে তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীর এবং তাদের শরীরী ভাষার মাধ্যমেই তিনি তাঁর নাট্যবস্তুকে দর্শকের কাছে হাজির করতে চেয়েছেন। থোটোস্কি মনে করতেন, সাজসজ্জা, রূপসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, এমন কী একটি মঞ্চ ছাড়াই থিয়েটার করা যেতে পারে। তাঁর থিয়েটার কর্ম দেখে, তাঁর ‘টুওয়ার্ডস-এ পুওর থিয়েটার’-পড়ে এবং থোটোস্কির সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তায় বাদল খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। থোটোস্কির সঙ্গে কথা বলে তিনি যে উপকৃত হন সেকথা বলতে গিয়ে বাদল সরকার লিখেছেন—

“There are certain things he had said which I liked very much and I think I can understand it and some ways have used them.”^৪

প্রায় একই রকমভাবে সেই ভালো লাগার কথা বলেছেন তাঁর লেখা ‘The third Theatre’ গ্রন্থে।

তিনি বলেছেন—

“... Grotowski’s work and his comments on theatre were fresh in my mind.”^৫

প্রসেনিয়াম থিয়েটার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন মনে তৈরি হলেও এতদিন সেখান থেকে বের হওয়ার পথ তাঁর জানা ছিল না। এবার সেই পথ যেন খুঁজে পেলেন। প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে যেমন একমাত্র পথ বলে মেনে নিয়েছিলেন, তেমনি সেই সঙ্গে এটাও মেনে নিয়েছিলেন এই থিয়েটার করার জন্য পয়সা কড়ির দরকার হয়। থিয়েটার হল ভাড়া থেকে শুরু করে সেট, লাইট-সব কিছুর জন্য প্রচুর খরচ। একটা সময় শতাব্দী প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। থ্রোটোস্কির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার এবং তাঁর থিয়েটার কর্ম দ্বারা বাদল নতুনভাবে উজ্জীবিত হন। ১৯৬৯ সালে ক্যালচারাল এক্সসেশন প্রোগ্রাম থেকে ফিরে এসে বাদল সরকার থ্রোটোস্কির পুওর থিয়েটারের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি প্রথমে জোর দিলেন খরচ কমানোর দিকে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

“আমরা ক্রমেই মঞ্চসজ্জা, আলো, সাজপোশাক ও আবহ সংগীত কমাতে লাগলাম। আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, আমরা টেপ রেকর্ডার বা প্রোজেক্টর-এর মতো কোনো যান্ত্রিক উপকরণ ব্যবহার করব না। সঙ্গে সঙ্গেই আক্ষরিক অর্থে আমরা পুওর থিয়েটার তথা গরিব নাট্যের ধারণাটা গ্রহণ করলাম। আমাদের নাট্যগোষ্ঠী গরিব, আমাদের দেশবাসী গরিব, আমরা চাইছিলাম আমাদের সেই দারিদ্র্যকেই আমরা এমনভাবে কাজে লাগাব যাতে প্রতিবন্ধ না হয়ে সেই দারিদ্র্যই আমাদের সম্পদ হয়ে ওঠে।”^৬

১৯৬৯ সালের প্রথম প্রযোজনা ‘প্রলাপ’ তারপর ‘সারারাত্তির’, ‘শেষ নেই’, ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ সবই পুওর থিয়েটারের ধারণা নিয়ে তৈরি। বাদল সরকার সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

“বল্লভপুরের রূপকথা’র টোটাল সেট খরচ পড়েছিল ৬৫ টাকা। বলতে পারেন পুওর থিয়েটারের দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা তখনই দেখা দেয়।”^৭

এই যে থিয়েটারের খরচ কমানোর ভাবনা এটাই প্রসেনিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার একটা প্রথম পদক্ষেপ। থিয়েটার যে সাজসজ্জা, রূপসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা ছাড়াও সম্ভব এটা এবার বাদল সরকার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারলেন। এইভাবে বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিপুল খরচের হাত থেকে রক্ষা করে শতাব্দীকে গ্রুপ থিয়েটার হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেন। কিন্তু পাশাপাশি বাদল সরকার উপলব্ধি করলেন এভাবে কতদিন? থিয়েটারকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়? তিনি

দেখলেন যে থিয়েটারের দর্শক কমছে। কলকাতার অন্যান্য গ্রুপ থিয়েটারের মতো শতাব্দীরও একই অবস্থা। দর্শকের অভাবে অনেক সময় হল ভাড়া পর্যন্ত পকেট থেকে বের করতে হয়। সকলেই সিনেমায় যাচ্ছে। তাহলে কি থিয়েটার খুব একটা দুর্বল মাধ্যম? এই প্রশ্ন বাদল সরকারকে আলোড়িত করেছে। তিনি ভাবতে লাগলেন খামতিটা কোথায়। সিনেমার প্রতি তুলনায় তিনি দেখলেন যে সিনেমার মতো সমস্ত কিছু যথাযথ বাস্তবিক দৃশ্য দেখানো থিয়েটারে সম্ভব নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

“থিয়েটার কী পারে? সিনেমায় অনেক কিছু দেখাতে পারে, সমুদ্রে বাড়, পাহাড়, অভিনেতার ক্লোজ-আপ...। আমাদের চিৎকার করতে হয় লাস্ট রো-কে শোনানোর জন্য, সামনের লোক বিরক্ত হয়। সিনেমায় মৃদুস্বরে কথা বললেও সকলে শুনতে পায়।”^৮

কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও তাঁকে আলোড়িত করেছিল কী জোর আছে থিয়েটারে যে, এত বছর পরেও তা টিকে আছে? তিনি উপলব্ধি করলেন থিয়েটার জীবন্ত, বাস্তব। অর্থাৎ থিয়েটার হচ্ছে এখন, এখানে; সিনেমা কিন্তু তা নয় সেখানেই থিয়েটারের আসল শক্তি। তিনি বলেছেন—

“সিনেমাতে একটা প্যাকিং বাক্স দেখিয়ে বলুন দেখি— এটা পুকুরঘাটের সিঁড়ি? পারবেন না। থিয়েটারে কোনও অসুবিধে নেই। একজন অভিনেতা ইচ্ছে করলেই অভিনীত চরিত্র থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকদের সরাসরি দুটো কথা বলে গেলেন, বলে আবার চরিত্রে ঢুকলেন—এ থিয়েটারেই গ্রহণযোগ্য, সিনেমা নয়।”^৯

তিনি উপলব্ধি করলেন থিয়েটার হল জীবন্ত কলা মাধ্যম বা লাইফ শো। যেখানে দর্শক এবং অভিনেতা একই দিনে একই সময়ে, একই স্থানে উপস্থিত হচ্ছেন এবং কিছুক্ষণ এক সঙ্গে থাকছেন। অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের এই যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এটা একমাত্র থিয়েটারেই সম্ভব সিনেমায় নয়। তিনি বলেছেন—

“থিয়েটার অন্যান্য জায়গায় হয়তো সিনেমার চেয়ে অনেক দুর্বল কিন্তু এখানে সে শক্তিশালী। মনে হয়েছে, এখানেই জোর দেওয়া উচিত।”^{১০}

বাদল সরকার অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে কমিউনিকেশন বা সংযোগের উপরেই এবার গুরুত্ব দিলেন। অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে সংযোগের উপর জোর দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন উভয়ের মাঝখানে বিস্তারিত ব্যবধান। সেক্ষেত্রে দু’দিকের ব্যবধান যতটা সম্ভব ঘোচানো উচিত। তখন তিনি প্রসেনিয়াম থিয়েটারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাতে বাধায় ভরা—

এক. স্তরের বাধা: অভিনেতা অভিনেত্রীরা থাকে উঁচুতে একটা স্তরে, দর্শকাসনে দর্শক থাকে নীচে, আবার ব্যালকনি থাকলে আরো এক স্তর তৈরি হয়।

দুই. দূরত্বের বাধা: সবাই একদিকে বসে বলে শেষ সারিটা অনেক পেছনে। যাদের বেশি দামের টিকিট তারা থাকে সামনে। দর্শকের সঙ্গে অভিনেতাদের এই কারণে একটা অসমদূরত্ব তৈরি হয়।

তিন. আলো আর অন্ধকারের বাধা: এটা সবচেয়ে বড় বাধা বলে বাদল সরকার মনে করেছেন। দর্শক নাটক দেখতে এসে তারা থাকে অন্ধকারে আর অভিনেতা থাকে আলোয়। সব কিছু করা হয় দর্শকদের জন্য, কিন্তু অভিনেতাদের ভান করতে হয় যেন তারা নেই। তাদের হাঁচি-কাশি বন্ধ, চুপ করে বসে একদিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

এই বাধাগুলো কীভাবে দূর করে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে ব্যবধান কমানো যায় সেই বিষয়টি বাদল সরকারকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। এতদিন এইসব প্রশ্ন মাথায় ঘুরলেও প্রসেনিয়ামেই নাটক করে গেছেন পুরো ছয়ের দশক। এবার যেন একটাপ পথ খুঁজে পেলেন। দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তিনি বহুদিন আগে দেখা সেই ‘থিয়েটার ইন্ দ্য রাউণ্ড’ পদ্ধতিকেই বেছে নিলেন। দর্শকের সমস্তরে নেমে এসে দর্শকের সঙ্গে অভিনয় ক্ষেত্রটা ভাগ করে নিলেন। এখানে প্রচলিত মঞ্চ আর থাকল না, মঞ্চ ব্যবস্থারও কোনো আয়োজন থাকল না। তাদেরই একটি অংশে মেঝের ফাঁকা জায়গাটাকেই মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হল। দর্শক ও অভিনেতা উভয়ই আলোতে একই ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে। একই সমতলে দাঁড়িয়ে বা বসে দর্শক অভিনয় দেখতে পারে। তৈরি হয়ে গেল অঙ্গনমঞ্চ। থিয়েটার ইন্ দ্য রাউণ্ডকেই এক-রকম ভাবে অঙ্গনমঞ্চ বলেন বাদল সরকার। প্রাথমিক ভাবে এরকম একটা চেষ্টা, তাঁর কথায় এক্সপেরিমেন্টাল শো করেন ১৯৭১ সালের ২৪ শে অক্টোবর কলকাতার অলবেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (এ.বি.টি.এ.)-এর হল ঘরে। প্রয়োজনা করলেন গৌরকিশোর ঘোষের গল্প অবলম্বনে লেখা নাটক ‘সাগিনা মাহাতো’। ‘সাগিনা মাহাতো’ করার পর বাদল সরকারের মনে হল— ‘এইটাই— করতে চাই।’^{১১} অনেকদিন থেকেই এই রকম একটা মঞ্চকে গ্রহণ করার ইচ্ছে জেগে উঠেছিল বাদল সরকারের মনে। কিন্তু তবুও তিনি প্রসেনিয়ামেই নাটক করে গেছেন পুরো ছয়ের দশক। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টা মাথায় ছিল, কিন্তু প্রয়োগের পথ পাচ্ছিলেন না। খরচ কমানোর প্রয়োজন এবং সংযোগ বাড়ানোর তাগিদ থেকেই তিনি প্রসেনিয়ামের চিরপ্রচলিত মঞ্চ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবলেন। সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার বলেন—

“১৯৭১ সালে যখন আমি ‘সাগিনা মাহাতো’ লিখলাম তখনই উপলব্ধি করলাম

আমার প্রসেনিয়াম থিয়েটার ছাড়ার সময় উপস্থিত। ২৪শে অক্টোবর— সাগিনা মাহাতো প্রথম মঞ্চের বাইরে অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন হলে দেখানো হল। নাটক চলাকালীন হঠাৎ আলো নিভে যায়। অন্ধকারের মধ্যেই চলল নাটক। পরে আলো ঠিক করা গেলেও— মঞ্চসজ্জায় লাইট ব্যবহার করা যায়নি। এই অবস্থায় অগণিত দর্শক উপভোগ করলেন নাটক। নবজাগরণের একটা ঢেউ উঠল, বুঝলাম মঞ্চসজ্জা ছাড়া নাটক চলতে পারে।”^{২২}

প্রসেনিয়াম থিয়েটার ছাড়ার সময় হয়েছে বললেও তখনও কিন্তু বাদল সরকার পুরোপুরি প্রসেনিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে আসেনি। প্রসেনিয়ামেও কাজ করছেন এবং সাথে সাথে অঙ্গন মঞ্চেও কাজ করছেন। প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা নাটকই সামান্য অদলবদল করে অঙ্গন মঞ্চে করেছেন। অর্থাৎ প্রথম প্রথম শতাব্দী একই সঙ্গে দু’ধরনের থিয়েটার দর্শনকে ব্যবহার করেছেন। ‘সাগিনা মাহাতো’, ‘বল্লভপুরের রূপকথা’, ‘আবু হোসেন’ যখন প্রসেনিয়াম মঞ্চে চলছিল কল-শোও আসছিল বিভিন্ন দিক থেকে তখন ‘সাগিনা মাহাতো’ নিয়ে আসেন অঙ্গন মঞ্চে। ‘সাগিনা মাহাতো’-কে নিয়ে দ্বিধা কাটিয়ে অঙ্গন মঞ্চের উপযোগী করে অভিনয় শুরুর পরেও, পরের বছরই ১৯৭২-এ শতাব্দী প্রসেনিয়ামে মঞ্চস্থ করলেন গিরিশচন্দ্রের ‘আবু হোসেন’। এমনকি ১৯৭২-এর ৩০ অক্টোবর ইন্ফলে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকটি প্রসেনিয়ামেই মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি লেখাও হয়েছিল সেইভাবে। অর্থাৎ অঙ্গন মঞ্চ তখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই ছিল।

অঙ্গনমঞ্চে এইসব পরীক্ষামূলক অভিনয়ের সময়ই ভারত সরকারের জওহরলাল নেহেরু ফেলোশিপ (জুন ১৯৭১-মে ১৯৭৩) পেলেন বাদল সরকার। ‘তখন মাথায় চিন্তাগুলো খুব ধোঁয়াটে। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের দোষ খুঁজে বার’^{২৩} করছেন। ‘গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগসূত্র রূপে সমন্বয়ের থিয়েটারের লক্ষ্যে কর্মপরীক্ষা তথা ওয়ার্কশপ’ নামে প্রস্তাবিত প্রকল্পের দায়িত্ব পেয়ে তখন তিনি নানাভাবে থিয়েটার সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা করছেন। থিয়েটার কর্মের সূত্রেই এই সময় আলাপ হয় আমেরিকার ‘Environmental Space theatre’ অন্যতম প্রবক্তা রিচার্ড শেখনারের সঙ্গে। ১৯৭১ সালে শেখনারের সঙ্গে বাদল সরকারের প্রথম আলাপ কলকাতায়। ঐ সময়ে শেখনার ও তাঁর স্ত্রী জোয়েন শেখনার ভারতে এসেছিলেন। কলকাতায় বাদল সরকারের পিয়ারি রোডের বাড়িতে বসে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ কথাবার্তা হয়। এমনকি ‘সাগিনা মাহাতো’ অঙ্গনমঞ্চে সফল অভিনয়ের পর মঞ্চে দেখা করতে আসেন রিচার্ড এবং তার স্ত্রী জোয়েন শেখনার। উভয়ের বন্ধুত্ব তৈরি হয়। কলকাতায় নানান আলোচনা সভায় এমনকি মাদ্রাজেও চলে গিয়েছিলেন বাদল সরকার শেখনার-এর সব আলোচনার মধ্যে থাকা এবং তাঁর নানান প্রশ্নের উত্তরের প্রত্যাশায়। শেখনার ছিলেন

প্রসেনিয়ামের ঘোর বিরোধী। যেহেতু বাদল সরকার প্রসেনিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে আসার কথা ভাবছেন পুরোপুরি সেই কারণে প্রসেনিয়ামের ঘোর বিরোধী শেখনারকে তাঁর ভালো লাগে।

“সালটা ১৯৭১। বাদল সরকারের অঙ্গনমঞ্চের পরীক্ষার সময়। বাদল সরকার নিজেই বলেছেন রিচার্ড শেখনারের ‘Environmental Space theatre’ তাকে মুগ্ধ করেছে। কারণ রিচার্ড শেখনার ‘Conventional proscenium stage’ ব্যবহার করেননি। আর ঐ সময় বাদল সরকারও ঐ জাতীয় কিছু করার পরিকল্পনা করেছেন।”^{১৪}

১৯৭২-এর জুলাই মাসে জওহরলাল নেহেরু ফেলোশিপ-এর দাক্ষিণ্যেই শেখনারের আমন্ত্রণে বাদল সরকার আমেরিকায় যান। সেখানে রিচার্ড শেখনার ও তাঁর পরিচালিত ‘দ্য পারফরম্যান্স গ্রুপ’-এর নাট্যকর্ম দেখেন। সেখানে তিনি দেখলেন স্টেজ ব্যবহার না করেও কীভাবে থিয়েটার করা সম্ভব। এটি আয়ত্ত করতে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Performance Group-এ যোগ দেন। ওয়ার্কশপ করেন, রিহার্সাল দেখেন। দেখে তিনি অভিভূত হন। কীভাবে স্পেসকে ব্যবহার করা হচ্ছে, দর্শকদের কীভাবে রাখা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে কীভাবে সংযোগ ঘটছে এ সমস্তই বাদল সরকারের দেখার বিষয় ছিল। কীভাবে দর্শক নাটকীয় আবহের অংশ হচ্ছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল বাদল সরকারের কাছে। সংযোগের এক নতুন ভাষা যেন তিনি খুঁজে পেলেন শেখনারের নাট্যকর্মে। যে মানুষ এক সময় মানুষে মানুষে ভালোবাসার বন্ধনেই বিশ্বাসী হয়ে রাজনীতির জগতে গিয়েছিলেন, যিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি দেখলেন কিছুটা হলেও শেখনারের দল তা করতে পারে। তিনি দেখলেন থিয়েটার ও মানুষের সংযুক্তির একটা প্ল্যাটফর্ম; বাদল সরকার এটাই চান।

এর পাশাপাশি আমেরিকার জুলিয়ান বেক ও জুডিথ ম্যালিনার ‘লিভিং থিয়েটার’ ও বাদল সরকারকে সমৃদ্ধ করেছে। আমেরিকাতে থাকাকালীন মূলত শেখনারের সূত্র ধরেই ‘লিভিং থিয়েটারের সঙ্গে বাদল সরকারের পরিচয়। তিনি এখানে দেখলেন রাজনৈতিক দর্শনকে কীভাবে থিয়েটার শিল্পের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যে কাজ রাজনীতির ক্ষেত্রে করা যায়— সে কাজ যে থিয়েটারের মধ্যেও করা যায় শিল্পিতভাবে তার উপলব্ধি ঘটল লিভিং থিয়েটার দেখে। লিভিং থিয়েটারে মতাদর্শকে থিয়েটারের মাধ্যমে তুলে ধরাটাই মূল কথা। জনসংযোগ তৈরি করা, মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের মধ্যে নিজস্ব দর্শনকে চারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা লিভিং থিয়েটারে করা হয়। নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রচার না করেও তাঁর রাজনৈতিক দর্শনটি থিয়েটারের মাধ্যমে তুলে ধরার পাঠ পেলেন লিভিং থিয়েটারে।

নেহেরু ফিলোশিপ শেষে যখন ফিরে এলেন কলকাতায়, বাদল সরকারের মাথায় তখন আর প্রসেনিয়াম থিয়েটার নেই এমনকি তাঁর সেই ক্লাসিক ‘এবং ইন্ডিজিৎ’ ও তিনি পেরিয়ে এসেছেন— তার অভিনবত্ব সত্ত্বেও তা প্রসেনিয়ামে বাঁধা ছিল। এতদিনের সব প্রশ্নের উত্তর তিনি পেয়ে গেছেন; যে চিন্তা এতদিন অগচ্ছালো ভাবে ছিল, ‘ধোঁয়াটে’ ছিল, দ্বন্দ্ব-সংশয় ছিল এবার তার নিরসন হলো। এবার তিনি প্রসেনিয়াম ছেড়ে পুরোপুরি চলে এলেন অঙ্গনমঞ্চে। আগস্টের শেষে কলকাতায় ফিরে এসে লিখে ফেললেন হাওয়ার্ড ফাস্টের ‘স্পার্টাকুস’ উপন্যাস অবলম্বনে অঙ্গনমঞ্চের জন্য প্রথম নাটক ‘স্পার্টাকুস’। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

“... এ উপন্যাসকে থিয়েটারে আনবার কল্পনা বেশ কয়েকবার করেছি, সাহসে কুলোয়নি। সে সাহস শেষ পর্যন্ত পেলাম, যখন প্রচলিত ‘প্রসেনিয়াম’ মঞ্চ ছেড়ে এসে ‘অঙ্গন মঞ্চ’ ধরলাম।”^{১৫}

এর আগেই অঙ্গন মঞ্চের পরীক্ষামূলক ব্যবহার করেছেন এ.বি.টি.এ-এর হল ঘরে। এবার পাকাপাকি ভাবে প্রসেনিয়াম মঞ্চের পরিবর্তে অঙ্গনমঞ্চে অভিনয় শুরু করলেন। ১২-ই নভেম্বর, ১৯৭২ অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর তিনতলার হল ঘরে ‘স্পার্টাকুস’-এর অভিনয় দিয়ে শুরু হল অঙ্গনমঞ্চে নিয়মিত অভিনয়। তিনি জানিয়েছেন—

“... ‘অঙ্গনমঞ্চ’-এর ভাবনাকে আমরা রূপ দিলাম অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর ৩০x২৮ ফুট এর ঘরে। ... আমরা ঘরের সাধারণ আলোয়, কোনো সাজসজ্জা ও সামগ্রী ছারাই নাটক করলাম। দর্শকদের সামনে রেখে নয়, বরং তাদের চারিদিকে তাদের সঙ্গে জায়গা ভাগ করে নাট্যপ্রযোজনা করলাম।”^{১৬}

নির্মিত হলো নাট্যের এক অন্যভাষা, পাওয়া গেল অন্য পথের সন্ধান। প্রসেনিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে এই ফর্মেই বাদল সরকার প্রায় একলাফে দর্শকের অনেক কাছে চলে গেলেন। দর্শক-অভিনেতার যে ব্যবধান ছিল সেই ব্যবধানটা আর থাকল না। ‘স্পার্টাকুস’-এর হাত ধরে বাংলা থিয়েটার একটি পৃথক ধারার সন্ধান পেল। থিয়েটার মানেই তিনদিক ঘেরা একদিক খোলা আলোকিত আয়তক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে থাকা দর্শকের অন্ধকারে সন্নিবেশ-এই যে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের চিন্তার আধিপত্য বা hegemony অঙ্গনমঞ্চ দারুণ প্রতিস্পর্ধায় তাকে প্রশ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। এই প্রসঙ্গে বাদল সরকারের স্বীকারোক্তি—

“আমি বুঝতে পারলাম, নাট্যসংস্কৃতির অনুশীলন করা সিনেমার সঙ্গে এক অযৌক্তিক দৌড় প্রতিযোগিতায় বন্দী করে রেখেছে নিজেদের। সিনেমা অনেক বেশি নির্মাণধর্মী। এ ছাড়া আমি নিজেও প্রসেনিয়াম থিয়েটার সম্পর্কে বীতস্পৃহ

হয়ে উঠেছিলাম। কারণ প্রতিপদে অজস্র প্রতিবন্ধকতার এর। বিশেষ করে ওই আলো-আঁধারির ব্যাপারটা। এর উপস্থাপন রীতিটাও অবাস্তব। যদিও নাট্য পরিচালক ও অভিনেতারা তাদের সাজসজ্জা, নাট্য-সরঞ্জামের ভিতরে বসে এক নিরাপদ ঘেরাটোপে অধিষ্ঠিত। আঁধারে বসে থাকা দর্শকদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব অনেক। কিন্তু-নাট্যকলার মতো এক সজীব শিল্পমাধ্যম আমাকে বাধ্য করল স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে প্রয়াসী হতে।”^{৭৭}

প্রসেনিয়ামের বিকল্প একটি থিয়েটারের সন্ধান করেছেন বাদল সরকার। সেই বিকল্প পথের সন্ধান এবার তিনি পেয়ে গেলেন। যার প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র ওই অঙ্গন মঞ্চ। ‘স্পার্টাকুস’-এর সাফল্যের পর পুরোনো ‘শতাব্দী’ ভেঙে একেবারে নতুন ভাবে শুরু হল শতাব্দীর পথ চলা। একেবারে নতুন একটা পর্বে পদার্পণ ঘটল বাদল সরকার ও তাঁর দল শতাব্দীর। অ্যাকাডেমি-তে দু’বছরের একটা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করে প্রত্যেক রবিবার অঙ্গনমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে যান তিনি। ‘স্পার্টাকুস’-এর পর ‘প্রস্তাব’, ‘মুক্তমেলা’, ‘মিছিল’ এই নাটকগুলি ছাড়া প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা বেশ কিছু নাটক অভিনীত হয়েছে অ্যাকাডেমির অঙ্গনমঞ্চে। যেমন— ‘সাগিনা মাহাতো’, ‘আবু হোসেন’, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, ‘ত্রিশ শতাব্দী’। অঙ্গনমঞ্চ কিন্তু একেবারেই নিরাভরণ ছিল না। ‘স্পার্টাকুস’, ‘মিছিল’-এর মতো কিছু নাটকে টুল, ছোট বেঞ্চ, সঙ্গে হাতের নাগালে থাকা আলোর সাহায্যে প্রত্যেক প্রয়োজনা্য নতুন ভাবে থিয়েটারের এই স্পেসকে ব্যবহার করা শুরু করেন বাদল সরকার। পরে ‘প্রস্তাব’, ‘মুক্তমেলা’ ইত্যাদি করে অঙ্গনমঞ্চের থিয়েটার কত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জোরালো হতে পারে তা প্রমাণ করেছেন। অঙ্গনমঞ্চ প্রসেনিয়াম না হলেও তার নির্দিষ্ট ঘর ছিল, অর্থাৎ নাটক দেখতে হলে ঢুকতে হবে এবং তা টিকিটবিহীনও নয় তখন। তবে প্রোডাকশন খরচ কমে যাওয়ায় টিকিটের মূল্য কমানো হয়েছে অনেক। আবার দর্শক সংখ্যার একটা নির্দিষ্ট সীমা ছিল। থিয়েটার প্রেমীদের জন্য মেম্বরশিপের ব্যবস্থা করা ছিল। মেম্বরশিপের জন্য চার টাকা এবং বছরে ছয় টাকা চাঁদার ব্যবস্থা ছিল। তবে প্রথম তিনশ জনের পরে মেম্বরশিপের জন্যও ছয় টাকা ধার্য ছিল। আবার লাইফ মেম্বরদের জন্য ছিল ২০০ টাকা। তবে নন-মেম্বরদের জন্য প্রথমে পাঁচ টাকা টিকিট থাকলেও পরে তা নেমে দু’টাকা হয়েছিল। প্রসেনিয়াম থেকে অঙ্গনমঞ্চে বাদল সরকারের উত্তরণ ঘটলেও এইসব সীমাবদ্ধতা থেকেও তিনি বেরুতে চেয়েছিলেন। অঙ্গনমঞ্চ প্রসেনিয়াম না হলেও প্রসেনিয়ামের মতোই তখনও চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী। দর্শকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্যেই অঙ্গনমঞ্চে নেমে এসেছেন, অথচ গুটিকয়েক দর্শকের মধ্যে তখনও আটকে আছেন। অর্থ থেকেও পুরোপুরি মুক্ত নয়। এই সময় হলের মালিক পক্ষ অস্বাভাবিক রকম হলভাড়া বাড়িয়ে

দেয়। দু'বছরের চুক্তি শেষে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের কর্তৃপক্ষ হল ঘরের ভাড়া দ্বিগুণ করে দেওয়ায় বন্ধ হয় এখানকার নিয়মিত নাট্যাভিনয়। বাদল সরকার তখন বিকল্প কিছু ভাবে বাধ্য হন।

বাদল সরকারের অঙ্গন মঞ্চ নিয়ে নাট্যচর্চা শুরুর প্রায় এক বছর আগে নাট্যকার পরিচালক বীরসেনের 'সিল্যুয়েট' নাট্যাগোষ্ঠী 'ওপেন এপিক থিয়েটার' নামে দিনের আলোয়, তিন পাশে বা শুধু সামনে বসিয়ে মাঠ মঞ্চে নাট্যাভিনয় শুরু করে। ১৯৭১-এর ১১ ডিসেম্বর 'মুক্তি আশ্রম' নাটকটির অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই ধরনের নাট্যাভিনয় শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কার্জন পার্কের এই মুক্ত নাট্য। খবরটা ছড়িয়ে পড়ামাত্র, শহর এবং শহরতলির বহুনাট্যদল এগিয়ে এল এখানে। অভিনীত হল নানান ধরনের নাটক। যেভাবে প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনয় হয় ঠিক সেইভাবেই একপাশে অথবা তিনপাশে দর্শক বসিয়ে নাট্য প্রযোজিত হল। কেউ কেউ 'সেট', 'প্রপস' ব্যবহার করে নাট্যাভিনয় করেছে এই মাঠ মঞ্চে। কেন এই মাঠ মঞ্চে অবতরণ? এ প্রশঙ্গে নাট্যব্যক্তিত্ব দেবশিস চক্রবর্তী বলেছেন—

“আসলে সিল্যুয়েট সহ অধিকাংশ নাট্যদলই কলকাতার প্রসেনিয়াম মঞ্চ ভাড়া নিয়ে নিয়মিত নাট্যাভিনয় করবার চেষ্টায় অসমর্থ হয়ে ধারে দেনায় পর্যুদস্ত হয়ে এই মাঠ-মঞ্চে নাট্যাভিনয় শুরু করে। এখানে টাকা পয়সার তেমন প্রয়োজন হয় না। প্রচার হয় খুব ভালো। অভিনয় শেষে দর্শকের স্বচ্ছাদানে সব খরচ উঠে যেত।”^{১৮}

বাদল সরকার অঙ্গনমঞ্চের সীমিত দর্শককে ছাড়িয়ে সর্বসাধারণের কাছে থিয়েটারকে পৌঁছে দিতে এই মাঠমঞ্চের পদ্ধতিকেই এবার গ্রহণ করলেন। ১৯৭৩-এর মার্চ শনিবার বিকেলে কার্জন পার্ক (সুরেন্দ্রনাথ পার্কে) বাদল সরকার ও তাঁর 'শতাব্দী' নাট্যদল অঙ্গনমঞ্চের নাটক 'স্পার্টাকুস' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নেমে পড়লেন এই মুক্তমঞ্চের অভিনয়ে। এইভাবে বাদল সরকারের প্রসেনিয়াম থেকে অঙ্গন এবং অঙ্গনমঞ্চ থেকে মুক্তমঞ্চে উত্তরণ ঘটল। চার দেওয়ালের বাইরে, মুক্ত আকাশতলে অব্যাহত প্রাঙ্গনে যত খুশি দর্শকের সামনে গিয়ে হাজির হলেন বাদল সরকার নিজের নাটক নিয়ে। এতোদিন দর্শক আসত অভিনয় দেখতে, এবার বাদল সরকার তাঁর দল নিয়ে চলে গেলেন দর্শকের কাছে। খোলা জায়গার এই মাঠ মঞ্চে—এখানে সব খোলা-সব উন্মুক্ত-দর্শক-অভিনেতা একাকার। এখানে মঞ্চ নেই, মঞ্চ ব্যবস্থা নেই। আলাদা আলোর ব্যবস্থা নেই। দৃশ্যসজ্জা নেই, সাজসজ্জা নেই, মেকআপ নেই। সর্বোপরি অঙ্গনমঞ্চে যে টাকাপয়সার বিষয়টি ছিল, মুক্তমঞ্চে এসে সেই ভাবনা থেকেও মুক্ত হলেন। এবারে সব দ্বিধা কেটে গেল। বাদল সরকার পেয়ে গেলেন আর এক নতুন

নাট্যপথের সন্ধান। তবে অঙ্গনমঞ্চ ত্যাগ করেননি। এই সময় বাদল সরকার অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চ উভয় ক্ষেত্রেই একটার পর একটা নাট্যাভিনয় করে গেছেন। প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা বহু নাটক সামান্য সম্পাদনা করে অঙ্গনমঞ্চে অভিনয় যেমন করেছেন, তেমনি আবার অঙ্গনমঞ্চের জন্য লেখা বেশ কিছু নাটক মুক্তমঞ্চে অভিনয়ের উপযুক্ত করে অভিনীত হয়েছে তাঁর নির্দেশনায়। এ প্রসঙ্গে দেবাশিস চক্রবর্তী বলেছেন—

“... মাঠ মঞ্চ এবং অঙ্গন মঞ্চে নাট্যচর্চার মধ্যে নাট্য নির্মাণ এবং নাট্য উপস্থাপনায় কিছুটা ফারাক থাকলেও দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনো ফারাক নেই। ফলে অঙ্গন-মঞ্চে এবং মাঠ-মঞ্চে নাট্যচর্চা একই সঙ্গে চালিয়ে গেছেন তিনি।”^{১৯}

তবে তিনি ধীরে ধীরে অঙ্গনমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় বন্ধ করতে বাধ্য হন বাদল সরকার। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর তিন তলার অঙ্গনমঞ্চে অভিনয় ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল, সিদ্ধি অ্যাসোসিয়েশন হল, প্রজ্ঞানানন্দ ভবন, লোরেটো ডে স্কুল-এ অঙ্গনমঞ্চে নাট্যাভিনয় হলেও নাট্য উপস্থাপনা নিয়ে ইচ্ছে মতো কাজ করবার সুযোগ ছিল না। নানা কারণে প্রায় প্রত্যেক হল কর্তৃপক্ষের থেকেই বাদল সরকার একটা সময় প্রত্যাখ্যাত হন। এমন একটা স্থায়ী অঙ্গনমঞ্চ পেলেন না যেখানে অঙ্গন মঞ্চের নাট্যরীতি নিয়ে, নাট্য প্রয়োগ নিয়ে, নাট্যে আলোর প্রয়োগ, দর্শকের বসার আসনের আয়োজন সব কিছু নিয়ে নানাভাবে কাজ করা যায়। বাদল সরকার তাই ক্রমাগত খোলা মাঠের মুক্তমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ওপর আরও বেশি জোর দিতে লাগলেন। একটি সুস্পষ্ট অনুভব তাঁকে এ পথে সামিল করেছিল। সে অনুভব থিয়েটার নিয়ে, যে অনুভব সমাজব্যবস্থা নিয়ে, যে অনুভব আক্রান্ত সাধারণ মানুষদের নিয়ে। এই অনুভবের কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন বাদল সরকার—

“... থিয়েটার কার? থিয়েটার মানুষের। সব মানুষের। সর্বসাধারণের। ...থিয়েটার কোথায়? থিয়েটার পাড়ায়, হাটে, রাস্তায়। যেখানে মানুষ। সব মানুষ। ... থিয়েটার মানুষের কাজ। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র। মানুষে মানুষে বন্ধন। ...থিয়েটার দেওয়াল- ছাদ নয়। থিয়েটার খোলামাঠ আর আকাশ। ... থিয়েটার সজীব প্রাণ। ... থিয়েটার জীবনের নগ্ন কঠিন চেতনা।”^{২০}

বাদল সরকার সব বাধা ভেঙে মানুষের কাছে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়েই অঙ্গনমঞ্চ থেকে নাটককে জনতার মুক্তমঞ্চে হাজির করতে চেয়েছেন।

১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে বাদল সরকারের নাট্যভাবনা নিয়ে দশটি প্রবন্ধ সম্বলিত ‘দি থার্ড থিয়েটার’ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকেই বাদল সরকারের নাট্যরীতি ‘থার্ড থিয়েটার’ নামে অভিহিত বা কথিত হয়। এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার জানিয়েছেন—

“আমি প্রথমে আমার বইটার নাম দিই ‘থার্ড থিয়েটার’। তারপর আমাদের থিয়েটারকে ‘থার্ড থিয়েটার’ বলতে আরম্ভ করে আমাদের কর্মীরা। এখন আমিও মেনে নিয়েছি।”^{২১}

নিজের নাট্যরীতিকে সরাসরি ‘থার্ড থিয়েটার’ নামে চিহ্নিত না করলেও ‘থার্ড থিয়েটার’ নামটি যে তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত এবং তিনি তাঁর থিয়েটার রীতি সম্পর্কে এই নামটি মেনে নিয়েছিলেন, তা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাদল সরকার প্রবর্তিত অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চ রীতির নাট্য থার্ড থিয়েটার নামেই পরিচিতি লাভ করেছে।

‘থার্ড থিয়েটার’ কথাটি এই দেশে বাদল সরকার প্রথম ব্যবহার করলেও বহু আগে থেকেই ইউরোপ-আমেরিকায় এটি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি ১৯০৫ সালে আয়ারল্যান্ডের নাট্যব্যক্তিত্ব সিনজ্ থার্ড থিয়েটার সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন। তিনি সিরিয়াস নাটককে ফাস্ট থিয়েটার এবং বাণিজ্যিক উপকরণ সম্বলিত নাটককে সেকেণ্ড এবং যেখানে সিরিয়াস নাটককে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা হয় তাকে বলেছেন থার্ড থিয়েটার।

‘থার্ড থিয়েটার’ সম্পর্কে প্রায় একই রকম কথা বলেছেন মার্কিন নাট্যসমালোচক রবার্ট ব্রুস্টাইন। তাঁর ‘The Third Theatre’ (১৯৭০) গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেখানে তিনি থার্ড থিয়েটারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে বাস্তববাদী থিয়েটার ক্রমশ আনন্দহীন হয়ে পড়েছে। অথচ সস্তা বাণিজ্যিক সংগীত মুখর নাটকে এত আনন্দ, এত হাসি থাকে যে মানুষকে সে তাৎক্ষণিক বিহ্বলতা দিতে সক্ষম। এই দুই থিয়েটারের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে তৃতীয় ধারার থিয়েটার।

‘থার্ড থিয়েটার’ সংক্রান্ত আলোচনায় যার কথা না বললেই নয় তিনি হলেন ডেনমার্কের নাট্য পরিচালক থ্রোটোস্কির শিষ্য ইউজিনো বারবা (Eugenio Barba)। ১৯৭৬ সালে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত থিয়েটার কনভেনশনে ইউজিনো বারবা ‘এনকাউন্টার অন থার্ড থিয়েটার’ নামক প্রবন্ধে থার্ড থিয়েটার সংক্রান্ত একটি তাত্ত্বিক আলোচনা করেন। যা পরবর্তীকালে থার্ড থিয়েটারের ম্যানিফেস্টো হিসাবে ইউরোপের প্রায় সব দেশে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি ‘ইন্টার ন্যাশনাল থিয়েটার

ইনফরমেশনস’ (ITI) পত্রিকায় ১৯৭৭-এর শীত সংখ্যায় ‘থার্ড থিয়েটার’ নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে প্রথম থিয়েটার বলতে তিনি বাণিজ্যিক তথা অনুদান প্রাপ্ত থিয়েটারগুলিকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে দ্বিতীয় থিয়েটার হল ‘আঁভা গার্দ’ থিয়েটার, যেগুলি মূলত পরীক্ষামূলক এবং পরিচালকেরই প্রাধান্য। এই শ্রেণির থিয়েটারে অভিনেতা-অভিনেত্রী পরিচালকের হাতের পুতুল মাত্র। পরিচালকেরা অভিনেতাদের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করেন নিজেদের পরিচালনা শৈলী দেখাবার জন্য। আর তৃতীয় থিয়েটারে দর্শকের সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের সময়ে নাটকের মুখোমুখি সংঘাতে দর্শককে তার অন্তর্জীবনের গভীর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছেন। বারবা-এর মতে জর্জ গ্রোটোস্কির কাজেই এই থিয়েটার পূর্ণতা লাভ করেছে।

বাদল সরকার এইসব থিয়েটার সম্পর্কে যে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন তা তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে বুঝা যায়। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন:

“আমি জানি অন্তত দু-জন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ দুটি আলাদা আলাদা অর্থ ও ইঙ্গিতে এই থার্ড থিয়েটার পরিভাষাটিকে ব্যবহার করেছেন। সে দুটি আবার আমাদের ধরনের থার্ড থিয়েটার থেকে আলাদা। আমি এই পরিভাষাটির ব্যবহার করেছি আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে—।”^{২২}

জওহরলাল নেহরু ফেলোশিপের (জুন ১৯৭১-মে ১৯৭৩) ‘Project workshop for a theatre of synthesis as Rural-Urban Link’ নামে প্রস্তাবিত প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়েই বাদল সরকার প্রথম-দ্বিতীয় এবং তৃতীয় থিয়েটারের প্রথম তাত্ত্বিক সংজ্ঞায়ন করেন। তাঁর ‘The Third Theatre’ গ্রন্থটিও ঐ প্রকল্প থেকেই রচিত। তিনি বলেছেন প্রথম থিয়েটার-লোকনাট্য, গ্রামাঞ্চলের থিয়েটার। যেটা ফোক বা ট্রাডিশনাল থিয়েটার। এই প্রথম থিয়েটার সম্পর্কে বাদল সরকার বলেছেন—

“আশ্চর্য এর আকর্ষণী ক্ষমতা গ্রামবাসীর কাছে। অথচ দু-একটি তিল পরিমাণ ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই নাট্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আজকের দরিদ্র গ্রামবাসীর জীবনের কোনও যোগাযোগ তো নেই-ই, উপরন্তু সেই সব দেবদেবী-রাজা-রাজড়ার কাহিনি মানুষকে বলে— যা হয় তাই হয়, যা হয় তাই হবে। অর্থাৎ পরিবর্তন সম্ভব নয়, যা আছে যা হচ্ছে তা দেবতার বিধান, মেনে নাও।”^{২৩}

অর্থাৎ প্রথম থিয়েটারের শক্তিশালী সংযোগ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা জীবনের প্রতি কোন ইতিবাচক বা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে না। অন্যদিকে প্রসেনিয়াম তথা নগরনাট্যকে তিনি বলেছেন দ্বিতীয় বা সেকেণ্ড থিয়েটার। এই থিয়েটারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও দেশের বৃহত্তর জনগণের কাছে না পৌঁছানোর জন্য তা সীমাবদ্ধ। এই থিয়েটারকে তিনি বলেছেন মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের

কর্মক্ষেত্র বা বিচরণ ক্ষেত্র। এই থিয়েটার বিলেত থেকে আমদানিকৃত। দু'শো বছর আগেও এর অস্তিত্ব ছিল না এবং আমাদের দেশেও অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় লোকনাট্য-এ প্রসেনিয়ামের কোন স্থান নেই। এই থিয়েটার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

“সেই থিয়েটারে সমাজ-পরিবর্তনের কথা, প্রগতির কথা বলা সম্ভব, বলা হচ্ছেও। কিন্তু যারা পরিবর্তন ঘটাতে পারে, সেই শ্রমজীবী বঞ্চিত মানুষ এ থিয়েটারে আসে না, এবং তাদের কাছে এই থিয়েটার নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, অসুবিধাজনক, প্রায় অসম্ভবই বলা চলে।”^{২৪}

তঁার মতে ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য বহন করে আজও ভারতে দুটি সমান্তরাল সংস্কৃতি একটি গ্রামে, একটি শহরে, কাব্য, চিত্রকলা, সংগীত সবকিছুর মতো থিয়েটারও সমান্তরাল ধারায় চলছে, মেলেনি, মিলবে না, যতদিন দেশের ঔপনিবেশিক চরিত্র ঘুচবে। প্রাথমিক ভাবে বাদল সরকার প্রথম থিয়েটার লোকনাট্য ও দ্বিতীয় থিয়েটার প্রসেনিয়াম থিয়েটার-এই দুইয়ের সিনথেসিস-এর উপর জোর দিয়েছেন— চেষ্টা করেছেন এই দুই থিয়েটারের একটা সমন্বয় করার। এক্ষেত্রে তিনি এই দুই থিয়েটারের রীতিকে বর্জন না করে দু'টি থিয়েটারের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে দুইয়ের সমন্বয় কথা বলেছেন তঁার ‘দি থার্ড থিয়েটার’ গ্রন্থে। ‘The Third Theatre’ গ্রন্থের ভূমিকায় বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

“In such a situation, whether we want to revitalise the city theatre or the village theatre, we have to attack the root of this dichotomy, and attempt to create a link between two through a Third Theatre—a theatre of synthesis.”^{২৫}

এখানে ‘তৃতীয় থিয়েটার’ তঁার মতে ‘থিয়েটার অফ সিনথেসিস’। বাদল সরকার তঁার ‘দি থার্ড থিয়েটার’ গ্রন্থে থিয়েটার অফ সিনথেসিসের কথা বলেছেন বলে অনেক ‘তৃতীয় থিয়েটার’ বলতে এই গ্রাম ও নগর নাট্যের থিয়েটার সিনথেসিস-এর কথাই বলে থাকেন। যেমন— নাট্য ব্যক্তিত্ব মোহিত চট্টোপাধ্যায় সাক্ষাৎকারে বলেছেন:

“... ফাস্ট থিয়েটার বলে তিনি লোকনাটকের যে-কথাটা বলেছেন এবং সেটাকে ছেড়ে দ্বিতীয় নাটককে ছেড়ে তিনি যে ‘Theatre of Synthesis’-এর কথা বলছেন— মানে ঠিক ছেড়ে তো আর সিনথেসিস হয় না। এক অর্থে এইটা নয়, ওনা নয়, আমি একটা নাটক করছি, এর মধ্যে দুয়ের কিছু কিছু সম্পর্ক রয়েছে। তার একটা Synthesis....”^{২৬}

নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরীও প্রায় একইভাবে বলেছেন—

“লোকনাট্য ও প্রসেনিয়াম— এই দুই থিয়েটারের রীতিকে স্পষ্টত বর্জন করে নয়, অভিনব ও অভাবিত কোনো কিছু সৃষ্টি না করে, পূর্বের দুটি থিয়েটারের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে এবং দুইয়ের মিলন ঘটিয়ে তৈরি করা হল ‘থার্ড থিয়েটার’।”^{২৭}

কিন্তু ‘দি থার্ড থিয়েটার’ গ্রন্থ প্রকাশের সময় (১৯৭৮) ‘গ্রাম ও শহরের যোগসূত্র স্বরূপ সমন্বয়ের থিয়েটার’কে থার্ড থিয়েটার বললেও পরবর্তীসময় তার কিছুটা বদল ঘটেছে। তখন বলেছিলেন লোকনাটক আর নগরনাট্য এই দুয়ে সিনথেসিস করে থার্ড থিয়েটার হবে। কিন্তু এই সিনথেসিস থেকে সরে আসেন। এই প্রসঙ্গে বাদল সরকারের নিজের বক্তব্য এই রকম—

“যখন ‘থার্ড থিয়েটার’ বইটা লিখেছিলাম বা ঐ কাজগুলো আরম্ভ করেছিলাম তখন আমাদের এই দুটো কালচার অর্থাৎ দুটো থিয়েটার, গ্রামের থিয়েটার আর শহরের থিয়েটার, দেশজ থিয়েটার আর বিদেশ থেকে আমদানি করা দেশীয়করণ করে নেওয়া থিয়েটারের মধ্যে একটা সমন্বয় করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কাজ আরম্ভ করার পরে এই সমন্বয়ের চেষ্টা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। ছেড়ে দিয়েছিলাম এই জন্য যে আমার মনে হয়েছিল ঐটা হবে না। একটা বিকল্প থিয়েটার তৈরি করার ব্যাপার আছে। তাই সমন্বয়ের প্রশ্নটা আর আসে না।”^{২৮}

থার্ড থিয়েটার বলতে তিনি সেই নাট্যকে বলেছেন, যেটা লোকনাট্য পুরো নয়, আবার নগরনাট্য পুরো নয়। “তখন বলেছিলাম যে আমাদের লোকনাটক আর নগরনাট্য এই দুয়ে সিনথেসিস করে থার্ড থিয়েটার হবে। সেটা থাকেনি। এখন থার্ড থিয়েটার হয়েছে লোকনাটক, নগরনাট্য তারপর একটা বিকল্প থিয়েটার। সেটাই এখন থার্ড থিয়েটার।”^{২৯} অর্থাৎ এখন বাংলা থার্ড থিয়েটার বলতে, যা দাঁড়িয়েছে তা হল, সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে গঠিত একটি বিকল্প থিয়েটার যা লোকনাট্যও নয় আবার নগরনাট্যও নয়।

কেন এই বিকল্প নাট্যের প্রয়োজন তার যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছেন নাট্যব্যক্তিত্ব মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন:

“বাদলদা, সমাজিক-রাজনৈতিক দিক থেকে যে ভাবে কথা বলেন, যে পদ্ধতিতে গিয়ে তিনি সেটা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করছেন, সেটা প্রোসেনিয়াম থিয়েটার কি পারত না! এখানে এইটুকু আমার মনে হয়,

বাদলদা যে-পথটা নিয়েছেন, সে-পথটা আরও বেশি বৈজ্ঞানিক, এবং মানুষের
আরও কাছাকাছি যাবার পক্ষে বেশি অনুকূল।”^{৩০}

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় থিয়েটারকেই যোগাযোগের সঠিক মাধ্যম বলে মনে হয়েছে
বাদল সরকারের। এ যোগাযোগ নাট্যিক নয় সামাজিক সচেতনতার সঞ্চালনও। তাই তিনি আরও
গভীরভাবে মন্তব্য করেছেন—

“... তৃতীয় থিয়েটার কোনও নতুন নাট্যশৈলীর পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা নয়; এ
থিয়েটার একটি দৃষ্টিভঙ্গি, একটি দর্শন।”^{৩১}

‘থিয়েটারের ভাষা’ গ্রন্থে বাদল সরকার জানিয়েছেন:

“কি বলতে চাইছি, কেন বলতে চাইছি, কাকে বলতে চাইছি— এইসব প্রশ্নের
সঙ্গে এই থিয়েটারের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ। এই সব প্রশ্নই এই বিকল্প থিয়েটারের
উৎস এবং ভিত্তি। থিয়েটারের শৈলীর, থিয়েটারের ভাষার রূপান্তর অবশ্যই
ঘটবে, তৃতীয় থিয়েটারের উদ্দেশ্যেই নতুন শৈলী, নতুন ভাষা দাবী করবে;
কিন্তু এমন আদৌ নয় যে থিয়েটারের শৈলী ও ভাষার রূপান্তর ঘটানোই উদ্দেশ্য;
এবং সেই অনুসারে যা হয় কিছু বক্তব্য গ্রহণ করা চলে। তৃতীয় থিয়েটার একটা
দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা ভাবধারা এবং সেই কারণেই স্বভাবতই এই
থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ একটা আন্দোলন। গবেষণাগারে প্রসূত একটা
অভিনব নাট্যশৈলী নয়, মাঠে-ঘাটে পরীক্ষিত যুগের ও সমাজের প্রয়োজনে
গড়ে ওঠা এক বিস্তীর্ণ আন্দোলন এই বিকল্প থিয়েটারের ভিত্তি।”^{৩২}

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার বা বিকল্প থিয়েটারের মূল কথা হল দর্শকের সঙ্গে সংযোগ। আর
এখানেই এই থিয়েটার হয়ে উঠেছে বিকল্প থিয়েটার। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সমস্ত সীমাবদ্ধতা
থেকে এই থিয়েটার মুক্ত। প্রসেনিয়ামে দর্শক মূলত শহরবাসী মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত; দর্শক অর্থের
বিনিময়ে নাটক দেখে, উপভোগ করে অর্থাৎ একটি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্ক থেকে যায়। প্রসেনিয়ামের
মঞ্চসজ্জা, মেক-আপ, লাইট, সাউন্ড সবই ব্যয়বহুল যার ফলে সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে তা দেশের
বৃহত্তম জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রসেনিয়াম থিয়েটারের এই
সীমাবদ্ধতার বিষয়টি লক্ষ্য করেই মন্তব্য করেছেন—

“বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্থীত
পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া
দেওয়া দুঃসাধ্য;”^{৩৩}

বাদল সরকার এই দুঃসাধ্যকে সাধ্য করেছেন প্রসেনিয়ামের বাহুল্যতা বর্জন করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

“থিয়েটারকে অনেক বেশি কমিউনিকেটিভ ও শক্তিশালী করবার জন্য নেমে এসেছিলাম। নেমে এসেই উপলব্ধি করলাম যে থিয়েটারে দামি এবং ভারি জিনিসগুলো আর দরকার হচ্ছে না।”^{৩৪}

আর এই কারণে থিয়েটারকে নিরাভরণ করে বাদল সরকার তৃতীয় থিয়েটারকে করে তুললেন— ‘পোর্টেবল, ফ্লেক্সিবল এবং ইনএক্সপেনসেবল’^{৩৫}

১. ‘পোর্টেবল’ বা বহনীয়: যেহেতু স্পট লাইট এসবের কোনও ব্যাপার নেই, তাই থিয়েটারের সামান্য যেসব সাজসরঞ্জাম লাগে তা সহজে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়।
২. ফ্লেক্সিবল বা নমনীয়: মানে যে কোন জায়গায় করা যায়, স্টেজ দরকার হয় না, দিনের আলোয় মাঠে করা যায়।
৩. ইনএক্সপেনসেবল বা সুলভ: থিয়েটারের দামি ও ভারি জিনিসগুলির প্রয়োজন না থাকায় গোটা ব্যাপারটাই হয়ে উঠে সুলভ। অর্থাৎ অর্থের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল নয়।

বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

“এক বিরাট মুক্তি যেন। অ্যাডিন গ্রামে যেতে পারতাম না, কারণ সেখানে আগে জানতে হত ইলেকট্রিসিটি আছে কিনা, পাকা রাস্তা আছে কিনা। এখন আর কোনও অসুবিধে রইল না, আমরা দিনের আলোয় করতে পারি, মাঠে করতে পারি, মঞ্চের প্রয়োজন নেই...।”^{৩৬} এভাবেই ‘ফ্রী থিয়েটারের ভিত্তি তৈরি হয়ে গেল।’^{৩৭}

বাদল সরকার দু’টো অর্থে এই ‘ফ্রি’ কথাটি ব্যবহার করেছেন। একটি হল ‘মাগনা’। মানে দেখতে গেলে পয়সা লাগে না। সবচেয়ে গরীব লোকও থিয়েটার দেখতে আসতে পারে। আর একটা মানে আছে যাতে অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা অনেক বেশি। ‘ফ্রি’ মানে সেখানে বাঁধন নেই, মুক্ত। টাকার ওপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত, মঞ্চের প্রচলিত ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত, মঞ্চমায়া-আবিলতা থেকে মুক্ত, স্থানের বন্ধন থেকে মুক্ত, আড়ম্বর থেকে মুক্ত, বেশভূষা-সাজসজ্জার ভার থেকে মুক্ত। অর্থাৎ তৃতীয় ধারার থিয়েটার সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত। এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাই মুখ্য। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন— “থিয়েটার ‘মানুষের ক্রিয়া’, human action, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ। মানুষের ঘাড়ে ক্রেতার ভূমিকা, বিক্রেতার ভূমিকা চেপে গেলে সত্যিকারের থিয়েটার ব্যাহত হয়।”^{৩৮} তৃতীয় থিয়েটারে তাই ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক নেই। ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কটা ব্যবহারিক হতে পারে, কিন্তু মানবিক সম্পর্ক বলা চলে না। কিন্তু

থিয়েটারের ক্ষমতা আছে মানবিক ক্রিয়া হয়ে ওঠার। বাদল সরকার তৃতীয় থিয়েটার এই মানবিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করে। সেখানে দর্শক আসছে ফ্রি, তারা দর্শকদের ডাকছেন ফ্রি, তাতে কোন বন্ধন নেই। এখানেই বাদল সরকার কথিত তৃতীয় ধারার থিয়েটারের একটা দর্শন তৈরি হয়ে যায়। যখন ফ্রি হয়ে গেল তখন দর্শক অভিনয়ের পর যে পয়সাটা দিচ্ছে সেটা কিন্তু দামও নয়, দানও নয়। সেটা তাদের অংশগ্রহণ। এই প্রসঙ্গে বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

“সেই জন্য খুব গরীব জায়গাতে শো করলেও আমরা কিন্তু পয়সা তোলায় চাদরটা ঘোরাই। তাদের কেন বঞ্চিত করব অংশগ্রহণ থেকে? তারা দশ পয়সা দিক, পাঁচ পয়সা দিক, দেওয়ার সুযোগটা পাক। এটা না করে জমিদারি সুলভ মনোভাবে যদি ভাবতাম তাদের পয়সা নেই তাই পয়সা নেব না— তাহলেই কিন্তু ওদের আর আমাদের মধ্যে একটা স্তর বিভেদ চলে এল। ওরা নিম্নস্তর, আমরা উচ্চস্তর। আমরা সমান পর্যায়ে সবাইকে দেখি, দেখতে চাই, যেহেতু তা ফ্রি। এটাই মানবিক ক্রিয়া। এর সঙ্গেই দর্শনটা এসেছে।”^{৭৯}

বাদল সরকার বিশ্বাস করেন, থিয়েটার সর্বসাধারণের। আর এটা বাস্তবায়িত করেছেন থিয়েটারকে একেবারে দেশের দরিদ্রতম মানুষটির কাছে হাজির করে। এর আগে থিয়েটারের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে, শহরের গ্রুপ থিয়েটারে অনেক বিপ্লবী থিয়েটার হয়েছে, তারা সমাজ পরিবর্তনের কথা বললেও তা একটি নির্দিষ্ট সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা আমাদেরই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ। তারা কখনই সামাজিক পরিবর্তনের শক্তি হতে পারে না। যারা শ্রমজীবী জনসাধারণ, যারা শ্রমিক মজুর তারা সেই প্রসেনিয়ামে পৌঁছচ্ছে না। বাদল সরকার তাঁর থিয়েটারের মাধ্যমে সেই সব মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে গেলেন। ফলে তাঁর তৃতীয় থিয়েটার হয়ে গেল বিষয়প্রধান। এখানে নাট্যশৈলীর খাতিরে বিষয়বস্তু নির্বাচন নয়, বিষয়বস্তুর জন্যে উপযুক্ত নাট্যশৈলীর অন্বেষণ করা হয়। এই কারণে এক একটা নাটকে এক এক রকম ফর্ম ব্যবহার করা হয়। একটি সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার বলেছেন—

“... third theatre আমার কাছে কোন form-এর ব্যাপার নয়, আমার গোষ্ঠী ‘শতাব্দী’র কাছেও নয়। আমার কাছে third theatre একটা দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গি। যে কথাগুলো আমরা বলতে চাইছি সেটাই আমাদের প্রাথমিক, সেখান থেকেই সব কিছুই শুরু হচ্ছে। অর্থাৎ Content থেকেই সবকিছু শুরু হচ্ছে। আমরা কোন form-এর কাছে কমিটেড নই। কোন form কে Point- ‘A’ থেকে Point ‘B’-তে নিয়ে যাবার কোন দায় আমাদের নেই।”^{৮০}

অনেকে বাদল সরকারের থিয়েটারকে এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার বলেছেন। কিন্তু তৃতীয় থিয়েটার সম্পর্কে এরকম ধারণা ঠিক নয়। বাদল সরকার নিজে এ বিষয়ে বলেছেন—

“... না এক্সপেরিমেন্ট জীবনে করিনি। এক্সপ্লোর করেছি, খুঁজেছি, অনুসন্ধান করেছি, তাই প্রত্যেকটা নাটক আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। ... আমাদের পথ ওটা নয়। একটা নতুন ফর্ম বা নাট্যশৈলী সৃষ্টি করব, এটা আমাদের একটুও উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ওই কথাটাকে সবচেয়ে তীব্রভাবে বলা, তার জন্যে এক্সপ্লোরেশন শব্দটাই যথেষ্ট।”^{৪১}

তৃতীয় থিয়েটারের কনটেন্টটা কী? এ প্রশ্নে বাদল সরকার বলেছেন—

“... আমাদের থিয়েটারটা ‘গিয়ার্ড টু সোশ্যাল চেঞ্জ’ (geared to social change)। ‘ইট ডাস নট মীন মাচ’ (It does not mean much) — মানে ওটা খুব এক্সপ্লেন করে না তো। আমি সেখানে যখনই বলছি খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রত্যেক নাটকে— এই সমাজটা খারাপ, এটা বদলাও, সেটা বলি না। কারণ সেটা অ্যাবসার্ড তো। ... সেখানে আমরা দুটো জিনিস চেষ্টা করি-হয়ে যায় চেষ্টাটা-একটা হচ্ছে এই সমাজটা বলবৎ রাখার জন্য প্রথম কথা কতগুলো সত্য গোপন করা হয়। যাদের স্বার্থে এই সমাজটা চলে, রাখা, কতগুলো সত্য তারা গোপন করে অথবা বিকৃত করে। এক নম্বর, আর জেনে শুনে কতগুলো মিথ্যা মিথ্‌স্ চালু করে, সেই মিথ-এ আস্তে আস্তে লোককে বিশ্বাস করিয়ে দেয় যে ওগুলো সত্য। আমাদের থিয়েটারের একটা কাজ হচ্ছে এই যে— সত্যগুলো চাপা দেওয়া হচ্ছে বা বিকৃত করা হচ্ছে বা যেখানে অর্ধ সত্য বলা হচ্ছে সেগুলোকে উদ্ধার করে প্রচার করা।”^{৪২}

আর এই সূত্রেই থার্ড থিয়েটারের অভিনয়রীতি হয়ে যায় স্বতন্ত্র। সত্য জানাতে গেলে মুখোশ খুলতে হয়। আপনাকে দিয়ে রচনা করা আপনার আবরণ খুলতে হয়। আবরণ আর আভরণ সত্যকে বিকৃত করে সে জন্য অভিনয়ও যথাসম্ভব আভরণহীন হওয়া উচিত। জীবনের সঙ্গে যদি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকে নাটকের তাহলে জীবন দিয়েই তা প্রকাশ করা উচিত। সেখানে চাতুরীর স্থান না থাকাই উচিত। অভিনয় যেমন মুখোশহীন হবে তেমনি হবে সহজাত। এ প্রশ্নে তিনি বলেছেন—

“অভিনয় কথাটার একটাই মানে— মানুষের ভিতরের কথা প্রকাশ করা। যে নাটক করছি, তার কথা যদি আমার নিজের কথা হয়ে না ওঠে, তবে থিয়েটার করা হয় না, নাটকটাকে কাঁধে বহন করে শবযাত্রা করা হয়।”^{৪৩}

তৃতীয় থিয়েটার যেহেতু উপাদানের বাহুল্য থেকে মুক্ত স্বভাবতই থিয়েটারের সমস্ত জোরটা গিয়ে পড়ে মানব দেহের উপর। প্রসেনিয়ামের নাটকের চোদ্দ আনা জুড়ে থাকে সংলাপ। সেখানে অভিনেতারা শুধু মঞ্চে হাজির হন; এছাড়া তাঁদের শরীরের বাড়তি কোন ভূমিকা থাকে না। কিন্তু তৃতীয় থিয়েটারে অভিনেতার শরীর নাটকের মূল উপকরণ। অভিনয়ের সময় অভিনেতার শরীর ছাড়া আর বাকি সব কিছুই গৌণ। তাই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সবকটি বাহ্যিক উপকরণ-পোষাক, আলোকসজ্জা, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি একেবারেই বাতিল হয়ে যায় এখানে। নাটকের বক্তব্য দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে কাজে লাগানো হয় শরীরকে। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার বলেছেন—

“যেহেতু তৃতীয় থিয়েটারকে টাকার উপর নির্ভরশীল থাকলে চলবে না, সেইহেতু নমনীয় বহনীয় ও সুলভ তাকে হতে হবে এবং সেইহেতু দারিদ্র্যও তাকে স্বীকার করে নিতে হবে—...। কিন্তু থিয়েটারকে ব্যবহার করবো অস্ত্র হিসাবে, অথচ সে থিয়েটার শিল্পগতভাবে দরিদ্র হবে, অর্থাৎ অস্ত্রটা হবে ভোঁতা— তা তো মেনে নেওয়া যায় না। যদি না মানি, তবে সমস্ত জোরটা গিয়ে পড়বে ঐ মানবদেহের উপর, থিয়েটারের ঐ অপরিহার্য উপকরণের উপর। ঐ উপকরণটিকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে, এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার শুধু যে অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য হয়ে উঠবে তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে সে ব্যবহার বাধাই সৃষ্টি করবে নাট্যক্রিয়ায়। সে ক্ষেত্রে ঐসব উপকরণ ত্যাগ করে থিয়েটার দরিদ্র হবে না, দুর্বল হবে না, বরং আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।”^{৪৪}

বাদল সরকারের নাট্যদর্শনের অন্যতম মূল কথাই হল শরীরের ওপর অনুশীলন। শরীরের ভাষাকে বাচিক ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত করা। শরীরী অভিনয়ের সুর, তাল, ছন্দকে সর্বাধিক অর্থবহ করে দর্শকের চেতনার গভীরে সঞ্চারিত করা এর মূল লক্ষ্য। তবে বাদল সরকারের কাছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিং মানে কোনো ফর্ম নিয়ে কসরৎ নয়, থিয়েটারের সম্ভাবনাকে বাড়ানোর চেষ্টামাত্র। তিনি জানিয়েছেন—

“শরীরী ভাষাকে অপরিহার্যভাবে ব্যবহার করার খাতিরেই ব্যবহার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যেখানে আমরা দেখি, শরীর নাটকের ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পারছে, কেবলমাত্র সেখানেই আমরা একটা ব্যবহার করি। শরীরকে শুধু ব্যবহার করার জন্য কখনই ব্যবহার করি না। ... নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ীই আমরা শরীরী ভাষা ও শারীরিক অভিনয় ব্যবহার করি।”^{৪৫}

অভিনয়ের ইতিহাসে বাস্তবোচিত অভিনয়ের এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। যাকে আমরা ন্যাচারালিজম বলি। এই অভিনয়ে মানবদেহ বাস্তব আচরণকে নকল করে। তার ফলে দর্শক মনে এক ইলিউশনের সৃষ্টি করে যা নাট্যভাবনা প্রোথিত করতে যুক্তিহীন ভাবে সাহায্য করে। দর্শককে ভাবতে দেয় না এই নাটক ও নাট্যকর্ম সম্পর্কে কোন বিরোধী বিচার। এখানে ন্যাচারালিস্ট অভিনয়ের বিষ লুকিয়ে থাকে। এই বিষ বাদ দিয়ে দর্শকের বিচার-বুদ্ধিকে মুক্ত রাখতে গেলে ন্যাচারালিস্ট অভিনয়কেই বাদ দিতে হবে। অভিনয়ের শর্ত কোনো বাস্তবের নকল করা নয়। অভিনয়ের শর্ত হবে কোন বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ঘটানো এবং এর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের কল্পনা শক্তিরও বিস্তার করা। এর ফলেই চলে আসে শরীরী অভিনয়। বাদল সরকার তৃতীয় থিয়েটারের রূপ নির্মাণে এই শরীরী অভিনয়কে ব্যবহার করেন, অবশ্যই তা তৃতীয় থিয়েটারের গড়ে ওঠা এবং দর্শন অনুসারে সৃষ্টি। কখনই তা নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিফলন নয়। এখানেই বাদল সরকার নিজস্বতায় সমৃদ্ধ।

বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটারের মূল ভিত লুকিয়ে আছে তাঁর সঙ্গে রাজনীতির সংযোগ ক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়ার উপর। ছাত্রাবস্থায় বাদল সরকার বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সে সময় তিনি পার্টির নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্তও ছিলেন। বাদল সরকার রাজনীতি করার সময় একটা সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে সবাই বেঁচে থাকবে, টিকে থাকা নয়। তখন তাঁর ভাবনা ছিল মানুষের জন্য কাজ করবেন, সাম্যের জন্য লড়াই করবেন, “যদি মরেই যাই রাস্তার উপর মরবো, খানায় নয়, গর্তে নয়।”^{৪৬} এমনই তখন তাঁর ভাবনা। সংগঠন করেছেন, বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর তিনি। তারপর এক সময় মোহভঙ্গ। এইসব সাধারণ মানুষের সংগ্রাম নিয়ে বাঁচার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন— হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। কিন্তু এই বাঁচা এবং বাঁচানোর চেতনা যায়নি ভেতর থেকে। তৃতীয় ধারার থিয়েটারের মধ্য দিয়ে সেই রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাই প্রকাশ পেল। যে রাজনৈতিক বোধ বাদল সরকারের ছিল রাজনীতি করার ফলে সেটাই এবার সম্ভব হল থিয়েটারের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন—

“... গোড়ায় যে রাজনীতির ব্যাপারটা ছিল, ... কখনো বিশ্বাসটা আসেনি যে থিয়েটারকে সেই ব্যাপারে কাজে লাগানো যায়। এই এখন আবার বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো। দেখলাম যে, দুটোর একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যাচ্ছে। এখন আমি কথা বলতে চাইছি, সমাজ সংক্রান্ত কথা, সমাজ পরিবর্তন সংক্রান্ত কথা, যেটা রাজনীতির ক্ষেত্রে করতে চেয়েছিলাম সেটা এখন থিয়েটারের ক্ষেত্রে করার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়ে গেল।”^{৪৭}

থিয়েটারের মধ্যে বাদল সরকার তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার কথা বলেছেন বটে, তবে তা কোন দলীয় রাজনীতি নয়। কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন তৃতীয় ধারার থিয়েটারের লক্ষ্য নয়। দলীয় রাজনীতির চাপ না থাকায় তিনি স্বাধীনভাবে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে তৃতীয় ধারার থিয়েটার পরিচালনা করেছেন। সমাজ কীভাবে বদলাবে একথা জানতে চাইলে, তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, “আমি স্বপ্ন দেখাতে পারি। কী করে পরিবর্তন হবে তা আমার কাজ নয়। পার্টি যাঁরা করে তারা হয়তো জানে।”^{৪৮}

তিনি থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে সাম্যবাদী তথা মানবতাবাদী দর্শনকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি পলিটিক্যাল থিয়েটার করছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বাদল সরকার বলেছেন—

“হ্যাঁ করি। কিন্তু পার্টি-পলিটিক্যাল থিয়েটার করি না। আমরা আমাদের পলিটিক্স চেনাই। ব্যাপক অর্থে পলিটিক্স কথাটার মানে হল, একটা দর্শন যা প্রত্যেকটা মানুষেরই আছে। তার জীবন দর্শনই তার পলিটিক্স। আমরা সেভাবেই নাটকটা করি। এখানে এমন কতগুলো মানুষ একত্রিত হয়েছে যারা বিশেষ কতগুলো বিশ্বাসে একমত হয়েছি। তাদের ব্যক্তিগত ভাবনার রাজনীতি এখানে যৌথ রাজনীতি হয়ে উঠেছে। সেই রাজনীতি থেকেই রাজনৈতিক নাটক করি। সেটা কোনো দলের ইলেকশন ম্যানিফেস্টোর সঙ্গে নাও মিলতে পারে।”^{৪৯}

আসলে বাদল সরকার ও তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটারের কর্মীরা স্বাধীনভাবে একটি স্বতন্ত্র দর্শন তুলে ধরতে চেয়েছেন, যার মূল কথাই হল থিয়েটারের সঙ্গে মানুষের সংযুক্তি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন। যে মানুষ এক সময় মানুষে মানুষে ভালোবাসার বন্ধনেই বিশ্বাসী হয়ে রাজনীতির জগতে গিয়েছিলেন, যিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নই বাস্তবায়িত হয়েছে তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটারে। তিনি তাঁর থিয়েটারের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এই মাধ্যমেও মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান ঘোচানো যায়। এখানেই তৃতীয় থিয়েটারের আসল জোর।

৩

বাদল সরকার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে, আলোচনা সভায় বারবার দাবি করেছেন অভিনব নাট্যশৈলীর অন্বেষণ তৃতীয় থিয়েটারের লক্ষ্য নয়, তৃতীয় থিয়েটার একটা দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা ভাবধারা। বাদল সরকার যতই বলুন নাট্যশৈলীর অন্বেষণ মূল লক্ষ্য নয় কিন্তু থার্ড থিয়েটারের প্রয়োগ পদ্ধতি বাংলা সহভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে সবচেয়ে চর্চিত বিষয়।

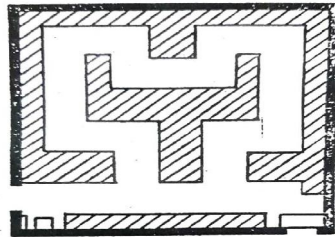
তৃতীয় থিয়েটারের নাট্যশৈলী দু’ধরনের মঞ্চব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। চারিদিক ঘেরা বদ্ধ ঘরে সীমিত দর্শকের সামনে অঙ্গনমঞ্চ এবং খোলা মাঠে অগুণতি দর্শকের সামনে মুক্তমঞ্চ। বাদল সরকার অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চ সম্পর্কে বলেছেন—

“অঙ্গনমঞ্চ’ নামটা আমারই দেওয়া। ... আমরা অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের দোতলার ঘরে যে থিয়েটার শুরু করি তার নাম দিয়েছিলাম অঙ্গনমঞ্চ। তারপর যখন কার্জন পার্কে করেছি তখন আর অঙ্গনমঞ্চ নাম রাখিনি। সেটার কোনো নামই দিইনি। কেউ যদি বলে মুক্ত মঞ্চ, মেনে নেব মুক্তমঞ্চ। আজও যদি ঘরের মধ্যে করি তখন সেটাকে আবার অঙ্গনমঞ্চই বলব।”^{৫০}

অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চ তৃতীয় থিয়েটারের দু’টি স্বতন্ত্র প্রয়োগক্ষেত্রে। অঙ্গনমঞ্চের অভিনয় পদ্ধতি প্রচলিত মঞ্চ-ব্যবস্থার মতো নয়। সাধারণত হলের চারটি প্রান্তেই তিনদিকে দেয়াল ঘেঁষে চতুর্থ দিকে একটি উঁচু প্ল্যাটফর্মের কোল ঘেঁষে দুই অথবা তিন সারিতে চেয়ার পাতা, প্ল্যাটফর্মের আড়াল থেকে অভিনেতারা আসা যাওয়া করেন। মাঝখানে পুরো মেঝেটা ফাঁকা পড়ে থাকে অভিনয়ের জন্য। কোন কোন নাটকে আসন বিন্যাসকে অবশ্য একটু পালটে নেওয়া হত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

“দর্শক-অভিনয় শিল্পীর যোগাযোগ বিভিন্নভাবে করা যায় নাটকের প্রয়োজন এবং সম্ভাবনা অনুসারে। দর্শকদের আসনগুলি সরিয়ে সাজিয়ে কখনও অভিনয় ক্ষেত্রের তিনদিকে রাখা যায়, কখনও দু’দিকে, কখনও বা অভিনয় ক্ষেত্র আর দর্শকদের এলাকা পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দর্শকদের সামনে, পাশে পিছনে-সব জায়গাতেই, অভিনয় চলতে পারে।”^{৫১}

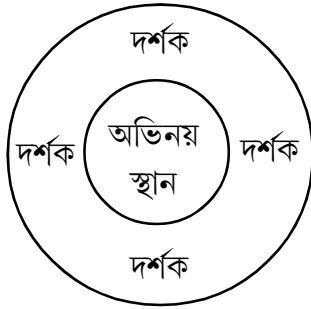
অঙ্গনমঞ্চের স্বল্প পরিসরে, দর্শকের অত্যন্ত কাছে, কখনো বা দর্শকের মাঝখান থেকে অভিনয় চলে। অঙ্গনমঞ্চে এই যে অভিনয় পদ্ধতি তা তিনি ঠিক করতেন ডায়াগ্রাম এঁকে। এর মধ্যে তিনটি ডায়াগ্রাম তিনি তাঁর ‘The Third Theatre’ গ্রন্থে উদাহরণ হিসেবে রেখেছেন। যেমন ‘মিছিল’ নাটকের জন্য বাদল সরকার অঙ্গনমঞ্চের যে ডায়াগ্রাম আঁকেন তা এইরকম—



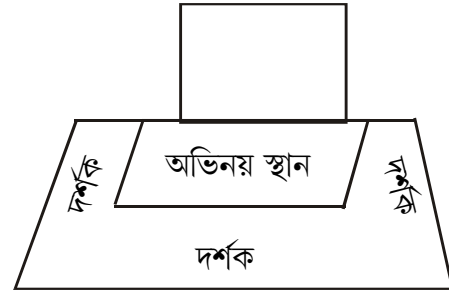
MICHHIL
ANGANMANCHA

অঙ্গনমঞ্চের এই গঠন আকৃতির নাম এরিনা আকৃতি। এরিনার আকৃতি আসলে একটা পরিধি। সেভাবে নির্দিষ্ট করে কিছু না হলেও করতে করতে যে সাইজটা তাদের উপযুক্ত বলে মনে হয় সেটাতেই তারা করে নিয়েছেন। যখন যেমন জায়গা পান তখন সেটার আয়তন বাড়ে-কমে। এই এরিনাটা হয় রেকট্যাঙ্গেল। এর কারণ অঙ্গন মঞ্চের ঘরগুলি অধিকাংশই রেকট্যাঙ্গেল হয়। তার সঙ্গে জোর করে রাউণ্ড করা অর্থহীন।

মুক্তমঞ্চ বা মাঠ মঞ্চের গঠন আকৃতি একটু আলাদা। মুক্তমঞ্চে রেকট্যাঙ্গেল হয়ে যায় রাউন্ড। বৃত্তাকার অভিনয়স্থলকে ঘিরে চারিদিকে দর্শক বসে থাকে। এ জমি মাপা হয় পা দিয়ে। চারপাশে দর্শক বসে থাকে। যে কোনো দিক থেকেই প্রবেশ পথ তৈরি করা যায়। দর্শকদের পিছন দিয়েও হাঁটার পথ থাকে। অবশ্য বর্তমানে একটি সাদা পর্দাকে পিছনে রেখে বর্গাকার বা আয়তাকার একটি অভিনয় স্থলকে তিন দিক থেকে ঘিরে থাকে দর্শক। নিম্নে মুক্ত মঞ্চ অভিনয় স্থলের গঠনের দুটি নক্সা দেখানো হল—



বৃত্তাকার অভিনয়ক্ষেত্র



বর্গাকার বা আয়তাকার অভিনয়ক্ষেত্র

অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চের নাট্যনির্মাণ এবং নাট্য উপস্থাপনায় ফারাক যাই থাকুক না কেন অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চ থার্ড থিয়েটারের এই দুটো প্রয়োগ ক্ষেত্রেই বাদল সরকারের কাছে ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

“আমি ব্যক্তিগতভাবে অঙ্গনমঞ্চে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। আমি বিশ্বাস করি, এই জায়গাটায় এখনও আরও অনেক কাজ করার আছে। কারণ মাধ্যমটা যোগাযোগের যে তীব্রতা দিতে পারে, খোলা জায়গা থেকে তা পাওয়া যায় না। আবার একই সঙ্গে, যেখানে অনেক মানুষ, আমাদের খোলা জায়গার অনুষ্ঠানগুলো সেখানেই আমাদের নিয়ে যায়। ... আমরা এই দুটোর

কোনওটাকেই ছাড়তে পারি না। ... শিল্পগতভাবে অঙ্গনমঞ্চের প্রযোজনায় আমি বেশি তৃপ্তি পাই, কিন্তু একজন সামাজিক জীব হিসেবে বেশি তৃপ্তি পাই খোলা জায়গার অভিনয়ে।”^{৫২}

বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটারে অভিনয় পদ্ধতি বাস্তববাদী অভিনয় পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। বাস্তববাদী থিয়েটারে অভিনয় জীবনের অনুকরণ। জীবন যেহেতু দৈনন্দিনতার অঙ্গ সেহেতু বাস্তববাদী অভিনয়ে দৈনন্দিনতা ঘুরে ফিরে আসে। বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের এই বাস্তবতার দায় ঘাড় পেতে সহ্য করতে চাননি, বরং বাস্তবতার ঘাড়ে চড়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। বাস্তববাদী থিয়েটারে কোনো একটি চরিত্র তার কথা কীভাবে বলবে, কোন সুরে উচ্চারণ করবে, দাঁড়িয়ে না পায়চারি করে না আরাম কেদারায় কাৎ হয়ে— তার মডেল আছে আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মে। কিন্তু অন্য রকমের নাটকের কথা কীভাবে বলা হবে তার কোনো অনুকরণযোগ্য মডেল নেই। এখানে ভঙ্গির, কণ্ঠস্বরের, গতিবিধির অবাধ স্বাধীনতা। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার জানিয়েছেন— “প্রতি কথাকে কি করে সর্বাধিক অর্থবহ করে তোলা যায়, দর্শকের চেতনার গভীরে সঞ্চারিত করা যায়— তার অগণিত পদ্ধতির মধ্যে থেকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পদ্ধতি বেছে নেওয়াই এ নাটকের নাট্যায়নের এবং নাট্যাভিনয়ের মূল কথা।”^{৫৩}

এই প্রসঙ্গে ‘ভোমা’ নাটক থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—

“এক। (উঠে) শেয়ালদা স্টেশনের এনকোয়ারি অফিসের সামনে একটি বৃদ্ধ মরেছে।

দুই। (উঠে) শেয়ালদা স্টেশনের বুকস্টলের পেছনে একটি শিশু জন্মেছে।

[সবাই উঠলো]

চার। শেয়ালদা ছেড়ে ভি-আই-পি রোড ধরো। চলো দমদম এয়ারপোর্ট — সী ইণ্ডিয়া!

[‘তিন’ মাঝখানে, অন্যরা চক্ৰাকারে ঘুরছে।]

পাঁচ। গ্রীষ্মে দার্জিলিং, পুজোয় কাশ্মীর, শীতে ওয়ালটোয়ার।

....

পাঁচ। জল ফুটিয়ে খাবেন, না হয় খাবেন শুধু কোকাকোলা।

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। সী ইণ্ডিয়া! সী ইণ্ডিয়া! সী ইণ্ডিয়া!”^{৫৪}

ভ্রমণের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু যার জন্ম-মৃত্যু শেয়ালদা স্টেশনে, তার কাছে ভ্রমণ বিলাসিতার নামান্তর। শেয়ালদা রেলগাড়ির স্টেশন, কিন্তু নাটকের উপস্থাপনায় এখানে আশ্রয়হীন অনাহারের মুখে চাবুকের মতো আসতে চাইছে, দমদমের রাস্তার নাম, যা ঘটনাচক্রে লোকমুখে এখনো ভি-আই-পি রোড অর্থাৎ সাধারণ মানুষের নয়, অতি বিশিষ্ট জনের। এভাবেই বাদল সরকার

গড়ে তুলেছেন তাঁর নিজস্ব প্রযোজনা কৌশল। তিনি বলেছেন—

“ ‘শিয়ালদা ছেড়ে ভি-আই-পি রোড ধরো’— এই কথা থেকে যদি দ্রুত ঘুরতে থাকে অভিনেতারা চক্রাকারে, এয়ারপোর্ট-কাশ্মীর কোকাকোলার ঘোষণাকে যদি বিশাল রংচঙে সাইনবোর্ডের মতো করে তোলে ভঙ্গীতে, উচ্চারণে এবং শেষে ‘সী ইণ্ডিয়া’ বলতে বলতে যদি সার্কাসের ঘোড়ার মতো দৌড়ায়, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন রিং-মাস্টারের মতো চাবুক আছড়ায়, তবে হয়তো নাট্যায়নের একটা রূপ পাওয়া যায় যা বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে।”^{৫৫}

বাদল সরকার তৃতীয় থিয়েটারের অভিনয় পদ্ধতির একটি লক্ষণীয় বিষয় হল কোরাসের অসামান্য ব্যবহার। গ্রিক নাটকে কোরাস ছিল সর্বজ্ঞ। তাদের তাই একক পরিচয় না থাকলেও বিশেষ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন সফোক্লিসের নাটকে। শেক্সপীয়রের কোরাসও সর্বজ্ঞ। এই ধারণাটি আমাদের ভারতীয় নাটকেও ছিল। সেখান থেকেই রবীন্দ্রনাথ কোরাস চরিত্র ব্যবহার করেন। আবার করেন বিক্ষিপ্তভাবে গণনাট্যের নাট্যকার ও পরিচালকরা। কিন্তু বাদল সরকারের কোরাস একদম স্বতন্ত্র। তারা কেউ দৈবজ্ঞ নয়। কোরাস তাঁর নাটকে মধ্যস্থতার কাজ করে। একটা বিষয় থেকে আর একটা বিষয়ে বয়ে যায়। যেমন ‘ভোমা’ নাটকের কোরাস বলে—

“পাঁচ। ভোমা ভাত খাবে বাবু।

এক। ভাত? ভোমা?

চার-ছয়। খবরদার স্ফালা!

এক। তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না ভোমা! তুমি কোথায়?

(চিৎকার করে) ভোমা।

[ভোমা। সাড়া নেই। চার-ছয় ভয়ার্ত, তটস্থ।]

চার। খবরদার স্ফালা!

ছয়। রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো!

এক। রক্ত?

দুই। মাছের রক্ত।

তিন। মানুষের রক্ত।

সবাই। ঠাণ্ডা আ-আ-। ঠাণ্ডা আ-আ। ঠাণ্ডা আ-আ।”^{৫৬}

এখানে একই সঙ্গে একাধিক বিষয় মিশ্রিত হচ্ছে কিন্তু কেউ বেশি কথা বলছে না। একাধিক অস্তিত্ব বয়ে যাচ্ছে। তাঁর কোরাস ব্যবহারের অসামান্য দক্ষতার কথা বলতে গিয়ে অদ্রীশ বিশ্বাস

‘সাগিনা মাহাতো’র শুঁড়িখানা দৃশ্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে যে মূল্যায়ন করেছেন এখানে তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

“সাগিনা মাহাতো’র শুঁড়িখানা দৃশ্য। ছেদিলাল মদ বেচে। পাহাড়িরা সমবেতভাবে মদ খায়। গান করে। গানটি বিমূর্ত। শব্দময় কিন্তু অর্থহীন। ‘চিত্ত’ শব্দটিকে বাদলবাবু নূন্যতম তিনমাত্রা এবং সর্বাধিক ন মাত্রায় ব্যবহার করেন। লক্ষণীয় যে বিজোড় মাত্রা। এই দক্ষতা বাদলবাবু ’৫৮ সাল থেকে দু’হাত উজার করে লেখা কবিতাবলীতে তৈরি করেছেন। ফলে মাতালের গানে ছন্দবদ্ধভাবে ‘চিত্ত-চিত্ত-চি’ সুর ও শব্দ মিশে গীত হয়। ছেদিলাল আবার মদ দেয়। ক্রমশ মাত্রা কমে কিন্তু বিজোড়ই থাকে। ৭, ৫ সর্বশেষ ৩ মাত্রা যখন উচ্চারিত হয় তখন সুর নষ্ট, মাতলামোতে বিচ্ছিন্ন ও সঙ্গতিহীন। একটা কোরাস এককে ভেঙে যায়। এভাবেই বাস্তবতাকে দৃশ্য গঠনের প্রয়োজনে অন্যভাবে ব্যবহার করেন বাদলবাবু।”^{৫৭}

প্রয়োজনার প্রয়োজনে কোরাস বারবার আসে। এভাবেই বাদল সরকার বাস্তববাদী অভিনয় পদ্ধতি অতিক্রম করে গেছেন।

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের নাট্যকাহিনির উপস্থাপনা পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট কাহিনি উপস্থাপনের চিরাচরিত রীতি থেকে স্বতন্ত্র। সুবৃত্ত নিয়ন্ত্রিত আখ্যানের পরিবর্তে তিনি তাঁর থিয়েটারে কবিতার মস্তাজ এবং ছোট ছোট ঘটনার কোলাজ ব্যবহার করেছেন। ‘মস্তাজ’ চলচ্চিত্রের একটা বিশেষ উপস্থাপন পদ্ধতি। মস্তাজ বিষয়টি আসলে গতিশীল। এতে টুকরো টুকরো অনেকগুলি দৃশ্যকে একীভূত করে এমন এক দৃশ্য তৈরি করা হয়, যা টুকরোগুলিতে ছিল না। যেমন একটি চলচ্চিত্রের কোন দৃশ্যে প্রথমে একটি মুমূর্ষু রোগী দেখানো হল, আর একটি জ্বলন্ত প্রদীপ দেখানো হল। পরবর্তী দৃশ্যে রোগী বা জ্বলন্ত প্রদীপ না দেখিয়ে দেখানো হল প্রদীপটি নিভে গেল। পৃথকভাবে রোগীর মৃত্যু দেখানো হলো না। কিন্তু দর্শকের মধ্যে প্রতীতি জন্মাল রোগীর মৃত্যু ঘটল। এই পদ্ধতির উদ্ভাবক চলচ্চিত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সর্গেই আইজেনস্টাইন। তিনি দেখিয়েছিলেন $২ \times ২ = ৫$; অর্থাৎ দুই অন্য একটি দুইয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে চার হয় ($২ + ২ = ৪$), যাকে একালাজ বলে। তাতে দুইটি দুইয়ের অস্তিত্ব অবিকল অটুট থাকে যোগফলের মাধ্যমে। কিন্তু যদি দুটি দুই গুণ করা হয়, তখন সংঘাত রূপের তারা একটি নতুন এক সংখ্যার উদ্ভাবন করে, সেটাই হল মস্তাজের বিশেষত্ব। এই পদ্ধতিকেই বাদল সরকার অন্যরকম ভাবে ব্যবহার তাঁর থিয়েটারে। তিনি থিয়েটারে ব্যবহার করলেন কবিতার মস্তাজ। থিয়েটারে কবিতার মস্তাজ ব্যবহার সম্পর্কে বাদল সরকার

জানিয়েছেন—

“যখন কাজটা প্রথম হাতে নিলাম, আমাদের কেউ-ই শব্দটার মানে জানত না। প্রথমে আমরা একটা কবিতা-মন্তাজ করব সিদ্ধান্ত হল, আর তারপর সেটার জন্যে প্রয়োজনীয় সব কবিতা খুঁজতে শুরু করলাম— ব্যাপারটা এরকম নয়। আসলে কয়েকটা কবিতা আমাদের খুব ভালো লাগল, আমাদের অনুভূতিতে নাড়া দিয়ে গেল— সেগুলোকে থিয়েটারের মধ্যে এনে ফেলার একটা প্রবল উত্তেজনা বোধ করলাম। আর তাই কবিতা-মন্তাজের আসল মানে কী, সে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে শব্দটা আমাদের কাছে একেবারে যথাযথ মনে হওয়ায় ওটাই আমরা ব্যবহার করতে লাগলাম।”^{৫৮}

সাধারণত দু’টি স্তরের মধ্য দিয়ে বাদল সরকার মন্তাজ বিষয়টি তৈরি করতেন। প্রাথমিক স্তরে মিররিং অথবা ‘স্লো মোশন-এর মতো কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের অনুশীলন করা হতো। এক্ষেত্রে বাদল সরকার নির্বাচিত কবিতাগুলো পড়ে যেতেন আর অভিনেতারা সেটা শুনে যেত। তাদের শব্দ আর অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে দিয়ে কবিতার পঙ্ক্তিগুলো থেকে তাদের তীব্র অনুভূতি স্বতস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসত। সেই অনুযায়ী পড়ার ধরনও বদলে যেত। বারবার পড়ার ফলে অসচেতন ভাবেই পঙ্ক্তিগুলোর নতুন নতুন উচ্চারণ, শব্দ-সুরের নতুনরকম ওঠানামা, নতুন স্বরভঙ্গি, কখনো বা দীর্ঘ বিরতি— এই সবকিছু অজান্তেই ঘটত। এইভাবে দীর্ঘপ্রস্তুতির পর থিয়েটারের মধ্য দিয়ে দর্শকদের দেখানোর জন্য বাদল সরকার আর একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যাকে তিনি বলেছেন— ‘মাইলস্টোন মেথড’। বাদল সরকার বলেছেন—

“কবিতাগুলো চূড়ান্ত বাছাই হয়ে গেলে আমরা তার কিছু জায়গার কোরিওগ্রাফি, কিছু পজিশন নির্দিষ্ট করে ফেললাম, মাইলস্টোনের মতো। অভিনয়ক্ষেত্র এবং অন্যান্য অভিনেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সকলের উপর আস্থা রাখা যায় বলেই দুটো মাইলস্টোনের মাঝখানের অংশটুকু অভিনেতাদের অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য যুক্ত রাখা হল। ‘মারা সাদ’ তৈরির সময়ও আমরা এই পদ্ধতি, মানে, ‘মাইলস্টোন মেথড’ অনুসরণ করেছিলাম।”^{৫৯}

বাদল সরকার দু’জন কবির কবিতা দিয়ে মন্তাজ তৈরির কাজটা শুরু করেন। একজন মফস্সলের স্কুলশিক্ষক মনিভূষণ ভট্টাচার্য; আর একজন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দু’জনের কেউ-ই প্রাতিষ্ঠানিকতার সাথে সমঝোতা করেননি— আর সবচেয়ে বড়ো বিষয় হল দু’জনের কবিতার মধ্যেই দারিদ্র্য ও বুভুক্ষ মানুষের জন্য এক গভীর অনুভূতি আর সেই সঙ্গে যারা ওই মানুষগুলোর প্রতি উদাসীন,

যারা ওই দারিদ্র্য আর খিদে তৈরি করে তাদের প্রতি এক ক্ষমাহীন রাগ ব্যক্ত হয়েছে। আর এই কারণেই বাদল সরকার এই দু'জন কবির কবিতা নির্বাচন করেছেন কবিতা মন্তাজ তৈরির জন্য। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দু'টি কবিতা উল্লেখ করেছেন। একটি 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ' অন্যটি 'শিশুদের রক্ষা করো'। এই দু'টি কবিতার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন—

“ ‘সম্ভবত, আমি কী বোঝাতে চাই, এতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

‘আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে!

কারা যেন আজো ভাত রাঁধে,

ভাত বাড়ে, ভাত খায়!

আর আমরা জেগে থাকি

আশ্চর্য ভাতের গন্ধে

প্রার্থনায়-সারারাত।’

লু সুন-এর গল্প নিয়ে তাঁর আর একটি কবিতা— ‘শিশুদের রক্ষা করো’। সভ্যতার পাঁচহাজার বছর ধরে মানুষ মানুষের মাংস খেয়ে বেঁচে আছে। কবিতাটি একেবারে শেষে এক গভীর আবেদন:

‘শিশুদের রক্ষা করো

যেসব শিশু এখনও মায়ের বুকের দুধ খায়,

যাদের ভাতের সঙ্গে এখনও নরমাংস মিশিয়ে দেওয়া হয়নি

রক্ষা করো

যেন তারা মানুষের মাংস না খায়।’

এই ধরনের সব কবিতাই মন্তাজ তৈরি করতে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছি।”^{১০}

এই প্রেরণাই তাঁকে ‘জন্মভূমি আজ’ নাটকটি লিখতে উৎসাহিত করেছে। ১৯৮৬ সালে নির্মিত এই নাটক প্রকৃতপক্ষে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য এবং বাদল সরকারের নিজের লেখা কবিতার মন্তাজ।

বাদল সরকার তাঁর থিয়েটারে মন্তাজ ব্যবহার করলেও তিনি মূলত কোলাজ পদ্ধতিরই সফল ব্যবহারী। একমাত্র ১৯৯০ সালে নির্মিত ‘পদ্মানদীর মাঝি’ নাটক ছাড়া এমন কোন নাট্যকর্ম নেই যেখানে তিনি পদ্ধতিগত ভাবে কোলাজের সঙ্গে মন্তাজকে এক করতে পেরেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র অথচ আটোসাঁটো উপন্যাস ‘পদ্মানদীর মাঝি’। তাকে নাট্যরূপ দিয়েছেন বাদল সরকার। এখানে তিনি কোলাজের সঙ্গে মন্তাজের সফল প্রয়োগ করেছেন। বহু দৃশ্য একাকার হচ্ছে কোলাজ পদ্ধতিতে। এখানে একাধিক অভিনেতা অভিনেত্রী ঘুরে ফিরে কুবের, কপিলা, মালা চরিত্রে

অভিনয় করে। আর আছে ন্যারেশন। কথকের মত করে বইটি পড়ে যাওয়া হয়। ঘুরে ফিরে আসে চরিত্রের। এর মাঝে একটিমাত্র সাদা কাপড় পুরো নাটকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ব্যবহার করা হয়। কাপড়টি কখনোই হাতছাড়া হয় না। ফলে মন্তাজরীতিতে এই কাপড়টিই ভিন্ন মাত্রা নিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে অদ্রীশ বিশ্বাস লিখেছেন—

“একটি দৃশ্যে কাপড় ছিল জলের ঢেউ, সেটাই যখন নৌকার পাল কিংবা জেলে
পাড়ার ঘর, বস্তি অথবা পুটুলি হয়ে যায়, তখন তার বদল প্রক্রিয়ার আড়ালে
চরিত্ররাও নিজেদের পরিচয় বদলে ফেলে। এভাবেই দুটি রীতি মিলে যায় এ
নাটকে— যার নাম দেন বাদলবাবু— ‘শ্রুতি আলেখে’।”^{৬১}

কাপড় কখনো ধুতি, কখনো দড়ি, কখনো লাঠি ব্যবহার করে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চলে যান বাদল সরকার। তাঁর মিশ্রণ কৌশলের অঙ্গ এই অনুষঙ্গগুলি। এগুলিকে বাদল সরকার বলেছেন ম্যাজিক্যাল প্রপট্‌স। কারণ, যেভাবে জাদুকর লোককে জাদু দেখায় হাতে এই রকম কিছু নিয়ে এবং একটা অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করতে জাদুকর হাতের ওই লাঠি প্রপট্‌সটি ছোঁয়ায়, তখনই ম্যাজিক হয়ে বদলে যায়। একে বলে ম্যাজিক্যাল মেথড। বাদল সরকার ‘পদ্মানদীর মাঝি’ নাটক ছাড়াও বহু নাটকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যেমন ‘পাণ্ডবাণী’তে হাতে থাকে এরকমই একটি বীণা, ঘুঙুর, লাঠি কিংবা চামর। দৃশ্য বর্ণনার পরিবর্তনে পাণ্ডবাণী গায়ক এগুলি ব্যবহার করে। বাদল সরকার একইভাবে ‘ভুল রাস্তা’ নাটকাভিনয়ে একটি রুমাল ব্যবহার করেন। অসাধারণ, সেই রুমালের ব্যবহার। যেমন, ‘সাদাকালো’ নাটকে দড়ি ও ‘দখল’ নাটকে ফিতের ব্যবহার।

একই পদ্ধতিতে বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটারে শব্দ ও সুরকেও ব্যবহার করেছেন। শব্দ তাঁর নাটকে তীব্র হৃদয় স্পর্ষকারী। তা কোনো বস্তুর শব্দ অথবা মুখ নিঃসৃত শব্দ, যাইই হোক। যেমন ‘খাটমাটু ক্রিং’ কিংবা ‘ত্রিশ শতাব্দী’তে লাঠি বাজানোর শব্দ ব্যবহার করেন। ‘চডুইভাতি’তে বাচ্চাদের কটকটি বাজনার শব্দ যুদ্ধের শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া কোরাস একক কিংবা সমবেতভাবে জলের শব্দ, বাঁধ ভাঙার শব্দ, ব্যাণ্ড পার্টির শব্দ, পাখির কলকাকলি, মেশিনের আওয়াজ, ফেরিওয়ালা অধ্যুষিত স্টেশন ও নির্জন রাত গড়ে তোলার কৌশল সত্যিই অভাবনীয়। এসবই বাদল সরকার প্রয়োজনে দৃশ্যান্তর প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করেন আবার দৃশ্য নির্মাণেও ব্যবহার করেন। এগুলির মধ্যে দিয়েই তিনি প্রপট্‌সের বিকল্প খুঁজে নিয়েছেন। এগুলি নিছক চমক বা কৌশল মাত্র নয়। বাদল সরকার যে অর্থে ফ্রি থিয়েটারের দিকে যেতে চান, সেই অর্থে ফ্রি থিয়েটার গড়ে তুলতে তিনি, থিয়েটারকে অনাড়ম্বর করে তুলেছেন এসবের মধ্য দিয়ে। আসলে তিনি ব্যায়াকে বর্জন করে আরো সহজ কিছু গ্রহণ করেছেন। কারণ, গ্রহণই তৃতীয় থিয়েটারের

প্রধান কথা। এভাবেই বাদল সরকার থিয়েটার তত্ত্বে, নাট্যরচনায়, প্রযোজনা কৌশলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন।

তৃতীয় থিয়েটারের কলাকুশলীরা প্রথাগত থিয়েটারের মতো মেক-আপ করে অভিনয় করেন না, তারা অভিনয় করেন সাদামাটা পোশাকে, চরিত্রের নিখুঁত সজ্জায় নয়, অভিনেতার ব্যক্তিগত রূপসজ্জাতেই অধিকাংশ সময়ে, কোন কোন সময় সামান্য দু’একটি বহিরাগত সাহায্য নেওয়া হয়, কোন বিশেষ চরিত্রকে আভাসিত করার জন্য। কোন ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে এখানে অভিনয় গড়ে ওঠে না, কোন চরিত্র বিশেষকে নিয়েও নয়; মুহূর্মুহু অভিনেতা চরিত্র থেকে চরিত্রে সঞ্চারণ করেন। অর্থাৎ দৃশ্যান্তরে চরিত্রের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়।

বাদল সরকার তার থিয়েটারে অনেক সময় পুরুষ চরিত্রে নারীদের দিয়ে অভিনয় করাতেন। চরিত্রকে দর্শকের বোঝবার জন্য কাপড়ের টুকরোতে ‘রাজা’, ‘মন্ত্রী’, ‘রাজপুত্র’-এইসব লিখে অভিনেতাদের পিঠে জামার গায়ে পিন দিয়ে লাগিয়ে দিতেন। যে অভিনেতা ছোট ছোট অনেকগুলো চরিত্রে অভিনয় করতো তার জন্যে লেখা হত ‘বার্তাবহ’, ‘রক্ষী’ ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতেই করা হয় ছোটদের একটি নাটক ‘রূপকথার কেলেকারী’। যেখানে রাজপুত্র চরিত্রে অভিনয় করেছেন একজন মহিলা। তাঁর পিঠে জামার গায়ে ‘রাজপুত্র’ লেখা পিন দিয়ে লাগিয়ে তাকে অভিনয়ে নামানো হয়। এমনকি সংলাপও বলতেন নিজের স্বাভাবিক গলার স্বরেই। পরবর্তীকালে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘ক্যাপ্টেন হুরবা’ও ঐ একইভাবে অভিনীত হয়। এখানেও অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্রে একজন মহিলাকে নির্বাচন করা হয়। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকারের অভিমত হল—

“যেহেতু নাটকটা স্বভাববাদী নয়, তাই একজন মহিলা একটা কাল্পনিক জাহাজের ভাইস-ক্যাপ্টেন হতেই পারেন। যাই হোক, কোনও চমক বা কায়দা দেখানোর জন্য নয়, দলের বিভিন্ন সদস্যের অভিনয় ক্ষমতার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রেও দর্শকরা কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেননি।”^{৬২}

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে দর্শক-অভিনেতা একাকার হয়ে যান। বাদল সরকারের কাছে দর্শক কেবল উপভোক্তা নয়, তারাও নাটকের সঙ্গে অঙ্গীভূত। দর্শকের ভেতর থেকেও উঠে আসবে অভিনেতা। তাই তিনি কেবল স্পেস শেয়ার করেই থামেননি, দর্শককে সমন্বিত করেন তাঁর নাটকে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ‘মিছিল’ নাটকটি। এই নাটকে এক পথের অন্বেষণ রয়েছে, যে পথে এক সত্য ঠিকানায় পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে সত্যি বাড়ি। সে তো স্বপ্নের পথ। তাই সেখানে স্পষ্ট ভাষা থাকে না, শেষে একটি সুর বাজে, যা জীবনের সুর। সেই সুর কণ্ঠে নিয়ে হাত ধরাধরি

করে তারা যায় সেই অস্থি পথে এবং ক্রমশ দর্শকের হাত ধরতে থাকেন অভিনেতারাও। তারাও উঠে মিছিলে যোগ দেন। তখন সে মিছিল নাটকের মিছিল হয় না, তা হয়ে উঠে মানুষের। যে পথ রচিত হয় সে পথ মানুষের যাত্রাপথ, মানবিক পথ। অন্যান্য অনেক নাটকেও এমন অনেক প্রশ্ন করা হয় যা কিনা দর্শকের জন্যই। ‘ভুলরাস্তা’ নাটকে তো দর্শকরাই সেই গল্প শোনার শ্রোতা অর্থাৎ নাটকের অংশ। নাটকের একটি চরিত্র কিছু মানুষের গল্প শোনাচ্ছে। সেই শ্রোতার নাটকেরই চরিত্র। সেই চরিত্রে অভিনেতারা আসেন না, সেই স্থানটি নেয় দর্শকরা। এইভাবে দর্শক-অভিনেতা একাকার হয়ে যায় এই তৃতীয় ধারার থিয়েটারে।

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে সূত্রধার। এই সূত্রধার আসলে লেখকেরই প্রতিনিধি অথবা প্রকারান্তরে গোটা নাট্যদলের— সে গল্প বলিয়ে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের সংযোগকারী অথবা উপস্থাপনার ব্যাখ্যাকার। তবে সূত্রধার কিন্তু নাট্যকারের প্রোটোটাইপ নয়। আর সে কারণেই বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে সূত্রধার এক নয়, একাধিক। একাধিক সূত্রধার দৃশ্য-স্থান-সময় পরিবর্তন ঘোষণা ছাড়াও নানা মন্তব্য করেন যা দর্শককে নাটকের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য বুঝতে সাহায্য করে। ‘গণ্ডী’ নাটকের মুখবন্ধ-এ বাদল সরকার সূত্রধারের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন—

“একটি কথা— যাঁরা বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন, তাঁদেরই বিভিন্ন সূত্রধারের ভূমিকা নেওয়া উচিত; কোনো ক্ষেত্রেই কেনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী যেন বিশেষ করে সূত্রধারের ভূমিকায় নির্দিষ্ট না থাকেন। এবং এ নাটকে সূত্রধাররা নাটকের অঙ্গীভূত, বিচ্ছিন্ন ঘোষকের ভূমিকা নয় তাদের।

সূত্রধারদের প্রতিটি কথার অর্থ দর্শকের উপলব্ধিতে না পৌঁছোলে নাটকটি অসম্পূর্ণ হয়ে যায়।”^{৬০}

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে একারণেই সূত্রধারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের শরীরী অভিনয় দিয়ে তৈরি করা হয় নানান প্রতীক। মঞ্চসজ্জার যাবতীয় অভাব পূরণ করা হয় তাদের শরীরী প্রকাশ ভঙ্গির সাহায্যে। এক্ষেত্রে ‘গণ্ডী’ নাটকের কয়েকটি মঞ্চ নির্দেশনার উল্লেখ করা যেতে পারে—

১. সূত্রধাররা নদী আর ভাঙ্গা পোল তৈরী করেছে শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে কাল্পনিক আঁকশি দিয়ে যে দড়ি ধরবার চেষ্টা করছে।

২. বারণা পার হয়ে চলে গেছে সোমা। সূত্রধাররা এখন পাহাড়ে পথ, পাথর, গাছ, উঁচু-নীচু রাস্তা।

৩. সূত্রধাররা এসে সারি দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে নদী হলো। ছড়ানো বাহু দুলছে ঢেউয়ের

মতো।

৪. সুমন পড়ে আছে, সূত্রধাররা তাকে ঘিরে এমনভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করছে যেন তারাই আগুনের আঁচ, বরফ-হাওয়া, খিদে।

এইভাবে সূত্রধার তৃতীয় থিয়েটারের নাট্য উপস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের অভিনয় পদ্ধতি প্রধানত ওয়ার্কশপ ভিত্তিক। ওয়ার্কশপ পদ্ধতির মধ্য দিয়েই নাট্যনির্মাণ, তৃতীয় থিয়েটারের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতি শুরু হয়েছিল ‘স্পার্টাকুস’ নাটকের অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় প্রস্তুতির সময়। বাদল সরকার তখন নতুন এক অঙ্গনমঞ্চের জন্য নতুন এক পথের সন্ধান করছিলেন। ‘স্পার্টাকুস’ নাটকের অভিনয়ের প্রস্তুতি করতে গিয়ে পেয়ে গেলেন এক নতুন নাট্য প্রয়োগরীতির সন্ধান। যাকে বাদল সরকার বলেছেন— ‘ওয়ার্কশপ’ বা কর্মশালা পদ্ধতি। তিনি লিখেছেন—

“সেটা একটা বিশেষ সময়। কারণ একটা নাটকের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে আসলে কোনও একটা নতুন পথের খোঁজ চলছিল, আর সেইসঙ্গে এক নতুন প্রয়োগরীতিও বেরিয়ে আসতে লাগল। আমরা একে ‘ওয়ার্কশপ’ বা কর্মশালা পদ্ধতি বলি।”^{৬৪}

বাদল সরকারের থিয়েটার বিষয়প্রধান, তাই নাটকের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একাত্ম হতে হয়। এটা একজন নাট্যকার লিখেছেন আর একজন পরিচালক দাবার ঘুঁটির মতো করে অভিনেতাদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন এমন নয়। প্রত্যেককে বিষয়টা গ্রহণ করতে হয়। বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

“... Content based theatre হওয়া মানে খালি পরিচালক নয়, খালি নাট্যকার নয়, Group-এর সমস্ত সদস্য অন্তত একটা Common বিশ্বাসের জায়গায় আসবে তো, সাধারণ বিশ্বাসের জায়গা, যে নাটকটা করছে তার বিষয়ে বস্তুর সঙ্গে তাদের একটা আত্মীয়তা থাকবে তো, তবে তো করতে চাইবে তারা, বুঝবে তারা। করা দরকার বলে মনে করবে তারা। তা না হলে তো হচ্ছে না। সেখানে কিন্তু production notes দিয়ে চলে না, আরো বেশি Involvement, আরো বেশি contribution দরকার এবং সেখানে work-shop process-টা প্রচণ্ড সাহায্য করে...;”^{৬৫}

প্রাথমিক ভাবে আমাদের মনে হতে পারে বাদল সরকারের থিয়েটারের নাট্য ওয়ার্কশপ আসলে থিয়েটার শিক্ষণ পদ্ধতি। হয়তো ঠিক তাই, কিন্তু সবটা তা নয়। এই নাট্য ওয়ার্কশপ পদ্ধতিটা

একজন নাট্যকর্মীর খানিকটা নিজেকে চেনার ব্যাপার। নিজেকে চেনা মানে নিজের সৃজন শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। একজন নাট্যকর্মীর নিজের শরীরের কী কী সম্ভাবনা আছে তার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার বলেছেন—

“শরীর বলতে পুরো শরীর হাত-পা নাড়া নয় কারণ naturalistic theatre-এর বাইরে আমরা চলে এসেছি তাই পুরো শরীরটা, মানে শিরদাঁড়াটাকেও ব্যবহার করা যায় যেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় আমরা ব্যবহার করি, এই অবহিত হওয়া, এবং নিজের চিন্তা এবং অনুভূতি তার সঙ্গে শরীরের মাধ্যমের প্রকাশ-এর সম্পর্কটা কি— এই সম্পর্ক স্থাপন করা। এই হচ্ছে work-shop-এর পদ্ধতি, বুঝতেই পারছেন, আমাদের থিয়েটারে এটা একেবারে অবশ্য কর্তব্য, এই link-টা না করলে পারি না, ...।”^{৬৬}

বাদল সরকার তাঁর থিয়েটার নাট্যওয়ার্কশপের যে পদ্ধতি নিয়ে এসেছেন সেটা তিনি নানা অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চয় করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন রিচার্ড শেখনারের। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন—

“প্রথম শিখেছি বেশ খানিকটা রিচার্ড শেখনারের (জন্ম: ১৯৩৪) কাছ থেকে। তার দলের সঙ্গে কাজ করে গ্রুপ এক্সারসাইজগুলো শিখি, ওয়ার্কশপগুলোতে অংশগ্রহণ করি, সেখান থেকেই প্রসেসটা আরম্ভ হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে যখন আমেরিকায় যাই তখন দু’মাস ওদের দলের সঙ্গে কাজ করি। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে আমি আরম্ভ করি।”^{৬৭}

রিচার্ড শেখনারের কাছ থেকে ওয়ার্কশপ-এর ধারণাটা রপ্ত করার পাশাপাশি আরো বহু জনের কাছ থেকে বাদল ওয়ার্কশপ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছেন। এক্ষেত্রে আরো দু’জন ব্যক্তির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। একজন কারনেল পেটারনেস্টো, আর একজন জন ক্যাসেন নামে এক ইংরেজ যুবক। তাঁদের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন—

“কারনেল পেটারনেস্টো নামে এক ব্রেজিলিয়ান ডান্সার এসেছিলেন। তার নাচের সঙ্গে আমাদের থিয়েটারের ভীষণ মিল আছে। সে ‘ডান্স থিয়েটার’ করে। সে আমাদের ওয়ার্কশপ করে, আমরা তার একটা ওয়ার্কশপ করি। আমি স্বীকার করি তার কাছে অনেক কিছু শিখেছি বলে, ...। জন ক্যাসেন নামে এক ইংরেজ ছোকরা এসেছিল, তার কাছ থেকে দু’একটা খুব ভাল ওয়ার্কশপ আইটেম পেয়েছি যা আমাদের কাজে লেগেছে।”^{৬৮}

ওয়ার্কশপ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এইসব মানুষজনের কাছ থেকে গ্রহণ করলেও বাদল সরকার তাঁর ওয়ার্কশপের মেথডোলজি তৈরি করেছেন ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখে। নিজের দল এবং দলের বাইরে করতে করতে তাঁর ওয়ার্কশপের একটা মেথডোলজি তৈরি হয়। কোন বদ্ধ পদ্ধতি নয়, সেটাও মুক্ত। নির্দিষ্ট কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে নয়। বাদল সরকার বলেছেন—

“রিজিড প্ল্যান থাকলে, এইটাই করা বজায় রেখে, ওয়ার্কশপ হয় না। ... আগের অনেক আইটেম বাদ গেছে, নতুন আইটেম এসেছে, তার কিছু অন্যের কাছে শিখেছি, কিছু আমি নিজে উদ্ভাবন করেছি। করে একটা প্রসেস এসেছে।”^{৯৯}

অর্থাৎ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে খুব দ্রুত এই পদ্ধতি ক্রমাগত পরিবর্তিত ও বিস্তৃত হয়। প্রথমে তিনি তাঁর দলের কাজের মধ্যে এর সূচনা করলেও পরে থিয়েটার ও থিয়েটারের বাইরের লোকদের নিয়ে তিনি যেসব ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছেন তার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও বিস্তৃত হয়েছে।

বাদল সরকারের ওয়ার্কশপের ধারণাও স্বতন্ত্র। তাঁর প্রবর্তিত ওয়ার্কশপে কোন প্রতিযোগিতার স্থান নেই; নেই কোন পর্যবেক্ষক বা অবজার্ভার-এর স্থান। কারণ তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

“কারণ আমি পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছি তো! যে সব মুখোশ পরেছি, সেগুলোকে আস্তে আস্তে বার করছি, যাতে ইনহিবিশনটা কাটে। থিয়েটারের সব থেকে বড় শত্রু তো ইনহিবিশন।”^{১০০}

বাদল সরকার তাঁর ওয়ার্কশপে কিছু এক্সটারনাল এবং কিছু ইন্টারনাল এই দু’ধরনের অনুশীলন করাতেন। এক্সটারনাল অনুশীলনে প্রথমে কিছু কিছু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করিয়ে নেওয়া হয়। এই ব্যায়ামগুলোর উদ্দেশ্যই থাকে কিছু আকর্ষণীয় খেলার মাধ্যমে একজনকে নাটকীয় অভিব্যক্তির মানসিক বাধা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করা। সেই সঙ্গে নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন হতে, নিজেরই শরীরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতাকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করা। এছাড়া শারীরিক ও মানসিকভাবে পারস্পরিক বিশ্বাস বাড়ানো, চলাফেরার মধ্য দিয়ে অভিনয় ক্ষেত্র ও অন্যসব কিছুর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কৌশল রপ্ত করা, একা ও দলগতভাবে শব্দগতি ও ছন্দ আবিষ্কার বাড়ানোর কৌশল রপ্ত করা এবং নিজের সৃষ্টিশীল দক্ষতাকে বের করে এনে ঠিক পথে চালিত করা আর সর্বোপরি সমষ্টিগত ও দলগত ঐক্যবোধের এক গভীর চেতনার জন্ম দিতে সাহায্য করাই হল এই এক্সারসাইজগুলির মূল উদ্দেশ্য। এগুলোকে বাদল সরকার বলেছেন এক্সটারনাল ওয়ার্কশপের— অনুশীলন। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বিভিন্ন খেলার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। খেলাগুলো

এমনভাবে সাজান থাকে, একটার সঙ্গে একটা জড়িত হয়ে হয়ে একটা জায়গায় পৌঁছায়। বাদল সরকারের নাট্যদল শতাব্দীর দীর্ঘ পনেরো বছরের নাট্যকর্মী তাপস মুখোপাধ্যায় এই জাতীয় কিছু থিয়েটার গেমের কথা বলেছেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—

“এই ধরনের একটা প্রাথমিক খেলা হল, ‘নেমগেম’। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কোনো একটা বাজনা বাজানো হয়। কিছু মানুষ সেখানে ঘুরতে থাকে এলোমেলোভাবে। হঠাৎ বাজনা থেমে গেলে বিচ্ছিন্ন সকলে ‘পেয়ার’ খুঁজে নিয়ে হাত ধরাধরি করে নিজের নাম, ধাম পরিচয় বলতে থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওটা বলতে হয়। তারপর আবার বাজনা শুরু হয়। আবার এলোমেলো ঘোরাঘুরি করা। আবার বাজনা থামলে অন্য কোনো ‘পেয়ার’ তৈরি করে পরিচয় দান। এভাবে হৈহট্টোগোলের মাধ্যমে অদ্ভুত একটা খেলা হয়।”^{৭১}

এরকম নানা খেলার মধ্য দিয়ে নাট্যওয়ার্কশপের প্রাথমিক অনুশীলন চলে। পরের ধাপ হল নাটকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খেলার মধ্যে দিয়ে মনকে নাটকের ভেতরে নিয়ে আসা। অর্থাৎ মন-শরীরের সম্পর্ক তৈরি করার অনুশীলন হয় এই পর্বে। এই জায়গায় থেকে কর্মশালা-অনুশীলনী ক্রমশ হয়ে ওঠে ইন্টারনাল। এই পদ্ধতির কার্যকারিতার কথা বলতে গিয়ে বাদল সরকার বলেছেন—

“এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে একজন অন্যের অনুভূতিকে, শরীরের মাধ্যমে, মুভমেন্ট-শব্দ-ছন্দ- এনার্জি ও ভাষার মাধ্যমে স্পর্শ করার বিভিন্ন পথ ক্রমশ আবিষ্কার করতে পারে।”^{৭২}

তাপস মুখোপাধ্যায় ওয়ার্কশপের কিছু ইন্টারনাল গেমের কথা বলেছেন। এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে তা উল্লেখ করা যেতে পারে—

“যেমন, একটা বেলুন দিয়ে বলা হয়, সবাই যেন এটাকে মাটিতে পরতে না দেয়। তা, সবাই তখন ওই বেলুনটাকে উঁচুতে রাখতে বাঁপিয়ে পড়ে; দৌড়ে এসে বেলুনে টোকা মারে— এভাবে একটা ধাক্কাধাক্কির সৃষ্টি হয়। বাদলদা তখন থামিয়ে দেন, বলেন, ‘সবাই মিলে যৌথভাবে চেষ্টা করুন। ধাক্কাধাক্কি করবেন না আর, অন্যকে বিশ্বাস করুন। যখন যার কাছে বেলুন যাচ্ছে তখন তাকেই টোকাটা মারতে দিন।’ আবার শুরু হয়। তখন সবাই স্বাভাবিকভাবেই ঘুরছে, বেলুন ও বাঁচাচ্ছে, কেউ ধাক্কাধাক্কি করছে না। অথবা, বাদলদা কোনো একজনকে মাঝখানে চোখ বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘আপনাকে বিভিন্ন

দিকে ফেলে দেওয়া হবে। আপনি পড়ে যাবেন।’ তাকে বাঁচাবে ঘিরে দাঁড়িয়ে
থাকা অভিনেতারা। যে ভয় পায়, তার পা ভেঙে যায়। বাদলদা, ভয় দূর করতে
এই খেলাটা খেলান। এতে দলের অন্যদের প্রতি আস্থা তৈরি হয়।”^{৭৩}

আরো নানা ধরনের ইন্টারনাল গেম চলে এই পর্বে। এরকম আর একটি খেলা দলের প্রত্যেককে
আলাদাভাবে যে কোনও একটি তাল ও লয়ে মুখে শব্দ করতে বলা হত এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ
শারীরিক ভঙ্গি করে ঘরের এক কোন থেকে আরেক কোনায় যেতে বলা হত। শর্ত হচ্ছে শব্দ ও
শরীরের ভঙ্গিকে একই তাল ও ছন্দে মেলাতেই হবে। এইসব ইন্টারনাল গেমের মাধ্যমে চলে
নাটকের বিষয় ও সংলাপ নিয়ে নানা খেলা। কিন্তু তাতে কোনও নির্দিষ্ট কোরিওগ্রাফির জন্ম দেয়
না, বরং নাটকের বিষয়টি একজন নাট্যকর্মীর রক্তে গেঁথে দিতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে একজন
নাট্যকর্মীর অন্তরের শক্তিকে, তার অনুভূতির তীব্রতাকে, নাটকের সমস্ত অভিনেতার পারস্পরিক
সম্পর্ককে টেনে বের করে আনে। আর সেটা থেকেই একটা চূড়ান্ত কোরিওগ্রাফি তৈরি হয়ে যায়,
যা একজন কোন পরিচালকের নয় একটি দলের সমবেত অংশগ্রহণের ফল— বাইরে থেকে চাপিয়ে
দেওয়া নয়। তাপস মুখোপাধ্যায় তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তাই লিখেছেন—

“কিছু কিছু গেম আছে, যেগুলো এক্সটারনাল হলেও তার সঙ্গে মানসিক যোগ
থেকেই যায়। যেমন, ‘স্লো মোশান’ সিনেমায় যেমন ধীর গতিতে ছবি চলে,
তেমনি, ওয়ার্কশপেও ধীর গতিতে হাঁটতে হয়। এতে মনের উপর ভীষণ প্রভাব
তৈরি হয়। প্রত্যেকটা পদক্ষেপ, পেশীর চাপ আমরা বুঝতে পারি, এভাবেই
প্রভাবটা তৈরি হয়। এই ইন্টারনাল গেমগুলোর মধ্যে দিয়ে মনের মধ্যকার
বিভিন্ন ইমোশনগুলোকে বের করে আনা। বের করে আনা ঠিক নয়, এগুলো
স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বেরিয়ে আসে। প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে কিছু কিছু
‘বদ্ধতা’ থাকে। সেই বদ্ধতা ভেঙে মানুষটাকে বের করে আনাই এই
ওয়ার্কশপগুলোর উদ্দেশ্য।”^{৭৪}

বাদল সরকার যে ধরনের বিষয় নিয়ে থিয়েটার চর্চা করেন, সেখানে অভিনেতাদের চিন্তা ও অনুভূতিই
হল একমাত্র মৌলিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়। শুধু দক্ষতা আর কায়দা দিয়ে অভিনয়
করা নয়, প্রত্যেক অভিনেতাকে বিষয়বস্তুর সাথে একাত্ম হতে হয় এবং তা থেকে উৎসারিত আবেগ
প্রতিফলিত হয় নাটকের বিষয়ে। বাদল সরকার এই ধরনের অভিনয় রীতিকেই বলেছেন “স্টেট
অর্ফ বিয়িং’ দিয়ে অভিনয়।”^{৭৫} তিনি বলেছেন—

“নিয়মানুগ অভিনয় বা ‘এনঅ্যাক্টমেন্ট’ আমরা চাই না। আত্মসচেতনতা ও

আত্মবোধ দিয়ে নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বুঝতে পারা, নিজের অন্তরের গভীরতাকে ছুঁতে পারা, আর সেই স্তরে পৌঁছে অন্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা— এইসবই একজন মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, ...।”^{৭৬}

বাদল সরকার তাঁর নাট্যওয়ার্কশপে সেই অভিনয় রীতিরই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আর সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে তৃতীয় থিয়েটার এক স্বতন্ত্র আঙ্গিক।

8

এখন প্রশ্ন হল বাদল সরকার তৃতীয় থিয়েটারের নাট্য আঙ্গিকের স্বরূপটা কী? তিনি যে নাট্য আঙ্গিকের উদ্ভাবন করেছেন সেটা কী একেবারেই নতুন কিছু? বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের আঙ্গিক, প্রয়োগশৈলীর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় দেশ-বিদেশের নানা নাট্য আঙ্গিকের। আলোচনার এই পর্বে আমরা বাদল সরকারের থিয়েটারের স্বরূপ কী? কোন কোন থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর থার্ড থিয়েটারের মিল খুঁজে পাওয়া যায় এবং কোথায় নতুনত্ব সেই দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

বিদেশি যেসব নাট্যআঙ্গিকের সঙ্গে বাদল সরকারের থিয়েটারের মিল রয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পোল্যান্ডের গ্রোটস্কির (Grotowski) ‘পুওর থিয়েটার’-এর। ১৯৫৯ সালে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে পোল্যান্ডের ওপোলে শহরে গ্রোটোস্কি প্রতিষ্ঠা করেন ‘থিয়েটার ল্যাবরেটরি’। তারপর ষাটের দশকের প্রথম থেকেই তাঁর চিন্তাজগতে যে আলোড়ন শুরু হয় তাঁরই ফল ‘পুওর থিয়েটার’। তাঁর চিন্তাভাবনাসমূহ নিয়ে যে গ্রন্থ তার নাম ‘Towards a Poor Theatre’। তাঁর থিয়েটারের তিনি নাম দিয়েছিলেন— ‘Poor Theatre’। গ্রোটোস্কি তাঁর থিয়েটারের লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন—

“We are seeking to define what is distinctively theatre, what separates this activity from other categories of performance and spectacle. Secondly, our productions are detailed investigation of the actor-audience relationship. That is, **we consider the personal and scenic technique of the actor as the core of theatre art.**”^{৭৭}

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে অভিনেতা-দর্শকের সংযোগের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

গ্রোটোস্কি মনে করেন দর্শকও অভিনয়েরই অংশ। তাদেরকে অভিনয়ে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন তিনি। গ্রোটোস্কি বলেন—

“We have resigned from the stage-and-auditorium plant: for each

production, a new space is designed for the actors can play among the spectators, directly contacting the audience and giving it a passive role in the drama (e.g.our productions of Byron's **Cain** and Kalidasa's **Shakuntala**). Or the actors may build structures among the spectators and thus include them in the architecture of action, subjecting them to a sense of the pressure and congestion and limitation of space (Wyspianski's **Akropolis**) That simply creates a bare laboratory situation, an appropriate area for investigation. The essential concern is finding the proper spectator-actor relationship for each type of performance and embodying the decision in physical arrangements.”^{১৮}

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে তো এই কথাই বলা হয়েছে। দর্শক কেবল উপভোক্তা নয়, তারাও নাটকেরই অংশ— এই কথাই বাদল সরকার তাঁর থিয়েটারে বলেছেন। থ্রোটোস্কি মনে করেন অভিনয় হবে সহজাত। তিনি বলেছেন অভিনেতাদের তিনি পূর্ব নির্ধারিত কিছু কৌশল শেখাতে চান না। চাতুরী দিয়ে দর্শককে ভোলানোর পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না। যে কারণে তিনি বলেছেন—

“We do not want to teach the actor a predetermined set of skills or give him a ‘bag of tricks’ ours in not a deductive method of collecting skills. ... The actor makes a total gift of himself. This is a technique of the ‘trance’ and of the integration of all the actor’s psychic and bodily powers which emerge from the most intimate layers of his being and his instinct, springing forth in a sort of transillumination.”^{১৯}

থ্রোটোস্কির মতো বাদল সরকারও মানুষের ভেতরকার মানুষটাকে বের করে আনতে চেয়েছেন। ‘থিয়েটারে মুখোশ’ প্রবন্ধে তাই বাদল সরকার বলেছেন—

“... রামের ভিতরে একটা স্বভাব আছে, রামের একটা স্বাভাবিক সত্তা আছে। নাটকের চরিত্র শ্যামেরও থাকার কথা। আসল বাস্তব-সেই সত্তা। সেই ভিতরের সত্তাকে টেনে বের করে থিয়েটার করতে পারলে হয়তো সত্যিকারের বাস্তবধর্মী

থিয়েটার হোত।”^{৮০}

থ্রোটোস্কি তাঁর নাট্যচর্চায় অভিনেতার শরীরী অভিনয়ের উপরই জোর দিয়েছিলেন। অভিনেতার শরীর প্রকাশের উপরই নির্ভর করেছেন তাঁর সমগ্র নাট্যপ্রযোজনায়। এতোদিন ধরে নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে যেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, সেই মঞ্চসজ্জা, আলো, দৃশ্য সজ্জা অর্থাৎ থিয়েটারের যাবতীয় আড়ম্বরকে তিনি বর্জন করেন। এগুলির চাইতে তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীর-এবং তাদের শরীরী ভাষার মাধ্যমেই তিনি তাঁর নাট্যবস্তুকে দর্শকের কাছে হাজির করতে চেয়েছেন। এই জন্য থ্রোটোস্কি তাঁর দীর্ঘ কর্মশালার আয়োজন করেন। মানুষের যে মুখোশটা সেটা খুলে আসল মানুষের সন্ধান করেন। আর এটা নির্মাণ করেন দীর্ঘ ওয়ার্কশপের মধ্যে দিয়ে। বাদল সরকারও তাঁর ওয়ার্কশপের মধ্য দিয়ে সেই মুখোশ খুলে আসল মানুষকে বের করার চেষ্টা করেছেন। থিয়েটারের শরীর থেকে তিনিও থ্রোটোস্কির মতো কেড়ে নিয়েছেন যাবতীয় আভরণ। সাজ-পোশাক, আলো-আঁধারি খেলা, মায়া সৃষ্টি করার যাবতীয় কৌশল তিনি ত্যাগ করেছেন। উভয়েই এইসব বাহুল্যকে বর্জন করেছেন প্রসেনিয়ামের সমালোচনা করে। বাদল সরকার যেমন প্রসেনিয়ামের বিস্তারিত বাধার উল্লেখ করেছেন, তেমনি বাহুল্য বিষয়ে থ্রোটোস্কিও থিয়েটারের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। তিনি বলেন—

“We have resigned from the stage-and-auditorium plant.”^{৮১}

থিয়েটারের যাবতীয় উপাদানের বাহুল্য বর্জন করার কারণে অভিনয়ের যাবতীয় জোর গিয়ে পড়ে দৈহিক ও বাচনিকভাষার উপর। স্বাভাবিক ভাবেই থ্রোটোস্কি আশ্রয় নিয়েছেন দর্শকের কল্পনা শক্তির উপর। থ্রোটোস্কি দর্শকের কল্পনাশক্তি, সৃজন শক্তির ওপর আস্থা রেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন—

“The theatre is also an encounter between creative people.”^{৮২}

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারেও এই দর্শকের কল্পনাশক্তির উপর গভীর আস্থার কথা বলা হয়েছে। এই জোরে তিনি তাঁর থিয়েটারকে করে তুলেছেন ফ্লেক্সিবল।

১৯৬৯ সালে যখন বাদল সরকার ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম সূত্রে পোল্যান্ড গিয়েছিলেন তখন তিনি থ্রোটোস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাঁর কাজ দেখেন। সেই সূত্রেই দু’জনের মধ্যে থিয়েটার সংক্রান্ত কিছু চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদান ঘটে। হয়তো এই কারণেই বাদল সরকারের থিয়েটারে থ্রোটোস্কির থিয়েটারের একটা প্রভাব পড়েছে বলে আমাদের মনে হয়। বাদল সরকার শ্রীরাম মেমোরিয়াল লেকচার, ১৯৯২-তে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

“There are certain things he has said which I liked very much and I

think I can understand it and some ways have used them.”^{৮৩}

তিনি গ্রোটোস্কির কাজ দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তার প্রয়োগও করেছেন। ১৯৬৯ সালে পোল্যান্ড সহ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়া ঘুরে এসেই তিনি ‘প্রলাপ’, ‘সারারাত্তির’, ‘শেষ নেই’ প্রভৃতি নাটক করেছেন, তাতে যে গ্রোটোস্কির পুণ্ডর থিয়েটারের ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে তা স্বীকারও করে নিয়েছেন। তিনি তাঁর ‘The Third Theatre’ বইয়ে লিখেছেন—

“... Grotowski’s work and his comments on theatre were fresh in my mind. Not much of those was reflected directly in our production of ‘Pralap’, and the subsequent productions of ‘Sarasattir’, ‘Sesh Nei’ and ‘Ballavpurer Rupkatha’ except one vital principle - the concept of the *Poor Theatre*.”^{৮৪}

প্রশ্ন জাগে তিনি কি তাহলে সম্পূর্ণ গ্রোটোস্কির থিয়েটারকেই নকল করেছেন? উত্তরটা এককথায় না। কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রোটোস্কির থিয়েটারের সঙ্গে বাদল সরকারের থিয়েটার আঙ্গিকের মিল থাকলেও দু’জনের থিয়েটার পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে আলাদা। গ্রোটোস্কির থিয়েটার মুক্ত থিয়েটার বা ফ্রি থিয়েটার নয়। থিয়েটারে নাট্যাভিনয় করে জনতার কাছে যাওয়ার কোন বাসনা তাঁর ছিল না। গ্রোটোস্কি প্রচণ্ড ট্রেন্ড করা কর্মীদের নিয়ে কাজ করেন। ব্যালে স্কুলের ছ’বছরের হোলটাইম কোর্স অথবা ড্রামা স্কুলের পাঁচ বছরের হোল টাইম কোর্স পাশ করা নাট্যকর্মীদের নিজের থিয়েটারে যুক্ত করে নিজে চার-পাঁচ বছর প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করেন। তিনি নির্দিষ্ট দর্শকের জন্যই থিয়েটার করতেন। এ প্রসঙ্গে দর্শন চৌধুরী যে তথ্য দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি জানিয়েছেন—

“তাঁর সবচেয়ে খ্যাতিপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ‘দ্য কনস্টান্ট প্রিন্স’— পোলিশ ল্যাবরেটরি থিয়েটারে অভিনয়ের সময়ে মোট ৪০ জন করে প্রতি শো’তে দর্শকের বসার ব্যবস্থা ছিল। এবং নিয়মিত অভিনয়ে এই চল্লিশজন করে দর্শকই নাটকটার অভিনয় দেখতে পেত।”^{৮৫}

বোঝাই যাচ্ছে অভিনেতা-অভিনেত্রী গ্রহণ করে নাট্যপ্রযোজনা— সবক্ষেত্রেই তিনি থিয়েটারকে পরীক্ষামূলক ভাবে নিয়ে একটি গবেষণাগারে পরিণত করেছিলেন। তাঁর চিন্তা ল্যাবরেটরি থিয়েটারেই আবদ্ধ ছিল। “দর্শকের মোহ ছাড়তে হবে— এই আপ্তবাক্যের কারণেই তিনি এর বাইরে তাঁর কোনো নাটকের অভিনয় করেননি।”^{৮৬}

বাদল সরকারের থিয়েটার এইখানে গ্রোটোস্কির থিয়েটার থেকে স্বতন্ত্র। প্রায় প্রথমাবধি

সেই চেষ্টাই করেছেন কীভাবে নাটককে দর্শকের কাছে হাজির করা যায়। করতে করতেই সেই পথ তিনি আবিষ্কার করেছেন। তিনি অঙ্গনমঞ্চের নির্দিষ্ট সংখ্যক দর্শকের মধ্যে থিয়েটারকে গবেষণাগারে আবদ্ধ না রেখে মুক্তমঞ্চের অসংখ্য দর্শকের মাঝে হাজির করেছেন। কার্জন পার্কে ‘সাগিনা মাহাতো’-র অভিনয় কিংবা ‘মিছিলের অভিনয়’ দেখে কয়েক হাজার দর্শক। পথচলিত জনতাও দর্শকে সামিল হয়ে যেত। কারণ তিনি মনে করেন— “থিয়েটার মানুষের। সব মানুষের।/সর্বসাধারণে।/...থিয়েটার খোলা মাঠ আর আকাশ।/থিয়েটার পোশাকে মোড়া পুঁটলি নয়।/সজীব-প্রাণ।/... কয়েক মুহূর্ত বর্ম-মুখোশ ফেলে সত্যিকারের মানুষের প্রকাশের সুযোগ থিয়েটারে।/এই প্রকাশের ‘মুহূর্ত’ একদিন ‘প্রতিদিন’ হবে, এটাই আজকের স্বপ্ন।/সত্যিকারের থিয়েটার সে স্বপ্নের বাহন।”^{৮৭}

পোল্যান্ডের থোটোস্কির থিয়েটার আঙ্গিকের পাশাপাশি বাদল সরকারের থিয়েটার আঙ্গিকের মিল রয়েছে রিচার্ড শেখনার-এর ‘পারফরম্যান্স গ্রুপ’-এর এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার-এর সঙ্গে। রিচার্ড শেখনার-এর থিয়েটারের সঙ্গে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করার আগে জানা প্রয়োজন কে এই রিচার্ড শেখনার? রিচার্ড শেখনার থিয়েটারে পারফরমিং আর্ট তত্ত্বের অন্যতম একজন প্রয়োগকারি। ‘এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার’ তাঁর প্রকাশের মূল মাধ্যম ও পছন্দ। ষাটের দশকে আমেরিকা সহ চীন, জাপান এমনকি ভারতেও তাঁর এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠে। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি সহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক এবং বিখ্যাত দি ড্রামা রিভিউ-এর সম্পাদক। তাঁর এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটারের মূল বৈশিষ্ট্য হল পারফরম্যান্সের মধ্যে দিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করা। ১৯৬৯ সালে ‘ডায়োনিসাস ইন সিক্সটি নাইন’ প্রযোজনা দিয়ে এই থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়। তারপর করেছেন তাঁর সেই বিখ্যাত প্রযোজনা ‘মাদার কারেজ’। একটি সাক্ষাৎকারে রিচার্ড শেখনার তাঁর থিয়েটারের নান্দনিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি কী তাঁর উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন—

“... এখানে স্থান (স্পেস) কে নির্মাণ করে ঘটনা (ইভেন্ট)। দর্শকদের এখানে জড়িত করা হয়। লিখিত নাট্যরূপ, আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা বা পারফরম্যান্সের একটা অংশমাত্র। এখানে সাংগীতিক নাট্যরূপ (মিউজিক্যাল টেক্সট), শরীরি নাট্যরূপ (বডি-টেক্সট) এবং এইরকম আরো অনেক কিছু আছে। এইগুলোই হল আমার থিয়েটার তত্ত্বের উৎকর্ষ।”^{৮৮}

আর এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার কী? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন—

“ঘটনা জায়গা তৈরি করে। প্রতিটি নাট্য-ঘটনা তাদের উৎসগুলির সংগে তাদের

সম্পর্ককে তুলে ধরা উচিত— তা সে নাটক, মানুষ কিংবা উভয়েই হোক না কেন। এটি একটি অনুষ্ঠিত হওয়ার জায়গা। এটিকে কেবলমাত্র নাটকীয় ভাবে স্পেসের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয় নি। এটি নিজে নিজেই জায়গা তৈরি করে নিচ্ছে এবং প্রসেসের মধ্যে যা কিছু আছে তা দর্শকই হোক বা অংশগ্রহণকারীই হোক তাদেরকে গ্রহণ করছে। এই সব কিছুই ভালভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যাতে আপনি ঠিক করে নিতে পারেন কি আপনি পারফর্ম করতে যাচ্ছেন এবং কি ভাবে সম্পর্কযুক্ত করছেন সেই সব মানুষদের সংগে যারা এগুলিকে গ্রহণ করছে।... এই সবকিছুকেই ভালভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে, অন্বেষণ করতে হবে এবং প্রত্যেকবার সতেজ ও তরতাজা করে নিতে হবে— এটাই হল এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার।”^{৮৯}

রিচার্ড শেখনার ছিলেন প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ঘোর বিরোধী। এই শেখনারের সঙ্গে বাদল সরকারের প্রথম সাক্ষাৎ হয় কলকাতায় তারপর ধীরে ধীরে দু’জনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শেখনার কলকাতায় বাদল সরকারের থিয়েটার দেখেছেন। শেখনারের আমন্ত্রণে ১৯৭৩-এ বাদল সরকার আমেরিকায় গিয়ে তাঁর ‘এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার’ দেখেছেন। তাঁর দলের সঙ্গে দু’মাস কাজ করেছেন। বাদল সরকার শেখনারের থিয়েটার পদ্ধতি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই শেখনারের থিয়েটারের প্রয়োগরীতির কিছু কিছু প্রভাব বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে পড়ে। বিশেষ করে শেখনারের নাট্যওয়ার্কশপ এবং শারীরিক অভিনয় রীতি বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটারে প্রয়োগ রীতির ক্ষেত্রে গভীরভাবে ব্যবহার করেছেন। বাদল সরকার তাঁর থিয়েটারে কীভাবে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিং ব্যবহার করেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন—

“প্রথম শিখেছি বেশ খানিকটা রিচার্ড শেখনারের (জন্ম: ১৯৩৪) কাছ থেকে।

তার দলের সঙ্গে কাজ করে গ্রুপ এক্সারসাইজগুলো শিখি, ওয়ার্কশপগুলোতে অংশগ্রহণ করি, সেখান থেকেই প্রসেসটা আরম্ভ হয়েছিল।”^{৯০}

বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারের নির্মাণগত বা শৈলীগত দিক থেকে যে কতটা শেখনারের দ্বারা প্রভাবিত, সেকথা বলতে গিয়ে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

“বাদলবাবুর তৃতীয় থিয়েটারের নির্মাণগত বা কৌশলগত মাত্রার দুটি দিকের দ্বিতীয়টি, ব্যক্তিনটের ব্যক্তিত্ব মন্থন করে তার নিজস্ব যাবতীয় স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা জারিত করে অন্য এক সত্তায় আত্মস্থ হয়ে নটগোষ্ঠীর সঙ্গে ও নাটকের বিষয়গত আবেগের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার লক্ষ্য নির্বাচন ও নির্ধারণ শেখনার-এর

এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার-এর ওয়ার্কশপ পদ্ধতি থেকেই বাদলবাবু আহরণ ও শিক্ষা করেছেন। ... তার মৌলিকতা এতটুকু লাঘব না করেও কিন্তু মানতেই হবে, শেখনার-এর এক কর্মদর্শনই তাঁকে আজীবন চালিত করেছে।”^{৯১}

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের প্রয়োগরীতিতে শেখনারের প্রভাব অনস্বীকার্য। বিশেষ করে শারীরিক অভিনয় রীতির ক্ষেত্রে বাদল সরকার অনেকাংশে শেখনারের কাছে ঋণী। কিন্তু অন্য বহু ক্ষেত্রে নিয়েও বলা যায় বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের প্রয়োগরীতি শেখনার অপেক্ষা নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র। বাদল সরকার শেখনার-এর শরীরী অভিনয়ের বেশ কিছু অংশগ্রহণ করলেও শেখনার যেভাবে তাঁর থিয়েটারে শরীরী অভিনয়ে গণ উন্মাদনা গড়ে তুলতে চান এবং তার জন্য প্রয়োজনে যৌনতা ও নগ্নতাকে কাজে লাগান, বাদল সরকার সে পথে হাঁটেননি। বাদল সরকার এই ধরনের গণউন্মাদনার চেয়ে দর্শকের চেতনার বিকাশকেই প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিয়েছেন। বাদল সরকার শেখনারের কাছ থেকে শারীরিক অভিনয়ের প্রক্রিয়ার জোরটুকু গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর প্রয়োজনায সেগুলিকে সম্যক ব্যবহারের অনুশীলন করেছেন। কখনই তাঁর মতো শরীর সর্বস্বতা, যৌনতা কিংবা নগ্নতায় অভিনেতার শরীরকে ব্যবহার করেননি।

শেখনারের কাছে ফ্লেক্সিবিলিটি এনভায়রনমেন্ট ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ নাট্যের বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাদল সরকার শেখনারের থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর তৃতীয় থিয়েটারের তুলনা টানতে গিয়ে বলেছেন—

“... আমার কাছে Content-টা ভীষণ important, environmental theatre আমার কাছে important নয়। কাজেই একেবারে আগাগোড়া তফাৎ।”^{৯২}

সেই সঙ্গে বাদল সরকার একথাও বলেছেন—

“At the same time ওদের কাছে ঐ workshop process-টা, ওদের non-proscenium theatre করার অভিজ্ঞতা, তার approach-টা ওদের থিয়েটারে exercise-গুলো শেখা, work-shop games-গুলো অন্তত প্রাথমিকভাবে শেখা যার ফলে প্রয়োজনে আমি অদল-বদল করে নিয়েছি।”^{৯৩}

বাদল সরকার যে ধরনের থিয়েটার করেন তাঁর সঙ্গে শেখনারের থিয়েটারের কিছু মিল অবশ্য আছে। আর এই কারণে শেখনারের থিয়েটারকর্ম তাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু তিনি শেখনারকে নকল করেননি। যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন সেটা নিজের মতো করে তাঁর থিয়েটারে প্রয়োগ করেছেন।

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের প্রয়োগরীতির সঙ্গে মিল পাওয়া যায় আমেরিকার

আর এক নাট্যকার জুলিয়ান বেক (Julian Beck) ও জুডিথ ম্যালিনা (Judith Malina)-র লিভিং থিয়েটার-এর সঙ্গে। লিভিং থিয়েটারও শেখনারের এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার-এর মতোই শারীরিক অভিনয়ের উপর নির্ভরশীল। এই থিয়েটার অনেকটা পথ নাটকের মতো। এদের কাছে রাজনৈতিক মতাদর্শকে থিয়েটারের মাধ্যমে তুলে ধরাটাই মূল কথা। লিভিং থিয়েটারে কনটেন্ট ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বাদল সরকার এ কারণেই জুলিয়ান বেক ও জুডিথ ম্যালিনাকে খুব সম্মান করতেন। একটি সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার বলেছেন—

“... কতকগুলো Content based theatre যেখানে আমাদের সঙ্গে মিল আছে এবং সেই হিসেবেই ‘জুলিয়ান বেক’ লোকটাকে আমি শ্রদ্ধা করেছি, এ approach টাকেই আমি শ্রদ্ধা করেছি, ...”^{৯৪}

লিভিং থিয়েটারে যেভাবে জনসংযোগ তৈরি করা, মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের মধ্যে নিজস্ব দর্শনকে চারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়— সেখানেই বাদল সরকারের থিয়েটার তার অনেকটা কাছাকাছি। বাদল সরকার যেভাবে স্টেজ ছেড়ে দর্শকের সঙ্গে স্থান ভাগ করে নেওয়ার কথা বলেছেন, লিভিং থিয়েটারেও তাই। বাদল সরকার আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ১৯৭১ সালে কলকাতার এ.বি.টি.এ হলে ‘সাগিনা মাহাতে’র পরীক্ষামূলক অভিনয়ের সময় যেভাবে স্টেজ এবং অডিটোরিয়ামকে উপেক্ষা করে দর্শকের সমতলে নেমে এসে অভিনয় ক্ষেত্রটাকে ব্যবহার করেছেন তা অনেকটা লিভিং থিয়েটারের মতো। বাদল সরকার বলেছেন—

“The living Theatre is considered as the first principal initiator of the new theatre in America. The living Theatre very rarely uses theatre halls and even when it does, the distinction between the stage and the auditorium is completely ignored.”^{৯৫}

লিভিং থিয়েটারের সঙ্গে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের আঙ্গিকগত মিল বলতে গেলে ওইটুকুই। বাদল সরকার এ কারণেই বলেছেন—

“... ওদের একেবারে form-এর ব্যাপারটা আমেরিকান, অথবা Euro-American Situation-এর ব্যাপার। সেটা আমাদের ভারতবর্ষে একেবারেই applicable নয়, ...”^{৯৬}

লিভিং থিয়েটার রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করলেও তা শেষপর্যন্ত ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ী সংস্কৃতির চর্চিতচর্ষণ হয়ে পড়ে। তারা শারীরিক অভিনয়ের উপর জোর দিলেও বক্তব্যের বিক্ষিপ্ততার কারণে তাদের শারীরিক অভিনয়ও ক্রমে প্রয়োগের সার্থকতায় ব্যবহৃত না হয়ে শরীর সর্বস্ব হয়ে

পরে। লিভিং থিয়েটারের সঙ্গে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের তুলনা করতে গিয়ে দর্শন চৌধুরীর মূল্যায়ণ এ প্রসঙ্গে ভীষণ যুক্তিযুক্ত। তিনি লিখেছেন—

“বাদল সরকার এঁদের শরীরী অভিনয়ের বেশ কিছু অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্য কোনো দিকেই এঁদের তেমন কোনো প্রভাব বাদল সরকারে নেই। তার অঙ্গন মঞ্চের অভিনয়ে চাঁদা দেওয়া সদস্যদের নিয়ে সবশুদ্ধ খুব বেশি দর্শক অভিনয় দেখতে পেত না। ১৯৮০-এর দশকের পর থেকে তিনি সাধারণ মানুষের মাঝখানে, গ্রামাঞ্চলে, কারখানায় হাজার দর্শকের কাছে তাঁর নাটক ও নাট্যাভিনয় নিয়ে গিয়েছেন।”^{৯৭}

এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে বাদল সরকার লিভিং থিয়েটার থেকেও কিছু কিছু তাঁর থিয়েটারে নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাকে নকল না করে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার তাই বলেছেন—

“খুব একটা তফাৎ হবে না, এই যে Identify যদি আমাদের থিয়েটারকে করা হয়, জুলিয়ান বেক-র সঙ্গে হোক বা রিচার্ড থেটনার-এর environmental theatre-এর সঙ্গেই হোক, খুব ভুল করা হবে, আদান-প্রদান আমাদের কতকগুলো হয়েছে এবং সেই আদান-প্রদানে আমি উপকৃতই হয়েছি, কারণ খুব একটা অল্প বয়েসে তো আমার এতগুলো ঘটেনি তাই যেটা দরকার সেটা নেওয়া বা নিয়েও অন্যভাবে ব্যবহার করা, assimilate করা বা বদলে নেওয়া এটার অসুবিধে হয়নি।”^{৯৮}

এইসব বিদেশী থিয়েটারের সঙ্গে কোন না কোন দিক থেকে বাদল সরকারের থিয়েটারের সাদৃশ্য অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে নানা সময় নানা কারণে বাদল সরকার বিদেশে থেকেছেন আর সেই সূত্রেই এইসব বিদেশী নাট্যব্যক্তিত্ব ও তাঁদের থিয়েটারের কাজকর্ম দেখেছেন। ফলে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে সরাসরি এইসব বিদেশী থিয়েটারের একটা প্রভাব অনিবার্যভাবেই পড়েছে। কিন্তু এর বাইরেও বিদেশী আরো বহু থিয়েটার বা নাট্যব্যক্তিত্ব আছেন যাঁদের প্রভাব বাদল সরকারের থিয়েটারে না পড়লেও আঙ্গিকগত দিক থেকে সেগুলির সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বলতে হয় জার্মানির নাট্যব্যক্তিত্ব বার্টোল্ট ব্রেখট (১৮৯৮-১৯৫৬)-এর কথা। হিটলার শাসনের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রেখট দর্শকের সঙ্গে সংযোগ সাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি অবশ্য প্রসেনিয়াম মঞ্চকেই ব্যবহার করে এই চেষ্টা করেছেন। তিনি নাট্যাভিনয় চলাকালীন প্রায়শই দর্শকের মাঝে চলে যেতেন। নাটকের অভিনয় থামিয়ে রেখে দর্শককে

নাট্যভাবনার সঙ্গে যুক্ত হতে উৎসাহিত করতেন। দর্শন চৌধুরী লিখেছেন—

“অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকের মধ্যে চলে যান, দর্শক থেকে উঠে আসেন,
আবার অভিনয়কালে দর্শকের সঙ্গে অবিরাম সংযোগ রক্ষা করে চলেন।
এইভাবে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা
ব্রেখটের নাট্যপ্রযোজনায় দেখা যায়।”^{৯৯}

ব্রেখট-এর এই যে দর্শকের সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংযোগের চেষ্টা এটাই তো বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারে করেছেন। প্রয়োগের ধরণটা অবশ্যই আলাদা কিন্তু নাট্য আবেদনে কোনও ফারাক নেই। আর একজন নাট্যব্যক্তিত্বের কথা এ প্রসঙ্গে আসে, তিনি হলেন ব্রাজিলের নাট্যকার প্রযোজক আগাস্তো বোয়াল (জন্ম: ১৯৩১-২০০৯)। শুরু থেকে মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে এসেছেন তিনি। বোয়ালও প্রসেনিয়ামের বাঁধামঞ্চ ছেড়ে মুক্তমঞ্চ নেমে এসেছেন তাঁর নাটক নিয়ে। তিনি দর্শককে তাঁর নাট্যাভিনয়ের অংশ হিসেবে দেখেছেন। দর্শন চৌধুরী তাঁর নাট্যকর্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

“সেখানে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে, দর্শকও তাতে যোগ দেয়। আবার দর্শক
কী বলছে, কী চাইছে সে শুনে ও বুঝে তৎক্ষণাৎ অভিনেতার তাদের বক্তব্য
তৈরি করে বলতে থাকেন। দর্শক ও অভিনেতার মিলিত সংযোগে গড়ে উঠতে
থাকে নাটকের পরিবেশ।”^{১০০}

অর্থাৎ দর্শক-অভিনেতার পারস্পরিক যৌথ অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে নাট্যবিষয়ের নির্মাণ ও বিস্তারই হল বোয়ালের থিয়েটারের (Theatre of the Oppressed) আসল কথা। বাদল সরকার আগাস্তো বোয়ালের নাট্যপদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত যে হননি সে নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে নাটক নিয়ে দর্শকের সঙ্গে সংযোগ সাধন এবং তাদের সামাজিকভাবে সচেতন করার চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর তৃতীয় থিয়েটারের সঙ্গে শৈলীগত সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

বাদল সরকার প্রবর্তিত তৃতীয় থিয়েটারের নাট্য আঙ্গিক নির্মাণে বিদেশী এইসব থিয়েটার প্রত্যক্ষ হোক কিংবা পরোক্ষভাবে হোক নিঃসন্দেহে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বলে রাখা দরকার, সেগুলিকে তিনি অনুকরণ করেননি। বিদেশের এইসব নাট্যব্যক্তিত্ব ও থিয়েটারের কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করলেও ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তিনি সেগুলি কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর থিয়েটারের সঙ্গে এইসব থিয়েটারের সাদৃশ্য কি, এর উত্তরে বাদল সরকার বলেছেন—

“সেটা ‘গ্রোটোস্কি’, ‘থেন্টনার’, ‘উইলিয়াম বেথ’ যারই হোক না কেন মিল

বলতে গেলে কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না, আমি আমার ভারতবর্ষের কতকগুলো আর্থ-সামাজিক অবস্থাতে, রাজনৈতিক অবস্থাতে একটা particular theatre আমরা বেছে নিয়ে করছি, এটা একেবারেই আমাদের এখানকার।”^{১০১}

তিনি আমাদের স্পষ্ট করেই বলেছেন বিদেশী নানা থিয়েটারের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তাঁর তৃতীয় থিয়েটার একেবারেই আমাদের এখানকার। অর্থাৎ বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের আঙ্গিকের সাদৃশ্য যদি খুঁজতেই হয় তাহলে আমাদের এদেশের লোকনাট্য, যাত্রার সঙ্গেই খুঁজতে হবে। এই আলোচনায় প্রবেশের আগে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রথমেই লোকনাট্য এবং যাত্রার মতো দেশজ অভিনয়রীতির স্বরূপ দেখে নেব।

নাট্যকলার প্রাচীনরূপ হল লোকনাট্য। সাধারণভাবে বলা যায়, লোকসমাজের দ্বারা রচিত ও অভিনীত লোকসমাজের জন্য লোকসমাজের নাটকই লোকনাটক। গ্রামীণ সমাজে লোকসাধারণের জীবন অবলম্বন করে এটি গড়ে ওঠে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

“গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয়, তাই লোকনাট্য।”^{১০২}

লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনির ওপরই অনেকাংশ নির্ভরশীল। আর সেই কারণে তা সংহত সমাজের কাছে আদৃত হয় বহুল পরিমাণে। কিন্তু কখনো কখনো পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক বিষয়ও লোকনাট্যে স্থান পায়। যেমন— রামায়ণ অবলম্বনে কুশান কিংবা রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রার মতো লোকনাটক। এগুলো তো পৌরাণিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। আসলে লোকজীবনের নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কার ভাবনা থেকেই লোকনাট্যের উৎপত্তি। অঞ্চল বিশেষের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিশেষ বিশেষ লোকনাট্যের জন্ম এবং তাঁদের দ্বারাই তার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। তাই স্থান, কাল, পরিবেশ, পরিস্থিতি, সামাজিকতা ভেদে লোকনাট্যের বৈচিত্র্য দেখা যায়। মূলত গীত-নৃত্য-বাদ্য এবং সংলাপের সমন্বয়ে গড়ে উঠে লোকনাট্য। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে স্থানিক লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকউৎসব ও পূজাপার্বণ। এদেশের লোকনাট্যের ধারা অনেক সমৃদ্ধশালী। বিষহরা, চোরচুম্বীর গান, পালাটিয়া গান, কুশান, হালুয়া-হালুয়ানি, আলকাপ, খন, ছৌ, সঙ, গম্ভীরা, লেটো, ভাদু, টুসু, রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, বেহুলা ভাসান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য লোকনাট্য। লোকনাট্যে নৃত্য ও গীত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে, তাই অনেক ক্ষেত্রেই লোকনাট্য লোকসঙ্গীত বা লোকগান নামেও পরিচিত। এইসব লোকনাট্যের নিজস্ব কিছু আঙ্গিক ও লক্ষণ আছে। সেগুলি

মোটামুটি এইরকম—

১. লোকনাট্য মূলত মৌখিক সংলাপ নির্ভর। পূর্ব নির্ধারিত কোন লিখিত নাট্যকাহিনিও এতে থাকে না। তবে গল্পটা থাকে। সেটা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ঠিক রেখে নিজের মতো করে সংলাপ তৈরি করে নাট্য কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একারণে নাট্যকাহিনি অনেক সময়ই দীর্ঘায়িত হয় এবং দেখা যায় সময়ের বাঁধাধরা ব্যাপারটা এখানে রক্ষিত হয় না।

২. প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত লোকনাট্যের অভিনয় হয় খোলা মঞ্চে। উপরে কখনো সামিয়ানা বা কখনো ত্রিপল দিয়ে ঢাকা থাকে। মঞ্চে কোন উপকরণের বাহুল্যতা থাকে না। এখানে কোন বাস্তবের ইলিউশন সৃষ্টির কোন চেষ্টা থাকে না। লোকনাট্যের চতুর্দিক অনাবৃত ও উন্মুক্ত থাকে। স্বল্পালোকে অথবা দিনের আলোয় অভিনয় হয় লোকনাট্য। সামান্য মেক-আপ এবং একটা দুটা বেঞ্চ কিংবা চেয়ার মঞ্চে রাখা হয় কখনো রাজা মন্ত্রীর সিংহাসন হিসেবে দেখানোর জন্য। অর্থাৎ নিরাবরণ, নিরাভরণ এবং নির্মদ নাট্যধর্মই হল লোকনাট্যের অন্যতম আঙ্গিক।

৩. অভিনয়স্থলটি মূলত হয় বৃত্তাকার। মঞ্চের মাঝখানে অভিনেতা-অভিনেত্রী, বাদ্যযন্ত্রী সবাই এক সঙ্গে বসে। সেখান থেকেই উঠে গিয়ে অভিনেতারা তাদের অভিনয় চালিয়ে যায়। অভিনয় শেষ হয়ে গেলে আবার ঐ স্থানে গিয়ে বসে। গোটা অভিনয় প্রক্রিয়াটি এইভাবে সম্পন্ন হয়। অবশ্য লোকনাট্যের প্রকার এবং স্থান বিশেষে মঞ্চের আকৃতি পরিবর্তিত হয়। উন্মুক্ত সমতল ভূমি মূলত মঞ্চায়নের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। যেমন, ‘কুশান’ লোকনাট্যের আসর বসে ফাঁকা মাঠে অথবা ‘খলান’-এর মাঝখানে যে কোন ধরনের ছাউনি দিয়ে। আবার ‘চোরচুন্নী’ গানে মঞ্চের কোন ব্যাপার নেই। কোন গৃহস্থ বাড়ির উঠানে বা বাড়ির সামনের জায়গায় নৃত্য ও গানের সহযোগে অভিনীত হয়।

৪. লোকনাট্যে কুশীলব সংখ্যা খুব সীমিত। লোকনাট্যে একজন অভিনেতা একই সঙ্গে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করে। সামান্য মেক-আপ পরিবর্তন করেই একজন অভিনেতা সেনাপতি থেকে মালি চরিত্রে অভিনয় করতে পারে। তাতে দর্শকের কোন অসুবিধা হয়না। কুশীলবদের মধ্যে লোকনাট্যে অন্যতম একটি চরিত্র হল ‘গীদাল’ মূল গায়ন। যিনি অভিনয় শুরুর আগে বন্দনা করে এবং গোটা নাট্যকে সে-ই পরিচালনা করে। তার সাজ পোশাক একবারেই সাধারণ, যেমন ধুতি, পাঞ্জাবি চাদর বা গামছা এই রকম সাধারণ পোশাকই ব্যবহার করে। প্রায় প্রত্যেক লোকনাট্যেই আকর্ষণীয় চরিত্র হিসেবে, একাধিক ‘ছোকরা’ বা ‘ছুকরি’ থাকে। মূলত পুরুষেরাই পরচুলা পড়ে মেয়েদের মতো শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ এবং সুউচ্চ বক্ষ বন্ধনী, হাতে চুড়ি এবং নিম্নমানের প্রসাধন সামগ্রী দিয়ে সেজে গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ করে আসর মাতিয়ে রাখে। বর্তমানে যুগের দাবী মেনে

লোকনাটকেও পুরুষের জায়গায় মেয়েরাই ছুকুরী সেজে নাচ-গান করে। এর পাশাপাশি লোকনাটো একটি মজাদার চরিত্র প্রায়ই থাকে, সেটা হল ভাঁড় চরিত্র। ভাঁড়েরা মাঝে মাঝেই গল্পের ভেতর ঢুকে পড়ে সমসাময়িক কোনো ঘটনাকে টেনে আনে। সেটা নিয়ে কিছু রঙ্গব্যঙ্গ করে লোক হাসাবার চেষ্টা করে।

‘গীদাল’ এবং অন্যান্য কুশীলবদের মূল সহায়ক হিসেবে থাকেন দোহার। নাটকের পালা চলার সময় এই দোহার নায়ক-নায়িকা বা অন্য কোন চরিত্রের ‘ধুয়া’ ধরে বা ‘দোহারকি করে। দর্শকের মনোরঞ্জননের জন্য ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, হাসি-ঠাট্টা চলতে থাকে।

৫. নৃত্য-গীত সহযোগে যেহেতু লোকনাট্য অনুষ্ঠিত হয় স্বাভাবিক ভাবেই নানারকম বাদ্যযন্ত্র এতে ব্যবহার করা হয়। আগে তাদের নিজেদেরই তৈরি করা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যেমন দোতরা, ঢাক খমক, খোল, বাঁশী, সারিঞ্জা ইত্যাদি দেশজ যন্ত্র ব্যবহার করা হত। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় কিছু নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্র স্থান করে নিয়েছে। যেমন হারমোনিয়াম, ফ্লুয়েট, ক্ল্যাসিওনেটের মতো আধুনিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্রীরা ‘গীদাল’ ও অন্যান্য কুশীলবদের সঙ্গে একসাথে অভিনয় স্থলের মাঝখানে বসেন।

৬. লোকনাট্যের অভিনয়রীতিতে দর্শকের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অভিনেতা অভিনেত্রীদের মতো লোকনাট্যের দর্শকরাও হয় সাধারণ। অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাদের মধ্যে বিস্তর কোন ব্যবধান থাকে না। লোকনাট্যের কুশীলবরা যেমন বেশিরভাগ দরিদ্র, নিরক্ষর হয়ে থাকেন দর্শকরাও তাদের মতোই সাধারণ। দর্শকরা পরিপাটি হয়ে পালা দেখতে আসেন না। বাড়ির কাছেই হয়তো কারও বাড়ির উঠানে পালা চলছে কাজ করতে করতেই হঠাৎ করে চলে গেলেন সেই পালা দেখতে। দর্শকের মাঝখানে যেহেতু অভিনয় চলে ফলে অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। তারা হতে পারেন নিরক্ষর কিন্তু কল্পনাশক্তিতে ভীষণ প্রখর। আর লোকনাটো এই কল্পনা শক্তিকেই কাজে লাগানো হয়। কল্পনায় তারা একটি সাধারণ কাঠের চেয়ারকে রাজসিংহাসন ভেবে নিতে পারে, এক রোগা অপুষ্টির শিকার গ্রাম্য অভিনেতাকে জমিদার ভেবে নিতে পারে। তাতে রসপিপাসায় কোন খামতি হয় না। কিছু কিছু ভ্রাম্যমান লোকনাট্য আছে যেখানে লোকনাট্য দলের সঙ্গে দর্শকও পিছু পিছু চলে যান। যেমন চোরচুনী গানের মতো কিছু লোকনাট্য আছে, যেগুলি একবাড়ি থেকে আরেক বাড়ি এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে দলবল নিয়ে চলে। অনেক সময় দেখা যায় চোর-চুনী গানের রসসাধন তৃপ্তির জন্য দর্শকও তাদের পিছন পিছন চলে। কীর্তনের ক্ষেত্রে এমনটাই দেখা যায়। গ্রামে নগরকীর্তনের দলের সঙ্গে সঙ্গে একদল লোকও অনেক সময় তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। অর্থাৎ এখানে অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং

দর্শক প্রায় একাকার। আর এখানেই লোকনাট্যে আসল শক্তি। এই শক্তিতেই যুগের পর যুগ ধরে এই ধারা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আজও টিকে আছে।

৭. লোকনাট্য মূলত ফ্রি থিয়েটার। আয়োজনে যেহেতু আড়ম্বর থাকে না ফলে খরচ অনেক কম হয়। ইলেকট্রিসিটি লাগে না। তাদের সামান্য আয়োজনে অভিনয় চলে। কোন অভিনেতা হয়তো অভিনয় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই, হাতে তালপাতার পাখা দিয়েই একটু বাতাস করে নিলেন। কখনো দর্শকের কাছ থেকে এক গ্লাস জল চেয়ে খেয়ে নিলেন। মঞ্চে সামান্য দু'একটা চেয়ার বা বেঞ্চ থাকে তা গ্রামের লোকেই যোগান দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ সেট, সেটিং প্রায় নেই বললেই চলে। স্বাভাবিকভাবে লোকনাট্যে খরচ খুব সামান্য। দর্শকদের টিকিট কাটার দরকার হয় না। লোকনাট্যের দলকে কারো কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয় না। লোকনাট্যের দলকে নতুন করে প্রয়োজনা করতে কোন প্রজেক্ট বা প্রোপোজালের দ্বারস্থ হতে হয় না। যদিও কিছু কিছু লোকনাট্যে একজন পৃষ্ঠপোষক থাকেন। একসময় কোন স্থানীয় জমিদার, জোতদার সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবার এই পৃষ্ঠপোষকতার কাজ করতেন। বর্তমানে অনেক সময় স্থানীয় পূজা কমিটিই লোকনাট্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে। তারা কিছু অর্থ লোকনাট্যের দলকে দিয়ে থাকেন। আর পাশাপাশি অভিনয় নাট্যকাহিনির অংশ হিসেবেই দেখিয়ে দর্শকের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। যেমন ধরা যাক শিষ্য তাঁর গুরুকে দান করতে চান কিন্তু তার কাছে অর্থ নেই; তখন সেই অভিনেতা ঘাড়ে গামছা বা চাদর পেতে উপস্থিত দর্শকের মাঝে গিয়ে ঘুরতে থাকেন। তখন সেই দুঃখ দেখে অশ্রুসজল দর্শক যে যার সাধ্য মতো সেই চাদর বা গামছায় অর্থ দান করে সাহায্য করেন। এইভাবে অভিনয় চলতে থাকে আর কিছু অর্থ সংগ্রহ ও চলতে থাকে। লোকনাট্যকে অর্থ সংগ্রহের এই রীতিকে 'মাঙন' বলা হয়। এই দিয়েই লোকনাট্যের দল রজনীর পর রজনী দিনের পর দিন অভিনয় চালিয়ে যায়। অভিনেতা-দর্শকের এই পারস্পরিক সংযোগই অভিনয় হয়ে ওঠে মানবিক। অভিনেতা এখানে রোজগার করতে আসে না, কারণ এটাকে তারা কখনোই জীবন-জীবিকার অঙ্গ হিসেবে দেখে না। যেটা করেন সেটা মনের আনন্দে। ফলে লাভ-লোকসানের হিসেব থেকে লোকনাট্য মুক্ত।

৮. লোকনাট্য মূলত ধর্মাশ্রয়ী। ধর্মকথা, দেবকথা, পুরাণকথা, বীরপূজা লোকনাট্যের বিষয়। তবে ধর্মাশ্রয়ী হলেও বাস্তব জীবনের নানা সমস্যাও তার মধ্যে উঠে আসে। আলকাপ, সঙ প্রভৃতি লোকনাট্যে প্রাচীন কাঠামোর মধ্যে তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে কিংবা গণতান্ত্রিক সরকারের নীতির বিরুদ্ধে কখনো কখনো ব্যঙ্গবিদ্রূপ ধ্বনিত হয়। বর্তমানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নানা ঘটনা ও অভিঘাতকে লোকনাট্যের

বঙ্গব্যাঙ্গের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করা হয়। চোর-চুন্নী গানে উঠে আসে সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা। পুরুলিয়ার ছৌ, বাহ্যিকরূপে ধর্মীয় মনে হলেও তা আদ্যন্ত রাজনৈতিক। তাদের দুঃখ, সংগ্রামের কথাই উঠে আসে ছৌ লোকনাটে। “আর গম্ভীরা, আলকাপ, লেটো, ধর্মপালা, সঙ— সেসব তো সরাসরি রাজনৈতিক।”^{১০০} অর্থাৎ লোকনাটে ভাবের অভিব্যক্তি যেমন আছে তেমনই আছে জীবনের শ্রম সচেতনতার প্রতিফলন। একদিকে ভক্তির ভাববিহীনতা আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা, হতাশা-সব মিলিয়ে লোকনাট্য গ্রামীণ মানুষের ভাব প্রকাশের এক অন্যতম নাট্যমাধ্যম। যেমন— কীর্তন। কয়েকশ বছর পর আজও গ্রাম আধা মফস্বলে নিয়মিত কীর্তনের আসর বসে। যেকোন কারণ ছাড়াই এক বা একাধিক লোক মিলে উদ্যোগ নিয়ে কীর্তনের আয়োজন করে। হাজার হাজার মানুষকে আবিষ্ট করে সেই উদ্যোগ। তারা হাসে-কাঁদে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। আর সেটা শুধু ধর্মীয় কারণ নয় বলে মনে হয়। বাচিক ও আঙ্গিক, অভিনয়, সুর ও তালের বিচিত্র চলন, নাচ, কথকতা, পৌরাণিক গল্পের ছাঁদে সমকালকে জুড়ে দেওয়া-পারফরম্যান্সের এমন শক্তি ছাড়া বোধ হয় একটা সম্ভব হত না।

৯. লোকনাটে শারীরিক অভিনয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। মূলত অভিনেতার বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, মুকাভিনয়, পদচালন, হস্ত সঞ্চালন প্রভৃতির মাধ্যমে অভিনয় ফুটিয়ে তোলা হয়। এগুলি কুশীলবরা নিজেরাই আয়ত্ত করে গুরু ধরে কারো কাছে শেখার দরকার হয় না। শারীরিক অভিনয় দিয়েই তারা দর্শককে হাসায়, ভাবায়, ক্রুদ্ধ করে তোলে, নীতিশিক্ষা দিয়ে থাকে। পুরুলিয়ার ‘ছৌ’ লোকনাট্য বীরভূমের রায়বেশে তো পুরোপুরি শারীরিক কসরৎ-এর উপর নির্ভরশীল। পায়ের সূক্ষ্ম কাজ, শরীরের বিভিন্ন অংশের সুচারু অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। দেহভঙ্গিতে আক্রমণ, প্রতিরোধ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি লক্ষণীয়। শরীরটা শূন্যে ভাসিয়ে আবার এক হাঁটু বা দুই হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়া, শূন্যে ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, হনুমানের অনুকরণে লাফ দেওয়ার মতো অসম্ভব সব শরীরী অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

১০. লোকনাটকের কাঠামোয় সাধারণ নাটকের মতো কোন ‘অঙ্ক’ বা দৃশ্য পর্বাক্ষ থাকে না। যেহেতু নাট্যকাহিনি অলিখিত ফলে নগরনাট্যের মতো অঙ্ক বিভাজনের ব্যাপার নেই। তবে লেখনীর শাসন না থাকলেও একটা অলিখিত শৃঙ্খলা থাকে। এক ধরনের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ শৃঙ্খলা আছে বলেই লোকনাট্য নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে, মন্তুর গতিতে এগিয়ে চলে।

লোকনাট্য বাদ দিলে এদেশের দেশজ অপর একটি অভিনয় ধারা হল যাত্রা। লোকজীবনের সঙ্গে লোকনাট্যের মতো যাত্রার দীর্ঘদিনের প্রাণের সম্পর্ক। যাত্রার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দর্শন চৌধুরী বলেছেন—

“সংস্কৃত অভিধানে উৎসব অর্থেই ‘যাত্রা’ শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ‘যা’-ধাতু থেকে উৎপন্ন বলে এর মধ্যে যাওয়ার ব্যাপারটা রয়েছে। এই গমন উপলক্ষেই উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হত বলে কালক্রমে উৎসব অর্থেই ‘যাত্রা’ শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে দেবমাহাত্ম্য শুধুমাত্র শোভাযাত্রায় নয়, একই স্থানে বসেই সবাই উপভোগ করত। ক্রমে দেবপরিক্রমা বন্ধ হল, কিন্তু এই ধরনের ধর্মানুষ্ঠান ‘যাত্রা’ নামেই প্রচলিত হল। কালক্রমে, এইরকম ধর্মোৎসবে নৃত্যগীতের সঙ্গে অভিনয়ের উপাদানগুলি যুক্ত হতে থাকে। এইভাবে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেবদেবীর কাহিনীকে নৃত্যগীত-সংলাপ এবং অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করাকেই ‘যাত্রা’ বলা হয়ে থাকে।”^{১০৪}

শুরুতে লোকনাট্যের মতো যাত্রাও খোলা আকাশের নীচে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে দর্শকের মাঝে অভিনয় হতো। ধর্মীয় বিষয়বস্তুই ছিল যাত্রার প্রধান অবলম্বন। কৃষ্ণলীলা, ব্রজলীলার পাশাপাশি রামযাত্রা, মনসার ভাসানযাত্রা এই সবই ছিল যাত্রার প্রধান বিষয়। তারপর সময়ের সাথে সাথে যাত্রার বিষয়বস্তু এবং অভিনয়রীতিতে ঘটেছে নানা পরিবর্তন। উনিশ শতকের প্রাক্‌মুহূর্তে নব্যবাবুদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে যাত্রায় উঠে এল কবিগান, ঝুমুর, খেউড়, হাফ আখড়াই-র মতো অসুস্থ, নগরজীবনের কুরুচিকর বিষয়বস্তু। এমনকি সে সময় কৃষ্ণযাত্রার ভক্তিরসও তরল উচ্ছ্বাস ও খিস্তি—খেউড়ের প্রভাব এড়াতে পারেনি। ব্রিটিশের সওদাগরি অফিসে কর্মরত নবোদ্ভূত নাগর সমাজ সারাদিনের কর্মক্লান্তির শেষে আমোদ-ফুর্তি চাইত। তাই দিনের বেলায় ধর্মকথা দিয়ে আরম্ভ হলে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যেত। সে সময় কিছু যাত্রামোদি মানুষ যাত্রার এই নিমজ্জন দশা থেকে মুক্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন। বিষয়বস্তুর পাশাপাশি উপস্থাপন পদ্ধতিতেও নানা পরিবর্তন এলো যাত্রায়। প্রাচীন যাত্রার ভক্তি আর ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলা নাটকের কারুণ্য এতে গ্রহীত হল। যাত্রার দেশজরস সংস্কারের সঙ্গে নতুন কালের রসপিপাসা মিশ্রিত হল। নতুন এই যাত্রায় এলো নানা বিষয়, বিলেতি থিয়েটারের অনুকরণে থিয়েটারি অভিনয়, পারস্পরিক সংলাপ, গানের কথা ও সুরের বৈচিত্র্য, ব্যায়বহুল সাজসজ্জা, উচ্চাঙ্গের রাগরাগিণী এবং পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে মনুষ্য চরিত্রও। ধীরে ধীরে যাত্রায় সঙ্গীত কমে অভিনয় অংশ বৃদ্ধি পেল। যাত্রা আর শোনার বিষয় নয়, যাত্রা হয়ে গেল দেখার বিষয়। অর্থাৎ সময়ে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা থিয়েটারের অনেক কাছাকাছি অবস্থানে চলে এসেছে। এখন যাত্রা, লোকনাট্য আর পরিশীলিত নাট্যের মাঝামাঝি শিল্পরূপ। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তি আর সিনেমা, নাটকের উপাদান গ্রহণ করে লোকভাষা, ধর্মাশ্রয়ী বিষয় বর্জন করে যাত্রা অনেকটা আধুনিক নাগরিক রূপলাভ করেছে।

আধুনিক যাত্রা একধরনের অতিনাটকীয় শিল্পকলা। এর নামকরণ থেকে সংলাপ উচ্চারণ, উপস্থাপন, আলোর কায়দা মেকাপ সবকিছু আড়ম্বরপূর্ণ।

লোকনাট্যের সঙ্গে যাত্রার পার্থক্য যাত্রার আধুনিক রূপের সঙ্গে। যাত্রার আদিরূপের সঙ্গে লোকনাট্যের তেমন কোন তফাৎ নেই। সেখানে উভয়েই নিরাবরণ, নিরাভরণ এবং দর্শকের সঙ্গে গভীর সংযোগ সাধনে সর্বদা সচেষ্ট। চিত্রপটের বদলে সেখানে চিত্রপটের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হত। যাত্রার মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন—

“আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে না। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।”^{১০৫}

যাত্রার এই জনসংযোগের ক্ষমতাকে হাতিয়ার করেই চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মভাবনা নিয়ে পথে নেমেছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মভাবনা নিয়ে পথে নেমেছিলেন। মহাপ্রভু বেশ কিছু সংস্কৃত নাটক থেকে কাহিনি নির্বাচন করে, যাত্রাগানে অভিনয় করেন বলে আমরা জানতে পারি। দর্শন চৌধুরী লিখেছেন—

“নদীয়ায় তিনি রুক্মিনীহরণ ও ব্রজলীলা অভিনয় করেন। নীলাচলে অভিনয় করেন ব্রজলীলা ও রাবণবধ পালা।”^{১০৬}

এইসব অভিনয় থেকে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি চৈতন্যদেব এই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর ধর্মভাবনা প্রচারের জন্য জনসংযোগের সুযোগ নিয়েছিলেন। বৃহত্তর জনগণের কাছে যাওয়ার জন্যই চৈতন্য গৃহবন্দী মঞ্চব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে খোলামঞ্চে জনতার কাছে গিয়ে অভিনয় করেছিলেন।

একই ভাবে যাত্রাগানের জনসংযোগের ক্ষমতাকে, তার আঙ্গিকে সফলভাবে কাছে লাগিয়েছেন চারণ কবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪ খ্রি:)। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তপ্ত পটভূমিকায় স্বদেশী মন্ত্রে অনুপ্রাণিত চারণকবি মুকুন্দ তাঁর যাত্রাগান নিয়ে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর ‘মাতৃপূজা’, ‘সমাজ’, ‘আদর্শ’, ‘পল্লীসেবা’, ‘সাথী’, ‘কর্মক্ষেত্র’ প্রভৃতি যাত্রাপালা পরাধীন দেশবাসীর মনে উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিল। এককথায় যাত্রাকে রাজনৈতিক চেতনার বাহন করে জাতির চিত্তকে জাগ্রত করার মহান ব্রত পালন করেছিলেন তিনি। যা স্বদেশী যাত্রা নামে পরিচিত। মুকুন্দ তাঁর স্বদেশ ভাবনা দর্শকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে নির্দিষ্ট কিছু কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। অভিনয় চলাকালে হঠাৎ অভিনয় থামিয়ে দিয়ে দর্শকের উদ্দেশ্যে

স্বদেশ মন্ত্র জাগানোর জন্য রসমধুর বক্তৃতা দিতেন। আবার বক্তৃতা থামিয়ে পুনরায় সেই অভিনয়ে ফিরে আসতেন। এই পদ্ধতিতেই তিনি দর্শকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন। দর্শক হয়ে উঠতেন অভিনয়ের অংশ।

দেশজ থিয়েটারের এই ধারাটির গুরুত্ব বুঝেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির প্রচলিত থিয়েটারের ঘরানা থেকে সরে এসেছেন। যাঁর প্রথম জীবনের স্বভাববাদী থিয়েটারে প্রবল সাফল্য তাঁর নাট্যচিন্তাকে বেঁধে ফেলতে পারেনি। বস্তুতঃ তাঁর নাট্যজীবনের শান্তিনিকেতন পর্ব (১৯০১-১৯১৫)-এর ‘শারদোৎসব’ (১৯০৮খ্রি:) থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের স্বতন্ত্র এই পথ প্রসেনিয়াম আর্চের বাইরে প্রসারিত হয়ে যায়। নাট্যঘর, উত্তরায়ণ, কোনার্ক-এ বা আশ্রকুঞ্জের আঙিনা ছাড়িয়ে চলে যায়। অনেকে অবশ্য এর জন্য শান্তিনিকেতনের বাস্তব পরিস্থিতিকেই অন্যতম কারণ মনে করেন। একথা ঠিক ওই একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় তাঁর বেশ কিছু প্রযোজনা করেছেন, যেগুলি প্রসেনিয়াম থিয়েটারের যাবতীয় বিষয়কেই মান্যতা দিয়েই অভিনীত। যেমন ১৯১৬-র জানুয়ারিতে জোড়াসাঁকোতে ‘ফাল্গুনী’ নাটকের অভিনয় কিংবা ১৯১৭-র অক্টোবরে ‘ডাকঘর’ নাটকের অভিনয় এগুলি প্রসেনিয়ামের বাঁধা মঞ্চেই অভিনীত হয় এবং প্রসেনিয়ামের যাবতীয় মঞ্চ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হয়। যদিও মঞ্চসজ্জায় খরচ কমানোর বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হত। আমাদের মনে হয় শান্তিনিকেতনে উপযুক্ত মঞ্চ ছিল না, উপকরণ পাওয়া যেত না, তাই শান্তিনিকেতনের নাট্যপ্রযোজনা এক রকম আর কলকাতার প্রযোজনা অন্যরকম হত, এই ধরনের যুক্তি খাড়া করে বিষয়টিকে লঘু করে দেখা চলে না। আশ্রমিক জীবনের উন্মুক্ত প্রতিবেশ নিশ্চিত ভাবেই তাঁর নাটকের ভঙ্গি ও বিষয়কে পাল্টে দিয়েছে, কিন্তু থিয়েটারকে বাঁধা মঞ্চের বাইরে এনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অভিনয়ের মূলে রয়েছে তাঁর থিয়েটার সংক্রান্ত সুগভীর ভাবনাচিন্তা। সচেতনভাবেই তিনি তাঁর নাট্যে প্রসেনিয়ামের বাইরে এদেশের লোকনাট্য-যাত্রা-কীর্তনের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। সেই অনুযায়ী নাট্য উপস্থাপনে এনেছেন নানা পরিবর্তন। বিশিষ্ট নাট্যপ্রাবন্ধিক অভিষেক বসু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“নিজের নাটককে যাত্রা কীর্তনের সমান্তরালে দেখতে চেয়ে কথা থেকে গানের সুরে, বা সংলাপের ভেতরের সুরে ক্রমশ ডুব দিচ্ছিলেন কবি, বাস্তবতাবাদের ছেঁদো যুক্তিতে কান না দিয়ে শারীরিক অভিনয় থেকে নাচের দিকে চলে যাচ্ছিলেন তিনি, আর বিষয়বস্তুর দিক থেকে নাটকের অন্তরে উঁকি দিচ্ছিল আনন্দময় গ্রামীণ যৌথতার স্বপ্নকল্প।”^{১০৭}

রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার নাট্যভাবনার সাক্ষ্য পাওয়া তাঁর ‘রঙ্গমঞ্চ’ প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন—

“বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্বীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য।”^{১০৮}

এই ধরনের থিয়েটারের দৃশ্যপট, মঞ্চ ব্যবস্থা সম্পর্কে এই সময় তাঁকে বিরূপ ধারণা পোষণ করতে দেখা যায়। দৃশ্যপটের ব্যবহার আসলে দর্শককে এক ধরনের ঠকানোর কৌশল বলেই তিনি মনে করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি এদেশের লোকানাট্য যাত্রার মতো কল্পনা শক্তির উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন—

“যাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য, আনন্দ করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে এত ঠকাইবার আয়োজন কেন? তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়িতে চাবিবন্ধ করিয়া আসে নাই। কতক তুমি বোঝাইবে, কতক তাহারা বুঝিবে, তোমার সহিত তাহাদের এইরূপ আপসের সম্বন্ধ। ... দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়— সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়।”^{১০৯}

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন এক্ষেত্রে আমাদের দেশের থিয়েটার অনেক বেশি মানবিক। আমাদের দেশজ থিয়েটারে বিলেতি থিয়েটারের মতো বাস্তবের বিভ্রম নেই। এখানে অভিনেতা ও দর্শক উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ যাত্রার প্রসঙ্গ টেনে তাই লিখেছেন—

“আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।”^{১১০}

রবীন্দ্রনাথ বিলেতি থিয়েটারের আড়ম্বরপূর্ণ মঞ্চসজ্জাকে জঞ্জাল মনে করেছেন। তিনি থিয়েটারকে সেই জঞ্জাল থেকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন থিয়েটার ব্যাপারটি হল বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল। ‘রাজা ও রাণী’র পরিবর্তিত নাট্যরূপ ‘তপতী’ (১৯ ভাদ্র, ১৩৩৬) নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

“অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মুক, মুঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায়

আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম
যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না।”^{১১১}

তিনি মনে করেছেন এদেশের দেশজ থিয়েটার সেই কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত। আয়োজনের অতিরিক্ত
ভার থেকে তা মুক্ত। সেখানে চিত্রপটের চেয়ে চিত্রপটই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সেই দিকটি লক্ষ্য
করে বলেছেন—

“আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ
হয় বটে কিন্তু পটের ঐক্যে মন সংকীর্ণ হয় না।”^{১১২}

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যকে দেশজ এই লোকনাট্য যাত্রা গানের আঙ্গিকে দেখতে চেয়েছেন। কলকাতার
প্রযোজনাগুলিতে হয়ত সেটা সর্বত্র রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু শান্তিনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথ
তাঁর নাট্যকে নিয়ে গেছেন এদেশের চিরপ্রচলিত লোকনাট্য-যাত্রার স্তরে।

বিভিন্ন আলোচনায়, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পারি দেশজ
লোকনাট্যের সঙ্গে বাদল সরকারের কোনদিনই প্রাণের যোগ ছিল না। একজন শহরবাসী শিক্ষিত
মধ্যবিত্ত-এর পক্ষে কোন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ছাড়া গ্রামীণ লোকনাট্যের মতো অভিনয়ধারার সঙ্গে
যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। শহরের মানুষ হিসেবে বাদল সরকার প্রথম দিকে প্রসেনিয়াম থিয়েটারকেই
বেছে নিয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার বলেছেন—

“আমি নগরনাট্যটা মেনে নিয়েছি, যাকে পরে দ্বিতীয় থিয়েটার বলেছি। কারণ
আমি নগরের লোক যেখানে থিয়েটার বলতে স্টেজই বোঝায় ...।”^{১১৩}

একই প্রসঙ্গে অন্য একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন—

“লোকনাট্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ভীষণ ভাবে কম। সুযোগ পেলেই দেখি,
আজও দেখি, সেটা অন্য কারণে। কিন্তু পরিচয়টা ভীষণ কম।”^{১১৪}

লোকনাট্য কিংবা যাত্রার সঙ্গে বাদল সরকারের পরিচয় সামান্য হলেও দেশজ এই অভিনয় ধারার
আঙ্গিক সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। বাদল সরকার তাঁর নাট্যজীবনের প্রথম পর্বে
থিয়েটার নিয়ে নানা চিন্তা ভাবনা করলেও দেশজ লোকনাট্য কিংবা যাত্রাগানের আঙ্গিকে যে
থিয়েটার প্রয়োগ করা যায় এই দিকটা ভেবে দেখেননি। দেশজ লোকনাট্য যাত্রার প্রতি বাদল
সরকারের আগ্রহ তৈরি হয় বিদেশের থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড-এ নাট্য দেখে। এই ধরনের থিয়েটারের
সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় লণ্ডনে থাকাকালীন, ১৯৬৭ সালে। এর কয়েক বছর পর দ্বিতীয়বার
প্যারিসে থাকাকালীন, ১৯৬৮ সালে। থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড আমাদের দেশের লোকনাট্য, যাত্রার
মতোই অভিনেতা ও দর্শকের সমান অংশগ্রহণে অভিনীত হয়। আমাদের দেশজ অভিনয় ধারার

সঙ্গে সাজু্য দেখে অভিভূত বাদল সরকার ২১.২.৫৮-তে মনুকে লেখা একটি চিঠিতে বাদল সরকার লিখেছেন—

“ ‘থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড’ আমাদের দেশের যাত্রার মতো মাঝখানে চত্বর হয়, চারিদিকে দর্শকরা বসে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকদের অত্যন্ত কাছে। পর্দা নেই, দৃশ্যপট নেই। ... বিনা উপকরণে শুধু অভিব্যক্তি আর অভিনয় দিয়ে দু’ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়ে রেখে দিলো। প্যাশান্ এমনভাবে অভিনয়ে ফোটানো যায় আমার ধারণা ছিল না।”^{১৫}

এই চিঠি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দেশজ লোকনাট্য, যাত্রার আঙ্গিকটা তিনি জানতেন, কিন্তু এই আঙ্গিক যে এভাবে থিয়েটারে প্রয়োগ করা সম্ভব তা তিনি থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড দেখে প্রথম বুঝতে পারলেন। প্যারিসে দ্বিতীয়বার এই একই পদ্ধতির থিয়েটার দেখে তিনি বুঝেছেন লোকনাট্য যাত্রা আঙ্গিকের মাধ্যমেই দর্শকের সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্ভব। ১৬.১২.১৯৬৪ সালের একটি চিঠিতে সেই উপলব্ধির কথা জানিয়ে মনুকে লিখেছেন—

“এবার মনে হলো, প্রচলিত স্টেজের থেকে এই মাধ্যমে দর্শকদের অনেক বেশি নাড়া দেওয়া যায়। সেট নেই, সাজসজ্জা নেই। তিনটে কেঠো টেবিল, ছ’টা কেঠো চেয়ার, দু’চারটে কাগজ ছাড়া আর কিছু নেই। অথচ মনে হোলো কয়েকটা জীবন্ত লোককে দেখছি। ... অভিনেতাদের দর্শকের এতো কাছে আসা যে সম্ভব, আগে যেন ধারণা ছিল না।”^{১৬}

এই অভিজ্ঞতাই আমাদের মনে হয় তাঁকে এদেশের লোকনাট্যে, যাত্রার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। আর সেই আগ্রহ থেকেই জওহরলাল নেহরু ফেলোশিপ (জুন, ১৯৭১-মে, ১৯৭৩)-এর সৌজন্যে ‘থিয়েটার অফ সিস্টেমিস অ্যাজ এ রুরাল আরবান লিঙ্ক’ প্রকল্পের কাজ শেষ করেন। গ্রাম-শহরের থিয়েটারের এই সম্মেলনের কাজ করতে গিয়ে লোকনাট্য, যাত্রার মতো দেশজ অভিনয় ধারার সঙ্গে বাদল সরকারের একটা সংযোগ তৈরি হয়। বাংলার ছৌ, গম্ভীরা, আলকাপ প্রভৃতি লোকনাট্য সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়। শুধু তো বাংলা নয় বাংলার বাইরেও যেখানে যেখানে তিনি গেছেন সেখানকার লোকনাট্য, যাত্রাগানের আঙ্গিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। পরিচিত হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের নৌটঙ্কি, বিহারের তামাশার মতো যাত্রাঙ্গিকের সঙ্গে। মণিপুরে গিয়ে তিনি ওয়ার্কশপ করেছেন আর মণিপুরী নৃত্য দেখেছেন এবং তার কলাকৌশল আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছেন। আবার আসামে গিয়ে বিহুর মতো জনপ্রিয় লোকনৃত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকারের সহকর্মী দীপঙ্কর দত্ত তাই লিখেছেন—

“একটা অন্যরকমের ইন্টার্যাকশন। আমরা তোমাদের নাটক শেখাচ্ছি, তোমরা আমাদের নাচটা শেখাও।”^{১১৭}

এভাবে বোধ হয় তিনি প্রথমনাট্য অর্থাৎ লোকনাট্যের সঙ্গে একটু একটু করে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। কীভাবে তিনি লোকনাট্যকে তাঁর থিয়েটারে প্রয়োগ করেছেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বাদল সরকার জানিয়েছেন—

“ডাইরেক্টলি নয়। ভাসাভাসা, একটা ধারণা থেকে করেছি। কখনও এগুলো দেখেছি, কিছুটা জানি, কিছুটা ধারণা, সব মিলে একটা আদল গড়ে তুলেছি। তাতে কোনো নাড়া বেঁধে শিক্ষার অভিজ্ঞতা নেই।”^{১১৮}

বাদল সরকার এখানে স্পষ্ট করেই বলেছেন লোকনাট্যের মতো দেশজ অভিনয় ধারার সঙ্গে সরাসরি কোন সম্পর্ক না থাকলেও তিনি তৃতীয় থিয়েটারে তার প্রয়োগ করেছেন। যার প্রথম প্রচেষ্টা এ বি টি এ হল ঘরের নির্মিত অঙ্গনমঞ্চে ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১ খ্রি: ‘সাগিনা মাহাতো’ যাত্রার মতোই চারিদিকে দর্শক বসিয়ে মাঝখানে একটা জায়গা বের করে শুরু করলেন অভিনয়। বাদল সরকার লিখেছেন—

“দর্শকরা মোটামুটি চারদিক ঘিরে বসেছিলেন। আমরা তাঁদের দেখতে পাচ্ছিলাম। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যেত তাঁদের। মধ্যে মধ্যে তাঁদের পাশে, তাঁদের পিছনে গেছি।”^{১১৯}

এই আঙ্গিক তো আমাদের চিরপ্রচলিত লোকনাট্য, যাত্রার আঙ্গিক। বাদল সরকার সেই আঙ্গিককেই এখানে প্রথম ব্যবহার করলেন। শুধু তাই নয়, সময় যত এগিয়েছে বাদল সরকার তত বেশি লোকনাট্য, যাত্রার আঙ্গিককেই ব্যবহার করেছেন তাঁর তৃতীয় নাট্যে। অঙ্গনমঞ্চের পর তিনি যখন বাঁধামঞ্চের বাইরে খোলা আকাশের নিচে সুরেন্দ্রনাথ পার্ক (কার্জন পাকে) তাঁর থিয়েটারকে নিয়ে গেলেন তখন সেটা অরো বেশি স্পষ্ট হল। আর কোনো নির্দিষ্ট হল ঘর থাকল না। একেবারে দিনের আলোয়, হাজার হাজার দর্শকের মাঝে শুরু করলেন নাট্যাভিনয়। ‘মিছিল’, ‘স্পার্টাকুস’, ‘মুক্তমেলা’ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সেই আঙ্গিকের ব্যবহার করলেন। থিয়েটার মানে তিনদিক ঘেরা একদিক খোলা আলোকিত আয়তক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে থাকা দর্শকের অন্ধকারে সন্নিবেশ নয়, প্রসেনিয়ামের মাপা মঞ্চ নয়, থিয়েটার হতে পারে দিনের আলোয়, যেখানে দর্শক সেখানে পৌঁছে যাবে থিয়েটার। এই ধারণারই এবার যথার্থ বাস্তবায়ন ঘটল তাঁর নাট্যে। সুতরাং এটা বলতে অসুবিধা নেই বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের মূলে রয়েছে আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত লোকনাট্য, যাত্রাগানের আঙ্গিক। যেখানে অভিনেতা-দর্শকের একটা গভীর সংযোগের মাধ্যমে অভিনয়টা সম্পন্ন হয়। বাদল

সরকার যে মুক্ত থিয়েটারের কথা বলেছেন, এদেশের লোকনাট্য প্রথমাবধি সবদিক থেকে মুক্ত। মঞ্চের জাঁকজমক থেকে মুক্ত, দৃশ্য, স্পষ্ট-লাইট থেকে মুক্ত, উন্মুক্ত মাঠে, রাতে কিংবা দিনের আলোয় যেখানে সেখানে লোকনাট্য অভিনীত হতে পারে। সেখানে দর্শকের টিকিট কেটে প্রবেশের ব্যাপার নয় তাই আর্থিক দিক থেকেও লোকনাট্যমুক্ত। অভিনয় চলাকালীন কখনো কখনো অভিনেতা যখন চাদর পেতে ধরেন দর্শকের কাছে, তখন দর্শক খুশি হয়ে যা দেন সেটা অভিনেতা সংগ্রহ করেন নেন। প্রাচীনকাল থেকে এই পদ্ধতিতেই কীর্তন, পালাগান গ্রামের সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করে আসছে। বাদল সরকার এই শ্রেণির দর্শকের কাছেই হাজির হয়েছেন তাঁর নাটক নিয়ে। আর বেছে নিয়েছেন সেই চিরপ্রচলিত লোকনাট্য, যাত্রার আঙ্গিকে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক অমিয় দেব বাদল সরকারের যে মূল্যায়ন করেছেন এখানে তা উল্লেখ করা যেতে পারে—

“... বাদল সরকার প্রসিনিয়ামে ক্লান্ত হয়ে আপন ভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত হতে

চাইছিলেন না, আপন ভূমিকেই আরো নিবিড় করে পেতে চাইছিলেন।”^{২০}

এদেশের মানুষ, এদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতই তাঁকে নিয়ে গেছে লোকনাট্য, যাত্রার দিকে। শুধু অঙ্গনমঞ্চ কিংবা মুক্তমঞ্চের আঙ্গিকেই নয়, নাটক রচনাতেও বাদল সরকার বারবার ফিরে গেছেন আমাদের দেশের লোকনাট্যের বিষয়বস্তুতে। অবশ্য লোকনাট্যের বিষয় যখন তিনি তাঁর নাট্যে তুলে আনছেন তখন সেটা আঙ্গিক হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। লোকনাট্যের সঙ্গে বাদল সরকারের এই সংযোগ লক্ষ করে নাট্যব্যক্তিত্ব মোহিত চট্টোপাধ্যায় এক আলাপ চারিতায় বলেছেন—

“আমার কেন জানি মনে হয় যে বাদলদার যে-নাটক — এই শেষের দিকের নাটকগুলোর কথা আমি বলছি, ভোমা/ইত্যাদি আরও অনেক নাটক আছে — সেখানে বাদলদার নাটকের যতটা লোকনাটকের দিকে ঝাঁক — মানে দূরত্ব বজায় রেখে — যতটা তিনি লোকনাটকের দিকে হেলে আছেন, ততটাই তিনি প্রোসিনিয়াম নাটক থেকে দূরে আছেন। ... অর্থাৎ তিনি প্রথম থিয়েটারকে ত্যাগ করে চলে এসে, দ্বিতীয় থিয়েটারকে ত্যাগ করে বলে এসে, প্রথম থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর একটা গোপন সম্পর্ক তিনি রক্ষা করেছেন, এইরকম আমার একটা মনে হয়।”^{২১}

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অনুধাবন যে কতটা সঠিক তা বাদল সরকারের কয়েকটি নাটকের উদাহরণ দিয়ে বোঝা যায়। যেমন তাঁর ‘লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’, ‘ভানুমতীকা খেল’, ‘রূপকথার কেলেকারী’, ‘ভোমা’, ‘ভুল রাস্তা’-র মতো নাটকগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ‘লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’ (১৯৭৪)

লোকনাট্যের আঙ্গিকে লেখা। পাঁচালীর চণ্ডি এখানে নেওয়া হয়েছে। লোকজীবনের কাহিনি থেকেই নাটকটি গড়ে উঠেছে। কবি গানের চঙেই কবির লড়াই-এর চাপান-উতোর জুড়ে দিয়ে নাটকটিকে উপভোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন—

“পচা।।...বলি ওহে কবির।

একটি কথা শুধাই তোমায় দাও দেখি উত্তর।

খুড়ো।। একটা কেন, দশটা শুধাও না! (গান: পাঁচালীর সুর)”^{১২২}

বোঝাই যাচ্ছে একেবারে কবিগানের চঙে এই সংলাপগুলি চরিত্রের মুখে বসিয়ে দিয়ে নাটকটি রচিত এবং সেইভাবেই অভিনীত হয়েছে। এই একই আঙ্গিকে রচিত ‘ভানুমতীকা খেল’ নাটকটি। এই নাটকে কবিগানের চঙে সঙ্গে রাস্তায় দেখানো মাদারিকা খেল-এর মজাটা জুড়ে দিয়ে নাটকটি জমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ‘রূপকথার কেলেকারী’ নাটকটিও কবিগানের আঙ্গিকে রচিত এবং অভিনীত। এরপর আবার রূপকথার গল্পের আঙ্গিকে লেখেন ‘হট্টমালার ওপারে’ (১৯৭৭)। আর এই লোক-আঙ্গিকের চূড়ান্ত প্রয়োগ দেখি তাঁর ‘ভুলরাস্তা’ (১৯৯২) নাটকে। একেবারে দেশজ লোক-আঙ্গিকে নাটকটি রচিত ও অভিনীত হয়। এইসব নাটকে লোক-আঙ্গিকের প্রয়োগ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দর্শন চৌধুরী তাই লিখেছেন—

“লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’, ‘ভানুমতীকা খেল’, ‘রূপকথার কেলেকারী’-এইসব নাট্যরচনা ও প্রযোজনার পথ রবেয়ে তিনি যখন ‘ভোমা’ কিংবা ‘হট্টমালার ওপারে’ পেরিয়ে ‘ভুল রাস্তা’য় এসে পৌঁছান, তখন দেখি সেখানে গঠনের বা আঙ্গিকের এবং বিষয় বিন্যাসের বুদ্ধিগ্রাহ্য কৌশল ছেড়ে একেবারে লোককথার আঙ্গিকে, লোকজীবনের পরম্পরায়, কখনও রূপকথার আশ্রয়ে নাট্যভাবনা উপস্থিত করতে থাকেন।”^{১২৩}

আসলে বাদল সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল জনসংযোগ। আর এই পথেই যে তা সম্ভব সেটা তিনি অনুভব করেছেন। তিনি শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জন্য থিয়েটার করতে চেয়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের কাছে লোকনাট্যের প্রতি যে আকর্ষণ তাতে করে ঐ আঙ্গিকের মাধ্যমেই যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ ও সুবিধাজনক। অতিচেনা, স্বাভাবিক জনজীবনের ঘটনা নিয়ে তিনি দর্শকের কাছে হাজির হয়েছেন। যেমন— লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’, ‘ভানুমতীকা খেল’, ‘রূপকথার কেলেকারী’, ‘ভোমা’, ‘ভুলরাস্তা’ কিংবা ‘চড়ুইভাতি’ (১৯৯৪) এইসব নাটক বলার সহজ পদ্ধতির জন্য দর্শকের অনুভবের মধ্যে সোজা ঢুকে যায়। অদ্রীশ বিশ্বাস এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

“এই নাটকগুলির প্রত্যেকটি যে লোক-আঙ্গিকে, তা নয়, কিন্তু লোক-আঙ্গিকের

চর্চা বাদলবাবুকে সেই সহজ পথটা, অন্তত নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তৈরি করে
দিয়েছে। এখানেই তাঁর পরম সিদ্ধি।”^{১২৪}

এইখানে এসে অনেকের মনে হতে পারে— মনে হওয়াটাই হয়ত স্বাভাবিক, থিয়েটার নিয়ে বাদল সরকারের এতদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল শেষে কিনা মিলে গেল লোকনাট্যে? তাই যদি হবে তাহলে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার কী ছিল। সরাসরি লোকনাট্যের মতো গ্রামীণ থিয়েটারই তো তিনি করতে পারতেন। এর উত্তরে আমরা বলতে পারি বাদল সরকার চাইলেই গ্রামীণ থিয়েটার তুলে আনতে পারতেন না। তিনি আদ্যন্ত শহরে লালিত। বাদল সরকার গ্রামীণ থিয়েটারের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাননি। দ্বিতীয় কথা হল, লোকনাট্য বা দেশজ অভিনয় ধারার আগ্নিকের সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার তাঁর দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্ট একটি স্বতন্ত্র থিয়েটার। বাদল সরকার আসলে লোকনাট্যের রিচুয়াল বা আচারধর্মিতাকে তাঁর তৃতীয় থিয়েটারে ব্যবহার করেছেন। যাকে তিনি বলেছেন থিয়েটারের উৎসমূল। বাদল সরকার বলেছেন—

“রিচুয়ালে নাট্যানুষ্ঠানটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। যেহেতু দর্শকের সক্রিয় ভূমিকা এই থিয়েটারের প্রধানতম গুণ, সেই হেতু নাট্যাভিনয়কে নাট্যানুষ্ঠান থেকে খুব একটা আলাদা করা যায় না। সেখানে একটি বিশিষ্ট অভিনেতৃগোষ্ঠী যদি থাকেও, তবে তাদের ভূমিকা হোলো দর্শককে নাট্যাভিনয়ের মধ্যে ঢুকতে সাহায্য করা।”^{১২৫}

এরপর তিনি বলেছেন—

“লোকনাট্যে দর্শকের ভূমিকা যথেষ্ট সক্রিয়, কারণ দর্শকের উপস্থিতিকে স্বীকৃতি দেওয়া লোকনাট্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং সেই কারণে নাট্যানুষ্ঠানই লোকনাট্যে সবচেয়ে বড়ো কথা।”^{১২৬}

বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারের অভিনয় পদ্ধতিকে সেই রিচুয়ালের স্তরেই উন্নীত করতে চেয়েছেন আর এটা করতে গিয়েই লোকনাট্যের আগ্নিককে ব্যবহার করেছেন। দেশের শ্রমজীবী, মেহনতি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ সাধনই যাঁর দার্শনিক ভিত্তি, সেই সব মানুষের সংস্কৃতিকে তাঁদের রিচুয়ালকে তো তাঁকে জানতেই হবে। স্বাভাবিক কারণে লোক উপাদান তাঁর নাট্যে আসবে। বাদল সরকার তাই লোকনাট্যের আগ্নিক আশ্রয় করে নাটকও লেখেন, কথকতার ঢঙে। পাঁচালীর ঢঙে, ‘লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’ নাটকের এমন নাম ব্যবহারও দ্বিধা করেন না। কিন্তু এই গ্রহণ তাঁর অন্তরে অনুকরণ হয়নি তা কখনো। বাদল সরকার যুক্তিবাদী মানুষ। তিনি যুগগত সমস্যাতে যুক্তির

আলোয় বিশ্লেষণ করেন। তাঁর কাজ সামাজিক অর্ধসত্য ও অসত্যগুলোকে তুলে দেখিয়ে দেওয়া। লোকনাট্যে যে ‘দেবদেবী-রাজা-রাজড়ার কাহিনি’^{২৭} আছে, ধর্মের যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পায় এবং তার ভেতর সংস্কারগুলোকে আঁকড়ে ধরার বিষয় থাকে, অনেকক্ষেত্রে যে মিথগুলো মানুষের জীবনে অমোঘ নিয়তি হিসেবে বাসা বাঁধে সে বিষয়ে বাদল সরকার তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল। অনেক সময় লোকনাট্যের আঙ্গিকই কেবল নয়, বিষয়কে গ্রহণ করেও তিনি অন্যমাত্রায় নিয়ে যান। ফলে লোকনাট্যের বিষয় তখন বাদল সরকারের বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আসে অর্থাৎ ঐ বিষয়কে গোঁণ করে অথবা ঐ বিষয়ের সাহায্যে মূলত যুগসমস্যায় ঢুকে পড়েন। ‘ভুলরাস্তা’ নাটকে তাই গল্প বলিয়ে ভিক্ষা করা চরিত্রটি রাজা-রাণীর গল্প দিয়ে শুরু করে বটে কিন্তু তার মধ্যে যেভাবে কমিশন খাওয়া বোর্ড প্রসঙ্গ এসে পড়ে তখন সেটা আর রাজা-রাণীর গল্প থাকে না। শেষপর্যন্ত রাজপুত্রকে ভুল রাস্তায় নিয়ে গিয়ে কাঠ কুড়ানী মা-ভাইয়ের সঙ্গে এক করে রাজা-রাণীর গল্পকেই প্রত্যাখান করে এ নাটক। ‘লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’ নাটকে কবিগানের চাপান উতোরের ঢঙে নাট্যকাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। তবে কবিগানের মতো আক্রমণ প্রতি আক্রমণের তীব্রতা নেই। কারণ নাটকের বক্তব্য-বিষয় একেবারে ভিন্ন। এই নাটকের পচাও খুড়ো দুটি চরিত্র। খুড়ো কোন সম্পর্ক বোঝাতে নয়, খুড়োর কলের মতো এই গণতন্ত্রের সিস্টেমগুলোকে ব্যঙ্গ করা হয়। খুড়ো তাই এই সিস্টেমের সমর্থনে সাওয়াল করে, অন্যদিকে এই সিস্টেমের শিকার হয়ে পচতে থাকা অতি সাধারণ মানুষ ‘পচা’ তার পেটের টানে প্রশ্ন করে। এই ভাবেই নাট্যকার লোকনাট্যের আঙ্গিকের ভেতরেই বুনে দেন তাঁর দর্শন এমনভাবে যা তাকেই অতিক্রম করে ভিন্ন নাট্যমাত্রা আনে। এখানেই বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার লোকনাট্য থেকে স্বতন্ত্র।

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার আসলে বথকিছুর সিঙ্গেলিস জাত একটি বিকল্প থিয়েটার। আমরা বুঝতে পারি প্রচুর অভিজ্ঞতার সিঙ্গেলিসের ফলেই তাঁর নিজস্ব দর্শন প্রকাশের উপযোগী একটা ফর্ম নির্মিত হয়। যে ফর্মের মাধ্যমে বাদল সরকার তাঁর বক্তব্যকে কনটেন্ট হিসেবে তুলে ধরেছেন। এই কারণে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের ফর্ম অনেক কিছুর সঙ্গে মেলেও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মেলে না। এক সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার বলেছেন—

“অনেক সূত্র থেকে যে সমস্ত জিনিস পেয়েছি, সব মিলিয়ে মিশিয়ে একটা কিছু ঘটেছে। অর্থাৎ কোনটাই যাকে তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া বা ‘গ্রাস্টিং’ বলে তা আমি করিনি।”^{২৮}

যেখানে যেমন পেরেছেন তিনি যেন মণিমুক্তা সঞ্চয়ের মতো করে সঞ্চয় করেছেন নাট্যকলার বিভিন্ন কৌণিক মাত্রা ও আঙ্গিক। থোটোস্কি, জুলিয়ান বেক, জুডিথ ম্যালিনা, রিচার্ড শেখনারদের

ভাবনা বহন করে বাদল সরকার তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন আমাদের দেশের দেশজ লোকনাট্য, যাত্রাগানের আঙ্গিক। দেশীয় এবং বিদেশীয় উভয় বিষয়কে আত্মীকরণের মধ্যে দিয়েই বাদল সরকার এক ভিন্ন নাট্যনির্মাণে পৌঁছেছেন। সে নির্মাণ তাঁর একান্তন্ত নিজস্ব। যদিও তিনি বলেছেন— “তৃতীয় থিয়েটার কোনও নতুন নাট্যশৈলীর পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা নয়, এ থিয়েটার একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটি দর্শন।”^{১২৯} কিন্তু সেই সঙ্গে বলতে হয় ঐ দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শনকে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য তিনি আঙ্গিকের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। থিয়েটার নিয়ে তাঁর এই নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলই হল তৃতীয় থিয়েটার। সেখানে অনেক কিছুর সঙ্গে মিল থাকলেও একটা স্বাতন্ত্র্য থেকে যায় যা একান্তভাবে বাদল সরকারকেই চিনিতে দেয়।

৫

বাদল সরকার তাঁর ‘থিয়েটারের ভাষা’ গ্রন্থে তৃতীয় থিয়েটার সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানান—

“... সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনই এই থিয়েটারের জন্মদাতা, এবং সেই কারণে বক্তব্যই এই থিয়েটারের উৎস এবং ভিত্তি। সেই অনুসারে তৃতীয় থিয়েটার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি, এবং এর প্রতিষ্ঠা একটা ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমেই হতে পারে;”^{১৩০}

তৃতীয় থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপ্তি যে একটা ব্যাপক আন্দোলনেই সম্ভব এটা বাদল সরকার উপলব্ধি করেছেন। আমরা লক্ষ্য করি জন্মলগ্ন থেকে তৃতীয় থিয়েটার কোনো আন্দোলনের রূপ পায়নি। প্রসেনিয়াম থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে একটা বিকল্প থিয়েটারের কথা বললেও তা কখনোই আন্দোলনের রূপ পায়নি। এ প্রসঙ্গে বিশাখা রায়, যিনি মীরা সরকার নামেই পরিচিত, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে বাদল সরকারের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। বিশাখা রায় লিখেছেন—

“১৯৬৩ সালে এবং ইন্ডিজিৎ লেখা হয়, বাকি ইতিহাস লেখা হয় ১৯৬৪-তে, *ত্রিংশ শতাব্দী*-র রচনাকাল ১৯৬৬, তথাপি রাজনীতিসচেতন নাট্য আন্দোলন গড়ে তুলবার কোনো ইচ্ছা বাদল সরকার প্রকাশ করেননি।”^{১৩১}

আমরা লক্ষ্য করি ১৯৭৩ সালে অঙ্গনমঞ্চে ‘স্পার্টাকুস’ কিংবা ‘আবু হোসেন’, ‘সাগিনা মাহাতো’-র মতো শ্রেণিসচেতন নাট্যসৃজন করবার পরও তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। আসলে থিয়েটারকে একটা আন্দোলনের স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সক্রিয় রাজনৈতিক মতাদর্শগত অবস্থান নেবার প্রয়োজন বাদল সরকার তখনও সেই অবস্থান নিতে পারেননি। একটা সময় প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন ঠিকই কিন্তু পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক শেষের পর বহুদিন বাদল সরকার প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বা সাংস্কৃতিক বামপন্থা থেকে নিরাপদ দূরত্বেই অবস্থান করেছেন। ‘বাকি ইতিহাস’,

‘ত্রিংশ শতাব্দী’ কিংবা ‘পরে কোনো দিন’ প্রভৃতি নাটকগুলিতে যুদ্ধবিরোধী, বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্র প্রসারবিরোধী তাঁর প্রতিবাদী অবস্থান তুলে ধরেন এবং সেই মতো নাটকগুলি প্রযোজনা করেন। কিন্তু নিজের দেশের অর্থনীতি-রাজনীতিতে পুঁজিবাদী শোষণ, আদিবাসী ও কৃষক বিদ্রোহের মতো গণ আন্দোলনকে দমণ করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির যে ক্রমবর্ধমান দমন-পীড়ন ও ফ্যাসিবাদী প্রবণতা তার বিরুদ্ধে তিনি সবার হননি। ১৯৭১ সালে লেখা ‘থিয়েটারি থিয়েটার: অঙ্গনমঞ্চ’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

“...সত্যিকারের থিয়েটারি থিয়েটার করতে গেলে দর্শক এবং অভিনয়শিল্পীকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসতে হবে, অর্থাৎ থিয়েটারকে ‘ঘনিষ্ঠ’ করতে হবে। ঘনিষ্ঠ করা যায় দুটি উপায়ে। এক— প্রেক্ষাগৃহ ছোট করে, যাতে কোনও দর্শকই শিল্পীর থেকে বেশি দূরে না থাকেন; এবং দুই— শিল্পীকে দর্শকের মধ্যে নামিয়ে এনে, যেটা করাবার প্রকৃষ্ট উপায় হল দর্শকদের চারিপাশে বসিয়ে মাঝখানে অভিনয় করা।”^{১৩২}

বাদল সরকারের এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনার মধ্যে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন দেখিনা। তখনও তাঁর তৃতীয় থিয়েটার দর্শক অভিনেতার ভাবের আদান-প্রদানকে ঘনিষ্ঠ করবার প্রয়োজনের গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিল। অঙ্গনমঞ্চে প্রবল সাফল্যে শতাব্দীর নাট্যকর্মীদের মধ্যে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তা ভাঁটা পড়ে। এমনকি শতাব্দীর যেসব নাট্যকর্মী ১৯৭৩ সালে স্পার্টাকুস-এর মতো নাটক তৈরি করে দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল তাঁরা প্রায় সকলেই দল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আসলে তাদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের দায়বদ্ধতা ছিল না। তাই শুধু শুধু শ্রম দিয়ে, সময় দিয়ে, বিনা পয়সায় বেশিদিন শতাব্দীর সঙ্গে থাকতে পারেননি। ফলে তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলন তখনও দূরঅস্ত। বরং অন্যরা চলে যাওয়ায় স্বভাবতই শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠী তথা বাদল সরকার একটা বাস্তব সংকটের মুখে পড়ে যান। এই অবস্থায় শতাব্দীকে নতুন করে গড়ে তোলার কথা তাঁকে ভাবতে হয়। শুরু হয় নতুন পথের সন্ধান। ঠিক তখনই সত্তরের দশকের উত্তাল সময়ের একদল দিগভ্রান্ত রাজনীতি সচেতন তরুণ-তরুণীর সঙ্গে বাদল সরকারের সংযোগ হয়। এইসব তরুণদের অনেকেই ছিল নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, যাঁরা বিপ্লবের চরমপন্থাকে জীবনের পাথেয় করে গণ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তারা ছিল নবীন স্বপ্নে ভরপুর। একটা তীব্র আবেগ তাদের চালিত করে। এই আবেগ ছিল সময়ের বাস্তব-অভিঘাত। তারা বিশ্বাস করেছিল পরিবর্তনের স্থায়িত্বে। তাই নতুন শতাব্দীর আসল জোর। এক সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

“প্রসেনিয়াম থিয়েটারে আমাদের যেটুকু সাফল্য অর্জন করেছিলাম, তখন যাঁরা ছিলেন, যাঁদের অভিনয়ের একটু নামটাম খবরের কাগজে রিভিউ-এ বেরোত— তাঁরা ‘শতাব্দী’কে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু আরও যাঁরা কোনোদিন থিয়েটার করবেনই না ঠিক করেছিলেন, মানে মাথাতেই ছিল না— ... আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অভিনয় করবার জন্য নয়— যে দল স্পার্টাকুস -এর মতো নাটক করে সেই দলের সঙ্গে আমি যুক্ত থাকতে চাই-এবং তারাই কিন্তু ঐ নতুন ‘শতাব্দী’র পুরো জোর।”^{১৩৩}

রাজনৈতিক আন্দোলনে যে শক্তি ছিলভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, সেই শক্তি এবার নিয়োজিত হল এক ভিন্ন ধারার থিয়েটার নির্মাণের কাজে। নতুন শতাব্দীর এক কর্মী যিনি নকশালবাড়ি আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বাদল সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়িবছর একসঙ্গে রকাজ করেছেন সেই বিশাখা রায় লিখেছেন—

“সময় থেকে ঝলসে বেরোনো নকশালবাড়ি আন্দোলনের তেজ গিলে নিয়ে আন্দোলনের শক্তি সঞ্চারের পথ সেদিন খোলা হয়েছিল। থিয়েটারে অজানা দিক নির্দেশ করবার প্রত্যয়ে আমরা স্থির ছিলাম। সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলি মিশে গলে আমাদের যাত্রাপথে। পথ হয়ে উঠল রাজনৈতিক।”^{১৩৪}

সাফল্য-সার্থকতার হিসেবিপনায় এতটুকু মাথা না ঘামিয়ে একটা যথার্থ রাজনৈতিক আবেগে এই যে তরুণ-তরুণীরা যারা নকশালবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্যেই সংস্কৃতির অন্য অর্থ আবিষ্কার করেছিল তারাই তৃতীয় থিয়েটারকে একটা আন্দোলনে পরিণত করার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। বাধা পথ ভাঙতে একটা অতিরিক্ত এনার্জির প্রয়োজন হয়, সেটা বাদল সরকার দু’হাত ভরে নিয়েছিলেন অন্য প্রজন্মের রাজনীতি সচেতন এই তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে। বাদল সরকার তাঁর শিল্পসৃজনের নিভৃত পরিসরটা এইসব নবীনদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। ফলে রূপান্তর ঘটাটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এক ঝটকায় ছিঁড়ে ফেললেন পুরনো পরিচয়। নকশাল আন্দোলনে খুন হওয়া, পিষে যাওয়া নবীন প্রাণের আর্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার শ্রমে নিজেকে নিয়োজিত করলেন তিনি। সেদিন তিনি এটা উপলব্ধি করেছেন পরিবর্তন ছাড়া অন্য পথ তাঁর জানা নেই। নবীন প্রাণের উপস্থিতি সেদিন বাদল সরকার এবং তাঁর নাট্যদল শতাব্দীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সুস্পষ্ট ভাবে শতাব্দী এই সময় একটা পক্ষ নিয়েছিল, শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর নাগরিক মনন এই সময় শ্রেণি সংঘর্ষের স্বপ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। বদলে যায় তৃতীয় থিয়েটারের গতিমুখ। ব্যক্তি বাদল সরকারও সেদিন স্থির করেছিলেন তাঁর অবস্থান। এই প্রথম তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক

মতাদর্শকে থিয়েটার চর্চার পুরোভাগে স্থাপন করলেন। এই রাজনৈতিক সংযোগই কিন্তু তৃতীয় থিয়েটারকে একটা আন্দোলনে পরিণত করেছিল। একটা রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে সংযোগেই তৃতীয় থিয়েটার অন্যমাত্রা পায়। সত্তরের দশকের উত্তাল সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনের অন্যতম গভীরতা। এই সত্য উচ্চারণ করতে গিয়ে বিশাখা রায় লিখেছেন—

“রাজনীতিই থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের অভিমুখ ছিল, রচনামূলক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের অভিপ্রায় ছিল না।”^{১৩৫}

এই রাজনৈতিক সংযোগের কারণেই মধ্যবিত্ত আশ্রয় বাদল সরকার ও তাঁর দল শতাব্দীকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। যুগে যুগে পিষে যাওয়া মানুষের চিৎকার, তাদের লড়াই, প্রতিবাদ জঙ্গলে-পাহাড়ে-ধান ক্ষেতের লড়াইয়ের একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার দায় সেদিন নিয়েছিল শতাব্দী। এই সময় থিয়েটারকে বাদল সরকার ও তাঁর দল শতাব্দী প্রান্তিক মানুষের দরজায় বা খুন হয়ে যাওয়া নবীন নকশাল তরুণ হৃদয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া স্থির করলেন। শুরু হল অনেকের সঙ্গে যৌথ পথচলা। পথ ভাঙার দুঃসাহসিক তেজে বাদল সরকার নিজেকে স্থিত করলেন। সেদিন বাদল সরকার এবং শতাব্দীর সদস্যরা ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা-নিরাপত্তা জলাঞ্জলি দিয়ে, দাঁত চেপে লড়াই করেছেন থিয়েটারকে প্রান্তিক মানুষদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। একটা বিশেষ কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে বাদল সরকার এই স্তরে পৌঁছেছেন। মূলতঃ ‘মিছিল’, ‘ভোমা’, ‘বাসি খবর’, ‘ভাঙা মানুষ’, ‘মানুষে মানুষে’ প্রভৃতি নাটকগুলির নির্মাণের মধ্য দিয়ে তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন হয়। এই সব নাটকগুলির নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলন গড়ে ওঠে। আমরা এবার সেই কর্মপ্রবাহের আলোচনা সূত্রে তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনের একটা রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলন প্রক্রিয়ার প্রথম প্রচেষ্টা হল ‘মিছিল’ নাটক। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৪-এর জানুয়ারি। এই নাটকটির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বাদল সরকার বলেছেন—

“সত্তর দশকের প্রথমে কোলাজে আঙ্গিকে কলকাতার ওপর একটা নাটক তৈরির ভাবনা আমার মাথায় এসেছিল। যেহেতু কলকাতা ‘মিছিল নগরী’ তাই যথাযথ নাম হিসেবে ওই নাটকটি তৈরি করার উপযুক্ত পথ হিসেবে ‘মিছিল’ নামটাই আমার উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। ঠিক তার আগের কয়েক বছরে বহু মানুষ কিশোর-কিশোরী পুলিশের হাতে গোপনে ও প্রকাশ্যে পশুর মতো নৃশংসভাবে খুন হয়েছিল। প্রত্যেক দিন খুন হয়ে যাওয়া একটা লোকের ছবি তাই আমার মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। আর সম্ভবত চরিত্রটিতে নিজেকে ভেবেই একটি বৃদ্ধ

বিদূষকের অস্পষ্ট ধারণা আমার মনের মধ্যে তৈরি হল।”^{১৩৬}

সত্তরের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিঘাতই যে ‘মিছিল’ নাটকের প্রেক্ষাপট, সেই বিষয়টি তিনি এখানে স্পষ্ট করেছেন। মিছিল নাটকের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলেছেন ১৯৯২ সালের দেশ পত্রিকায় সুরজিৎ ঘোষকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। তিনি বলেছেন—

“... ‘মিছিল’ নাটক যখন লেখা হয়, যাতে একটা ছেলে প্রত্যেক দিন মরছে,

এটার সঙ্গে ঐ ৭০-৭১ সালের সালের ঘটনাগুলোর যোগ খুবই প্রকট, ...।”^{১৩৭}

সত্তরের দশকের উত্তাল সময়ে শহর কলকাতার বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, সাংস্কৃতিক কর্মী, সকলেই কম-বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। সংবেদনশীল মানুষদের প্রতিক্রিয়া সেদিন ব্যক্ত হতে শুরু করেছিল। ‘মিছিল’ নাটক খুব প্রত্যক্ষভাবেই শহরের অভীষ্কার সঙ্গে যুক্ত। নকশাল আন্দোলন দমন করবার জন্য যে নৃশংস সম্ভ্রাস ঘটেছিল তা প্রত্যক্ষ করেছিল শহরের মানুষ। আঁতকে উঠেছিল সাধারণ মানুষের জমাট বাঁধা ভিড়। কারণ এই তাণ্ডবলীলার কোনো আচ্ছাদন ছিল না। শহরের রাজপথে খুন হওয়া লাশ পড়ে থাকত। আপাত বিরোধহীন সমাজমন ধাক্কা খায়। একটা ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এই সময় তৈরি হয়। তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলন ও ‘মিছিল’ নাটককে এই পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত করেই বুঝতে হবে।

‘মিছিল’ নাটকে আছে এক ‘বুড়ো’র নিভৃত কণ্ঠস্বর। যখন সে খুব ছোটো ছিল জানতে চেয়েছিল অদৃশ্য হওয়া মোড়ের পর কী আছে। ‘খোকা’ তাকে জানায় মোড়ের পর স্তূপ হয়ে পড়ে আছে খুন হওয়া দেহ। এর মধ্যে কোন কাল্পনিক তথ্য নেই। সত্তরের দশকে লাগাতার নকশালপন্থীদের ধরে ধরে রাস্তায়, জেলে, সংঘর্ষে খুন করা হয়েছে। পথঘাট ভরে গিয়েছিল তাদের রক্তে। খুন হওয়া লাশ নির্লজ্জভাবে মাটিতে পড়েছিল। ‘ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ’ গ্রন্থে বর্ষীয়সী স্বাধীনতা সংগ্রামী কল্যাণী ভট্টাচার্য লিখেছেন—

“১৯৭০ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কলকাতা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে একের পর এক পাঁচটি বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। সংবাদপত্র অনুযায়ী এবং পুলিশি ভাষ্য অনুযায়ীই এই গণহত্যাকাণ্ডগুলির যাঁরা শিকার হয়েছেন তাঁরা প্রায় সবাই ‘নকশালপন্থী’ অভিহিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সভ্য বা সমর্থক। ... এটাও পরিষ্কার যে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় এইসব নকশালপন্থীরা আততায়ীর হতে নিহত হয়েছেন।”^{১৩৮}

সময়ের এই ঐতিহাসিক সত্য প্রতিফলিত হয়েছিল বলেই ‘মিছিল’ নাটক শক্তিশালী। নাটকের

শুরুতেই দপ করে আলো নিভে যায়। মনে হয় যেন সবাই বিভ্রান্ত, সবাই স্তব্ধ। ভয়ানক এক বিপদ যেন ছেয়ে ফেলছে চারিদিক।

“এক।। কী হলো, আলো নিভে গেলো কেন?

দুই।। ফিউজ হয়ে গেলো নাকি সব?

তিন।। লোড্ শেডিং। এ যা হয়েছে না? প্রত্যেক দিন—

চার।। না না, সাবোতাজ্-কেউ তার কেটে দিয়েছে—

পাঁচ।। সাবধান! এই কিন্তু ছিনতাইয়ের মওকা—

... ..

ছয়।। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না, এ কী হলো?

[হঠাৎ একটা গগণভেদী আর্তনাদ, কেউ খুন হল যেন।]”^{১৭৯}

নাটকের ‘খোকা’ এক নাগাড়ে বলে চলেছে—

“খোকা।। আমি খুন হয়েছি। আমি। এই যে এখানে। আমি খুন হয়েছি। আমি!

আমি! এই যে-আমি! আমাকে মেরে ফেলেছে।... আমি! এই যে

এখানে— আমি— খুন হয়েছি— মরে গেছি— রোজ খুন হই—

রোজ রোজ খুন রোজ মৃত্যু রোজ—

[...গগণভেদী আর্তনাদে ফেটে পড়লো, পথে লুটিয়ে পড়লো খোকা।...]”^{১৮০}

সমগ্র মিছিল জুড়ে দেখা যায় ‘খোকা’কে খুঁজে বার করবার টান টান উত্তেজনা। সন্ত্রাসের হিংস্র কণ্ঠস্বর হুংকার দিয়ে বলে—

“কোটাল।। (প্রচণ্ড ধমকে) চোপ!

[সবাই থেমে গেলো একসঙ্গে]

কেউ খুন হয় নি, যাও বাড়ি যাও।”^{১৮১}

শাসকের আত্মসী হুংকার স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল মিছিলের ধ্বনি। যুগে যুগে এটাই প্রতিষ্ঠানের মুখ। সময়ের গর্জন বারবার চাপা দেবার চেষ্টা চলে। নাটকে দেখা যায় অনৈতিক পীড়ন দমবন্ধ করে দিয়েছে মানুষের। কোটাল হুংকার দিয়ে বলে, ‘বাজে কথা! মিথ্যে গুজব! বাড়ি যাও সব!’^{১৮২} ক্ষমতাকাঠামোর এই হিংসা সেদিন ‘খোকা’রা সহ্য করতে চায়নি। প্রভুর গুণ আছে, শক্তি আছে এই যুক্তিতে কোটাল বলীয়ান। ‘খোকা’ গ্রাহ্য করেনি এই দাপট। ‘মিছিল’ ছিল সেই খোকাদের প্রতিরোধের ভাষা, প্রতিবাদের সংকল্প। ‘খোকা’ শাসকের চোখে চোখ রেখে গর্জন করে বলে—

“আমি খুন হয়েছি, রোজ খুন হচ্ছি, রোজ খুন হবো— এটাই আসল কথা।

রাতের অন্ধকারে, দিনের গোলমালে, প্রত্যক দিন সে কথাটা তোমরা চাপা দেবার চেষ্টা করো। কিন্তু হবে না! আমি দেবো না চাপা দিতে! আপনারা দেবেন না চাপা দিতে!”^{১৪৩}

নকশাল আন্দোলন সফল হয়নি। তবুও এই শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল। দেশ জুড়ে উঠেছিল আলোড়ন। ‘মিছিল’ নাটকের পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে সেই রাজনৈতিক সক্রিয়তার কোলাহল। ১৯৭৪ সালের ২০ জুলাই কলকাতার কার্জন পার্কে যেখানে নিয়মিত সমাজ সচেতন নাটক চর্চা করা হত সেখানে প্রবীর দত্ত নামক এক তরুণ দর্শককে পুলিশ নির্মমভাবে প্রহার করে হত্যা করে। “কারণ, সে সব নাটক করেছিল অতিবিপ্লবী কিছু নকশালপন্থী দল, যারা অস্ত্র ধরার ডাক দিয়ে ডেলিবারেটলি ১৪৪ ধারা ভাঙে। ... পুলিশ মাঠে ঢুকে অত্যন্ত সাধারণ দর্শকের উপর লাঠি চালায় এবং প্রবীর দত্তকে খুন করে।”^{১৪৪} এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারা বাংলার মানুষ সেদিন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সাংস্কৃতিক কর্মীরা সম্মিলিতভাবে কার্জন পার্কে ‘মিছিল’ নাটকটি অভিনয় করেন। এই নাটকটিকেই সেদিন সমবেতভাবে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সম্মানসের বিরুদ্ধে ‘মিছিল’ নাটকটিই ছিল অন্যতম হাতিয়ার। প্রতিটি নাট্যকর্মী সেদিন অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত শক্তি কী, কেনই বা মিছিল বারবার ঘুরে আসে। একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিটি নাট্যকর্মী বিদ্রোহের সেই অন্তর্নিহিত শক্তিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। সেদিন খুন হয়ে পড়েছিল ‘খোকা’দের লাশ। তারা সেই স্পিরিটটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। পুরো নাটকটাই ঘুরে ঘুরে অভিনয় করা। মিছিল কখনো দর্শকের ঘাড়ের ওপর, কখনো দূরে। সমগ্র পরিকল্পনায় একটা জীবন্ত ভাব যুক্ত হয়েছিল। সমস্ত নাট্যগোষ্ঠী পরিবর্তনের দর্শনে আস্থা রেখেছিল বলেই এই পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছিল। ‘মিছিল’ নাট্যসৃজনের কথা বলতে গিয়ে বিশাখা রায় তাই লিখেছেন—

“নাটকের শুরুতে দর্শকদের এক এক করে হাত ধরে প্রবেশ করিয়ে একটা আঁকাবাঁকা বেগের মধ্য দিয়ে পথ ঘুরিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া হত। চমকে ওঠা দর্শক মুহূর্তে নিজস্ব ঘেরাটোপ থেকে বাইরে ছিটকে পড়তেন। ... *মিছিল* নাটকে ‘খোকা’-র পর পর কতগুলি মৃত্যুদৃশ্য তৈরি করা হয়েছিল। নিরাভরণ, প্রায় নিঃশব্দ ছিল সেই দৃশ্য। ‘খোকা’ ফাঁসিকাঠে ঝুলছে, ‘খোকা’ যুদ্ধক্ষেত্রে খুন হচ্ছে, ‘খোকা’ গ্যাসচেম্বারে দমবন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছে— এগুলি তৈরি করতে প্রয়োজন হয়েছিল সমগ্র শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর তন্ময় একাগ্রতা ও কল্পনাশক্তি। সেদিনের সমগ্র চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে সামাজিক দর্শনবোধ একটা মস্ত ভূমিকা

পালন করেছিল। এই শক্তিতে বলীয়ান হয়েই থার্ড থিয়েটার আন্দোলন দীর্ঘপথ পরিক্রমা করেছিল।”^{১৪৫}

বিশাখা রায় আরও লিখেছেন—

“ ‘খোকা’দের হারিয়ে যাওয়া সেদিন দগদগে ঘায়ের মতো লেপটে ছিল সমাজমনে। ‘খোকা’দের পথভ্রষ্ট করবার নানা মতলব বাতাসে ঘোরে। চোখ নাচিয়ে, গলা ফাটিয়ে লোক দেখানো হয়। হত্যা করা হয়। দায়িত্ব নেবার সামাজিক প্রশ্নটা একেবারে সামনে এসে পড়ে। *মিছিল* নির্মাণ করে নাট্যকার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, *মিছিল* অভিনয় করে নাট্যকর্মীরা দায়িত্ব নিয়েছিলেন, দর্শকরা গানের সুরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পুরো যাত্রাটাই ছিল রাজনৈতিক।”^{১৪৬}

এই রাজনৈতিক আদর্শবাদের জোরেই ‘রাতের অন্ধকারে, দিনের গোলমালে’^{১৪৭}, যে সত্যটা শাসক চাপা দিতে চায় সেই অভিসন্ধি শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠী সম্মিলিত ভাবে প্রতিহত করার শপথ নিয়েছিল। একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মিছিলের পরিক্রমায় নাট্যকর্মী থেকে দর্শক সকলেই সেদিন সামিল হয়েছিলেন। সেই পরিক্রমার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিশাখা রায় লিখেছেন—

“... নতুন বাড়ি-র স্বপ্নগাথা গলা ফাটিয়ে গ্রামে-গঞ্জে, রেল স্টেশনে, খোলা ড্রেন, বস্তির গলিতে বলে বেড়িয়েছিলাম। সাহস একটা জন্মেছিল। সেটাই ছিল আমাদের রাজনীতির শক্তি। ... পশ্চিমবাংলার কাপাসটুকুরী নামে এক প্রত্যন্ত গ্রামে *মিছিল* করতে যাওয়া হয়েছিল। নাটকের শেষে গানের সুর নিয়ে আমরা দর্শকদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম— একে একে সমস্ত নিরন্ন গ্রাম আমাদের সঙ্গে উঠে এল। ... আমরা হেঁটে চললাম। মিছিল উচ্চারণ করে—
বুড়ো।। কোথায় চললে?
খোকা।। মরতে। খুন হতে।
বুড়ো।। চলো, আমি তোমার পেছনে আছি।
খোকা।। পেছনে আছি মানে? পেছনে আছো কেন?
বুড়ো।। সামনে যাবার কথা ছিল। পারিনি। তার আগেই হারিয়ে গেছি। তাই
পেছনে আছি।”^{১৪৮}

সত্য এই স্বর। এই স্বর অন্বেষণ করাই ছিল তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনের লক্ষ্য। একটা বিশ্বাস সেদিন তাদের মনে জন্মেছিল যে সত্যিকারের সত্যি মিছিল একদিন আসবেই। একদিন পৌছে

যাবেন নতুন বাড়ি'র ঠিকানায়। সেই বিশ্বাসেই মিছিল নাট্যসৃজন হয়েছিল।

সময় যত এগিয়েছে তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনের তীব্রতা ততই প্রসারিত হয়েছে। ক্রমশঃ শহর ছাড়িয়ে থিয়েটারকে ‘বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া’-র^{৪৯} সংকল্প গ্রহণ করা হয়। বাদল সরকার ও তাঁর দল শতাব্দী পৌঁছে গেলেন দেশের বৃহত্তর প্রান্তিক মানুষের দ্বারা। শতাব্দীর নাট্যসৃজনে উঠে এল সেইসব প্রান্তিক মানুষের স্বর। যেমন— ‘ভোমা’ নাটক। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৫ সাল। নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় ১৯৭৬ সালের ২১ মার্চ সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া গ্রামে। ‘ভোমা’ নাটক শুরু হয়েছে অন্যকে জানাবার দায়বদ্ধতা দিয়ে। ভোমা উচ্চারণ করে—

“এক। আমি জানি।
দুই। কী জানো?
এক। আমি জেনেছি। আগে জানতাম না।
তিন। কী জানতে না?
এক। অনেক অনেক দিন কেটে গেছে না জেনে। এখন জেনেছি।
চার। কী জেনেছো?
এক। অনেক কথা। অনেক অনেক কথা।
পাঁচ। কী কথা?
এক। সে কথা এখনো অনেকে জানে না। যেমন আমি আগে
জানতাম না।
দুই। কী জানতে না?
এক। আমি বলতে চাই। যারা এখনো জানে না, তাদের বলতে
চাই।
তিন। কী বলতে চাও?
এক। অনেক কথা। ভোমার কথা।
চার। কে ভোমা?”^{৫০}

বাদল সরকার ভোমা নাটকের মুখবন্ধ-এ জানিয়েছেন—

“সুন্দরবন অঞ্চলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় রাঙাবেলিয়া গ্রামের হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক তুষারবাবুর কাছে। ভোমার গল্প তাঁর কাছেই শুনেছিলাম।”^{৫১}

কী ছিল সেই গল্প? ভোমা’ই বা কে? ভোমা নাট্যসৃজনের উৎস কী? বিশাখা রায় লিখেছেন—

“...মাস্টারমশাই বলে চলেছেন সর্দারপাড়ার ভোমা-র গল্প। সে জঙ্গল হাসিল

করেছিল। বাঘের সঙ্গে লড়েছিল। ভোমার বাপ, মা, ভাই কেউ তেঁতুলগোলা জল খেয়ে মরে গেছে, কাউকে কুমিরে টেনে নিয়ে গেছে। ভাত নেই, চারদিকে শুধু নোনা জল। ... ভোমা ভাত খাবে বাবু’ এই একটাই খরখরে চিৎকার ঢেকে ফেলল চারদিক। এরপর শুরু হয় আলোচনা। সম্মিলিতভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে কথাগুলো জরুরি, এই কথাগুলো ঘিরে-থাকা দর্শকদের জানাতেই হবে। ... ‘ভোমা ভাত খাবে বাবু’— খরখরে চিৎকার যেন ঘরের দরজায় এসে ঘা দিচ্ছে। আমরা স্থির করলাম এই জানাকে প্রকাশ করতে হবে। আগ্রাসী ক্ষমতা কাঠমোকে ধাক্কা মারতে হবে।”^{১৫২}

অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের প্রান্তিক মানুষের স্বর অনুসন্ধানই ছিল ‘ভোমা’ নাট্যসৃষ্টির মৌলিক তাগিদ। সত্তরের দশকের একদিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়াবহতা অন্যদিকে বাংলার খাদ্য-আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন সেই সময়কার অনেক সংবেদনশীল মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। মূলতঃ গ্রাম-শহরের অনৈতিক বিভাজনের প্রশ্নটা নগরকেন্দ্রিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল। নগর কলকাতায় পাতাল রেল তৈরি হবে, না কৃষিতে তিনটি ফসল ফলানোর উপযোগী জলের ব্যবস্থা করা হবে, উন্নয়নের মাপকাঠি কি শুধুমাত্র শহরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে না, কৃষিপ্রধানদেশের মৌলিক সমস্যার সঙ্গে তাকে যুক্ত করা হবে? সত্তরের দশকে ‘গ্রাম দিয়ে শহর ঘোরো’ এই শ্লোগান মূলত প্রান্তিক মানুষের ভাতের অধিকারের প্রতি দিক নির্দেশ করে। নকশালবাড়ি আন্দোলন চলে আসা ধারণাগুলিকে সরাসরি নস্যাৎ করতে শুরু করে। প্রশ্নগুলি সেই সময়ের নতুন প্রজন্মের কাছে নতুন ভাবে হাজির হওয়ায় উত্তর খোঁজবার পদ্ধতিতেও নতুন সুর, নতুন বুদ্ধিমত্তা এবং দায়বদ্ধ আবেগ সংযোজিত হবার সম্ভাবনা তৈরি হল। সমাজমন ও ব্যক্তিমন সেদিন দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার কোন সুযোগ পেল না। এই দায়বদ্ধতাই বাদল সরকারসহ তাঁর দল শতাব্দীকে নিয়ে গেছে চব্বিশ পরগণার ভাদুরিয়া গ্রামে, সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া গ্রামে, ভোমার কাছে। তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন চারদিকে খেতে না পাওয়া নিরন্ন ভোমাদের হাহাকার। তাদের কণ্ঠনালী ঘিরে দপদপ করছে ভাত খাবার আকাঙ্ক্ষা। তারা “যুঁইফুলের মতো সাদা গরম ভাতের স্বপ্ন”^{১৫৩} দেখে। কিন্তু ভাত জুটবে কীভাবে? অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তো অন্যায় বিভাজন। ভোমা নাট্যসৃজনের মধ্য দিয়ে সেই বিভাজনের অন্যায় আগ্রাসন তুলে ধরা হয়েছে।

“এক।। শুনুন শুনুন— আমি আজ আপনাদের একটা গল্প শোনাবো!

[গল্পটা চলতে থাকবে। ওরা নিজেদের তালে গুণগুণ করে গাইবে আর নাচবে।]

একটা ছোট গ্রাম, গ্রামের নাম ভাদুরিয়া, অঞ্চল শিমুলপুর, জেলা চব্বিশ পরগণা, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, দেশ ভারতবর্ষ। গ্রামে আড়াইশো পরিবার, তার ষাটটা পরিবারের জমি তিন বিঘের কম, নব্বইটা পরিবারের কোনো জমিই নেই, তারা পরের জমিতে জন খাটে, দিনে চার টাকা মুজরি পায়। এক একটা পরিবারে পাঁচ ছয় দশজন পোষ্য, চার টাকা রোজে চাল জোটে না, গম, তা রুটি বানানো পোষায় না, জলে আটা গুলে নুন দিয়ে রাঁধলে কম আটা বেশিক্ষণ পেটে থাকে। ..., আজকাল তবু নলকূপের কল্যাণে কিছু রবিশস্য গম বোরোধান হচ্ছে তাই ফাল্গুন থেকে বৈশাখও কিছু কাজ জোটে, কিন্তু ইলেকট্রিসিটি নেই, ডিজেল পাম্প, তা ডিজেল মেলে না, সার মেলে না, সারের দাম দ্বিগুন হয়ে গেলো, ...

দুই।। রাস্তায় জল জমছে প্রতি বছর, কলকাতা গ্রাম না শহর?

তিন।। কলকাতায় আজও কম্পোজিট স্টেডিয়াম হোলো না, ছি ছি ছি!

চার।। হুগলি নদীর দ্বিতীয় সেতু নিয়ে খালি টালবাহানা, কবে কাজ হবে?

পাঁচ।। পাতাল রেল কলকাতায়-ভারতে প্রথম, কিন্তু হচ্ছে কই?

[প্রত্যেকে কথা শেষ করেই নাচে ফিরে যাচ্ছে।]

এক।। শুনুন শুনুন, আমার গল্পটা শেষ হয় নি। ইলেকট্রিসিটি নেই, কিন্তু খুঁটি আছে তার আছে— আজ তিন বছর। ... যদি ইলেকট্রিসিটি আসে, যদি খালটা সংস্কার হয়, যদি আরো নলকূপ বসে— মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ, তবে সোনা ফলে যাবে...

দুই।। দ্বিতীয় সেতু— কবে হবে?

তিনি।। স্টেডিয়াম— কবে হবে?

চার।। পাতাল রেল— কবে হবে?

...

দুই।। দ্বিতীয় সেতু মাত্র ষাট কোটি টাকা—

তিন।। সি-এম-ডি-এ গর্ত খুঁড়ে মাত্র দু'শো কোটি টাকা—

চার।। পাতালরেল মাত্র তিনশো কোটি টাকা—

এক।। মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা, আমি হিসেব করে দেখেছি— ... দান চাই না, ধার দিন। ব্যাঙ্কের সুদে, চোদ্দ, পার্সেন্ট সুদে ধার দিন, ফসল তুলে সুদ শুদ্ধ শোধ করে দেবে চাষী, সোনা ফলে যাবে, ক্ষেতমজুর সারা বছর কাজ পাবে, মজুরি বাড়বে—”^{১৫৪}

গ্রাম-শহরের এই অন্যায় বিভাজন সেদিন বাদল সরকার ও তাঁর শতাব্দী নাট্যদলকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। গ্রাম-শহরের অসম বিভাজনের মাপকাঠিতে তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন

ভোমাদের ক্ষুধা ও প্রান্তিক মানুষের সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করার। একই সঙ্গে স্বপ্ন দেখেছিলেন পরিবর্তনের। শুরু হয়েছিল তুমুল এক কর্মযজ্ঞ। সরকারি পরিসংখ্যান, সমীক্ষা, নানা রিপোর্ট সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে, কৃষক, বিদ্রোহের নানা ইতিহাস অধ্যয়ন করা প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকার মর্মান্তিক রাজনীতি, কৃষিপ্রধান অর্থনীতির মৌলিক ভিত্তিটা কী তা অনুধাবন করার চেষ্টা— সবই ছিল এই সৃজন প্রক্রিয়ার অঙ্গ। ভোমা কে? কে ভোমা? এই অনুসন্ধানের মধ্যে প্রতিটি থিয়েটারকর্মী সম্মিলিত ভাবে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই সৃজনপ্রক্রিয়ায় সেদিনের প্রতিটি থিয়েটারকর্মী প্রান্তিক মানুষ ভোমার স্বর আয়ত্ত্ব করার চেষ্টা করেছেন। তার জন্য সমস্ত দলকে একমুখী ও কঠোর পরিশ্রমী হতে হয়েছিল। দিনের পর দিন ধরে চলে বিভিন্নরকম ওয়ার্কশপ। প্রতিটি থিয়েটারকর্মীকে ভেঙেচুরে আবিষ্কার করতে হয়েছে নিজ পরিচয়। কেমন ছিল সেই সৃজনপ্রক্রিয়া? আবারও আমরা বিশখা রায়ের স্মৃতিচারণা এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। কারণ এই সৃজন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলেছেন—

“শরীর ছিল আমাদের সম্পদ। আমাদের নাট্যসৃজনে দেহের পূর্ণ প্রয়োগ করা ছিল জরুরি। দেহবল্লরী আছড়ে পিছড়ে আমরা তৈরি করেছি ধান ক্ষেতে বয়ে যাওয়া হাওয়া, ভেঙে পড়ে যাওয়া যন্ত্র, বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে সর্বনাশ হয়ে যাবার কান্না, বোমার আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হওয়া মাতা ধরিদ্রী। বিকলাঙ্গ শিশুর মিছিল হানা দিয়েছে, ধাক্কা মেরেছে দর্শকদের স্তম্ভিত হয়ে যাওয়া মুখে। কিছুই যেন বাদ দেওয়া হয়নি। এক অবিশ্বাস্য এনার্জি উৎসারিত হয়েছিল ভোমার অঙ্গন থেকে। এই শক্তিই দিকনির্দেশ করেছিল।”^{১৫৫}

তিনি আরও লিখেছেন—

“পুরো প্রবাহটাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক। ... দীর্ঘ অনুশীলন প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে যে আস্থা উৎসারিত হয়েছিল সেটাই থার্ড থিয়েটারের ভবিষ্যৎ গতিমুখ নির্ধারণ করে দিয়েছিল। থিয়েটারের ইতিহাসে এর মূল্য অপরিমিত। ভোমা সৃজন করা না গেলে ভিন্ন থিয়েটারের আন্দোলন কতদূর যেতে পারত সে ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ আছে। বিরুদ্ধ স্বর ধরে রাখতে গেলে একটা শক্তির কেন্দ্র প্রয়োজন হয়। ভোমা ছিল আমাদের শিকড়।”^{১৫৬}

একটা তীব্র আবেগ সেদিন যুক্ত হয়েছিল এই সৃজন প্রক্রিয়ার সঙ্গে। থিয়েটারের জন্য তাঁরা ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। ভোমার চোখে আগুনের ঝড় জাগাতেই হবে এটাই ছিল তাঁদের সেদিনের শপথ। বাদল সরকার ও তাঁর শতাব্দী নাট্যদলের প্রতিটি কর্মী

সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন—

“হ্যাঁ হ্যাঁ, এই পৃথিবীটার মালিক তো আমরা সবাই, তাই না ভোমা? আমরা সবাই যদি প্রাণপণে খেটে সব কিছু বানাতাম, বানিয়ে সবাই মিলে ভাগ করে নিতাম, তাহলে ঐ আজব ছবিটা-যার জোরে ভোমা তোমার রক্ত আমরা কিনে খাই, আর যার অভাবে তুমি ভাত পাও না, ঐ আজব অশ্লীল ছবিটার পাট জন্মের মতো চুকিয়ে দিয়ে—আমি বোঝাতে পারছি না ভোমা! শুধু বুঝতে পারছি—তুমি কুড়ুল হাতে উঠে না দাঁড়ালে এই বিষাক্ত গাছের জঙ্গল হাসিল হবে না ভোমা! আমার আবাদ, আমাদের আবাদ— আমাদের স্বপ্নের আবাদ—”^{১৫৭}

এটাই ছিল সেদিনের সক্রিয় রাজনীতি। এই সক্রিয় চেতনাই শতাব্দীকে নিয়ে গেছে প্রান্তিক মানুষের কাছে। রূপান্তরের প্রতি সেদিন গভীর আস্থা রাখা হয়েছিল, ভোমা নাট্যসৃজন ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শতাব্দী নাট্যদলের কর্মীরা এটা বিশ্বাস করেছিলেন একদিন ভোমারা ঠিক রুখে দাঁড়াবে। শতাব্দীর এই রাজনৈতিক সক্রিয়তার কথা বলতে গিয়ে বিশাখা রায় খুব স্পষ্ট করে বলেছেন—

“সুস্পষ্ট ভাবে আমরা একটা পক্ষ নিয়েছিলাম, একটা বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন থেকেই আমরা স্বপ্ন আহরণ করেছিলাম। সাম্যবাদকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। যুক্তিগতভাবেই বাদল সরকার বা থার্ড থিয়েটার আন্দোলন দেশ কাল রহিত কোনো ব্যতিক্রম নয়। শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর নাগরিক মনন শ্রেণি সংঘর্ষের স্বপ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল।”^{১৫৮}

এই রাজনৈতিক অবস্থানগত কারণেই সেদিন বাদল সরকার ও তাঁর গোটা নাট্যদল ‘ভোমা’ নাটক নিয়ে হাজির হয়েছে সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া গ্রামে ভোমাদের বাড়ির উঠোনে। এইসব প্রান্তিক মানুষদের বঞ্চনার কথা, তাদের ভাতের অধিকারের কথা তাদেরই সামনে তুলে ধরার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ীই ১৯৭৬ সালের ২১ মার্চ সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া গ্রামে শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠী ‘ভোমা’ নাটকটি প্রথম অভিনয় করে। এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা সেদিন শতাব্দী লক্ষ্য করেছিল গ্রামের মানুষদের মধ্যে। শতাব্দীও সেই উন্মাদনায় এগিয়ে যাওয়ার শক্তি সঞ্চয় করেছিল। বিশাখা রায় লিখেছেন—

“রাঙাবেলিয়া গ্রামের মাঝখানে খোলা মাঠ, কাদা দিয়ে পিটিয়ে একটা উঁচু জায়গা তৈরি করা হয়েছে। ওটাই অভিনয়ের স্থান। সামনে-পেছনে, ডানদিকে-বাঁদিকে গিজগিজ করছে মানুষের মাথা। ছেলে-বুড়ো-মা-বউ চারদিকে চুপ করে বসে আছে। গোত্রাসে গিলছিল শহরের মানুষদের তৈরি

ভোমা নাটক। এই অভিজ্ঞতা ছিল তুলনাহীন। নিরন্ন জীবন্ত মানুষের উপস্থিতিই
আমাদের মনে সাহস জুগিয়েছিল।”^{১৫৯}

বিশাখা রায়ের এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার
গ্রামে ভীষণ ভাবে সফল হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল না থাকার কারণে
বাদল সরকার ও তাঁর নাট্যদল শতাব্দীর পক্ষে গ্রামে গিয়ে নিয়মিত থিয়েটার করা সম্ভব ছিল না।
কারণ দেশে তখন জরুরি অবস্থা (২৫ জুন, ১৯৭৫ থেকে ২১ মার্চ, ১৯৭৭) আধিপত্যবাদী ক্ষমতার
চূড়ান্ত প্রকাশ হয়েছিল সেদিন। পুলিশ প্রশাসনের অত্যাচার ও সন্ত্রাসের কারণে বেশিরভাগ নাট্যদল
মুক্তমঞ্চে অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। শতাব্দীও তখনকার মতো গ্রামে গিয়ে অভিনয়
না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। গ্রামে অভিনয় বন্ধ করলেও শতাব্দী কিন্তু এই সময় রাষ্ট্রের
অনুশাসন অগ্রাহ্য করে শহরের অঙ্গনমঞ্চে তাদের অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকে। কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে থিওজফিক্যাল সোসাইটির হলঘরটি ভাড়া নিয়ে অঙ্গনমঞ্চে আবার নিয়মিত
অভিনয় শুরু করে শতাব্দী। ঠিক সেই সময় থেকে জরুরি অবস্থা উঠে যাওয়া পর্যন্ত বাদল সরকার
প্রত্যেক শুক্রবার সেখানে শতাব্দীর অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকে। ‘ভোমা’র অভিনয় খোলা
জায়গায় বন্ধ করে দিয়ে সেইসময় প্রজ্ঞানানন্দ ভবন ভাড়া নিয়ে বেশ কয়েকটি রবিবার অভিনয়
করা হয়েছিল। যদিও তা ছিল অত্যন্ত গোপনে। দলের পরিচিত কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ
করে অভিনয় করা হয়েছিল। তবু সেদিন ঘর ভরে গিয়েছিল। শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে
দর্শকরাও সেদিন এই সৃজন প্রক্রিয়ার শরিক হয়েছিলেন। বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“দর্শকদের দিক থেকে ওই সাড়া শুধু নাটকটার প্রযোজনার গুণে নয়, আসলে
ওইরকম একটা সময়ে এরকম একটা নাটক ওভাবে অভিনীত হচ্ছে, সেটাও
একটা বড় কারণ। একদিক থেকে বললে, ওই পরিস্থিতিতে দর্শকরা এই নাটক
দেখাটাকেও একটা রাজনৈতিক কাজ বলে মনে করতেন।”^{১৬০}

প্রত্যন্ত গ্রাম সেদিন হাজির হয়েছিল শহরের বাঁধানো দরজায়। ছোট কারখানা উঠে যাচ্ছে। জলের
অভাবে ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে। শ্যালো মেশিন বসাবার পুঁজি নেই। তিন ফসলী জমিতে তিনবার
চাষ করা যাচ্ছে না। সারের দাম ক্রমশ বেড়ে চলছে—এইরকম প্রতিটি প্রবণতার বিপরীতে দাঁড়
করানো হয়েছে ভোমাকে খোঁজবার দায়। এই দায় সেদিন শতাব্দীর প্রতিটি নাট্যকর্মীর পাশাপাশি
দর্শকরা নিয়েছিলেন। দর্শক-অভিনেতা সম্মিলিত ভাবে স্থির প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেছিল—

“... চারিপাশে আগাছা পরগাছার বিযাক্ত জঙ্গল বেড়ে উঠছে। বিষ। বাতাসে
বিষের গন্ধ। জিভে ভোমার রক্তের স্বাদ। ভোমার রক্ত খেয়ে আমরা হাসছি,

খেলছি, দুকষ বেয়ে রক্ত ঝরছে, ঝরছে, বিষগাছ বাড়ছে, আমার রক্ত, মানুষের রক্ত, ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা— ... কিন্তু ভোমা আছে! আমি জানি ভোমা আছে! জানি, তাই আমার স্বপ্ন আছে। স্বপ্ন। ভোমা উঠছে। ভোমা উঠছে। মরচে ধরা কুড়ুল কুড়িয়ে নিচ্ছে হাতে, শান দিচ্ছে। ... হাত শক্ত হচ্ছে ভোমার! সাঁড়াশি আঙুল কুড়ুলের হাতলে চেপে বসছে। ছেঁড়া চোখে বাঘমারা আগুন জ্বলে উঠছে! ভোমা উঠছে! ... মারো জোয়ান হেইও!”^{১৬১}

সেদিন সমস্ত রকম অন্যায় আশ্রাসনের বিরুদ্ধে অভিনেতা থেকে সাধারণ দর্শক প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন। একটা সক্রিয় রাজনৈতিক দর্শন থেকেই তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন এইসব প্রান্তিক মানুষেরা তাদের অধিকার ফিরে পাবে। এই অধিকার ফিরে পাওয়ার লড়াই তুলে ধরা হয়েছে ‘ভোমা’ নাট্যসৃজনে। তার জন্যেই তো শতাব্দীর কর্মীরা বারবার ছুটে গেছেন দুর্গম কাদা পেরিয়ে সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া গ্রামে। শতাব্দীর তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনের ইতিহাসে ভোমা নাট্য সৃজন তাই ‘একটা great leap forward’।^{১৬২}

এই ধারায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যসৃজন হল ‘বাসি খবর’। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৮ সাল। শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠী নাটকটি প্রথম অভিনয় করে ৬ জুলাই, ১৯৭৯ সালে থিওজফিক্যাল সোসাইটির হল ঘরে। নাটকটির নাট্যসৃজন সম্পর্কে বাদল সরকার লিখেছেন—

“এই নাটকটা দলের মধ্যে সমবেত প্রয়াসের ফল। একেবারে শেষের দিকে, যা যা খবর ও লেখাপত্র যোগাড় হয়েছে এবং যা যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে আমি একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করি। এই নাটকে আমার অবদান বলতে যেটুকু তা নাটকের কাজ চলাকালীন বাকি সদস্যদের মতোই, পাণ্ডুলিপি লেখায় নয়। আর ঠিক এই কারণেই আমি ‘বাসি খবর’-এর নাটককার নই, খুব বেশি হলে সম্পাদকমাত্র।”^{১৬৩}

সত্তরের দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে বাদল সরকার নাট্যরচনার পাশাপাশি কোলাজ তৈরিতে মশগুল হয়ে পড়েন। নানা রঙের ছেঁড়া কাগজের টুকরো, আঠা মোছার ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন রকম কোলাজ নির্মাণ করতেন। ১৯৭৯ সালে ছেঁড়া কাগজ জুড়ে জুড়ে, আঠা মুছে মুছে একটা কোলাজ তৈরি করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন ‘Faces of Man’-‘মানুষের বহু মুখ’। কী ছিল এই কোলাজে? *Faces of Man* বিরাট কোলাজের মাঝখানে এক বিমর্ষ মানুষের মুখ। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে নানা মুখ, অন্য মানুষের মুখ। এরা কি অন্য মানুষের মুখ না কি একই মানুষের খণ্ড খণ্ড অবয়ব। বুঝি, কেন্দ্রের মুখ নিজেই ছড়িয়ে দিয়েছে তার নিজস্ব দিনযাপনের

ইতিকথা। ইতিহাসকে সে যেভাবে ভাবতে শিখেছে, চিনতে শিখেছে যেন সেই ইতিকথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রঙের ঠাসা বুননে। নিঃসঙ্গতা-বেদনা, ভয়-ক্রোধ, দম্ভ-হতাশা, উচ্চাশা-সন্ত্রাস যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে ছড়িয়ে থাকা নানা মুখের কোলাজে।”^{১৬৪} বাদল সরকার যখন এই কোলাজ দলের সদস্যদের সামনে তুলে ধরলেন তখন তা নিয়ে শুরু হয় নানা আলোচনা। শুরু হয় তীব্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। দলের কোন কোন সদস্যের মনে হয়েছিল কোলাজে প্রদর্শিত মানুষের বোধের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। যুগে যুগে পিষে যাওয়া মানুষের লড়াই এই কোলাজে অনুপস্থিত। শতাব্দী এই অসম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার দায় নিতে অস্বীকার করে। তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলন একটা বিশেষ দর্শনকে নিয়ে চলে। তাঁরা সেই সত্যের কাছে দায়বদ্ধ। সম্মিলিতভাবে সেদিন বাদল সরকারের কোলাজটা বর্জন করা হয়। যুক্তিসঙ্গত কারণেই এমনটা করা হয়েছিল। একটা প্রতিবাদী স্বর নির্মাণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ‘ভোমা’র মতো আবার শুরু হল অনুসন্ধান, প্রান্তিক মানুষের স্বর অনুসন্ধান। এদেশে সংগঠিত হওয়া সাঁওতাল বিদ্রোহের উপাখ্যান Faces of Man কোলাজের সঙ্গে যুক্ত করে নির্মাণ করা হল আরেক ইতিহাস। ‘বাসি খবর’ নাটকের নির্মাণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বাদল সরকার লিখেছেন:

“আমরা কর্মশালা করতাম আর আলোচনায় বসতাম। সেইসব আলোচনায় আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন তুলতাম, আর উত্তরগুলো এমন সব সিদ্ধান্তে আমাদের পৌঁছে দিত যার ওপর নাটকটা দাঁড়াবে। আমরা যদি মানুষের লড়াইকে কেন্দ্রীয় বিষয় করি তাহলে কি সাধারণভাবে বিদ্রোহকে দেখাব, নাকি ইতিহাসের কোনও নির্দিষ্ট বিদ্রোহকে তুলে নেব? উত্তর এল, একটা নির্দিষ্ট বিদ্রোহ। কোনটা? একজন বলল, ঊনবিংশ শতাব্দীর সাঁওতাল বিদ্রোহ। পরামর্শ গৃহীত হল।”^{১৬৫}

ইতিহাসের ঘটে যাওয়া সেই সাঁওতাল বিদ্রোহকে তুলে ধরবার জন্য শুরু হল অনুসন্ধান। আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কাহিনী তুলে ধরতে চলে নানা গবেষণা। এক্ষেত্রে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কিছু গ্রন্থের সাহায্য নেন বাদল সরকার ও তাঁর দলের কর্মীরা। বিশেষ করে ধীরেন্দ্র বাস্কের ‘সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস’, সুপ্রকাশ রায়ের ভারতের ‘বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস’, ‘ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম’ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি সমকালীন সংবাদ পত্র থেকেও নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কারণ শুধুমাত্র সাঁওতাল বিদ্রোহের ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া এই নাট্যসৃজনের উদ্দেশ্য ছিল না। সমকালীন সময়ের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই কৃষক বিদ্রোহকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছিল। বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

“... আমরা কি সাঁওতাল ও অত্যাচারীদের নিয়ে ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের ওপর একটা নাটক তৈরি করব? উত্তর এল, না। তাহলে কী? আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা দেখাব, অর্থাৎ শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। কেন? কারণ, ওই বিদ্রোহকে আমরা এই সময়ের বাস্তবতার সাথে এক সুতোয় গাঁথতে চাই।”^{১৬৬}

১৮৫৫-৫৭ সালের সাঁওতাল কিংবা হল বিদ্রোহের অন্তরালে ছিল নির্মম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। জঙ্গলের অধিকারী আদি মানুষদের জঙ্গল কেড়ে নেওয়া, স্বাধীনতা তছনছ করা, শোষণে জর্জরিত করা ছিল এই সন্ত্রাসের মুখ। সেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে পিষে যাওয়া প্রান্তিক মানুষেরা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। ‘বাসি খবর’ নাট্যসৃজনে এই সাঁওতাল বিদ্রোহকে সত্তরের দশকের কৃষক বিদ্রোহ-নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখার চেষ্টা করা হয়। শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠী ‘বাসি খবর’ নাট্যসৃজনের গোড়া থেকেই সাঁওতাল বিদ্রোহ বর্ণনা করার কোন অভীক্ষা পোষণ করেনি। ভোমা বা ‘মিছিল’ নাটকের মতো ‘বাসি খবর’ নাটকেও এইসব প্রান্তিক মানুষদের বেদনার প্রেক্ষাপটে নিজেদের যাচাই করবার চেষ্টা করেছেন। বুঝবার চেষ্টা করেছেন শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মনন কীভাবে ক্রিয়া করবে তার অভিমুখ ও রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিকে।

‘বাসি খবর’ নাটকটি শুরু হয়েছে এক শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া দিয়ে। তারপর সেই শিশু ধীরে ধীরে বড়ো হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশু ক্রমে আত্মস্থ করে প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃতি। অভ্যাসের স্বাভাবিক প্রবণতায় সে এগিয়ে যায় নিরাপদ মধ্যবিত্ত আচ্ছাদনের দিকে। এই আশ্রয়ের বোধ তাকে লালন করেছে— সুতরাং এটাই তার পছন্দ। ঠিক তখনই তার মধ্যবিত্ত নিশ্চিত জীবন থেকে কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে গেল। আগাগোড়া সাদা ব্যাঙেজে মোড়া এক মৃতদেহ যৌবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। উঠে আসে অন্যপারের ইতিহাস। মরে যাওয়া, ‘বাসি’ হয়ে যাওয়া ইতিহাসের টুকরো তছনছ করে দিল তার নিরাপত্তার বোধ। ছক বাঁধা বৃত্তের বাইরে এবার সে পা রাখতে বাধ্য হল। কেঁপে উঠল ভূমি। শাসকের ক্ষমতা কাঠামো সমূলে উপড়ে ফেলার সংকল্পে সে চিৎকার করে বলেছে—

“মৃত্যু, রক্ত আর ভীতি শাসন করছে এই ভূমি। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কী ঘটছে আর কী ঘটবে, সবাই জানে। এখনো চিৎকার করে উঠছি না কেন? সময় কি আসেনি? আসেনি?”^{১৬৭}

খোকার এই জার্নি সেটা প্রকাশ করার জন্য বেশ কিছু ওয়ার্কশপ সরাসরি প্রয়োগ করা হয় নাট্যশৈলীতে। এই ওয়ার্কশপের অঙ্গ হিসেবে বেশ কিছু খেলা বা গেম ‘বাসি খবর’ নাটকে ব্যবহার করা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি অন্যতম হল স্পেস-কভারিং বা পরিসরকে চেনা। দলের প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে

একমুখী, নমনীয় ও সক্রিয় করে তোলার জন্য এই গেমের ব্যবহার করা হয়েছিল। এই গেমটি ব্যবহার করে ‘বাসি খবর’ নাটকটি শুরু হয়েছিল। আঙ্গিকের বিশেষ প্রয়োগে গোড়া থেকেই ‘বাসি খবর’ নাটকটিতে একটা ছন্দবদ্ধ ঐকতান গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। চোখে চোখ রেখে চেষ্টা করা হয় দর্শকদের টেনে নিতে ‘বাসি খবর’-এর নাট্যকাহিনীতে। ‘বাসি খবর’ নাটক মূলত তথ্য নির্ভর। অতীত, বর্তমান, মধ্যবিত্ত আশ্রয়, ছিন্নভিন্ন হওয়া সবই ঘটেছিল তথ্যের মাধ্যমে। অর্থাৎ তথ্যের মধ্যেই সংবেদনশীল নাটকীয়তা মিশে ছিল। সমগ্র নাটকে যুথবদ্ধ অভিনয় করাই সম্ভব ছিল। কারণ কোনো একক চরিত্রের অন্যেকে ছাপিয়ে যাবার কোনো সুযোগ এই নাটকে ছিল না। নাটকের এই বিশেষ বিন্যাসের কারণেই ওয়ার্কশপ-কে সরাসরি প্রয়োগ করবার সুযোগ ‘বাসি খবর’ নাটকে ছিল।

স্পেস কভারিং বা পরিসরকে চেনা খেলার পাশাপাশি নাটকে তীব্র নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করবার জন্য দৌড়ের অনুশীলনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ‘বাসি খবর’ নাটকের বিন্যাসে এই খেলা যুক্ত করে বাদল সরকার দৌড়ের অন্তর্নিহিত শক্তিকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। দৌড়ের মধ্যে যুক্তিসংগতভাবে একটা বেড়া ভেঙে ফেলার উদ্যোগ থাকে, সেটাকে শতাব্দী আয়ত্ব করেছিলেন ‘বাসি খবর’ নাটকের সাঁওতাল হলের বাঁধভাঙ্গা এনার্জি নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করার জন্য। এই দৌড়ের মধ্যে সেদিন স্পন্দিত হয়েছিল ব্যথা, ক্রোধ এবং স্বপ্নের ধারণা। নাটকের বিন্যাসের সঙ্গে কীভাবে এই দৌড় যুক্ত করা হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে—

“এক।। ইংরেজ নীলকুঠি লুঠ!

...

এক।। জমিদারি ঘাঁটি লুঠ!

পাঁচ।। পাকুড় রাজবাড়ি!

ছয়।। মহেশপুর রাজবাড়ি!

.....

দুই।। (মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে) সৈন্য পালালো!

কোরাস।। (লাফিয়ে পড়ে) পালাল!

দুই।। পুলিশ জমাদার পালালো!

কোরাস।। পালালো!

দুই।। ডাকহরকরা চৌকিদার পালালো!

কোরাস।। পালালো!

...

দুই। জমিদার পালালো!

কোরাস।। পালালো!

দুই। ডিকু পালালো!

কোরাস।। পালালো! পালালো! পালালো!”^{১৬৮}

এখানে দৌড়! দৌড়! আর দৌড়! সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী শাসক তার দলবল নিয়ে সাঁওতাল ছেলের তাণ্ডবের ধাক্কায় সাঁওতাল পরগণা ছেড়ে পালাল। এটাই বিদ্রোহ। এটাই শক্তি। বাদল সরকার ও তাঁর দলের কর্মীরা চেয়েছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত শক্তিকে একটা উদ্দাম দৌড়ের সাহায্যে চারপাশে ঘিরে থাকা দর্শকদের মধ্যে গেঁথে দিতে। এটাকেই শতাব্দী সেদিন সচেতন রাজনীতি বলে মনে করেছিল।

‘বাসি খবর’ নাট্যসৃজনে দৌড় অনুশীলনের পাশাপাশি ভাস্কর্য তৈরির খেলা (Sculpture) নামক এক বিশেষ খেলার অনুশীলন করা হত এতে “একদল থিয়েটারকর্মী একটা বৃত্ত তৈরি করে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। মাঝখানে বেরিয়ে আসে একটা গোলাকৃতি পরিসর। নির্দেশ পাওয়া মাত্র যে কোনো একজন বৃত্ত ভেঙে নিজস্ব ভঙ্গিমায় পড়ে থাকা ক্ষেত্রটিকে পরিক্রমা করতে থাকে। হেঁটে চলার ভঙ্গি ক্রমশ বদলাতে শুরু করে। ... একটু সময় নিয়ে সে একটা বিশেষ ভঙ্গিমায় খোলা জায়গাটায় স্থির হয়ে দাঁড়াবে। যেন সে একটা পাথরের মূর্তি। এরপর বাইরের বৃত্ত থেকে আরও একজন বেরিয়ে আসবে, সৃষ্টি করবে নিজস্ব বলয়, স্থির হয়ে দাঁড়াবে। সৃষ্টি হবে একটি ভাস্কর্য। এখানে একটাই নতুন শর্ত যুক্ত হবে। দ্বিতীয় ভাস্কর্য অবশ্যই প্রথম ভাস্কর্যকে কোনো না কোনো ভাবে স্পর্শ করে থাকবে। একইভাবে সমস্ত পারফরমার একযোগে সুষমামণ্ডিত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে তৈরি করবে ভাস্কর্য যা তৈরি হবে ব্যক্তির নিজস্ব ছন্দে। একই সঙ্গে সমস্ত ভাস্কর্যটি হবে একটা দলবদ্ধ সৃষ্টি। একটা বিশেষ দিকে মুখ করে থাকবে এই যৌথ সৃষ্টি।”^{১৬৯} ভাস্কর্য তৈরির মাধ্যমে শতাব্দী সেদিন অপমানিত মানবাত্মার ক্রোধ চারিদিকে বসে থাকা অন্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। ভাস্কর্য গড়ার মধ্য দিয়ে প্রতিটি পারফরমার হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ঘাড় মটকে খুন হওয়া আদিম মানুষের গায়ে। তারা শাসকের চোখে চোখ রেখে সম্মিলিতভাবে উচ্চারণ করে:

“... ইংরেজ শাসকের আসল কাজ ছিল রাজস্ব আদায় করা। ভূমিরাজস্ব দু’হাজার টাকা থেকে বেড়ে যোলো বছরে তেতাল্লিশ হাজার টাকায় উঠেছিলো ১৮৫৪ সালে। অল্প খরচে কার্যকরী শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হিসাবে সাঁওতাল অঞ্চলকে দেখানো হতো।

...

কোরাস ।। (মৃদুস্বরে) দামিন-ই-কো-দামিন-ই-কো...

এক ।। বছরের পর বছর সীমাহীন শোষণ-উৎপীড়ন-অত্যাচারের চাপে

সাঁওতালদের মাদলের স্থলিত ধ্বনি কখন যে বিদ্রোহে পরিণত হতে আরম্ভ

করেছে—”^{১৭০}

ওয়ার্কশপ পদ্ধতি অনুসরণ করে যুথবদ্ধ ভাস্কর্য ‘বাসি খবর’ নাটককে ‘বাসি’ হয়ে যাওয়া সাঁওতাল ছেলের তথ্য পরিবেশন করা হয়। অভিনেতার সাঁওতাল চরিত্র সেজে বিদ্রোহের খবর উপস্থাপন করবার কৌশল অবলম্বন করে না। বরং মধ্যবিত্ত, নিম্পৃহ দর্শকদের দিকে তারা সোজা ছুঁড়ে দেয় সংবাদের তীক্ষ্ণ ফলা। অভিনেতাদের মতো দর্শকও বিদ্ধ হয়। এইভাবে সেদিন পরিবর্তনের দর্শন পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল আপামর সাধারণ দর্শকের দরজায়।

একটা ভিন্নধারার থিয়েটার শৈলী গড়ে তুলতে হলে হাতে কলমে কাজ করার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ প্রয়োগ বাদ দিয়ে শুধু নাট্যতত্ত্ব নির্মাণ দিয়ে চলে না। দর্শন থাকতে পারে, আদান-প্রদানের প্রসঙ্গ থাকতে পারে। কিছু উৎসাহী মানুষও থাকতে পারেন— তবু এই উপাদানগুলি যোগ করলেই শিল্প সৃজন হয় না। তৃতীয় ধারার থিয়েটার বহনীয়, নমনীয় ও সুলভ, কিন্তু তারও আগের পর্ব হল থিয়েটার শিল্পটা সৃজন করা। অর্থাৎ একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভাকে নানা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একটা পরিণত স্তরে নিয়ে যাওয়া। ‘বাসি খবর’ নাটক শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীকে এই পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

শতাব্দীর থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের ইতিহাসে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যসৃজন হল ‘ভাঙা মানুষ’ ও ‘মানুষে মানুষে’। প্রথমটির সময়কাল ১৯৭৭ আর দ্বিতীয়টির সময়কাল ১৯৮১ সাল। এই দুটি নাট্যসৃজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান চার বছর হলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে একই গোত্রের। দুটি নাটকেই ভাষার ব্যবহার ছাড়া একটা বিশেষ মতাদর্শ প্রকাশ করবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কশপের উপর ভিত্তি করে নাটক সৃজন করা হয়েছিল। ওয়ার্কশপের ধারাবাহিক চর্চার ভিত্তিতে স্বরক্ষিপন, শারীর বিন্যাস, ধ্বনির ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল যা ‘ভোমা’ ও ‘বাসি খবর’ নাট্যনির্মাণেও করা হয়েছিল। তবু এই নাটক দুটি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ এই নাটক দুটি ছিল ভাষাহীন। ‘ভোমা’ নাট্যসৃষ্টিতে ক্ষুধা নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কশপের পাশাপাশি ‘ভোমার ক্ষুধা লাগে’ এই ভাষা ছিটকে বেরিয়ে এসে ‘ক্ষুধা’ শব্দের অনুভবকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই নাটক দুটিতে ভাষা ছাড়া ক্ষুধা বা ভালোবাসার বন্ধন প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ‘ভাঙা মানুষ’ ও ‘মানুষে মানুষে’ নাট্যসৃজন সম্পর্কে বাদল সরকার বলেছেন:

“ভাঙা মানুষ’ বলতে ভেঙে পড়া অথবা টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া এক মানুষ। সেটা ১৯৭৭-এর প্রথম দিক। আমরা দড়ি, খুচরো পয়সা, বাসি রুটি-এইসব দিয়ে অনাহার, টাকাপয়সা, বন্দিত্ব, অত্যাচার ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কর্মশালা করছিলাম। সেই কর্মশালা থেকে বেরিয়ে আসা তীব্র এনার্জি আমাদের একটা ‘র-ওয়ার্কশপ’ করতে প্রলুব্ধ করল। এটা একটা অস্বাভাবিক ধারণা, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সঙ্গত ও প্রচণ্ড আপত্তি উঠল। কিন্তু দীর্ঘ বিতর্ক ও আরও কর্মশালার পরে আমরা এগোনোর ঝুঁকি নিলাম। যোগদানকারীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে এটাকে আমাদের সবচেয়ে বড় চলা বলা যেতে পারে। এত তীব্র অনুভূতি নিয়ে আমরা অভিনয় করতাম যে একটা সামান্য বিষয় হাসিও আমাদের ভীষণভাবে ধাক্কা দিত। আর সেই কারণেই মাত্র ন’টা অভিনয়ের পর এটা নিয়ে আমরা আর চলতে পারিনি। ... বছর চারেক পরে আমরা ‘মানুষে মানুষে’ নামে ওই বিষয়ের ওপরেই নির্দিষ্ট একটা নাটকের চেহারা দিলাম। ... ‘মানুষে মানুষে’ আমাদের রিপোর্টারির একটা প্রায় সংলাপহীন প্রযোজনা...।”^{১৭১}

‘ভাঙা মানুষ’ বা ‘মানুষে মানুষে’ নাটক দুটি আদ্যন্ত রাজনৈতিক। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্যায় পীড়ন বাদল সরকারসহ সমগ্র শতাব্দী নাট্যদলকে বিচলিত করেছিল বলেই সংলাপহীন নাটক দুটি সেদিন সৃজন করা হয়েছিল। আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মর্মে ছিল সমবেতভাবে দর্শকদের সঙ্গে নিয়ে সতেজ বিদ্রোহের স্বর উচ্চারণ করবার ইচ্ছা। একটা বিশেষ দর্শন ও তার জন্য এই নাটক দুটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। যে পদ্ধতি ব্যবহার করে এই নাট্যনির্মাণ সম্ভব হয়েছিল তার প্রতি স্বরে মিশে ছিল রাজনৈতিক দ্যোতনা। এই দুটি নাটকে কতগুলি বিশেষ নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া হয়। আসলে নাটকে কতগুলি পরস্পর বিরোধী ঘটনা, অবস্থান, ক্রিয়া, নৈঃশব্দ, হুংকার একযোগে একটা বেগ তৈরি করে। এক বিশেষ অভিমুখে এই বেগ ধাবিত হয়। এই গতির বিপরীতে স্থাপন করা হয় অন্য কোন ঘটনা বা অবস্থান— তৈরি হয় সংঘাত। গড়ে ওঠে নাটকীয় মুহূর্ত। ‘ভাঙা মানুষ’ ও ‘মানুষে মানুষে’ দুটি সংলাপহীন নাটকে কিছু শব্দ, কিছু ধ্বনি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে নানা নাট্যমুহূর্ত। শুকনো রুটি, চাবুক, ঘণ্টা, পয়সার থালি, কালো কাপড়, ঝকমকে নাগরা জুতো, বেলুন প্রভৃতি নানা প্রপ ব্যবহার করে নানা দলবদ্ধ ও একক দেহভঙ্গিমা দিয়ে এই মুহূর্তগুলি তৈরি করা হয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল নাটকীয় সংঘাত। একদিকে চাবুক, অন্যদিকে বাসি রুটি— নাটকের গতিমুখ নিয়ে এসেছে স্তরবিভক্ত সমাজের অন্যায় রাজনীতি। খণ্ড খণ্ড

নাট্যমুহূর্তগুলি জোড়া দিয়ে তৈরি হয় এক নাট্যপ্রবাহ। ভাষা ছাড়া থিওর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, সমাজের অসম কাঠামোকে তুলে ধরার জন্য শতাব্দী নাট্যদল সেদিন ‘ভাঙা মানুষ’, ‘মানুষে মানুষে’ নিয়ে হাজির হয়েছেন মানুষের দরবারে।

‘ভাঙা মানুষ’ ও ‘মানুষে মানুষে’ নাটক দুটির দর্শক প্রতিক্রিয়া সেদিন কিন্তু অনুকূল ছিল না। দর্শকের ঔদাসীন্য শতাব্দীকে বাধ্য করেছিল এ দুটি নাটকের অভিনয় বন্ধ রাখতে। বাদল সরকার ‘ভাঙা মানুষ’ সম্পর্কে বলেছেন— ‘মাত্র ন’টা অভিনয়ের পর এটা নিয়ে আমরা আর চলতে পারিনি।’^{১৭২} একথা ‘মানুষে মানুষে’ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। প্রশ্ন হল তবে কেন এই নাট্যসৃজন? ভাষাহীন এই দুটি নাট্যনির্মাণ আদৌ দর্শকদের মনে পৌঁছোবে কি না সেই ঝুঁকি তো ছিলই। তাহলে শতাব্দী কেন নিজেদের টেনে নামালো এই ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায়? সেদিন বাদল সরকার ও তাঁর দলের সহকর্মীরা বুঝতে চেয়েছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যকর্মের শর্তাবলী কী? দর্শক প্রতিক্রিয়া যেমন একটা দিক, প্রথাগত পণ্যসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বছরের পর বছর টিকে থাকাটাও একটা দিক। বাদল সরকার ও তাঁর দলের কর্মীরা এটা উপলব্ধি করেছিলেন পণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হলে নতুন চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী থিয়েটারকর্মীর প্রয়োজন। মূলধারায় টিকে থাকাটা কোনো চ্যালেঞ্জ নয়। কিন্তু ধরাবাঁধা শর্তে বিকল্প থিয়েটার বেশিদিন চলবে না, প্রসারিতও হবে না। বহু ব্যবহারে শব্দের অর্থ বা দর্শন হারিয়ে যায়, সুতরাং জীবন্ত দর্শন সৃষ্টি করবার জন্য ভিন্ন শর্ত, ভিন্ন রাজনীতি প্রয়োজন হয়। তাই তীব্র সংবেদনকে জড়ো করে, নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করতে দর্শকের অঙ্গনে নিজেদের নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কোন যান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাত্রা করা হয়নি। সক্রিয় দর্শন ছিল এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তি। থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের প্রতিটি নাটকেই সমাজসম্পৃক্ত প্রশ্ন নিয়ে আসা হয়েছে, এসেছে তর্ক ও যুক্তি। তর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে দর্শক-নাট্যকর্মীর পারস্পরিক সম্পর্ক। সেদিন শতাব্দীর অভিনয়ে কোন মুখোশ ছিল না, ছিল না কোন পক্ষ। প্রতিটি ভঙ্গিমা, চেয়ে থাকা, ছন্দ, কোরিওগ্রাফি, সমস্তই প্রকাশ করা হত একটা বিশেষ মানসিক স্তর থেকে। চেতনা ও সং আবেগ এক ভিন্ন স্তরে উন্নীত করবার দুর্লভ প্রয়াস ছিল ‘ভাঙা মানুষ’, ‘মানুষে মানুষে’ নাটক দুটিতে। দর্শক প্রতিক্রিয়া অনুকূল না হলেও বেড়া ভাঙবার এই সিদ্ধান্ত শতাব্দীকে সেদিন নিতে হয়েছিল।

শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর চিন্তা কাঠামোয় একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট খুঁজবার ও তাকে নাটকে যুক্ত করবার প্রক্রিয়া খুব সক্রিয় ছিল। রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে মতাদর্শের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে তার অন্তর্নিহিত যুক্তি বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছিল। সত্ত্বরের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনে যুক্ত নবীনদের স্বপ্ন সেদিন ভেঙে গেলেও ইতিহাসে স্থায়ী দাগ রেখে যায়। এই ইতিহাস চেতনাই সেদিন

প্রেরণা জুগিয়েছিল নবীন সন্ধানের যাত্রাপথকে। সত্তরের দশকের সেই অন্যায় রাষ্ট্রকাঠামোয় দাঁড়িয়ে থিড়ে কী সেটা শতাব্দীর থিয়েটার কর্মীদের অনুভব করবার প্রয়োজন হয়েছিল বলেই এই নাট্যসৃজন করা হয়েছিল। এই দুটি নাটক সফল না হলেও এর মধ্যে প্রোথিত ছিল থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের রাজনৈতিক নির্যাস। থার্ড থিয়েটার আন্দোলন সত্য চেতনার উচ্চারণের জন্য তৈরি হয়েছে কি না তা বিচার করবার দরকার ছিল। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের থিয়েটার বেচবার কোন দায় ছিল না। বাদল সরকার ও তাঁর শতাব্দীর ‘কোম্পানি’ খুলে থিয়েটার বেচবার কোন অভীপ্সা ছিল না। ফলে লাভ-লোকসানের হিসেব না করে এইরকম একটি ঝুঁকিপূর্ণ নাট্যসৃজন করতে কোন দ্বিধা ছিল না। থিড়ে, অসাম্য, রাষ্ট্রীয় সম্ভ্রাস, উচ্চাশা পার হয়ে কী করে মানুষে মানুষে ভালোবাসার বন্ধন গড়ে তোলা যায় এই ভাবনা থেকেই ‘ভাঙা মানুষ’ ও ‘মানুষে মানুষে’ নাট্যসৃজন। থার্ড থিয়েটার আন্দোলন সেদিন নিত্য নতুন সম্ভাবনায় যে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল সেটা পরখ করে দেখবার প্রয়োজন হয়। ‘ভাঙা মানুষ’ ও ‘মানুষে মানুষে’ নাট্যসৃজনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন বিশাখা রায়। এই দুটি নাট্যসৃজনের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন:

“ভাঙা মানুষ, মানুষে মানুষে শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর সীমা অতিক্রম করবার কাহিনি। মানুষে মানুষে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করবার এক জীবন্ত উদ্যোগ। ভাঙা ভাঙা মানুষ, টুকরো টুকরো মানুষ অসাম্যের বেড়া উপরে ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধা পড়বে এই স্বপ্নকথা এই দুটি ভাষাহীন নাটকে উচ্চারণ করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেটাই ছিল আমাদের অভিপ্রায়।”^{১৭৩}

বাদল সরকার ও তাঁর নাট্যদলের কর্মীরা সেদিন উপলব্ধি করেছেন ভারতবর্ষের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি সমগ্র কাঠামোটিই অন্যায় বিভাজন দ্বারা পীড়িত তাই নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ না নিয়েও স্তরবিভক্ত অসম বিভাজনের বিপক্ষে একটা রাজনৈতিক অবস্থান নিতে হয়েছিল বাদল সরকার ও তাঁর দল ‘শতাব্দী’কে। ‘ভাঙা মানুষ’ ও ‘মানুষে মানুষে’ ছিল শতাব্দীর অন্তর্গত ভারতবাসীর সংগ্রামে সামিল হবার জোরালো হাতিয়ার। উন্মুক্ত হয় থিয়েটার সৃষ্টির নতুন দুয়ার। জোর দেওয়া হয়েছিল মানবমনের গূঢ় শিল্পসম্ভারকে। শরীরী নানা ছন্দ, দেহভঙ্গিমায় ক্ষুধার তীব্র অনুভবকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। পুরোপুরি হয়ত সফল হননি, কিন্তু চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। শুকনো রুটি চিবিয়ে খেতে খেতে একটা অনুভব শতাব্দীর প্রতিটি সদস্যকে সেদিন ঘিরে ধরেছিল। খুলে গিয়েছিল থিয়েটার সৃষ্টির নতুন দরজা। কিছু সময়ের জন্য হলেও ‘ক্ষুধা’ শতাব্দীর প্রত্যেকের সংবেদনে আছড়ে পড়েছিল। একেই তো বাদল সরকার ও তাঁর দল সৎ চেতনা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এই সৎ চেতনাই সেদিন বাদল সরকার ও তাঁর নাট্যদল

শতাব্দীকে শব্দহীন এই দুটি নাটক নির্মাণে প্ররোচিত করেছিল, প্রেরণা জুগিয়েছিল। একই সঙ্গে থার্ড থিয়েটার আন্দোলনে সংযোজিত হয়েছিল নতুন মাত্রা।

বাদল সরকার কোথাও এক জায়গায় বেশিদিন থেমে থাকেননি। খোঁজ, খুঁজে চলা। চলতে চলতে নতুন সম্ভাবনা। নতুন এক দিশা। এক পরিণতি থেকে অন্য পরিণতিতে। এক লক্ষে অন্য পথে। ভিত্তিভূমি যার এক বলিষ্ঠ দর্শন। ১৯৮৬ সালের ২৮, ২৯, ৩০ মার্চ, বাদল সরকার তাঁর নাট্যদল শতাব্দী এবং আরো বেশ কিছু গান ও নাটকের দল মিলে শুরু করেন গ্রাম পরিক্রমা। গ্রাম থেকে গ্রামে এগিয়ে চলল শতাব্দীর সম্মিলিত গ্রাম পরিক্রমা— উত্তর ২৪ পরগণার মহলন্দপুর, চারঘাট, মোল্লাডাঙা, দরগা, চারঘাট যোগেশ পাঠাগার, বলরামপুর, দক্ষিণ চাকদহ, সুটিয়া, রামচন্দ্রপুর এবং শেষে ঠাকুরনগর। এর আগে বাদল সরকার তাঁর নাট্যদল নিয়ে এক আধবার যে গ্রামে যাননি তা নয়। কিন্তু সেগুলি ছিল মূলতঃ আমন্ত্রণমূলক। অনুষ্ঠান হওয়া থেকে সব কিছুই নির্ধারিত হয় উদ্যোক্তা বা কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে। এবারের গ্রাম পরিক্রমার ভঙ্গিটাই ছিল স্বতন্ত্র। প্রথমত, এটা সম্পূর্ণ স্ব-উদ্যোগ, দর্শকরা থিয়েটার করবার জন্য তাঁদের ডেকে নিয়ে যাননি, তাঁরাই গেছেন দর্শকের কাছে তাঁদের থিয়েটার নিয়ে। দ্বিতীয়ত, কোন একটি দল নয়, ছ’টি নাট্যদল (শতাব্দী, পথসেনা, এরিনা থিয়েটার গ্রুপ, তীরন্দাজ, ঠাকুরনগর সাংস্কৃতিক পরিষদ ও ঋতম) এবং দু’টি গানের দল (পি এটি অশোনগর এবং হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা) একত্রে অংশগ্রহণ করেন। তৃতীয়ত, অনুষ্ঠান ও একদিনের বা নির্দিষ্ট কোন একটি গ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই পরিক্রমা হয় তিন দিন ধরে ২৮ মার্চ থেকে-৩০ মার্চ পর্যন্ত। চতুর্থত, এর আর্থিক দায় (যাতায়াত ও খাওয়া খরচ) বহন করেন গ্রামের মানুষরা, অংশগ্রহণকারী দলগুলি এবং কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি। সুতরাং এই গ্রাম-পরিক্রমা সম্পূর্ণ আলাদা। এখন প্রশ্ন হল কেন এই গ্রাম পরিক্রমা? ১৯৮৬-তে শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর বহু নতুন ধারার নাট্যসৃজন করা হয়ে গিয়েছিল। তাহলে বারবার নিজেদের পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন কী? এ প্রসঙ্গে শুরুতেই বলতে হয় বেঙ্গালুরুর ‘সমুদায়া’ নামক একটি নাট্যগোষ্ঠীর কথা। যারা নিয়মিত গ্রামে গ্রামে গিয়ে নাটক করে। কোথাও যেন এইরকম একটা কিছু খুঁজছিলেন শতাব্দীর কর্মীরা। এই রকম একটা সমাজ পরিবর্তনের সংস্কৃতি-এক অন্য ভোরের স্বপ্নের সন্ধান করছিলেন বাদল সরকার ও তাঁর দল শতাব্দী। এতদিন নাটক করছিলেন শ্রমজীবীদের নিয়ে, অথচ তারা অনুপস্থিত। তাদের কাছে পৌঁছতে হবে। প্রয়োজনে আরও বড় উঠোনের খোঁজ। ভারতবর্ষ-সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উঠোন গ্রাম। নাটক, গান নিয়ে শতাব্দী ও সহযোগী নাট্যগোষ্ঠীর সদস্যরা চললেন সেই গ্রামে। শুরু হল গ্রাম পরিক্রমা। কেন পরিক্রমা, সম্ভবতাবেই বাদল সরকার বলেছেন—

“মানুষ দর্শক হয়ে বিশেষ স্থানে আসবে, এ অপেক্ষায় না থেকে, যেখানে মানুষ থাকে, কাজ করে, সেইখানে নিজেরাই পৌঁছে থিয়েটার করে তাকে দর্শকে পরিণত করা যাচ্ছে। অনেক ব্যাপক হচ্ছে থিয়েটারের ক্ষেত্র, বিষয়বস্তু পৌঁছে দেবার ক্ষেত্র।”^{১৭৪}

এই উদ্দেশ্যেই থিয়েটারের এক পৃথক ভাষার সন্ধানে শুরু হয় গ্রাম পরিক্রমা। আসলে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষের অর্থনীতি, সমস্ত কাঠামো এবং বিচ্ছিন্ন প্রান্তিক মানুষের কাছে যাবার এবং তাদের বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছিল এই গ্রাম-পরিক্রমায়। বাদল সরকার বলেছেন— “কারণ আমরা জানি যে গ্রামে না গেলে দেশের সত্যিকারের পরিস্থিতিটা বোঝা যায় না।”^{১৭৫} ভারতবর্ষের অধিকাংশ দরিদ্র, গ্রামীণ ও বঞ্চিত মানুষের কাছে এক সরল ও তীব্র থিয়েটারকে পৌঁছে দিতেই বাদল সরকারের, শতাব্দী ও তাঁদের সহযোগী কিছু নাট্যগোষ্ঠী সেদিন গ্রাম-পরিক্রমায় সামিল হয়েছিল। যে থিয়েটার তাদের জীবনের বঞ্চনা এবং নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করবে। সেই সঙ্গে তাদের উদ্বুদ্ধ করবে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের জন্য। এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক আদর্শ বা কোনো বৈপ্লবিক চেতনা চাপিয়ে দেওয়া কিন্তু গ্রাম পরিক্রমার উদ্দেশ্য ছিল না। গ্রাম শহরের অসম বিভাজনকে দূর করবার লক্ষ্য নিয়েই সেদিন বাদল সরকারের শতাব্দীসহ ও অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠী গ্রাম পরিক্রমায় সামিল হয়েছিল। সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে তাই দীপঙ্কর দত্ত লিখেছেন—

“শহরকে বাঁচাতে হয় গ্রামকে ঠকিয়ে। অথচ এরকম হবার কথা ছিল না। সহজেই একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারত। হয়নি। ফিরে এসেছি আবার সেই শহরে। পাঁচিল টপকে গিয়েছিলাম, পাঁচিল ভাঙতে পারিনি। হয়তো আমরা পারবোও না। তবুও যন্ত্রের দাসত্ব করার আগে হয়তো বারবার এভাবে পাঁচিল টপকে পালাতে হবে সেই সব মানুষের কাছে। অনেক আঘাতে পোড় খাওয়া শক্ত বুক, ঝাজু মেরুদণ্ড নিয়ে যাঁরা একমাত্র পারেন মানুষের সাথে মানুষের বিভেদের পাঁচিলটাকে গুঁড়িয়ে দিতে।”^{১৭৬}

কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও শ্রেণিবিভক্ত সমাজ কাঠামোকে তাঁরা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর এই কারণে থিয়েটারের বাঁধাধরা পথ থেকে সরে এসে নাটক গান নিয়ে শুরু করেছিলেন এক সাংস্কৃতিক পদযাত্রা তথা গ্রামপরিক্রমা। প্রচলিত বেচা-কেনার পদ্ধতির বাইরে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মানুষের সাথে মানুষের যোগসূত্র আর বন্ধনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি বের হয়েছিলেন গ্রাম পরিক্রমায়। রাতের অন্ধকারে, ধান ওঠা খরখরে আলপথ মাড়িয়ে,

গান গাইতে গাইতে বাদল সরকারসহ শতাব্দী ও অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠীর সদস্যরা হাজির হয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইসব মানুষদের বৃহৎ উঠোনে— গ্রামে। সাধারণত, একেবারে সাধারণ মানুষের সাথে থাকা, নাওয়া, খাওয়া, নাটক, গান আলোচনা। দিনের পর দিন প্রায় প্রায় নিয়ম করে বাদল সরকার তাঁর নাট্যদল শতাব্দী এবং সহযোগী নাট্যগোষ্ঠীদের নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা চালিয়ে গেছেন। গ্রামবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার যথার্থ অর্থেই হয়ে ওঠে সর্বসাধারণের। অভিনেতা দর্শকের অবাধ মিলন সম্ভব হয়েছে গ্রাম পরিক্রমায় সমস্ত বাধা ভেঙে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠেছে মুক্ত থিয়েটার। শতাব্দী নাট্যদলের অন্যতম একজন কর্মী গৌতম সেনগুপ্ত গ্রাম পরিক্রমার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তাই লিখেছেন—

“প্রতিটি অনুষ্ঠানের শেষে প্রায় সকলেই আমরা দর্শকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি। দর্শকরাও এগিয়ে এসেছেন আমাদের কাছে। উভয়ের মেলামেশা ঘটেছে অবাধ। ... কোনো ফাঁক বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।”^{১৭৭}

বাদল সরকার এতদিন এই থিয়েটারেরই তো সন্ধান করেছেন! ১৯৭১ সালে ‘গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ সমন্বয়ের থিয়েটার’ (Workshop for a theatre of synthesis as a rural-urban Link) বলে যে থিয়েটারের সন্ধানের সূত্রপাত, পনেরো বছরে (মার্চ, ১৯৮৬) এই সন্ধানের একটা পরিণতি ঘটেছে এই গ্রাম পরিক্রমায়। যথার্থ অর্থেই গ্রাম শহরের, থিয়েটারের সমন্বয় ঘটে এই পরিক্রমার মধ্যদিয়ে। থার্ড থিয়েটার আন্দোলনও গ্রাম পরিক্রমার মধ্য দিয়ে একটা পরিণতির স্তরে পৌঁছায়। এ প্রসঙ্গে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যবান পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—

“সত্তরের দশক থেকে নব্বুইয়ের দশক পর্যন্ত অন্তত তিনটে দশক জুড়ে বাদলবাবুর পরিকল্পনায় ও নেতৃত্বে যে থিয়েটার আন্দোলনের সূচনা ও প্রসার— তার নামকরণে ‘থার্ড থিয়েটার’ থেকে ‘ফ্রি থিয়েটার’-এই আমার বেশি আনুগত্য-তার একটা স্বাভাবিক অথচ তাৎপর্যপূর্ণ পর্বান্তর ঘটে পরিক্রমায়।”^{১৭৮}

এই স্তরে পৌঁছেই যেন বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার একটা পূর্ণরূপ পায়। ৭১ সালে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল— যে কারণে, তারই প্রায় পূর্ণরূপ এই গ্রাম-পরিক্রমা। ধীরে ধীরে যত খোঁজ তত পরিণত হয় চিন্তাভাবনা। পরিশীলিত হয় তাঁর নাট্যভাবনা। এক্ষেত্রে অবশ্যই সমষ্টির দান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে সত্তরের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের একদল তরুণ-তাজা প্রাণের বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারকে যে ভিন্নমাত্রা সঞ্চার করে তা বলার অপেক্ষা

রাখে না। শুধু যে তাঁর থার্ড থিয়েটারের পর্বান্তর ঘটে তা-ই নয়, স্বয়ং বাদল সরকারেরও মধ্যে একটা আমূল রূপান্তর ঘটে। বেশ কিছু আদর্শবাদী তরুণ-তরুণীর জীবন্ত উপস্থিতি এবং রাজনীতির ইতিহাস তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাদল সরকার একটা সময় বামরাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা বা অন্য কোন গণ-আন্দোলনের ধারে কাছেও ছিলেন না। সেই বাদল সরকার মাথায় একটা গামছা বেঁধে চড়া রোদে পায়ে হেঁটে একটার পর একটা গ্রাম পরিভ্রমণ করেছেন। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাদল সরকার নিয়মিত গ্রাম পরিভ্রমণ চালিয়ে গেছেন। সঙ্গে পেয়েছেন একদল তাজা যৌবন। রূপান্তর না ঘটলে এমনটা হয় না। সম্মিলিত প্রয়াসেই সেদিন নির্মিত হয় থিয়েটারের এক পৃথক ভাষা। জাঁকজমক বাহ্যল্যবর্জিত মাঠের নাটক, খুঁজে পেল এক নতুন প্রাণ। থার্ড থিয়েটার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল বাংলা সহ পড়শি রাজ্যেও বিশেষ করে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, মিজোরাম, মণিপুরে শতাব্দীর আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে বহু নাট্যদল এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। সেদিনের সমগ্র চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে সামাজিক দর্শনবোধ একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। এই শক্তিতে বলীয়ান হয়েই থার্ড থিয়েটার আন্দোলন দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ করেছিল। আর এই কারণেই সমকালে এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবাংলার নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার আন্দোলন একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে নিয়েছে। থার্ড থিয়েটারের একনিষ্ঠ দর্শক ও তাত্ত্বিক সহযোগী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাই বলেছেন—

“পশ্চিম বাংলার নাট্য আন্দোলনের ক্রমাগত ইতিহাসে গণনাট্য আন্দোলনের পর তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনেই বোধ হয় প্রথম আবার একটা সমাজসচেতন ভাবাদর্শের ভিত্তিমুখ পাওয়া গেল। মধ্যে যে কটি ধারার উত্থান ঘটেছে, তাদের প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য সীমিত ছিল থিয়েটারের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা তথা শক্তির উন্মোচনে, এক বিশেষ নাগরিক মধ্যবিত্ত দর্শক সমাজের রুচি ও চাহিদার সুনির্দিষ্ট পরিমণ্ডলকে মেনে নিয়েই তার যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিত হয়েছে।”^{১৭৯}

আমরা এখানেই নাট্যকর্মী বাদল সরকারের নাট্যভাবনা তথা তাঁর তৃতীয় থিয়েটার বিষয়টির আলোচনা শেষ করছি। প্রসেনিয়াম মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে যে থার্ড থিয়েটার নামক বিকল্প থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করলেন তার স্বরূপ, তার প্রয়োগ কৌশল এবং কীভাবে একটা সময়ে তা সর্বভারতীয় নাট্যআন্দোলনে পরিণত হয় সেই দিকগুলিই এই অধ্যায়ে ধরার চেষ্টা করা হলো।

সূত্র নির্দেশ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৩। বাদল সরকার তাঁর 'The Third Theatre' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বাদল সরকারের মন্তব্যটি বাংলায় ভাষান্তর করে তার উক্ত গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। সেটিই এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে।
২. ঘোষ, ঋতদ্বীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৪৩
৩. সরকার, বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ডিসেম্বর ২০০৬, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮, পৃ. ২২৭-২২৮
৪. Sircar, Badal : Voyages in the Theatre, Shri Ram Memorial Lecture iv 1992, P.54
৫. Sircar, Badal : The Third Theatre, First Published by Badal Sircar on August 1978, P.25
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৪
৭. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস : চত্রবতীর সাক্ষাৎকার : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ ফিফাস লেন, কল-৭৩, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৪
৮. বাদল সরকার, দেবশিস মজুমদারের : বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, ৬ সাক্ষাৎকার : প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল-০০১, পৃ. ১০১
৯. ঘোষ, ঋতদ্বীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৪৭
১০. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল ৯ প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড,

কল-২৫, পৃ. ১৭

১১. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার : নাট্যপত্র স্যাস, সংকলন ১৬, ৬৮ ফিফাস লেন, কল-৭৩, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৪

১২. বাদল সরকারের সঙ্গে সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার: যুগান্তর, রবিবার, ১২ ই মার্চ, ১৯৯৫, পৃ. ৭

১৩. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস : নাট্যপত্র স্যাস, সংকলন ১৬, ৬৮ ফিফাস লেন, কল-৭৩, চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার ১৯৯৯, পৃ. ২৫৫

১৪. মণ্ডল, বিভাসকান্তি : থার্ড থিয়েটার এবং বাদল সরকার, আগন্তুক, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪২১, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ৩৪০ ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (দোতলা), ঢাকা-১০০০, পৃ. ৩৫-৩৬

১৫. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০, পৃ. ১১৬। বাদল সরকার স্মারক সংখ্যায় দেবশিস চক্রবর্তী 'প্রসঙ্গ বাদল সরকার' প্রবন্ধে বাদল সরকারের মন্তব্য ব্যবহার করেছেন। এখানে সেটিই তুলে দেওয়া হয়েছে।

১৬. চৌধুরী, দর্শন : নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৯, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ১৩৮, উক্ত বই দর্শন চৌধুরী বাদল সরকারের মন্তব্য ব্যবহার করেছে, এখানে সেটিই তুলে দেওয়া হয়েছে।

১৭. তদেব : পৃ. ১৩৭-১৩৮

১৮. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০, পৃ. ১১৯

১৯. তদেব : পৃ. ১১৮

২০. সরকার, বাদল : 'ইস্তাহার', নানামুখ, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, প্রথম প্রকাশ,

- ১৯৮৮, পৃ. ২৭৮
২১. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল ৯ প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ২৩
২২. ঘোষ, ড. অরুণরতন : অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প, ২০০৪, দ্বিতীয় বর্ষ, শরৎ সেন'স কম্পাউন্ট, আমডিহা, পুরুলিয়া, পৃ. ১১
২৩. ঘোষ, ঋতদ্বীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৬৯
২৪. তদেব : পৃ. ৭০
২৫. Sircar, Badal : The Third Theatre, First Published by Badal Sircar on August 1978, P. 3
২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ২০৩
২৭. চৌধুরী, দর্শন : নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৯, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৯৮-৯৯
২৮. 'থার্ড থিয়েটার : কাউন্টার কালচার' নাম দিয়ে কর্ণিক পত্রিকায় জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৫-এ বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। পরে অমৃতলোক, বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৯৬-তে তা পুনর্মুদ্রিত হয়। বর্তমান উদ্ধৃতি অমৃতলোক থেকে দেয়া, পৃ. ৯২
২৯. সেখ জাহির আব্বাস : 'মুক্ত নাটক বিষয়ে বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, নাট্যসৃজনী, শারদসংখ্যা, ২০১১, পৃ. ২৮৫
৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৮৯
৩১. ঘোষ, ঋতদ্বীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা

- ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ.৭১
৩২. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ২০
৩৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বিচিত্র প্রবন্ধ, রঙ্গমঞ্চ, রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ পৌষ, ১৪১০, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-১৭, পৃ. ৬৮১
৩৪. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল ৯ প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ.১৮
৩৫. তদেব : পৃ. ১৮
৩৬. বাদল সরকার, দেবাশিস : বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, ৬ মজুমদারের সাক্ষাৎকার প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল-০০১, পৃ. ১০৪
৩৭. বাদল সরকারের সঙ্গে সুরজিৎ : দেশ, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, বর্ষ ৬০, ঘোষের সাক্ষাৎকার সংখ্যা ৩, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল-০১, পৃ. ৪১
৩৮. ঘোষ, ঋতদ্বীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ‘থিয়েটার বেচাকেনা’ প্রবন্ধ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ.৪৩
৩৯. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল ৯, প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ১৯
৪০. চৌধুরী, উত্তম : ১৬টি সাক্ষাৎকার, ‘বাদল সরকারের সঙ্গে কাজল চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার’, বাণী শিল্প, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫, কল-০০৯, পৃ. ১২১
৪১. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল ৯’ প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ২০

৪২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৩৫
৪৩. ঘোষ, ঋতদীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ‘থিয়েটারের মুখোশ’ প্রবন্ধ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৬৫
৪৪. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ৩৫
৪৫. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৫৯
৪৬. সরকার, বাদল : ‘রাতজাগা’, নানামুখ, লেখনী, পৃ. ২৬৯
৪৭. বাদল সরকারের সঙ্গে সুরজিৎ : দেশ, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, বর্ষ ৬০, ঘোষের সাক্ষাৎকার সংখ্যা ৩, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কল-০১, পৃ. ৪১
৪৮. সেখ জাহির আব্বাস : ‘মুক্ত নাটক বিষয়ে বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, নাট্যসৃজনী, শারদসংখ্যা, ২০১১, পৃ. ২৮৫
৪৯. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ২৮
৫০. তদেব : পৃ. ২৩
৫১. ঘোষ, ঋতদীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকারের ‘থিয়েটারি থিয়েটার: অঙ্গনমঞ্চ’ প্রবন্ধ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৪৯
৫২. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৮৮-৮৯

৫৩. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রিট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ৫২
৫৪. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'ভোমা' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ২৯৭
৫৫. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রিট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ৫৩
৫৬. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'ভোমা' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৩১৬
৫৭. অমৃতলোক : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪
৫৮. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ব্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৯৬-৯৭
৫৯. তদেব : পৃ. ৯৮
৬০. তদেব : পৃ. ১০০
৬১. অমৃতলোক : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৫৫
৬২. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ব্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৯৩
৬৩. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'গণ্ডী' নাটকের মুখবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৪০৮
৬৪. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ব্রিক লেন, কলকাতা-১৪,

	পৃ. ৪৩
৬৫. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস : চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার	নাট্যপত্র স্যাস, সংকলন ১৬, ৬৮ দিয়ার্স লেন, কল-৭৩, ১৯৯৯, পৃ. ২৬১
৬৬. তদেব :	পৃ. ২৬১
৬৭. বিশ্বাস, অদ্রীশ :	মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ৩২
৬৮. তদেব :	পৃ. ৩২-৩৩
৬৯. বাদল সরকার, দেবশিস : মজুমদারের সাক্ষাৎকার	বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল-০০১, পৃ. ১১৫
৭০. তদেব :	পৃ. ১১৭
৭১. অমৃতলোক :	বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৬৯।
৭২. সরকার, বাদল :	ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ব্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৪৫
৭৩. অমৃতলোক :	বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৬৯।
৭৪. তদেব :	পৃ. ৬৯
৭৫. সরকার, বাদল :	ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ব্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ১০৬
৭৬. তদেব :	পৃ. ১০৬
৭৭. Jerzy Grotowski :	Towards a Poor Theatre, (Edited by Eugenio Barba) Routledge A Theatre Arts Book, New York, First Routledge edition, 2002, P. 15
৭৮. তদেব :	পৃ. ১৯-২০
৭৯. তদেব :	পৃ. ১৬

৮০. সরকার, বাদল : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ‘থিয়েটারে মুখোশ’ প্রবন্ধ, ঋতদীপ ঘোষ, সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০বি ব্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৬১
৮১. Jerzy Grotowski : Towards a Poor Theatre, (Edited by Eugenio Barba) Routledge A Theatre Arts Book, New York, First Routledge edition, 2002, P. 19
৮২. তদেব : পৃ. ৫৭
৮৩. Sircar, Badal : Voyages in the Theatre, Shri Ram Memorial Lecture IV, 1992, P.54
৮৪. Sircar, Badal : The Third Theatre, First Published by Badal Sircar on August 1978, P.25
৮৫. চৌধুরী, দর্শন : নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশশতক, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১০, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১০৫
৮৬. তদেব : পৃ. ১০৫
৮৭. সরকার, বাদল : ইশতেহার, মার্চ, ১৯৭৭, নানামুখ, অঞ্জলি বসু, ১৯৮৮, পৃ. ২৭৮
৮৮. রিচার্ড শেখনারের সঙ্গে : অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প, ২০০৪, দ্বিতীয় বর্ষ, শরৎ সেন
ড. অরুণরতন ঘোষের সাক্ষাৎকার : কম্পাউন্ড, আমডিহা, পুরুলিয়া, পৃ. ১৭
৮৯. তদেব : পৃ. ১৯
৯০. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ৩২
৯১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৫-১৬
৯২. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ ফিফাস লেন, কল-৭৩, চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার : ১৯৯৯, পৃ. ২৫৯

৯৩. তদেব : পৃ. ২৫৯-২৬০
৯৪. তদেব : পৃ. ২৬০
৯৫. Sircar, Badal : The Third Theatre, First Published by Badal Sircar on August 1978, P. 40
৯৬. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ ফির্য়াস লেন, কল-৭৩, চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার ১৯৯৯, পৃ. ২৬০
৯৭. চৌধুরী, দর্শন : নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশশতক, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১০, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১০৬
৯৮. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ দির্য়াস লেন, কল-৭৩, চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার ১৯৯৯, পৃ. ২৫৯
৯৯. চৌধুরী, দর্শন : নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশশতক, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১০, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৯৫
১০০. তদেব : পৃ. ১০৯
১০১. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ ফির্য়াস লেন, কল-৭৩, চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার ১৯৯৯, পৃ. ২৬০।
১০২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাঙলার গ্রামীণ লোকনাটক (সনৎ মিত্র সম্পাদিত), উত্তর বাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য, পৃ. ১
১০৩. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, প্রবন্ধ ‘বাদল খারায়’, প্রবীর গুহ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০, পৃ. ১০৮
১০৪. চৌধুরী, দর্শন : বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেগিয়াটোলা লেন, কল-০৯, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৭, পৃ. ২৭
১০৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বিচিত্র প্রবন্ধ, রঙ্গমঞ্চ, রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ,

- চৈত্র ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ পৌষ, ১৪১০, বিশ্বভারতী, ৬
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-১৭, পৃ. ৬৮০
১০৬. চৌধুরী, দর্শন : বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেগিয়াটোলা
লেন, কল-০৯, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ,
সেপ্টেম্বর, ২০০৭, পৃ. ২৯
১০৭. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, প্রবন্ধ ‘বাংলা থিয়েটার
বাংলা নাটক’, অভিষেক বসু, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি
পত্রিকা, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড,
কল-২০, পৃ. ১৬৬
১০৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বিচিত্র প্রবন্ধ, রঙ্গমঞ্চ, রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড,
১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ,
চৈত্র ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ পৌষ, ১৪১০, বিশ্বভারতী, ৬
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-১৭, পৃ. ৬৮১
১০৯. তদেব : পৃ. ৬৮০
১১০. তদেব : পৃ. ৬৮০
১১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : ‘তপতী’ নাটক, ভূমিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড,
জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ,
১৩৬৮, পৃ. ১০৩৩-৩৪
১১২. তদেব : পৃ. ১০৩৪
১১৩. বাদল সরকারের সঙ্গে সুরজিৎ : দেশ, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, বর্ষ ৬০,
ঘোষের সাক্ষাৎকার
সংখ্যা ৩, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কল-০১, পৃ. ৪০
১১৪. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ ফির্য়াস লেন, কল-৭৩,
চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার
১৯৯৯, পৃ. ২৫৬
১১৫. সরকার, বাদল : প্রবাহের হিজিবিজি, লেখনী, ডিসেম্বর, ২০০৬, ৯০০
পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-১২, পৃ. ২৮
১১৬. তদেব : পৃ. ২২৮
১১৭. বাদল সরকারের সঙ্গে দীপঙ্কর : অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, অক্টোবর, ১৯৯৩, পৃ. ১৫৬
দত্তের সাক্ষাৎকার

১১৮. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল ৯ প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ৩৩
১১৯. সরকার, বাদল : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ‘অঙ্গনমধ্যে অভিনয়’ প্রবন্ধ, ঋতদীপ ঘোষ, সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৪২।
১২০. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, প্রবন্ধ ‘বাদল সরকার: একাত্তরের এক স্মৃতি’ অমিয় দেব, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০, পৃ. ৩৪
১২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, সীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, পৃ. ২০১-২০২
১২২. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’ নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ২৪৬-২৪৭
১২৩. চৌধুরী, দর্শন : নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশশতক, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১০, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১৯১
১২৪. অমৃতলোক : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৫২
১২৫. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রিট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ৪২
১২৬. তদেব : পৃ. ৪৩
১২৭. সরকার, বাদল : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ‘তৃতীয় থিয়েটার বাঙালি দর্শক’ প্রবন্ধ, ঋতদীপ ঘোষ, সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০বি ক্রিক লেন,

- কল-১৪, পৃ. ৬৯
১২৮. অমৃতলোক : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, 'থার্ড থিয়েটার কাউন্টার কালচার', জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৯৩
১২৯. সরকার, বাদল : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'তৃতীয় থিয়েটার বাঙালি দর্শক' প্রবন্ধ, ঋতদীপ ঘোষ, সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৭১
১৩০. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ২২
১৩১. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৩
১৩২. সরকার, বাদল : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'থিয়েটারি থিয়েটার : অঙ্গনমঞ্চ' প্রবন্ধ, ঋতদীপ ঘোষ, সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৪৮-৪৯
১৩৩. বাদল সরকারের সঙ্গে সুরজিৎ : দেশ, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, বর্ষ ৬০, ঘোষের সাক্ষাৎকার সংখ্যা ৩, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কল-০১, পৃ. ৪১
১৩৪. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৫০
১৩৫. তদেব : পৃ. ৮৭
১৩৬. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৬২
১৩৭. বাদল সরকারের সঙ্গে সুরজিৎ : দেশ, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, বর্ষ ৬০, ঘোষের সাক্ষাৎকার সংখ্যা ৩, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কল-০১, পৃ. ৪১

১৩৮. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ২৬-
২৭। এই গ্রন্থে একাত্তরের বীভৎস রাস্ত্রীয় সন্ত্রাসের তথ্য
তুলে ধরতে কল্যাণী ভট্টাচার্যের উক্ত গ্রন্থ থেকে তথ্য
তুলে ধরেছেন। এখানে সেটিই তুলে ধরা হয়েছে।
১৩৯. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘মিছিল’ নাটক, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩,
পৃ. ২০৯
১৪০. তদেব : পৃ. ২১১
১৪১. তদেব : পৃ. ২১১
১৪২. তদেব : পৃ. ২১০
১৪৩. তদেব : পৃ. ২৩২
১৪৪. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল প্রকাশনা, প্রথম
সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড,
কল-২৫, পৃ. ৩৫-৩৬
১৪৫. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬,
পৃ. ১০
১৪৬. তদেব : পৃ. ২১
১৪৭. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘মিছিল’ নাটক, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩,
পৃ. ২৩২
১৪৮. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬,
পৃ. ৩২-৩৩
১৪৯. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রিট,
কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ২৩
১৫০. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘ভোমা’ নাটক, মিত্র ও ঘোষ

		পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ২৯৫
১৫১. তদেব	:	পৃ. ২৯৪
১৫২. রায়, বিশাখা	:	থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৪৬-৪৭
১৫৩. সরকার, বাদল	:	নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'ভোমা' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৩২৯
১৫৪. তদেব	:	পৃ. ৩০১-৩০২
১৫৫. রায়, বিশাখা	:	থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৫৩
১৫৬. তদেব	:	পৃ. ৫৪
১৫৭. সরকার, বাদল	:	নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'ভোমা' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৩২৮-৩২৯
১৫৮. রায়, বিশাখা	:	থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৬৭
১৫৯. তদেব	:	পৃ. ৪০
১৬০. সরকার, বাদল	:	ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৬২
১৬১. সরকার, বাদল	:	নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'ভোমা' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৩৩১-৩৩২

১৬২. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬,
পৃ. ৪৮
১৬৩. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ
ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১
শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪,
পৃ. ৭৯
১৬৪. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬,
পৃ. ৮০
১৬৫. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ
ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১
শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪,
পৃ. ৭৫-৭৬
১৬৬. তদেব : পৃ. ৭৭
১৬৭. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘বাসি খবর’ নাটক, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩,
পৃ. ৫১০
১৬৮. তদেব : পৃ. ৪৯৮-৪৯৯
১৬৯. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬,
পৃ. ৯৫
১৭০. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘বাসি খবর’ নাটক, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩,
পৃ. ৪৮৬-৪৮৭
১৭১. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ
ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১
শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪,
পৃ. ৬৭

১৭২. তদেব : পৃ. ৬৭
১৭৩. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬,
পৃ. ১১০
১৭৪. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রীট,
কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ৫৮-৫৯
১৭৫. ঘোষ, ড. অরুণরতন ও : অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প, ২০০৪, দ্বিতীয় বর্ষ, শরৎ সেজ'স
ঘোষ, ড. অসীমরতন : কম্পাউন্ট, আমডিহা, পুরুলিয়া, পৃ. ৯
১৭৬. চক্রবর্তী, দেবশিস : পরিক্রমা তিন দশক, মীরা প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয়
সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৮, ৪২২, গড়ফা মেন রোড,
কল-৭৫, পৃ. ৮৪
১৭৭. তদেব : পৃ. ৭৪
১৭৮. তদেব : পৃ. ১১
১৭৯. তদেব : পৃ. ২৫

চতুর্থ অধ্যায় সমকালীন নাট্যকর্মী ও বাদল সরকার

বাদল সরকারের সমসময়ে বা প্রায় সমসময়ে বাংলা থিয়েটারে আবির্ভূত হন বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত কিংবা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নাট্যব্যক্তিত্ব। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের নাট্যকর্মের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা থিয়েটারকে একটা উচ্চতর স্থানে যে নিয়ে গেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গতানুগতিক বাণিজ্যিক থিয়েটারের ধারা থেকে সরে এসে বাংলা থিয়েটারে এক স্বতন্ত্র নাট্যাভিনয়ের ধারার সূচনা করেন বিজন ভট্টাচার্য। তাঁর হাত ধরেই নাট্যাভিনয়ের জগতে প্রথম একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। শম্ভু মিত্র ও তাঁর ‘বহুরূপী’ নাট্যদল ষাট-সত্তরের দশকে প্রবলভাবে বাংলা থিয়েটারে প্রায় একছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল। অভিনয়, উপস্থাপনার সর্বাপেক্ষা মান-এ শম্ভু মিত্র ও বহুরূপী নাট্যদল তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। অন্যদিকে উৎপল দত্ত প্রথমে ‘লিটিল থিয়েটার গ্রুপ’ ও পরবর্তিতে ‘পিপলস থিয়েটার’ নিয়ে একের পর এক নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারে তিনিও একটি স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণ করেছেন। নাটকের বিষয়ের বিস্তারে, ভাবনার প্রকাশে এবং উপস্থাপনার মুগ্ধিয়ানায় বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়কে একটা ভিন্ন স্তরে পৌঁছে দেন। উৎপল দত্তের পরে পরেই বাংলা থিয়েটারের আবির্ভাব ঘটে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্তের দ্বিমুখী নাট্যপ্রযোজনা বিভিন্ন বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের পাশে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর এক ভিন্নমুখী ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই চারজন নাট্যব্যক্তিত্বের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য বাদল সরকারের অনেকটাই পূর্ববর্তীকালের। আর শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সময়ের দিক থেকে তাঁরা নিকটবর্তী এবং বাদল সরকার তাঁদের সামসাময়িক। ভবেশ দাশ এ সম্পর্কে লিখেছেন,

“শম্ভু মিত্র উৎপল দত্ত আর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিনটে নাম একইসঙ্গে উচ্চারিত হয়... যেন নাট্যের একটা যুগ বোঝাতে এই তিনটে নামেরই উচ্চারণ অনিবার্য।”

আমরা এই অধ্যায়ে সমকালীন এই প্রথিতযশা নাট্যব্যক্তিত্বের নাট্যকর্মের বিশেষ অবদান ও আঙ্গিকের উল্লেখ নাট্যকর্মী বাদল সরকারের নাট্যকর্মের অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করব। নাট্যসৃজনের ক্ষেত্রে কোন কোন দিক থেকে এঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছেন সেটিই এই আলোচনায় তুলে ধরা হবে। মনে রাখতে হবে, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনজনেরই নাট্যভাবনার বুনিয়াদ তৈরি হয় গণনাট্য সংঘের পরিমণ্ডলে। আর সেই সূত্রে গণনাট্য

সঙ্ঘের কথাও এখানে উঠে আসে। এই কারণে আমরা এখানে গণনাট্য সঙ্ঘের একজন অন্যতম প্রতিনিধি স্থানীয় নাট্যব্যক্তিত্ব বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্মের স্বরূপ অন্বেষণের মধ্য দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছি। তাঁকে বাদ দিয়ে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা বাদল সরকারের নাট্যকর্মের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বলা বাহুল্য বাদল সরকারের সমকালে আরো বহু খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা তাঁদের অসাধারণ নাট্যসৃজন কর্মের দ্বারা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাট্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। নাট্যক্ষেত্রে তাঁদের অবদান কোনোদিক থেকেই অস্বীকার করার নয়। তাঁদের মধ্য থেকে আমরা উক্ত কয়েকজন নাট্যকারকে আলোচনার কেন্দ্রে এনেছি এই কারণে যে তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলা থিয়েটারের জগতে একজন প্রতিনিধি স্থানীয় নাট্যব্যক্তিত্ব। তাঁরা প্রত্যেকেই গতানুগতিক থিয়েটার ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে নাট্যজন প্রক্রিয়াকে এক একটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছেন।

আমরা শুরুতেই আলোচনা করবো বাংলা প্রগতিশীল গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্যের (জন্ম-১৭ই জুলাই, ১৯১৭ ফরিদপুর; মৃত্যু- ১ জানুয়ারি, ১৯৭৮) নাট্যকর্ম সম্পর্কে। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যজীবন শুরু হয় চল্লিশের দশকে। বাংলা থিয়েটারের তখন বন্ধ্যাদশা। তখন নতুন নাট্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি। যে থিয়েটার আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম তা জীর্ণ হতে হতে, ক্লান্ত হতে হতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিল যাতে কেবল কিছু স্বয়ম্ভু অভিনেতা তাঁদের দাপট দেখাবেন আর নাটক সেই দাপটকে আরো উচ্চকিত করে তুলবে, এই ছিল তখন থিয়েটারগুলির একমাত্র ভূমিকা। আর নাটকের বিষয়? কখনো ইতিহাস, কখনো পুরাণের আশ্রয়ে নিতান্ত পারিবারিক সুখ-দুঃখের কাহিনি। বাণিজ্যিক থিয়েটারগুলিতে এভাবেই অভিনয় চলছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নতুন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা, এদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তরের করালগ্রাস, স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বার জোয়ারে বাংলা থিয়েটারের সব জীর্ণতা ধুয়েমুছে তৈরি হলো এক স্বতন্ত্র নাট্যআন্দোলন— গণনাট্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের সূচনা করেন কিছু ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী গোষ্ঠী। এঁদেরই সংস্কৃতির শাখা ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা ইণ্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন যা আই.পি.টি.এ. নামে পরিচিত। এই গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত থেকেই বিজন ভট্টাচার্যের নাট্য জীবনের সূত্রপাত ও বিকাশ। গণনাট্য সংঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল নাটক উপস্থাপনার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ, শোষণ ও যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে মানুষকে জাগিয়ে তোলা এবং নিপীড়িত জনগণকে পাদপ্রদীপের আলোয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। অভিনয়ের ব্যাপারে স্থির করা হয় যে পুরোনো নাটকের বদলে এমন নাটক অভিনয় করা হবে যার মাধ্যমে প্রকাশ পাবে একালের কথা

অর্থাৎ যেসব ভয়াবহ জটিল বৃহৎ সমস্যা যা সকল নিপীড়িত মানুষের বক্তব্য হয়ে উঠবে। কিন্তু তেমন নাটক কোথায়? তেমন নাট্যকর্মী বা কোথায়? ঠিক এই সময় বাংলা থিয়েটারের জগতে উঠে এলেন বিজন ভট্টাচার্য। যিনি নিজেও বিশ্বাস করেন শিল্প সাহিত্য হবে মানুষের জন্য। বিজন ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন, সেই সূত্রেই সাধারণ মানুষের জীবন ও যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন। কীভাবে তিনি নাটকে এলেন? শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

“... স্মৃতিচারণায় বলেছেন বিজনদা, ডি এন মিত্র স্কোএরের গা দিয়ে তাঁকে যেতে হত, যে রাস্তায় তখন তিনি থাকতেন, ডা. রাজেন্দ্র রোড, ভবানীপুরে। যেতে যেতে লক্ষ্য করতেন যে, ওই স্কোএরে বহু দুর্ভিক্ষপীড়িত, দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষ, তারা ওইখানে বাস করে, দিনযাপন করে। নারী, পুরুষ, শিশু। বিজনদা স্মৃতিচারণায় বলেছেন, ‘আমি যখন ওখান দিয়ে যেতাম, আমি লজ্জায়, গ্লানিতে, অপরাধবোধে কোনোদিন মুখ তুলে চাইতাম না। বারবার মনে হত আমরা তো কিছু করতে পারি না, আমরা তো কিছু করি না, কী করে তাকাব ওদের দিকে?’”

এই মানুষগুলোর কথা তিনি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কীভাবে বলবেন? তখন তাঁর মনে হয়েছে সেটা সাহিত্যের অন্য কোনো বাহনে শোনানো যায় না, তার কারণ অন্য যে কোনো বাহনে লেখকের এমন একটা প্রভুত্ব থাকে, এমন একটা আধিপত্য থাকে, যে লেখক যেন সব জেনে-বুঝে বসে আছেন, সেখান থেকে এদের কথা বলা যায় না। তখনই তাঁর মনে হয়,

“যদি ওরা নিজেদের কথা নিজেরা বলে, তবেই হতে পারে। এবং সেখান থেকে কোথাও মনে হয় যে, সেই বাহন হতে পারে কেবলমাত্র নাটক। যেখানে... তিনি নিজেকে নাটকের মাঝখানে এনে স্থাপন করবেন না। তিনি বাইরে থাকবেন, দূরে থাকবেন, সরে থাকবেন, আর এই নাটকের মানুষগুলো মানুষ হয়ে উঠবে নাটকের চৌহদ্দির মধ্যে-তার স্বতন্ত্র স্বাধীন চৌহদ্দির মধ্যে-নাট্যকার সুতোর টানে তাদের খেলাবেন না।”

এই তাগিদ থেকেই বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যজগতে আসা। আর একই কারণে যুক্ত হয়ে পড়েন গণনাট্য সংঘের সঙ্গে। এই গণনাট্য সংঘের জন্যই এরপর লিখতে থাকেন একের পর এক নাটক। নাটক রচনা, অভিনয় এবং নির্দেশনা সবকিছুই পরিচালিত হয় গণনাট্যের আদর্শ মেনে। গণনাট্য সংঘের ঘোষিত নীতি হলো, শিল্প হবে মানুষের জন্য। এই ভাবধারায় তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা ‘আগুন’

নাটক। এটি একটি একাক্ষ নাটক। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রয়োজনায়া নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৩ সালের ২৩ মে নাট্যভারতী মঞ্চে। অভিনয়ে ছিলেন সুধী প্রধান, তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র) প্রমুখ। পরিচালনায় এবং প্রধান ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং বিজন ভট্টাচার্য। এরপর তিনি লিখলেন ‘জবানবন্দী’। গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে ১৯৪৪-এর ৩ জানুয়ারি স্টার থিয়েটারে নাটকটি অভিনীত হয়। সুধী প্রধানের ‘নবনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি এই নাটকের পরিচালনায় ছিলেন শম্ভু মিত্র। এই নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, সুধী প্রধান, তৃপ্তি ভাদুড়ী, বাণী চক্রবর্তী, রবীন মজুমদার প্রমুখ। এই নাটকে প্রথাগত নাটকের মতো গান নেই, হাসি নেই, নাটুকে সংলাপ নেই, আছে একেবারে সহজ, সুস্পষ্ট নাট্যঘটনা। সন্ধ্যা দে এই নাটকের মূল্যায়ন করতে গিয়ে যথাযথই বলেছেন,

“‘জবানবন্দী’-কে পুরো নাটক না বলে চিত্র বা নকশা বললেই ঠিক বলা হবে।

এক কথায় বলা যেতে পারে, ঐতিহাসিক মহা মন্বন্তরের পটভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্যের ‘জবানবন্দী’-র জন্ম, সচেতন জনজীবনের রূপকার গণনাট্যের জন্ম।”^৪

‘জবানবন্দী’-র পর বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক ‘নবান্ন’। প্রথম অভিনীত হয় ১৯৪৪-এর ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে। শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য নাটকটির যুগ্ম পরিচালনার ভার নেন। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, গঙ্গাপদ বসু, শোভা সেন, তৃপ্তি ভাদুড়ী, মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ। এই নাটকটি বস্তুত মরণবিজয়ী গ্রামীণ কৃষক সমাজের অন্তরের বলিষ্ঠ আশাবাদেরই প্রতীক। গণঅভিনয়ের মাধ্যমে, গণজীবনকে তুলে ধরা, গণসঙ্গীতের ব্যবহার, চট দিয়ে মঞ্চসজ্জা, তাৎপর্যপূর্ণ আলোর প্রয়োগ দারিদ্র্যের প্রতিফলন স্বরূপ সব কিছু মিলিয়ে ‘নবান্ন’ সেদিন গণনাট্য আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষ স্পর্শ করেছিল। এরপর তিনি একে একে রচনা করেন ‘অবরোধ’, ‘জীয়েন কন্যা’, ‘মরাচাঁদ’, ‘কলঙ্ক’, ‘গোত্রান্তর’ প্রভৃতি নাটক। তবে স্বাধীনতার পর থেকেই ধীরে ধীরে গণনাট্য সঙ্ঘ-এ ভাঙ্গন শুরু হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, তীব্র মতানৈক্য— এই সবকিছু গণনাট্য আন্দোলনের ওপর চরম আঘাত নেমে আসে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৯-এ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। আরো অনেক কারণেই গণনাট্য আন্দোলনের উপর মর্মান্তিক আঘাত নেমে আসে, তখন গণনাট্যের ভাঙন রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৪৮-এ গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখকে নিয়ে শম্ভু মিত্র গঠন করলেন ‘বহুরূপী নাট্যগ্রুপ’, ১৯৫০-এ উৎপল দত্ত তৈরি করলেন ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’, আর বিজন ভট্টাচার্য ১৯৫১-তে তৈরি করলেন নিজের নাট্যদল ‘ক্যালকাটা থিয়েটার’

(১৯৫১-৭০)। অবশ্য গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এলেও তখনও গণনাট্য সংঘের আদর্শ ও ভাবধারা থেকেই তিনি সরে আসতে পারেননি। এই পর্বে লেখা হল, ‘ছায়াপথ’ (১৯৬১), ‘মাস্টারমশাই’ (১৯৬১), ‘কৃষ্ণপক্ষ’ (১৯৬৬), ‘ধর্মগোলা’ (১৯৬৬), ‘দেবীগর্জন’ (১৯৬৬), ‘গর্ভবতী জননী’ (১৯৬৯) এর মতো নাটক। এই পর্বে লেখা নাটকগুলির মধ্যে— এক অর্থে ‘নবান্ন’ উত্তর পর্বে বিজন ভট্টাচার্যের লেখা সবচেয়ে আলোচিত নাটক হল ‘দেবীগর্জন’। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৬-র ২১ ফেব্রুয়ারি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জাতীয় সংহতি সম্মেলন উৎসবে। নির্দেশনায় ছিলেন স্বয়ং বিজন ভট্টাচার্য। মঞ্চ পরিকল্পনা আবহসংগীত আলোকসম্পাত রূপসজ্জায় ছিলেন যথাক্রমে খালেদ চৌধুরী, প্রদীপ চক্রবর্তী ও শক্তি সেন। সঙ্গীত ও সুর সৃষ্টিতে ছিলেন স্বয়ং নাট্যকার। আর অভিনয় করেছিলেন, কালী মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ, চন্দন লাহিড়ী, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ। পচাগলা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার বিসর্জনের বাজনার তালে তালে ভুঁইচাষীদের কণ্ঠে নতুনকালের ‘দেবীগর্জন’ এখানে ধ্বনিত হয়েছে। বীরভূমের আদিবাসী সাঁওতাল কৃষক সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রামের কাহিনির প্রেক্ষাপটে, তিনি এখানে মেহনতী মানুষের সংগ্রামের এক নতুন ইতিহাস নির্মাণ করেছেন। পৌরাণিক রূপকল্প ও একালের শ্রেণিসংগ্রাম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এই নাটকে।

দেবীগর্জন-এর পর বিজন ভট্টাচার্য ও তাঁর দল ক্যালটাকা থিয়েটার নামায় ‘গর্ভবতী জননী’। মুক্ত অঙ্গনে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৯-এর মে মাসে। নাটকের পরিচালনায় বিজন ভট্টাচার্য। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন, বিজন ভট্টাচার্য, সৌমেন মজুমদার, শ্যামল ঘোষ, বিজয় চক্রবর্তী, ছন্দা চ্যাটার্জী প্রমুখ। নাটকটির আবহসংগীত, মঞ্চ ব্যবস্থা, রূপসজ্জা ও আলোকসম্পাতে ছিলেন যথাক্রমে মুরারী ধর, তরুণতপন লাহিড়ী, অনাথ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মল্লিক। নাটকের পটভূমি একটি গ্রাম, দারিদ্র্য যেখানকান মানুষের নিত্য সঙ্গী। জঙ্গল থেকে গাছ-গাছরা সংগ্রহ করাই এই গ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ। সুযোগ সন্ধানী পাইকাররা তাদের শোষণ করে। তাদের শয়তানি বুদ্ধিতে নাজেহাল হয়েও ওরা বাঁচে। ‘গর্ভবতী জননী’র গল্প বলতে এটুকুই। কিন্তু এই সামান্য বিষয় সম্বল করে নাট্যকার আমাদের নিয়ে যান এক অন্য জগতে। একটি মাত্র সেট, প্রশস্ত একটি চত্বরই ঘটে চলে পুরো নাট্যঘটনা। যেন একটি গোটা গ্রাম বাংলা প্রাণ পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর এখানেই পরম বেদনায় ধ্বনিত হয়ে উঠেছে সেই সর্বনাশা সময়, যখন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লিপ্ত সন্তানেরা তাদের জননীকেও চিনতে পারে না। বিজন ভট্টাচার্যের এ এক অসাধারণ নাট্যসৃষ্টি। আনন্দবাজার পত্রিকা তাদের ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০ সংখ্যায় নাটকটির প্রশংসা করে একটি লেখা প্রকাশ করে। তার উল্লেখ পাই নাট্যগবেষক, অভিনেত্রী সন্ধ্যা দে-র একটি গ্রন্থে। আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়,

“না, শুধু গ্রাম আর মানুষ, মাটি মন আর বিশ্বাসই গর্ভবতী জননীর শেষ কথা নয়। নাটক শেষ হলে আসন ছাড়তে ভুলে গিয়েছিলাম। গর্ভবতী জননী তবে কী? প্রতিকী নাটক? ভিন্নতর জীবনদর্শনের এক দৃশ্যকাব্য? হ্যাঁ তাই। আমরা ধরে নিতে পারি এই গ্রাম অতীতের ভারত, আজকের ভারত এবং ভবিষ্যতেরও। সারল্য আর বুদ্ধির যে দ্বন্দ্ব তা চিরকালীন।”^৫

এরপরে তিনি সত্তরের দশকের গোড়াতেই ক্যালকাটা থিয়েটার থেকে সরে এসে আবার ‘কবচকুণ্ডল’ নামে নতুন একটি নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা (১৯৭০-৭৮) করেন। এই পর্ব থেকেই নাট্যকারের মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে লোকায়ত ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। “স্বয়ং নাট্যকার নিজের মুখে উচ্চারণ করেছিলেন, ‘আমিও বিভ্রান্ত’। তীব্র সংলগ্নতা ও আবেগ তীব্রতা চেনাভঙ্গী পরিহার করে এখানে নাট্যকারকে দেখা যায় নিরাসক্ত দার্শনিকের ভূমিকায়।”^৬ এই পর্বের লেখা নাটকগুলির নাট্য প্রযোজনার মধ্যে এই ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

কবচকুণ্ডল পর্বে বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক ‘সোনার বাংলা’। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত এই নাটকটি বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের উদ্যোগে ও কবচকুণ্ডল-এর প্রযোজনায় প্রথম পরিবেশিত হয় ইডেন গার্ডেন-এ। নির্দেশনায় ছিলেন ভট্টাচার্য নিজেই। কবচকুণ্ডল পর্বে তাঁর দ্বিতীয় নাটক ‘কৃষ্ণপক্ষ’। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১২ জানুয়ারি, ১৯৭৫-এ, রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। বহু চরিত্র নিয়ে বিশাল দলগত এই প্রযোজনায় নির্দেশক ও সংগঠক হিসেবে বিজন ভট্টাচার্য এই নাটকে এক সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকা পালন করেন। ওই একই বছরে ২২ শে মার্চ রবীন্দ্রসদন নাট্যোৎসবে কবচকুণ্ডল প্রযোজনা করে বিজন ভট্টাচার্যের রচিত ও নির্দেশিত নাটক ‘আজ বসন্ত’। এই নাটকে মাত্র চারটি চরিত্র। অভিনয় করেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী বসু ও রামকৃষ্ণ সিন্হা রায়। সঙ্গীত সৃষ্টি ও আলোকসম্পাতে নাটকটিকে রীতিমত বাধ্বয় করে তুলেছিলেন দীপক চৌধুরী ও তাপস সেন।

জীবন ও ভালোবাসাকে গ্রাস করার জন্য একালের কঠিন পরিবেশে যে প্রতিকূলতা ও সংকট তৈরি হচ্ছে নাট্যকার সেই অসহায় পরিস্থিতির একটি বেদনাময় কাহিনি এখানে তুলে ধরেছেন। নাটকের নায়ক তরুণ প্রেমিকটি উপলব্ধি করে যে চারদিকে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে যৌবন ভালোবাসাকে পিষে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে। আপাতত নিরীহ এই কাহিনির মধ্যে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, লুবিয়াংকা, কারাগাণ্ডা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক নির্যাতন প্রসঙ্গ এনে বিজন ভট্টাচার্য নাটকটির সীমাকে কখনো কখনো আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

বিজন ভট্টাচার্যের শেষ নাটক ‘চলো সাগরে’। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে রচিত এই নাটকে

সমকালীন বাম ঘেঁষা নাট্যপ্রয়াসের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৭৭-এর ৩০ মার্চ, তপন থিয়েটারে। নির্দেশনার দায়িত্ব ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। অভিনয় করেন বিজন ভট্টাচার্য, সমরেশ মজুমদার, অসিত মুখার্জি, অশোক চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট অভিনেত্রী মলিনাদেবী। এই নাটকের মঞ্চ আলো রূপসজ্জা ও সঙ্গীতের দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, শক্তি সেন প্রমুখ। তবে দুর্বল প্রযোজনা ও সংগঠনের ত্রুটির জন্য নাটকটি সেই অর্থে মঞ্চসফল হতে পারেনি।

বিজন ভট্টাচার্য তো শুধুমাত্র নাটককারণ নয়, একজন দক্ষ নাট্যসংগঠনও। নাটক রচনা থেকে নাট্যপ্রযোজনা সর্বত্রই তিনি প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মধ্যে থেকেও নিজের স্বতন্ত্র নাট্যভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকে বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের সমালোচনা করে বলেন যে তাঁর নাটকগুলি অনেক বেশি আলগা, শৃংখলাবদ্ধ নয়, তার নাটক গোছানো নয়, সাজানো নয় সুচারুরূপে বিন্যস্ত নয়। কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যের নাটক সম্পর্কে এই ধরনের সমালোচনা ঠিক নয়। আসলে যে নাট্যশৃঙ্খলার কথা বলা হয়, তা তো বিলেতি নাটক থেকে আমদানিকৃত নাট্যশৃঙ্খলা। সেই শৃঙ্খলা নাটকের কোন স্বভাবজাত ধর্ম নয়। এটা একধরনের চাপিয়ে দেওয়া প্রথা, নাটককে বেঁধে রাখার প্রয়াস। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক এই বন্ধন থেকে মুক্ত। থিয়েটারের সীমিত হিসেবিপনার মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। এ প্রসঙ্গে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় যে মূল্যায়ন করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন,

“... যেহেতু বিজনদা নাটকের ওই রকম একটা পূর্বনির্ধারিত বিন্যাসকে অবধারিত বলে গ্রহণ করেননি, যেহেতু বারবার একেকটা সামাজিক, ঐতিহাসিক সংকটের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, একেকটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, তাঁকে আবার নাটকে আসতে হয়েছে, নাটক তৈরি করতে হয়েছে, কোনো বাঁধা ধরা নাটকের পথ তিনি গ্রহণ করেননি।”^{৭৭}

আমরা বলবো এখানেই বিজন ভট্টাচার্য স্বতন্ত্র। আরো বহু বিষয় থেকে বিজন ভট্টাচার্য গতানুগতিক ধারাকে ভেঙেছেন। আমরা যদি নাটকের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব একটা সময় ছিল যখন নাটক মানেই যেন দর্শকের কাছে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রং ঢং-এ সাজ। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কথা বলার ভঙ্গিও যেন সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা, সম্পূর্ণ পৃথক। সবসময় একটা নাটকীয়তা তাতে বজায় থাকতো। বিজন ভট্টাচার্য এই প্রথা থেকে সরে আসলেন। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলো নিজেরাই নিজেদের কথা বলে, বাইরে থেকে কোনকিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না। ফলে দর্শকরা আর মঞ্চে স্বর্গলোকের মানুষকে দেখলো না, তারা যেন তাদেরই পরিচিত কোন

এক গ্রামের দুর্গত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ। যেখানে কোন সাজসজ্জার বাহুল্য নেই, নেই কোন অতিনাটকীয়তা। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্য ভাবনার আরেকটা নতুনত্ব হলো তিনি পথকে মঞ্চে তুলে এনেছেন। তাঁর ‘জবানবন্দী’, ‘নবান্ন’, ‘দেবীগর্জন’-র মতো বেশকিছু নাটক আছে যেগুলির শিকড় বাংলার মাটিতে। তাঁর নাটকের মানুষগুলি যেন জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত বাঙালি। এরা অধিকাংশই গ্রাম বাংলার প্রতিনিধি। তারাই নাটকের প্রাণ।

নাট্য প্রযোজনা ক্ষেত্রেও বিজন ভট্টাচার্য পুরাতন ঐতিহ্য থেকে সরে এলেন, নির্মাণ করলেন এক স্বতন্ত্র ধারা। এতদিন নাটকে মঞ্চসজ্জার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হত বিজন ভট্টাচার্য নানা পদ্ধতিতে সেই খরচ কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। দর্শক যাতে বুঝতে পারে কোনটা ড্রইংরুম কোনটাপ ফুটপাথ আর কোনটা ধনী বিত্তশালীর ঘর, তার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই তিনি করলেন। মঞ্চে বস্তুভার অনেক কমিয়ে আনলেন। অবশ্য এই সবার মূলে কাজ করেছে গণনাট্য সংঘের প্রেরণা। কেননা গণনাট্য সংঘের ঘোষিত নীতিই হলো, নাটক হবে সাধারণ মানুষের জন্য, তাদের নিয়েই রচিত হবে নাটক। আর এই নাটক যেহেতু সাধারণের, তাই গ্রাম-গঞ্জে ছুটতে হবে নাট্যকর্মীদের। ফলে বিশাল মাপের বস্তুভার হলে সেগুলি বহন করে নিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সেই বস্তুভার কমাতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই খরচ কমে গেল। পুরাতন পথ থেকে সরে এসে নির্মাণ করলেন এক স্বতন্ত্র ধারা। ঋত্বিক ঘটকের মতে বলা যায়— বিজন ভট্টাচার্যই প্রথম দেখালেন কি করে জনতার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হয়, কি করে সম্মিলিত অভিনয় ধারার প্রবর্তন করা যায় এবং কি করে বাস্তবের একটা অংশের অখণ্ডরূপ মঞ্চের উপর তুলে ধরা যায়।

মঞ্চস্থ উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও বিজন ভট্টাচার্য গতানুগতিক ধারা থেকে সরে এসেছেন। যেহেতু তাঁর নাটকের বেশিরভাগ চরিত্রই নিম্নবিত্ত শ্রেণি থেকে উঠে আসা, ফলে রাজা-মহারাজার সাজ-পোশাকের এতদিনকার ঐতিহ্যের পরিবর্তে তা হয়ে উঠলো অতি সাধারণ। নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দেশজ সংস্কৃতির ব্যবহার। ‘নবান্ন’ নাটকে গ্রামীণ জীবনকে তুলে ধরেছেন চটের মতো সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করে। চটের সরল সহজ সেটের ব্যবহার করে সেদিন তিনি দর্শককে চমকে দিয়েছিলেন। ‘জীবনকন্যা’ নাটক তো লোকায়ত দেশজ গীতিপালার এক অনন্য নিদর্শন।

বিজন ভট্টাচার্য যেহেতু নিজে একজন অভিনেতা ফলে তিনি অভিনয়ের খুঁটিনাটি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর অভিনয় ভঙ্গির মধ্যে কোন আবেগের আতিশয্য নেই। নেই কোন অতিনাটকীয়তা। অবশ্য শুধু বিজন ভট্টাচার্য নয়, গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা এতদিন ধরে যে অভিনয় রীতি চলে আসছিল তার থেকে অনেকাংশেই সরে এলেন। এই সব শিল্পীদের মধ্যে শম্ভু মিত্র ছাড়া

কিন্তু কেউই পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তারা পেশাদারী মঞ্চের অভিনয়ের ঐতিহ্যকে প্রায় অস্বীকারই করলেন। শুধুমাত্র শম্ভু মিত্র এবং বাকি দু-একজনের অভিনয়ের মধ্যে পেশাদারী থিয়েটারের সুরেলা, আবৃত্তিমূলক, নাসিক্য উচ্চারণ এবং শব্দ প্রয়োগের কুশলতা কাজ করেছিল। বাকিটা অভিনয় করতে এসে জীবন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে জীবনের তাগিদেই অভিনয় করে গেছেন। অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য এই নতুন অভিনয় ধারার অন্যতম পথপ্রদর্শক।

বিজন ভট্টাচার্য শুধু একজন অভিনেতা নন তিনি একজন অভিনয় শিক্ষকও। তিনি মনে করতেন, নন অ্যাকটিং ইজ দি বেস্ট অ্যাকটিং। তিনি মনে করতেন অভিনয় তৈরি করে চরিত্র চৈরি করা যায় না চরিত্রের মধ্য থেকেই অভিনয় বের করে আনতে হয়। শরমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি বলেছেন,

“... যিনি অভিনয় করবেন তিনি কতটা অভিনেতা বা অভিনেত্রী আমার তা জানার দরকার নেই। আমি যা জানতে চাই ... চরিত্রের সঙ্গে চেতনার স্তরে, বোধের স্তরে তার কতটা আত্মীয়তা আছে। ... অভিনয় তৈরি করে ... চরিত্র তৈরি করা যাবে না। ... চরিত্রের মধ্য থেকে অভিনয়কে আহরণ করতে হয়।”^৮

বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যজগতের আর এক অন্যতম কিংবদন্তি নাট্যকর্মী হলেন শম্ভু মিত্র (জন্ম ২২ আগস্ট ১৯১৫, দক্ষিণ কলকাতায়, ডোভার রোড, মৃত্যু- ১৯ মে ১৯৯৭)। শম্ভু মিত্রের নাট্যজীবন শুরু হয় চল্লিশের দশকে, পেশাদারী থিয়েটারে অভিনয় দিয়ে (১৯৩৯-৪২)। ১৯৩৯ সালে অভিনেতা হিসেবে যোগ দেন রঙমহল থিয়েটারে। এখানে বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘মাটির ঘর’, ‘মালা রায়’, ‘রত্নদ্বীপ’ প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন। এই খানেই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। যিনি নাট্যক্ষেত্রের ‘মহর্ষি’ নামেই অধিক পরিচিত। তাঁর সঙ্গে শম্ভু মিত্রের ঘনিষ্ঠতা এবং স্নেহভাজন হতে সময় লাগেনি। রঙমহল উঠে গেলে শম্ভু মিত্র এরপর যোগ দেন মিনার্ভা থিয়েটারে। এখানে তাঁর প্রথম অভিনয় ৭ই জুন ১৯৪০, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর পরিচালনায় ধীরেন মুখোপাধ্যায়ের ‘জয়ন্তী’ নাটকে। বিপরীতে ছিলেন তৎকালীন জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপর্ণা দেবী। মিনার্ভায় এটিই শম্ভু মিত্রের একমাত্র অভিনয়। পরবর্তীতে মিনার্ভার মালিক দিলওয়ার হোসেন কর্তৃক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অসম্মানের প্রতিবাদে শম্ভু মিত্র মিনার্ভা ছেড়ে বেড়িয়ে আসেন। ১৯৪১-এ শম্ভু মিত্র যোগ দেন নাট্যনিকেতন মঞ্চে। অভিনয় করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালিন্দী’ এবং বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘মাটির ঘর’ নাটকে। ১৯৪১-এর শেষ নাগাদ নাট্যনিকেতন উঠে যায়। পরে নাট্যনিকেতন-এর বাড়িটি কিনে নেন শিশির ভাদুড়ী। শিশিরকুমার ভাদুড়ী সেখানে প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীরঙ্গম মঞ্চ। ১৯৪১-এর অক্টোবর, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সূত্রে শম্ভু মিত্র যোগ

দিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর শ্রীরঙ্গম মঞ্চ। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নির্দেশনায় ২৮ নভেম্বর ১৯৪১, অভিনয় করলেন তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘জীবনরঙ্গ’ নাটকে। এই নাটকে নাট্যকার বলে একটি ছোট চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন। এরপর তিনি পরপর অভিনয় করলেন, ‘সীতা’, ‘রীতিমতো নাটক’, ‘আলমগীর’-এর মতো নাটকে। ‘সীতা’-য় শত্রু ‘আলমগীর’-এ দিলীর খাঁ, ‘রীতিমতো নাটক’-এ ডাক্তার চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। মোটামুটি এই ছিল শ্রীরঙ্গম মঞ্চ শব্দ মিত্রের নাট্যাভিনয়ের অভিজ্ঞতা।

“শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গমে তিনি যোগ দেন ১৯৪১-এর অক্টোবর নাগাদ, ছিলেন মোটামুটি আট মাস, ১৯৪২-এর মে পর্যন্ত। ঢুকেছিলেন যখন *জীবনরঙ্গ* রিহার্সাল চলছিল, বেরিয়ে এসেছেন *উড়োচিঠি* প্রযোজনা চলাকালীন। ... *উড়োচিঠি*-তে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করবার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেটা করেন শৈলেন চৌধুরী।”^৯

এই সময় ভূমেন রায়, নির্মালেন্দু লাহিড়ী, জীবন গাঙ্গুলী, নরেশ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন মিলে ট্যুরিং অর্থাৎ ভ্রাম্যমান থিয়েটার তৈরি করে নাটক করে চলেছেন। শব্দ মিত্র যোগ দিলেন সেই থিয়েটার দলে। এখানেও দু-একটি নাটকে অভিনয় করার পর শব্দ মিত্র পুরোপুরি ভাবেই বেরিয়ে এলেন পেশাদার মঞ্চ ছেড়ে। অল্প বয়সে পেশাদার মঞ্চের একজন সচেতন দর্শক রূপে এই ধরনের থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে যে উচ্চধারণা শব্দ মিত্রের মনে গড়ে উঠেছিল সেই ধারণা যে ভুল এটা তিনি এবার বুঝতে পারলেন। সমকালীন সংকট থেকে সম্পর্কহীন নাটক নির্বাচন এবং পেশাদারিত্বের অভাব শব্দ মিত্রকে বাধ্য করেছিল পেশাদার থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। তিনি উপলব্ধি করেছেন পেশাদারী থিয়েটার তার নির্দিষ্ট কাজটাই ঠিকভাবে করতে পারছে না। একটা থিয়েটার তার সমাজের জন্য যা যা করতে পারে, করা উচিত তার কিছুই হচ্ছে না। তিনি একটা এমন থিয়েটারের অন্বেষণ করেছিলেন যা সমাজের জন্য কাজে লাগে। এই ভাবনা থেকেই তিনি পেশাদারী মঞ্চ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এক কথায় পেশাদার মঞ্চের প্রচলিত নাট্যাভিনয় তাঁকে হতাশ করেছিল। একটা অন্য ধরনের থিয়েটারের কথা তখন ভাবছেন তিনি। যদিও তাঁর কল্পিত থিয়েটারের রূপটা কি হবে সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা তখনো গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এটা স্থির করেছেন যে পেশাদারী মঞ্চ আর নয়। একটা অন্য কিছু করতেই হবে। এতদিনের থিয়েটার অভিজ্ঞতা এবং তাঁর পঠন পাঠনের জগত থেকে গড়ে ওঠা একটা নিজস্ব নাট্যবোধই এক ভিন্ন থিয়েটার সন্ধান তাকে তাড়িত করে। এরই ফাঁকে লিখে ফেললেন সমসময়কে ধারণ করে রাখা নাটক ‘উলুখাগড়া’ (১৯৪২)।

শম্ভু মিত্র যখন একটা নতুন ধরনের থিয়েটার করার পরিকল্পনা করছেন তখনই যোগাযোগ ঘটে গণনাট্য সংঘের অন্যতম কর্মী তাঁর বন্ধু বিনয় ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। সেই সূত্রেই শম্ভু মিত্র যোগদান করেন গণনাট্য সংঘ (১৯৪৩-৪৮)-এ। কীভাবে সেই সংযোগ ঘটে? শম্ভু মিত্রের কথায়—

“... একদিন ওই বিনয় আর বিজন ভট্টাচার্য, এরা এসে বললে যে ওই অ্যান্টি ফ্যাশিস্ট রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে। সেখানে ও নাটক করবে, অমুক করবে— আমি যদি যাই। তা এইসব ব্যাপারে— যদিও মোটামুটি আমি থিয়েটারেরই লোক-কিন্তু এই কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে— ফ্যাসিজম্ কী, আর্ট বা এইগুলো— মোটামুটি জানা ছিল তো— মানে এসব ব্যাপারে লেখাপড়া একটু ছিল। সেজন্য এ জিনিসটা আমার কাছে ঠিক মনে হল, মনে হল, হ্যাঁ যাওয়া যাক। তো সেই গেলুম, তারপর সেখানে আই.পি.টি.এ হল।”^{১০}

১৯৪৩-যোগ দিলেন ‘ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’-এ। আসলে শম্ভু মিত্র তখন থিয়েটারের মাধ্যমে সমসময়ের বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। এখানে তিনি যুক্ত হয়ে দেখলেন বাংলা পেশাদার থিয়েটারের যে রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে স্থবিরতা লক্ষ করেছেন তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই পরিবেশ। আবার সেখানে যোগ দিয়ে তিনি এমন নাটক পেলেন যার মধ্যে দিয়ে তাঁর নিজস্ব নাট্যবোধ চরিতার্থতা লাভ করতে পারে। নাটকের বিষয় বিন্যাস, নাটকের সংলাপ এবং নাট্য উপস্থাপনা সবকিছুই তাঁর অনুসন্ধানের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। বস্তুত সমকালীনতার অনুষ্ণাই তিনি খুঁজে পেলেন ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের নাটকে।

১৯৪৩ সালের ২২ মে থেকে ২৫ শে মে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস-এ শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় অভিনীত হল বিনয় ঘোষের নাটক ‘ল্যাবরেটরি’। এই সম্মেলনেই আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় আই.পি.টি.এ অর্থাৎ ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’। এতদিন পেশাদারী মঞ্চে শম্ভু মিত্র শুধুই অভিনয় করে গেছেন কিন্তু এবার অভিনয়ের পাশাপাশি অবতীর্ণ হলেন নির্দেশকের ভূমিকায়। আর প্রথম প্রচেষ্টাতেই শম্ভু মিত্র নির্দেশক হিসেবে পুরোপুরি সফল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম বুলেটিনে ‘ল্যাবরেটরি’ নাটকের প্রয়োগ পরিকল্পনা অভিনয়ের প্রশংসা করে লেখা হয়—

“... The technique of using slogans from off stage rising up into a crescendo gave the play it’s dynamic quality and should be recommended to all other groups to be used whenever suitable. It creates

the illusion of a crowd and brings out, through the slogans, the pressing and urgent needs of the hour. The acting in the Bengali Play was certainly about the best in the whole show.”^{১১}

শম্ভু মিত্র এরপর করলেন বিজন ভট্টাচার্যের ‘জবানবন্দী’। এটিই গণনাট্য সংঘের প্রথম প্রযোজনা। ৩রা জানুয়ারি, ১৯৪৪; স্টার থিয়েটারে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় অভিনীত হল ‘জবানবন্দী’। নির্দেশক হিসেবে শম্ভু মিত্রের এটি দ্বিতীয় নাট্যপ্রযোজনা। পেশাদারী থিয়েটারের বাইরে এক ভিন্ন অভিনয় ধারার সন্ধান তিনি বহুদিন ধরেই করছিলেন। ‘ল্যাবরেটরি’ নাটকের মধ্য দিয়ে এই নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল, তাকেই এবার পূর্ণতর রূপ দিতে চাইলেন ‘জবানবন্দী’ নাটকে। শম্ভু মিত্রের ‘জবানবন্দী’ নাটকের প্রযোজনা সেদিন পূর্ববর্তী পেশাদারী থিয়েটারের ধারা থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ নতুন একটি নাট্যধারার সূচনা করে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ পেশাদারী নাট্যকাভিনয়ের সঙ্গে এই নাট্যকাভিনয়ের পার্থক্য এই যে, অর্থোপার্জন এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গণজীবনকে রূপ দেওয়াই ছিল এর আসল লক্ষ্য।

গণনাট্য সংঘে শম্ভু মিত্রের পরবর্তী প্রযোজনা বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ (১৯৪৪-এর ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চ)। অবশ্য নাটকের মঞ্চায়নে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই দুই নাট্যব্যক্তিত্বের সংযোগে বাংলা থিয়েটারের জগতে তৈরি হলো এক নতুন ইতিহাস। বস্তুতঃ শম্ভু মিত্রের দ্বারা মূল নাটকের অভিনয় উপযোগী ব্যাপক সম্পাদনা, হাতে আঁকা সিনের পরিবর্তে চটের পর্দার ব্যবহার খুব সামান্যতম উপকরণ ব্যবহার করে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং পার্কের দৃশ্যকে দর্শকের কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা, চরিত্রোপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদে এবং দৃশ্যসজ্জায় সদ্য অতীতে ঘটে যাওয়া দুর্ভিক্ষকে জীবন্ত করে তোলা এবং সমকালীন বাস্তবতা থেকে ‘ফ্যান দাও’, ‘ফ্যান দাও’ আর্তচিৎকার কোরাসে প্রয়োগ করে এক বাস্তবসম্মত আবহ সৃষ্টি করা— শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনার এই সমস্ত প্রায়োগিক কৌশল এবং তারই সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের অব্যর্থ ডায়ালেক্ট উচ্চারণ ও অসামান্য অভিনয় শিক্ষার গুণে ‘নবান্ন’ নাট্যায়ন সেদিন এক চূড়ান্ত বিন্দু স্পর্শ করতে পেরেছিল।

‘নবান্ন’-এর পর শম্ভু মিত্র করলেন রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এই নাটক সফল প্রযোজনা হয়ে উঠতে পারেনি। একটা অন্যতম কারণ শম্ভু মিত্রের তখনও রবীন্দ্রনাটক করবার মতো বোধ বা ক্ষমতা আয়ত্ত হয়নি। আক্ষরিক অর্থেই এটি শম্ভু মিত্র নির্দেশিত প্রথম রবীন্দ্রনাটক আবার গণনাট্য সংঘ পর্বের এটিই তাঁর শেষ নাটক।

‘মুক্তধারা’ অভিনয়ের (মে, ১৯৪৬) অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শম্ভু মিত্র গণনাট্য সংঘ থেকে

বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত? কারণ একাধিক। গণনাট্য সংঘ ছাড়ার প্রাথমিক কারণ হলো গণনাট্য সংঘের কাজ কর্মের উপর পার্টির অহেতুক হস্তক্ষেপ যা শম্ভু মিত্রের ঠিক মনে হয়নি। শিল্পীর ওপর কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতকে তিনি স্থান দিতে চাননি। তাই বেরিয়ে এসেছিলেন গণনাট্য সংঘ থেকে। শম্ভু মিত্র গণনাট্য সংঘ এসেছেন ভালো নাটক করবেন বলে কিন্তু তিনি দেখলেন যে এখানে সেই অর্থে কোন ভালো নাটক নেই। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

“আমি অনেকদিন থেকেই নানান বিদেশি নাটক পড়ি এবং সেগুলো কেমন অভিনয় হয়, তার ধরনটা নিজে নিজে কল্পনা করি। তো এটা অনুভব করি, আমাদের যে অভিনয়টা হয় বা যে নাটকগুলো দেখি সেগুলোর সঙ্গে কী রকম নিজের বিস্তর ফারাক মনে হয়। ... মনে হয় এগুলো কী ক’রে Seriously ভাবা যাবে, Seriously করা যাবে— এই রকম মনে হ’ত। ... যাতে মনে হ’ত যে এইরকম যেখানে লেখক-টেখকেরা মেলে, সেখানে বোধ হয় বেশ ভাল নাটক হ’তে পারে। গিয়ে দেখলুম, কোথায়— এখানেও নাটক কিছু নেই ...।”^{১২}

অর্থাৎ ভালো নাটকের অভাব শম্ভু মিত্রের গণনাট্য সংঘ ছাড়ার একটা অন্যতম কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তেতাল্লিশের মন্বন্তর ও বামপন্থী গণপ্রতিরোধের আবহে তৈরি হওয়া গণনাট্য আন্দোলন বাংলা নাটকে যে অভিনবত্ব এনেছিল একথা অস্বীকার করা কোন উপায় নেই। কিন্তু শম্ভু মিত্র উপলব্ধি করেছেন গণনাট্য সেই অভিনব নাট্য আন্দোলন পার্টি আর সাংগঠনিক রাজনীতির মারপ্যাঁচ ক্রমশ লক্ষ্য থেকে চ্যুত হয়েছে। এরপর সাতচল্লিশের দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উদ্বাস্ত সমস্যা, স্বাধীন ভারতবর্ষে কমিউনিস্টপ পার্টি নিষিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি বহু ঘটনায় শম্ভু মিত্র তখন প্রায় দিশেহারা। অথচ ভালো নাটক করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করছে। তবে তিনি এটাও জানেন একদিনে ভালো নাটক তৈরি করা যাবে না। কিন্তু শুরু করতে হবে। তিনি লিখেছেন—

“... সর্বগুণ সমন্বিত ও সর্বজনপ্রিয় নাটক আমাদের দেশে এক্ষুনি হঠাৎ হতে পারে না। আজকের কাজ হচ্ছে চেষ্টার, আপ্রাণ অনুশীলনের এবং সেই অনুশীলনের উৎসাহদাতা সমালোচক হতে পারেন একমাত্র সংস্কৃতিমনা ব্যক্তির।”^{১৩}

এই ভাবনা থেকেই ১৯৪৮-এর শেষার্ধ্বে শুরু হল নতুন নাট্যদলের নতুন প্রযোজনার প্রচেষ্টা। শম্ভু মিত্র সঙ্গে পেলেন তিন সহকর্মীকে: অশোক মজুমদার, অমর গাঙ্গুলী, ও মহম্মদ জাকেরিয়া। আর পেয়েছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে। তৈরি হল নাট্যদল। নাম রাখলেন ‘অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়’

কিছুদিন পরে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথামতো দলের নামকরণ হল ‘বহুরূপী’ (১৯৫০)। বহুরূপী নাট্য দলের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শম্ভু মিত্র বলেছেন— “ঐ ভালো ক’রে করতে হবে আমাদের। ... ভালো নাটক করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।”^{৪৪} অর্থাৎ তিনি ভালো নাটক ভালোভাবে করতে চেয়েছেন। বলাবাহুল্য এধরনের একটা নাট্যদল গড়ে তোলার ভাবনা বাংলা তথা ভারতবর্ষের থিয়েটারের ইতিহাস একেবারেই অভিনব। একটা অপেশাদার গ্রুপ থিয়েটার দলের এই ধারণা বাংলাসহ ভারতীয় থিয়েটারে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এখানে উল্লেখ্য প্রথম পর্বের পেশাদারী থিয়েটার ছিল অনেকটা কোম্পানিসুলভ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। পরবর্তী পর্বে শিশিরকুমার মতো কিছু নাট্য ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা লিমিটেড কোম্পানি। আর শম্ভু মিত্র বহুরূপীর মাধ্যমে সূচনা করলেন সমিতিভুক্ত দল অর্থাৎ গ্রুপ থিয়েটার। এখানে কেউ মালিক নন একটা গণতান্ত্রিক সংগঠন। শম্ভু মিত্রের বহুরূপী-র এই দেখানো পথেই পরবর্তীকালে বাংলার গ্রুপ থিয়েটারগুলি গঠনতন্ত্র নির্মিত হয়।

বহুরূপী পর্বে (১৯৪৮-৮০) শম্ভু মিত্রের প্রথম প্রযোজনা বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’। ১৯৪৮ সালের ১৩, ১৪ ও ১৬ সেপ্টেম্বর রঙমহল-মঞ্চে এই নাটকের অভিনয় হয়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে করেছেন বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালী সরকার, ঋত্বিক ঘটক, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ। বহুরূপী তথা শম্ভু মিত্রের প্রথম থেকেই লক্ষ্য ছিল পেশাদারী মঞ্চার গতানুগতিক ধারা থেকে থিয়েটারকে মুক্ত করা। ‘নবান্ন’ সেই ভাবনার প্রথম পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা। এ সম্পর্কে শম্ভু মিত্র বলেন:

“যদি নতুন করে কিছু করতে হয় তাহলে দলের চেহারা এবং ভিত্তি প্রচলিত পেশাদারী পদ্ধতি অনুসরণ করে করলে করা যাবে না। কারণ তাহলে অর্থপ্রাপ্তির আকঙ্ক্ষায় দর্শকের পছন্দমায়িক নাটকই করতে হবে, তারা যে পদ্ধতি দেখে অভ্যস্ত সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে বড়জোর আলগা চটক হিসেবে এখানে সেখানে চমক সৃষ্টির চেষ্টা করা যেতে পারে। তাতে কোনোদিনই ভালো নাটক ভালোভাবে করা যাবে না।”^{৪৫}

বহুরূপীর পরবর্তী প্রযোজনা তুলসী লাহিড়ীর ‘পথিক’। ১৯৪৯-এর ১৬ অক্টোবর, রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট বর্তমানে নেতাজি মঞ্চ-এ শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় অভিনীত হল ‘পথিক’। বাংলা বিহার সীমান্তে গ্র্যাণ্ড ট্রান্স রোডের ধারের একটি চায়ের দোকানকে নিয়ে এই তিন অঙ্কের নাটকের একমাত্র দৃশ্যপট তৈরি হয়। জানা যায় ‘নবান্ন’ নাটকের মত ‘পথিক’ নাটকেও স্টেজের তিনদিক চটের পর্দা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। দরজা-জানালাগুলো তারই গায়ে কাটা ছিল। এভাবে চট দিয়ে

ঘেরা মঞ্চে ঘরের ছাউনি দিয়ে তৈরি হয়েছিল কয়লাখনি অঞ্চলের পরিচিত দোকানঘর। বাস্তব পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলতে সেই চায়ের দোকানে লাগানো হয়েছিল চা কোম্পানির পোস্টার। এই সবকিছুই করা হয়েছিল সময়ের দাবি মেনে।

‘পথিক’ করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শম্ভু মিত্র পর পর করলেন ‘উলুখাগড়া’ (১২ আগস্ট, ১৯৫০), ‘ছেঁড়া তার’ (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৫০) ও ‘বিভাব’ (২৯ এপ্রিল, ১৯৫১)। প্রথম নাটকটি শ্রী সঞ্জীব ছদ্মনামে লিখেছেন শম্ভু মিত্র, দ্বিতীয়টি তুলসী লাহিড়ী এবং তৃতীয় নাটকটি লিখেছেন বহুরূপীর কয়েকজন সদস্য মিলে। তিনটি নাটকেরই নির্দেশনায় ছিলেন শম্ভু মিত্র। প্রতিটি নাটকই ভাবনার বিশিষ্টতায়, মঞ্চসজ্জার আধুনিকতায়, অভিনয় দক্ষতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল।

‘নবান্ন’ (১৯৪৮) থেকে ‘বিভাব’ (১৯৫১)-এই পর্যন্ত বহুরূপী-র নাট্যপ্রযোজনাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সমকালীন সময়ের নানা ঘাত— প্রতিঘাত। গণনাট্য সংঘ ছেড়ে এলেও শম্ভু মিত্র নাটক নির্বাচনে সময়ের প্রতি, সমাজের প্রতি, তাঁর দায়বদ্ধতা থেকে কখনো সরে যাননি। দারিদ্র্য-ক্ষুধা, সাম্প্রদায়িক বিভাজন থেকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত— বহুরূপী তথা শম্ভু মিত্রের নাট্যচিন্তার বৃত্তটি তখন এমনই নানান সামাজিক অভিঘাতের মধ্যে থেকে পথ খোঁজার চেষ্টা করছে। কিন্তু এর পরেই শম্ভু মিত্র ও তাঁর বহুরূপী থিয়েটার গ্রুপের অভিমুখ বদলে যায়। এতদিন যে থিয়েটারের ঐতিহ্যের মধ্যে নিজের নাট্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন সেই থিয়েটার সম্পর্কেই এবার তিনি প্রশ্ন তুলেন। ১৯৫১-এ লেখা ‘বাংলা থিয়েটার’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

“স্বাধীনতার পরেও আমরা আর কতদিন বিলেতি বা ‘বিদেশি চাকচিক্যের সামনে’ এভাবে নপুংসক আত্ম-অবমাননায় মগ্ন থাকব?”^{১৬}

এই বলে তিনি বিলিতি থিয়েটারের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে দেশীয় লোকনাট্য-যাত্রাকে অনুসরণের কথা বলেন। এটা তো ঠিক উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরেই এদেশে আমদানি হয় ‘বিলিতি যাত্রা’র। আর ব্রাত্য থেকে যায় আমাদের দেশীয় লোকনাটক ও যাত্রা। ক্রমশ আমরা ভুলেই গেছি আমাদের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি। শম্ভু মিত্রের মতে সেই ঔপনিবেশিক থিয়েটার খুব স্বাভাবিক কারণেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাই পথ খুঁজে পেতে আমাদের ফিরতে হবে যাত্রার পথে। তবে পুরোনো যাত্রার পথে নয়, নতুন করে তাকে খুঁজে পেতে হবে। শম্ভু মিত্রের ভাষায়:

“হয়তো যাত্রারই পথে। কিন্তু পুরোনো যাত্রার পথে নয়। নতুন করে খুঁজে পেতে হবে তাকে। আমাদেরও অনেকের চেষ্টা সেই পথে। এমন একটা নাট্যশিল্প খুঁজে পেতে চাই যা একান্তভাবে বাঙালির। ... আমাদের বাংলার ছবি, বাংলার নাচ, বাংলার কাব্য যেন প্রাণ দেয় সেই নাট্যের। বাংলার নিগূঢ়

প্রাণ যেন প্রকাশ পায় তাতে। সেই হবে আমাদের ‘যাত্রা’, আমাদের বাঙালি থিয়েটার।”^{১৭}

শম্ভু মিত্র সেই নাট্যাদর্শের সন্ধানে আশ্রয় নিলেন রবীন্দ্রনাথে। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথের রুচিবোধ তাঁর নাটকের ফর্মকে এত কঠোর করেছে যে তা সাধারণ দর্শকের মনকে ছুঁতে পারেনি, সাধারণ রঙ্গালয়ও তাঁকে বুঝতে পারিনি। তদানীন্তন সাধারণ রঙ্গালয় ও তাঁকে মেলাবার দায়িত্ব আছে বর্তমানে। বলাবাহুল্য এই মেলাবার কঠিন দায়িত্বই নিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র ও তাঁর বহুরূপী থিয়েটার গ্রুপ। রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে দেশজ থিয়েটারের মধ্যেই শম্ভু মিত্র একটা নতুন নাট্যাদর্শের সন্ধান শুরু করলেন এই পর্বে। তাঁর এই নবলব্ধ নাট্যচিন্তনের প্রথম সাক্ষ্য পাওয়া যায় ২১ আগস্ট, ১৯৫১ শ্রীরঙ্গম মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের ‘চার অধ্যায়’ প্রযোজনার মধ্যে। ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসের নাট্য রূপায়নে শম্ভু মিত্র অসামান্য মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। অসামান্য বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়, সংলাপের উচ্চারণ, মঞ্চসজ্জা, আবহন নির্মাণ— সব মিলিয়ে আধুনিক এক নাট্যভাষা নির্মিত হয়েছিল এই প্রযোজনায়। শম্ভু মিত্র যেন নাট্যের এক অযুত সম্ভাবনার জগৎ এবার খুঁজে পেলেন রবীন্দ্রনাথে।

বহুরূপী-র পরবর্তী প্রযোজনা ‘রক্তকরবী’। প্রথম অভিনয় করে ১৯৫৪-এর ১০ মে রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট, বর্তমান নেতাজি ভবন-এ। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায়, ‘রক্তকরবী’-র এই প্রযোজনা বাংলা নাট্যের ইতিহাসে এক মাইল ফলক। রবীন্দ্রনাথের নাটককে ইউরোপীয় অথবা সংস্কৃত কোন নাট্য-ব্যাকরণের লক্ষণ মেলানো যায় না। কিন্তু সাধারণ থেকে প্রতীক, মাটি থেকে আকাশ, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম যে প্রসারতা আমাদের দেশজ শিল্পচিন্তার ভেতর আছে, তারই সেরা উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’। শম্ভু মিত্র ‘রক্তকরবী’-র দেশজ আঙ্গিকটি ধরতে পেরেছিলেন। এবং সেই অনুযায়ী তিনি ‘রক্তকরবী’-র মঞ্চায়ন করেছেন। গগনেন্দ্রনাথের ত্রিকৌণিক ছবির আদলে ‘রাজার জাল’, ওপরে শ্যেনচক্ষুর লাল নিষেধ, চারদিকে কমররাজার দাঁতের ইঙ্গিত, এই প্রযোজনার মধ্যে উদ্ভাসিত খালেদ চৌধুরী ঘরবাড়ি, যন্ত্রের বিচিত্র লঘুগভীর, কর্কশ, ক্লান্তিকর শব্দসমাহারের সঙ্গে নাকাড়া বাঁশি ও বেহালার সুর দর্শকদের উদ্বেল করে। সন্ধ্যা দে লিখেছেন,

“এখানে পরিচালক শম্ভু মিত্র যা করতে চেয়েছেন তা অনুকরণ নয়, রবীন্দ্রনাথের নকল নয়, রবীন্দ্রানুগ প্রেরণায় নতুন সৃষ্টি।”^{১৮}

এককথায় বলা যায়, বহুরূপী প্রযোজিত ‘রক্তকরবী’ সমস্ত প্রথাবদ্ধতা ও গতানুগতিকতাকে ভেঙে দিয়ে রবীন্দ্রনাট্য নিয়ে সৃজনশীল নিরীক্ষার অমিত সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। শম্ভু মিত্রের ‘রক্তকরবী’ নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে উৎপল দত্তের মূল্যায়ন এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

“বহুরূপী বাংলা মঞ্চের প্রকৃত ঐতিহ্যটিকে ধরেছেন। ... কোথায় যেন বহুরূপী খাঁটি বাংলা নাট্যরূপটা ধরেছেন— বাচিক অভিনয়ে বিশেষ ক’রে। পুরো নাটকের কথোপকথন, যেন একটা সঙ্গীতের উত্থান-পতনের মতন কানে আছড়ে পড়তে থাকে, তার মধ্যে শম্ভুবাবুর নিজের উদাত্ত কণ্ঠস্বর যেন শুদ্ধপর্দায় কতকগুলি চমকপ্রদ তান দিয়ে বৈচিত্র্য আনত, গান জমিয়ে দেয়া কঠিন চরিত্র সৃষ্টির মধ্যেও এই সুরের আর গদ্যছন্দের খেলায় বহুরূপী অপ্রতিদ্বন্দ্বী; এখানেই বিশেষ ক’রে তাঁরা খাঁটি বাঙালি। অন্যপক্ষে যুরোপীয় মঞ্চের প্রোসিডিয়ামের অভ্যন্তরে ইন্দ্রজাল সৃষ্টির অপূর্ব কলাকৌশলও বহুল পরিমাণে এনে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন শম্ভু মিত্র।”^{১৯}

শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপীর পরবর্তী প্রযোজনা ‘পুতুল খেলা’। ১০ই জানুয়ারি, ১৯৫৮ মহাজাতি সদনে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। মূল নাটক ইবসেন-এর ‘এ ডলস্ হাউস’। নাট্য রূপান্তর করেন শম্ভু মিত্র। মঞ্চ সজ্জা ও আলোক সম্পাতের দায়িত্বে ছিলেন খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন। একটিমাত্র দৃশ্য, প্রধানত কেবল দুটি চরিত্র, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতার ব্যবহার, উদ্বেগ মুখর মুহূর্ত গড়ে তোলার তীব্র নাটকীয়তা, মানসিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলোর সুষম বিন্যাস এবং সর্বোপরি বাংলা নাটক নতুন প্রগতিশীল বোধের সঞ্চার সব মিলিয়ে ‘পুতুল খেলা’ অসাধারণ মঞ্চসফল নাটক।

ইবসেন-এর পর শম্ভু মিত্র আবার ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথে। ১৯৫৯-এর ১৫ ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ার-এ শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হলো ‘মুক্তধারা’ নাটক। যদিও এই নাটকের মহলা অনেক আগের থেকেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বভারতীর নতুন বিধি-নিষেধের কারণে অনেকটা সময় চলে যায়। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, দেবতোষ ঘোষ, কুমার রায় প্রমুখ। আমরা জানি গণনাট্য সংঘ পর্বশম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় ‘মুক্তধারা’ অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু নির্দেশক জানিয়েছেন গতবারের মতো এবারও ‘মুক্তধারা’ নাট্যাভিনয় ব্যর্থ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্রের স্বীকারোক্তি,

“‘চার অধ্যায়’ ও ‘রক্তকরবী’ অভিনয়ের পরে যখন মনে হল যে রবীন্দ্রনাটকের হিসেব আমরা বুঝে গিয়েছি, তখনই মুক্তধারা করতে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে ব্যর্থ হলাম। বুঝলাম রবীন্দ্রনাথ অতো সোজা নয়, অত সহজে তাঁকে বুঝে ফেলা যায় না।”^{২০}

দ্বিতীয়বার ‘মুক্তধারা’ নাট্য প্রযোজনায় ব্যর্থ হলেও তিনি হাল ছাড়েননি। আবার করলেন রবীন্দ্রনাথের

‘বিসর্জন’ নাটক। নাটকটি অভিনীত হয় ১৯৬১-র ১১ নভেম্বর, দিল্লির আইফ্যাক্স হল-এ কিন্তু এবারও দর্শকের মন জয় করতে তিনি ব্যর্থ হলেন। এরপর বহুরূপী-র জন্য শম্ভু মিত্র বেছে নেন ‘অন্ধকারের নাটক’ শিরোনামে সোফোক্লিসের ‘রাজা অয়দিপাউস’ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’ নাটক। মূলত ষাট-সত্তরের দশকের উত্তাল সময়কে তিনি এইসব নাট্যায়নের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যেখানে অন্ধকারের করাল গ্রাসে জীবন আচ্ছন্ন, পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাসের এক ভয়ঙ্কর পরিবেশে জীবনের আদর্শ মুখ খুবড়ে পড়ে, সেই সময়কে তিনি তুলে ধরার জন্য ‘অন্ধকারের নাটক’ হিসেবে এই দুটি নাটকের পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন।

‘রাজা অয়দিপাউস’ অভিনীত হয় ১৯৬৪-র ১২ জুন, নিউ এম্পায়ার-এ। সোফোক্লিসের নাটকের ছব্ব অনুসরণ না করে শম্ভু মিত্র আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপটে নাটকটির নবনির্মাণ করেন। এক্ষেত্রে শম্ভু মিত্র অনেকটাই অনুসরণ করেছেন ইয়েটসকে। এই নাটকটির আবেদন চিরকালীন এবং আন্তর্জাতিক। গ্রিক মহাকাব্যে এবং ট্রাজেডিতে যে অভাবনীয় ভয়ঙ্কর এবং অন্ধকারের সামনে নায়কদের দাঁড়াতে হয়, সেখানে তাঁদের হেলেনীয় পতনের মধ্যেও বড় হয়ে উঠে এক আশ্চর্য সংগ্রামী পৌরুষ। ইয়েটসের পথে ধরেই শম্ভু মিত্র চেষ্টা করেছেন সেই রাজা অয়দিপাউসকে আঁকতে, যিনি ধ্বংস জেনেও আত্ম আবিষ্কারের নিষ্ঠুর সত্যকে মর্যাদার সঙ্গে বহন করেন। শম্ভু মিত্র নাটকটির সত্যধর্ম রক্ষায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচলিত থেকেছেন। এই নাটকে অভিনয় করেছেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, অমর গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, পান্না মুখার্জী, কালীপ্রসাদ ঘোষ। মঞ্চসজ্জায় ছিলেন অনিল ব্যানার্জি আর আলোকসম্পাতে ছিলেন তাপস সেন, রমাপদ চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ চক্রবর্তী। সব মিলিয়ে ‘রাজা অয়দিপাউস’ বহুরূপীর সার্থক প্রয়াস।

শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপীর পরবর্তী প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’ নাটক। প্রথম অভিনয় হয় টি এম্পায়ার-এ ১৯৬৪-র ১৩ জুন। এই নাটকে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শম্ভু মিত্র। রাণীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন কুমার রায়, অমর গাঙ্গুলী, অরুণ মুখার্জী, কালীপ্রসাদ ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ। নাটকটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্র ভীষণভাবে সফল। এ প্রসঙ্গে সন্ধ্যা দে’র মূল্যায়ন আমরা উল্লেখ করে বলতে পারি—

“... সবচেয়ে কৃতিত্ব, ‘রাজা’-র আপাত অনড় ঘটনাবলীকে সচ্চল ছন্দে মঞ্চের ওপর জাগিয়ে রাখা। এই ছন্দ ফুটে উঠেছে চরিত্রগুলির কম্পোজিশনে, তাদের শারীরিক মুদ্রায়, তাদের স্বরের উত্থাপতনে এবং পারস্পরিকতায়। রাণীর সুদর্শনার অন্ধকার ঘর, নেপথ্য থেকে রাজার বাণী, রাজপথে পরবাসীর উৎসব যাত্রা এবং শেষ দৃশ্যে রাণীর বদ্ধজীবনের অবসানের দৃশ্য ব্যঞ্জনা দর্শকদের

কাছে স্মরণীয়।”^{২১}

শম্ভু মিত্রের নাট্য জীবনের স্মরণীয় সৃষ্টি তাঁর ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটক। ‘রাজা অয়দিপাউস’ এবং ‘রাজা’ নাটকের মঞ্চায়নের সমকালেই এই নাটকের পরিকল্পনা। একটি সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

“... আমার মনে আছে যখন আমি ‘অয়দিপাউস’ আর ‘রাজা’ রিহর্সাল দিচ্ছি, সেই মহলার সময়ই মনে হয়েছিল যে এইটাতে তো বেশ একটা সোজা ক’রে সেট ক’রে— একটা প্ল্যাটফর্মে ‘রাজা’ হ’য়ে যাচ্ছে। তা আমার মনে হয়েছিল যে এইটাই কিন্তু আরও কায়দা ক’রে ব্যবহার করা যায়। এই কী ক’রে করা যায় করতে (করতে)— এই সব ভাবতে-ভাবতে কেমন ক’রে জানি না এই চাঁদ সদাগরের কাহিনিটা মাথায় এসেছিল এবং মনে হয়েছিল যে এইটা আমাদের এখনকার সঙ্গে-আধুনিক কালের সঙ্গে ভয়ানক ভাল মেশে। এইটা করা যায়।”^{২২}

যদিও এই নাটক শম্ভু মিত্র মঞ্চায়ন করেননি। কিন্তু নাটক হিসেবে ‘চাঁদ বণিকের পালা’ অপূর্ব সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্যের কাঠামোর মধ্যেই আধুনিক এক যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের ‘পাড়ি’ দেবার সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

শম্ভু মিত্রের ‘বহুরূপী’র এই পর্বের নাট্যকর্মের বৃত্তটি মূলত রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন, সোফোক্লিয়ার মতো ধ্রুপদী নাট্যের মধ্যে আবর্তিত। কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি সেই সময়টায় পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা দেশ ও জাতি যখন স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় কাতর, তখন সেই বিপর্যস্ত সমকালকে স্পর্শ করতে চেয়ে তিনি ফিরে এলেন একেবারে সমকালীন নাট্যকারদের নাটকে। যেন নিজেরই তৈরি করা ধ্রুপদী প্রযোজনার আদর্শকে নিজেই ভেঙ্গে তছনছ করেছেন তিনি। অসংখ্য প্রশ্ন আর দ্বিধা-সংশয়, অবিশ্বাসের সংঘাত, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থেকে সমকালকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখার যন্ত্রণা যেন বেরিয়ে আসে তাঁর এই সময়ের নাট্যপ্রযোজনা থেকে। বেছে নিয়েছেন নীতিশ সেনের ‘বর্বর বাঁশি’ মারাঠি নাট্যকার বিজয় তেগুলকরের নাটক ‘শান্ততা কোট চালু আছে’-র বাংলা ভাষান্তর ‘চোপ আদালত চলছে’ এবং সর্বোপরি বাদল সরকারের ‘বাকি ইতিহাস’, ‘পাগলা ঘোড়া’-র মতো নাটক।

শম্ভু মিত্র একটি সাক্ষাৎকারে নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন— “আমি একেবারে— আদ্যোপান্ত ‘নোটো’ লোক যাকে বলে।”^{২৩} নাটক নিয়ে, নাটকের প্রয়োগের কলাকৌশল নিয়ে তিনি সারাজীবন নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা গেছেন। বাংলা থিয়েটারে নির্মাণ করেছেন থিয়েটারের একটি স্বতন্ত্র ধারা।

শম্ভু মিত্র থিয়েটারের নামে সস্তা জনপ্রিয়তায় বিশ্বাস করতেন না। এজন্য শম্ভু মিত্র অবশ্য দর্শক-শ্রোতার শিল্প সন্তোগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি মনে করেন দর্শক যদি তাদের সামাজিক হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা না করে, সস্তা হাততালির বিনোদন যদি তাদের গ্রাস করে তাহলে থিয়েটার কখনো উন্নত হতে পারে না। অর্থাৎ দর্শকের শিল্পেবোধের বিষয়টি শম্ভু মিত্রের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, দরকার সুবিবেচিত গুণবিচার— “পিঠ চাপড়ানো নয়, নবাবি নয়, খালি সত্যকার গুণটাকে গুণ বলে বোঝা।”^{২৪}

শম্ভু মিত্র থিয়েটারের মঞ্চব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কথা বার বার বলেছেন। বাংলা থিয়েটারের প্রথম পর্ব থেকেই আমরা লক্ষ্য করি দর্শককে ভোলানোর জন্য নানা রকম কৌশল অবলম্বন করা হয়। বাস্তবতার খাতিরে মঞ্চে গোটা একটা গাছ তুলে আনার ঘটনাও একসময় ঘটেছে। থিয়েটারের ইতিহাসে জানা যায় স্বয়ং অমরেন্দ্র দত্ত নাকি মঞ্চে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হতেন। বেশিরভাগ দর্শক ওই চাকচিক্যেই ভোলেন এবং সস্তা-আবেগের স্টান্টবাজি অভিনয়ে মুগ্ধ হন। শম্ভু মিত্র এই ধরনের মঞ্চ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন না। অবশ্য তিনি নিজেও একসময় মঞ্চব্যবস্থার এই প্রথাগত ঐতিহ্যকেই স্বীকার করেই তাঁর নাট্যপ্রযোজনাগুলি করে গেছেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটে। পাশ্চাত্য থিয়েটারের অঙ্ক অনুকরণ থেকে বেরিয়ে এসে তাকে তিনি আমাদের দেশের ঐতিহ্যের অনুসারী করে গড়ে তোলার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,

“আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় আমাদেরই মতো হওয়া চাই। বিদেশীর চতুর্থ শ্রেণীর অনুকরণ যেন না-হয়।”^{২৫}

বাংলা থিয়েটারে ‘নবনাট্য’-নামক একটি নতুন শব্দবন্ধের আমদানি করেন শম্ভু মিত্র। ১৯৫১-তে লেখা ‘আন্দোলনের প্রয়োজন’ প্রবন্ধে তিনি সর্বপ্রথম ‘নবনাট্য’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন এবং একটি বৃহত্তর নাট্য আন্দোলনের গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। নবনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে শম্ভু মিত্রের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তিনি বলেছেন—

“...নবনাট্য মানে সেই নাট্য যেটা জীবন সম্পর্কে আমাদের গভীরতার বোধ এনে দেবে, সমাজের জটিল স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধির সহায়ক হবে, যেটা আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়কে একসঙ্গে বেঁধে মহৎভাবে বাঁচবার অনুপ্রেরণা দেবে।”^{২৬}

অর্থাৎ আদর্শগত দিক থেকে নবনাট্য হলো ‘ব্যক্তিগত মানুষ’ আর ‘সমাজগত মানুষ’কে মঞ্চে পরিসরে মেলানোর একটি বিকল্প নাট্য। শম্ভু মিত্র উপলব্ধি করেছেন নাট্যমঞ্চে পাল্টে যাওয়া চরিত্রকে

সমাজের সঙ্গে, ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়াটা জরুরি। আর সে কারণেই তিনি এই ধরনের নাট্য আন্দোলনের কথা বলেছেন। শুধু আদর্শগত দিক থেকে নয়, মঞ্চায়নের দিক থেকেও তাঁর নবনাট্য ধারণা অভিনব। তিনি বলেছেন, “যুরোপের naturalistic মঞ্চসজ্জার সবচেয়ে অক্ষম অনুকরণ আমাদের ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ। এবং সেইগুলো দেখতে দেখতেই আমাদের দর্শকরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আজ তাই দরকার হয়েছে নতুন ক’রে মঞ্চসজ্জা করবার। যে-মঞ্চসজ্জায় বাহুল্য থাকবে না, কিন্তু গভীরতা থাকবে।”^{২৭} সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন মঞ্চ সজ্জা বাহুল্য থাকবে না, তার মানে এই নয় যে পুরোনো যাত্রায় ফিরে যাওয়া, আসলে তাকে নতুন করে তুলে ধরা।

শম্ভু মিত্র তাঁর নাট্যায়নের মধ্যে এই নবনাট্যের ধারণাকেই মান্যতা দিয়েছেন। এটা ঠিক শম্ভু মিত্র যে নবনাট্য আন্দোলনের জন্য প্রাণাতিপাত করেছেন সারাজীবন, তা কিন্তু বেশিদিন দীর্ঘস্থায়ী হলো না। কিছু দিনের মধ্যেই সেই আন্দোলন পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। নবনাট্যের নামে শুরু হয় যথেষ্টাচার—

“... নবান্ন-এ আরম্ভ যার রক্তকরবী-তে তা হয়েছে সমাপ্তি। ... অথচ এখন দেখি অলিতে গলিতে নব-নাট্য আন্দোলন বলে অজস্র ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে উঠেছে। এরা কারা? এরা আমাদের বাঙালি জাতির সেই অনাদ্যন্ত দ্বিতীয় ধারাটি— যেটি হল সংখ্যাগুরু প্রিয়...”^{২৮}

শম্ভু মিত্র এই সময়ে এক ধরনের আত্মপ্রশ্নে, আত্মবীক্ষায় জর্জর। কোন পথে বাংলা থিয়েটারের উত্তরণের সম্ভব হবে? এবার শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনায় এলো ভারতীয় বা জাতীয় নাট্যাদর্শ। নবনাট্য থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যান ভারতীয় থিয়েটারের তত্ত্বে। শম্ভু মিত্র মনে করেন ইউরোপীয় নাট্যাদর্শের সঙ্গে ভারতীয় নাট্যাদর্শের মূল পার্থক্য জীবন দর্শনে। ইউরোপীয় নাট্যের মূল ভিত্তি সংঘাত। সেখানে ভারতীয় নাট্যাদর্শের মূল নিহিত রয়েছে তার সুগভীর জীবনবোধ। সেই জীবনবোধের প্রকাশের পদ্ধতি কখনোই ইউরোপের রিয়ালিস্টিক মঞ্চরূপ নয়, বরং বাস্তববাদী নাটকের ফর্মকে ভেঙেই তবে ওই সুগভীর সত্যপ্রকাশ করা সম্ভব। এই পথেই আসবে বাংলা থিয়েটারের আসল মুক্তি। আর সেই সঙ্গে তিনি এটাও বিশ্বাস করেন বাংলা নাট্যের ভবিষ্যতে পৌঁছতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়েই তবে যেতে হবে। তাঁকে এড়িয়ে গেলে হবে না। কেননা রবীন্দ্রনাথেই আছে সেই কাঙ্ক্ষিত ভারতীয় নাট্যধরণ, আমাদের নিজস্ব জীবন দর্শন।

শম্ভু মিত্র মনে করেন অভিনয় হলো ‘আবেগের কাব্য’। অভিনয় শেষপর্যন্ত একটা ‘ভালোবাসার কাব্য’ হয়ে ওঠে, যা ব্যক্তি মানুষের বহিজীবন ও অন্তর্জীবনকে একই উপলব্ধিতে লীন করে দেয়। যেখানে শেষ পর্যন্ত থাকে না কোনো নাটকীয় টেনশন। সেই নাট্যাভিনয়ের ফর্ম

আমাদের জাতীয় জীবনেই আছে। এক্ষেত্রে শম্ভু মিত্র আমাদের দৃষ্টি দিতে বলেছেন যাত্রার দিকে। তবে পুরোনো থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার মধ্যে এই কাঙ্ক্ষিত ‘কাব্য’ পাওয়া সম্ভব নয় অথচ সেটা পাওয়া যাবে যাত্রার অনুভব থেকেই। আর সে-কারণেই তিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথ একমাত্র সেই নাট্যকার, যাকে অবলম্বন করে পৌঁছোনো যাবে সেই কাঙ্ক্ষিত ভারতীয়ত্বে। আসলে তিনি উপলব্ধি করেছেন বাংলা থিয়েটার আর যাই হোক সেটা আমাদের মাটিজাত নয়। তার সঙ্গে আমাদের কৃষ্টি-কালচার মন ও মননের কোন যোগ নেই। সুতরাং ভারতীয় থিয়েটার বলে যদি কিছু থাকে আমাদের লোকজসংস্কৃতির গভীরেই তার সন্ধান করা উচিত। শম্ভু মিত্র তাঁর নাট্যপ্রযোজনাগুলির মধ্যে, বিশেষ করে বঙ্করূপী পর্বের নাট্য প্রযোজনা মধ্যে সেই ভারতীয় থিয়েটারেরই অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এখানেই শম্ভু মিত্রের নাট্য ভাবনা স্বতন্ত্র।

শম্ভু মিত্রের সমকালেই বাংলা থিয়েটারে আবির্ভাব ঘটে উৎপল দত্তের (জন্ম: ২৯ মার্চ ১৯২৯, মৃত্যু: ১৯ আগস্ট, ১৯৯৩)। উৎপল দত্তের থিয়েটার জীবনের হাতেখড়ি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পঠনকালে। অভিনেতা রূপে বাংলা থিয়েটারে উৎপলদত্তের আবির্ভাব ১৯৪৩ সালে। সে বছর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের যৌথ উদ্যোগে সাঁ সুসি প্লেয়ার্স-এর প্রযোজনায় ফাদার উইভার-এর পরিচালনায় ‘হ্যামলেট’ নাটকে ছোট্ট একটি চরিত্রে অভিনয় দিয়ে উৎপল দত্তের থিয়েটারে প্রবেশ। তারপর কয়েকজন সহপাঠী মিলে ১৯৪৭-এ প্রতিষ্ঠা করলেন ‘দ্য অ্যামেচার শেকসপীরিয়ানস্’ নাট্যদল। ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ রঙ্গমঞ্চে তাঁরা প্রযোজনা করে শেক্সপিয়ারের ‘রিচার্ড দ্য থার্ড’ নাটক। এই নাটকের অভিনয় সূত্রেই উৎপল দত্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিখ্যাত শেকসপীরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানির নাট্য পরিচালক জেফ্রি কেনডালের সঙ্গে। আর তাই, “কোন ভারতীয় বা বাঙালি ঐতিহ্যে নয়, উৎপল দত্ত শুরু থেকেই লালিত হলেন যুরোপিয় প্রয়োগ ঘরানায়।”^{৯৯} এই জেফ্রি কেনডালের কাছ থেকে উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটারের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছেন। উৎপল দত্ত লিখেছেন, “এটুকু বললেই হবে, যা শিখেছিলাম তাই এনে প্রয়োগ করেছিলাম লিটল থিয়েটার গ্রুপে।”^{১০০} কেনডালের নাট্যদল ‘শেক্সপিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল’-এ উৎপল দত্ত বেশ কিছু অভিনয়ও করেন। একই সঙ্গে নিজস্ব নাট্যদল ‘দ্য অ্যামেচার শেকসপীরিয়ানস্’-এ নাট্যদলে অভিনয় করে যাচ্ছেন। তাঁর ‘দ্য অ্যামেচার শেক্সপিয়ারিয়ানস্’ নাট্যদলের সর্বশেষ প্রযোজনা ‘দ্য টুয়েলভ নাইট’। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর, সেন্ট জেভিয়ার্স মঞ্চে। এই পর্বে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে উৎপল দত্তের থিয়েটার চর্চার প্রাথমিক প্রস্তুতি এভাবেই চলতে থাকে। দ্য অ্যামেচার শেকসপীরিয়ানস্ দলের নাট্য নির্বাচন, পরিচালনা, অভিনয়— উৎপল দত্তই ছিলেন মূল উদ্যোক্তা। এর পাশাপাশি কেনডালের সাহচর্যে অভিনয়রীতি সম্পর্কে

ধারণা এবং পেশাদারী থিয়েটারের কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন উৎপল দত্ত। সুতরাং উৎপল দত্তের নাট্য জীবনের ক্ষেত্রে এই পর্বটির গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৪৯সালে ‘দ্য এমেচার শেক্সপিয়ারিয়ানস্’ নাট্যদল ভেঙে দিয়ে ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ১৯৫০-এ তিনি গড়লেন ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’ (এল টি জি)। শুরু হলো উৎপল দত্তের থিয়েটার চর্চার নতুন পর্ব। তিনি বুঝতে পারছিলেন ইংরেজিতে নাটক করে শৌখিনতা চরিতার্থ হতে পারে কিন্তু আদতে কিছু হবে না। ফলে বাংলায় নাটক করার আন্তরিক ইচ্ছা তিনি অনুভব করলেন। নাটক করার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি অনুভব করতে পারলেন তখনই, যখন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির স্বরূপটা বুঝলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে জনতাকে বাদ দিয়ে নাটক হয় না, একান্তে বসে নাট্যসাধনা। এই অনুভব থেকেই তিনি গড়ে তুললেন ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’।

উৎপল দত্তের নির্দেশনায় এল টি জি প্রথম অভিনয় করে ইবসেনের ‘ঘোস্টস’ নাটক। নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেন শিউলি মজুমদার। অভিনয় হয় নিউ এম্পায়ার-এ ১৯৫০-এর ২৬ নভেম্বর। নাটকটি বাংলার পটভূমিতে সামাজিক নাটক হিসেবে দর্শকদের কাছে গৃহীত হয়েছিল। ওই বছরই (১৯৫০ সালে) উৎপল দত্ত যোগ দিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এ। সেখানে অভিনয় করলেন পানু পাল-এর ‘ভাঙা বন্দর’ নাটকে। পরিচালনা করলেন বাংলায় ‘ম্যাকবেথ’ রবীন্দ্রনাথ-এর ‘বিসর্জন’ গোবিন্দ-এর ‘রেভিজার’। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। গণনাট্য সংঘের কিছু কিছু মতাদর্শগত ভিন্নতা, পরস্পরের প্রতি অকারণ কুৎসা, নানা মিথ্যাচার, সংঘের কর্মীদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি বহু কারণে উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘ ছেড়ে আসতে বাধ্য হলেন। তিনি লিখেছেন—

“.. আমি গণনাট্য সংঘে থাকতে পারলাম না। নেতৃত্বের একাংশ কোনও অজ্ঞাত কারণে আমাকে নানা উদ্ভট রাজনৈতিক বিচ্যুতির দায়ে অভিযুক্ত করতে লাগলেন। ... বিসর্জন অভিনয় করেছি, সুতরাং আমি স্বভাবতই ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া ভাবধারা আমদানি করে গণনাট্যের সংগ্রামী ঐতিহ্য নষ্ট করতে চাইছি। ... আমি একাধারে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী বিচ্যুতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পড়লাম।”^{৩১}

ফিরলেন আবার লিটল থিয়েটার গ্রুপে। এল টি জি-তে উৎপল দত্তের দ্বিতীয় প্রযোজনা ইবসেন-এর ‘এ ডলস হাউস’-এর অনুবাদ ‘পুতুলের সংসার’ নাটক। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, তরুণ মিত্র প্রমুখ।

এরপর উৎপল দত্তের পরিচালনায় এল টি জি করে রুশ নাট্যকার কনস্তান্তিন সিমোনভ-এর ‘রাশিয়ান কোশেচন’ অবলম্বনে অনূদিত নাটক ‘সাংবাদিক’। এটি অভিনীত হয় আই টি এফ প্যাভেলিয়নে ১৯৫২-র ডিসেম্বর। নাটকটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিক তীব্রভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বণিক সভ্যতার ক্রীতদাস একচেটিয়া সংবাদপত্র মানুষের আত্মিক পতনকে কীভাবে ঘনিয়ে তোলে এবং প্রতিভা কীভাবে পণ্য হয়ে যায় এটিই এই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়।

এই পর্বে উৎপল দত্তের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের ‘অচলায়তন’। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৮ জুন, ১৯৫৩। এই নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সন্ধ্যা দে লিখেছেন—

“নাটকটি প্রযোজনা করার একটি কারণ আছে সে সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির এক প্রধান ব্যক্তিত্ব এস এ ডাঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ ও ‘অচলায়তন’ নাটক দুটিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যা উৎপল দত্ত সঙ্গত বলে মনে করেননি। এল টি জি-র ‘অচলায়তন’ প্রযোজনা তারই উত্তর।”^{৩২}

এরপর উৎপল দত্ত মঞ্চায়ন করেন শেক্সপিয়ারের ‘ম্যাকবেথ’। অনুবাদক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ডিসেম্বর, ১৯৫৪ নিউ এম্পায়ার-এ। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, লেডি ম্যাকবেথ-এ শোভা সেন। এছাড়াও অভিনয়ে ছিলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল রায়, জ্যোৎস্না ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ। অভিনয় এবং আলোকসজ্জায় উৎপল দত্ত মুন্সিয়ানার পরিচয় দিলেও সামগ্রিকভাবে এই প্রযোজনা সমকাল অনেকের কাছে শিল্পসম্মত হয়নি। এমনকি লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রধান পৃষ্ঠপোষক কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকায় এই নাটকের সমালোচনা করে বলা হয়—

“.... নাটকের প্রযোজনা আগাগোড়া যে উচ্চ স্বরে বেঁধে রাখা হয়েছে, তাতে শেক্সপিয়ারের সমস্ত সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়েছে। পুরো নাটকেই একটা অতিমাত্রায় ভৌতিক আবহাওয়া, নাটকের মূল রস লঙ্ঘিত হয়েছে।”^{৩৩}

একটা বিষয় লক্ষণীয় উৎপল দত্ত একদিকে যেমন বার বার ঘুরে ফিরে বিদেশি নাট্যকার, কখনো ইবসেন কখনো শেক্সপিয়ারের নাটক করেছেন সেই সঙ্গে কিন্তু এদেশের মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র প্রমুখের নাটকও করেছেন। শেক্সপিয়ারের ‘ম্যাকবেথ’ করার পরই উৎপল দত্ত করলেন মধুসূদনের ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৬-র মার্চ মহম্মদ আলি পার্কে, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে। আর ১৯৫৯-এ ওই একই মঞ্চে করলেন ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’। দুটি নাটকেরই

নির্দেশনায় ছিলেন উৎপল দত্ত। মধুসূদনের নাটক প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। উৎপল দত্তের মতে মাইকেলের নাটকগুলি তাঁর গণতান্ত্রিক চেতনায় আলোকিত। প্রায় সবগুলোই ভারতের সুপ্রাচীন সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসে যাওয়ার কাহিনি; সে-ব্যবস্থার অমানবিক দিকগুলি তুলে ধরেছে। হয়তো এক-আধ ফোঁটা অশ্রু কবির গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে অতীত গৌরব লুপ্ত হবার কাহিনি বলতে গিয়ে। মার্কসই বলেছিলেন, ফিউডাল সমাজের পতন থেকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয়, কিন্তু বুর্জোয়া-সমাজ যখন ধসবে তখন কমেডি ছাড়া কিছু রচিত হবেনা। সেই ট্র্যাজিক বিষয়তা মাইকেলকে মাঝে মাঝে গ্রাস করেছে। নাটকের পটভূমিকা যাই হোক না কেন, নাট্যকারের নিজস্ব বিশ্ববীক্ষা তাতে একইভাবে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। ঠিক এই কারণেই উৎপল দত্ত মধুসূদনের নাটকের মঞ্চায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।

অন্যের নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি এইসময় উৎপল দত্ত তাঁর নিজের লেখা বেশকিছু নাটকও নিয়মিত মঞ্চায়ন করেন। ১৯৫৯-এর ৩১ ডিসেম্বর মিনার্ভায় উৎপল দত্তের পরিচালনায় অভিনীত হয় তাঁরই লেখা নাটক ‘অঙ্গার’। এ নাটকের পটভূমি ছিল পঞ্চাশের দশকে ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক ঘটনা-চিনাকুড়ি কয়লা খনি দুর্ঘটনা। কাহিনি, মঞ্চ ও নেপথ্যের বিভিন্ন কাজ, সংগীত, আলোর অসামান্য ব্যবহার, সবমিলিয়ে ‘অঙ্গার’ মঞ্চ একটি সফল প্রযোজনা। নাটকটির উপস্থাপনা বাংলা থিয়েটারে সম্পূর্ণ নতুন জোয়ার নিয়ে আসে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ‘অঙ্গার’ নাটকের মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন—

“এ ধরনের নাটক বাংলাদেশে আছে বলে মনে হয় না।... নাট্যমঞ্চের সাজসরঞ্জাম যাকে Production ও Stage Craft বলে, চমৎকার। শেষ দৃশ্যটি অপূর্ব।... তাই বলছি অঙ্গার ভালো লেখা এবং ভালো অভিনয়। এই ধরনের জিনিস বাংলায় নেই। এবার কি সত্যিই বাংলা নাটকের মোড় ফিরবে?”^{৩৪}

তবে সেদিন গণনাট্য সংঘের অনেকেই এই নাটকের আঙ্গিকের প্রাধান্যের অভিযোগ তুলে উৎপল দত্তকে তীক্ষ্ণ বাক্য মানে বিদ্ধ করেন। পক্ষান্তরে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতো কিছু মানুষজন লিটল থিয়েটারের এই প্রযোজনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। উৎপল দত্ত লিখেছেন—

“....তাঁরা আঙ্গিকের প্রাধান্যের অভিযোগ তুললেন। অভিনয়কে নাকি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে যান্ত্রিক কলাকৌশল। পক্ষান্তরে হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রায় টেবিল চাপড়ে লিটল থিয়েটারকে সমর্থন করলেন; বললেন বিষয়বস্তু দিক থেকে একটুও আপোষ না করে পেশাদার থিয়েটারের সাম্রাজ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে লিটল থিয়েটার।”^{৩৫}

এই নাটকে প্রায় একটা জনতাকে মঞ্চে তুলে আনা হয়েছে। সবমিলিয়ে বাংলা মঞ্চে যুগ চেতনার এক অসমসাহসী দলিল ‘অঙ্গার’ নাটক। এরপর উৎপল দত্তের নির্দেশনায় এল টি জি প্রযোজনা করে উৎপল দত্তের আরেকটি মৌলিক নাটক ‘ফেরারী ফৌজ’। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬১-র ২৮ শে মে মিনার্ভা মঞ্চে। নাটকের পটভূমি চট্টগ্রাম অঙ্গাগার লুণ্ঠনের পরবর্তী সময়। তরুণ বিপ্লবী অশোকের ব্যক্তিসত্তা ও বিপ্লবীসত্তার দ্বন্দ্বিকতা এই নাটকের কেন্দ্রীয় আখ্যান। বৃদ্ধ যাজকের মৃত্যুকে ঘিরেও এক করুণ অন্তর্বয়ন গড়ে উঠেছিল এই প্রযোজনায়। এ নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই ঘোষ প্রমুখ। মঞ্চ, আলো, সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতি সবদিক থেকে এটি উৎপল দত্তের আরেকটি সফল প্রযোজনা।

লিটিল থিয়েটার গ্রুপ-পর্বে উৎপল দত্তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকর্ম হল ‘তীর’ নাটক। এই নাটকের প্রেক্ষাপট সত্তরের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলন। আদিবাসী ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন কৃষকদের সশস্ত্র বিপ্লব উৎপল দত্ত এই নাটকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। উৎপল দত্ত লিখেছেন—

“যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পরেই নকশালবাড়ি বিদ্রোহ, জুন’ এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তির মধ্যে লিটিল থিয়েটারের পদক্ষেপ।... ভেবেছিলাম, কৃষক-যোদ্ধার বীরত্ব অমরগাথা হয়ে থাকবে, পথটা যদি ভুলও হয় তবু থাকবে। ... রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত আরও যেন গুলিয়ে গেল মাথার মধ্যে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অধৈর্যপনা ও অতি-বামপন্থী ধ্যানধারণা আমাদের অনেককে পেয়ে বসেছিল। লিটিল থিয়েটারের সদস্যবৃন্দের অনেকেই আমাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না, কিন্তু ‘তীর’ নাটক একান্তভাবে জোতদারের অত্যাচার, কৃষকের প্রতিরোধ ও পুলিশের জুলুমে আবদ্ধ থাকায় সেটা মঞ্চস্থ করতে সকলে সহযোগিতা করছিলেন।”^{৩৬}

নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৭, মিনার্ভা মঞ্চে। নাটকটির মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ‘তীর’ নাটকের প্রযোজনা প্রসঙ্গে আমরা দর্শন চৌধুরী বক্তব্যএখানে উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি লিখেছেন, “মঞ্চে একসঙ্গে চার জায়গায় অভিনয় চলছে। পিছন মঞ্চে উঁচু টিলার মতো জায়গা থেকে সুকরা টুডু মাদলের তালে গ্রামে সঞ্চেত দিচ্ছে। নিচে মঞ্চের মাঝে প্রাক্তন সৈনিক, বর্তমানে কৃষক রণবাহাদুর গ্রামবাসীদের ফৌজি শিক্ষা দিচ্ছে। সামনের বাঁদিকে একজন কামারশালায় অস্ত্র বানিয়ে চলেছে, ডানদিকে কমরেড বিপ্লবের ক্লাস চালাচ্ছে। মঞ্চ বিভাজনের মধ্য দিয়ে গ্রামের নানা মানুষের নানা কর্মের প্রস্তুতি দেখানো হয়। সর্বকর্মই আবর্তিত বিপ্লবের প্রস্তুতিতে। ‘থিয়েটারে প্রকৃত শিল্পীর হাতে যে কোনো সামান্য জিনিস বাঙুয় হয়ে উঠতে

পারে।’ ‘তীর’ প্রযোজনা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত”।^{৭৭}

উৎপল দত্ত তাঁর ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ পর্ব’-এর অধিকাংশ নাট্য প্রযোজনা করেছেন মিনার্ভা থিয়েটারে। কিন্তু গ্রুপের মধ্যে নানা কারণে দলীয় মতবিরোধ একটা সময় এমন জায়গায় পৌঁছায় যে উৎপল দত্ত গ্রুপ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন। পাশাপাশি মিনার্ভা থিয়েটার থেকেও তিনি বেরিয়ে আসেন। মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গে উৎপল দত্তের দীর্ঘ প্রায় দশ বছরের (জুন, ১৯৫৯-’৬৯) পথচলা শেষ হয় ১৯৬৯-এ।

উৎপল দত্ত লিটল থিয়েটার গ্রুপ ছেড়ে বেরিয়ে এসে প্রথমে ‘বিবেক নাট্যসমাজ’ (১৯৬৯-৭১) এবং পরে ‘পিপলস লিটল থিয়েটার’ (পি এল টি) গ্রুপ তৈরি করে এই সময় তিনি তাঁর নাট্যকর্মের ধারা অব্যাহত রাখেন। এই পর্বে দেখা যায় উৎপল দত্ত-র আর সে ভাবে কোন বাঁধা মঞ্চ রইল না। নির্দিষ্ট কোন মঞ্চ না থাকায় তাঁকে এবার ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চ ব্যবহারের উপযোগী মঞ্চস্থাপত্য নির্মাণ করতে হল। দর্শন চৌধুরী উৎপল দত্তের এই দ্বিতীয় পর্বের নাট্যায়নের মৌলিক পরিবর্তনের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“মিনার্ভার মতো বহুতল জুড়ে বহুমাত্রিক ‘ভিস্যুয়াল গ্রাঞ্জার’ নির্মাণের সুযোগ রইল না। তৈরি হল অতি দ্রুত উপস্থাপনার মতো মঞ্চসজ্জা। অভিনয়ান্তে অতি সহজে যাতে খুলে নেওয়া যায়।”^{৭৮}

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আমরা উল্লেখ করতে পারি মিনার্ভার পরের বেশকিছুটা সময় উৎপল দত্ত যাত্রামঞ্চ অভিনয় করেন। সেই যাত্রাভিনয়ের অভিজ্ঞতাই এক্ষেত্রে উৎপল দত্তকে সাহায্য করেছে। যাত্রার নিরাভরণ মঞ্চের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি ক্রমে এগিয়ে চলেন আধুনিক থিয়েটারের বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনার দিকে। উৎপল দত্তের নাটক রচনা ও প্রযোজনার প্যাটার্নও এই পর্বে পাল্টে যেতে থাকে।

পি.এল.টি পর্ব-এ উৎপল দত্তের প্রথম নাট্য প্রযোজনা ‘টিনের তলোয়ার’। নাটকটি অভিনীত হয় ১২ অগাস্ট, ১৯৭১ রবীন্দ্র সদন মঞ্চে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা। নাট্যকার ও পরিচালক উৎপল দত্ত স্বদেশিকতার উন্মেষ পর্বে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভূমিকা বদলের পূর্বাভাসটিকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন এ নাটকে। সন্ধ্যা দে লিখেছেন—

“...অপেরাধর্মী নাটকীয়তার ব্যঞ্জনা, নাট্য-সংগীতের সুন্দর ব্যবহার এবং এরই সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপল দত্ত, শোভা সেন ও ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের নিপুণ অভিনয়, সুরেশ দত্ত কৃত মঞ্চমায়া ও তাপস সেনের আলোক সম্পাত ‘টিনের তলোয়ার’কে একটি কালজয়ী প্রযোজনায় পর্যবসিত করেছে।”^{৭৯}

এইপর্বে উৎপল দত্তেরপরবর্তী একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম হল ‘ব্যারিকেড’। নাটকটি অভিনীত হয় ১৯৭২-এর ২৫ ডিসেম্বর, কলামন্দির-এ। এই নাটকের মাধ্যমে জার্মানির নাৎসিবাদের দানবীয় নগ্ন স্বরূপটি তুলে ধরা হয়েছে। একজন কমিউনিস্ট থেকে সাধারণ গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষও যে এই ভয়াবহ সন্ত্রাসের শিকার — উৎপল দত্ত তা অনেকটা থ্রিলারের ভঙ্গিতে দর্শকের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই প্রযোজনায় বিস্ময়কর ছিল চরিত্র পরিচিতির মুহূর্তগুলি— এক দীর্ঘ প্রাচীরের ঘুলঘুলির ভিতর থেকে ক্রমশ বেরিয়ে আসে নাটকের ভয়াবহ চরিত্রগুলি, স্নানায়মান আলোয় যা মুদ্রিত হয়ে যায় দর্শকের চোখে। পি.এল.টি পর্বে উৎপল দত্তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’। উৎপল দত্তের পরিচালনায় নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৭৪-এ ১৬ মে কলামন্দির-এ। সত্তরের দশকের জরুরি অবস্থার প্রাক-লগ্নে সন্ত্রাস-কবলিত কলকাতার যাপন-যন্ত্রণার ছবি ধরা পড়েছিল এই নাটকে। নাট্যকাহিনি রচনায় এবং প্রযোজনায় উৎপল দত্ত যে বাস্তবতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তা বহুদিন পর্যন্ত দর্শকের মনে দাগ রেখেছিল। মঞ্চ পরিকল্পনায় উৎপল দত্ত প্রায় বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। একই দৃশ্যে কার্জন পার্ক, চৌরঙ্গিপাড়ার ব্যস্ততা, অফিসবাড়ি, রাজপথ যেন চলচ্চিত্রের ফ্রেমের মতো ধরা পড়েছিল। এরপর ১৯৭৮-এর ২৬ জানুয়ারি রবীন্দ্র সদন মঞ্চে উৎপল দত্ত প্রযোজনা করলেন ‘তিতুমীর’ নাটক। এই নাটকে চব্বিশ পরগনার নারকেলবেড়িয়ার কৃষক তিতুমীরের সংগ্রামকে যেভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অভিমুখে নিয়ে গিয়েছেন উৎপল দত্ত তার যাথার্থ্য এবং বাস্তবতা নিয়ে সমকালে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নাট্যঘটনার বিন্যাস এবং স্বভাববাদ ও বাস্তবতার যুগ্মতায়, প্রয়োগ কৌশলে এ নাটক যথেষ্ট দর্শক সমাদর পেয়েছিল। তিতুমীরের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করেছিলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, সমীর মজুমদার, মৃণাল ঘোষ, শ্যামল ভট্টাচার্য ও শোভা সেন। মঞ্চ পরিকল্পনাতেও যেভাবে বাঁশের কেঁলার সম্মুখভাগ মঞ্চে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, তা বাংলা রঙ্গমঞ্চে সম্পূর্ণ অভিনব। এরপর উৎপল দত্ত আবার ফিরে এসেছেন মধুসূদন-গিরিশ ঘোষ-এ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভাদীপ্ত জীবনের কাহিনি অবলম্বনে উৎপল দত্ত রচনা করলেন ‘দাঁড়াও পথিকবর’। উৎপল দত্তের পরিচালনায় এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ৪ ডিসেম্বর, ১৯৮০, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে। উৎপল দত্তের এই নাটক রচনা বেশ বস্তুনিষ্ঠ এবং আবেগ বর্জিত। চিরাচরিত পদ্ধতিতে নাট্যরচনার আঙ্গিক ত্যাগ করে তিনি ছোট ছোট ঘটনার সম্বন্ধে নাট্যকাহিনি নির্মাণ করেছেন। যেমন বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য মধুসূদনের নাট্যরচনা ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ নাটকের মহলা, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ রচনা, মধুসূদন কর্তৃক ‘নীলদর্পণ’ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ, বিদ্যাসাগর- মধুসূদন সম্পর্কের বিন্যাস, ভাস্কর-এ চতুর্দশপদী কবিতা রচনা ইত্যাদি ছোট ছোট

প্রাসঙ্গিক ঘটনার অনুষ্ণে নাট্য কাহিনি গড়ে উঠেছে। মঞ্চ, আলো অভিনয়, সমস্ত দিক থেকেই যেন নতুন করে পি এল টি-র গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত। এছাড়া হেনরিয়েটার চরিত্রে নীলিমা দাস এবং বিদ্যাসাগর চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও অসামান্য অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এরপর করলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত ‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস’। এটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৮২-র ৬ নভেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে। নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, তৃপ্তি গঙ্গোপাধ্যায়, মৃণাল ঘোষ, বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

উৎপল দত্তের থিয়েটার মূলত পলিটিক্যাল থিয়েটার। তাঁর নাট্যচর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভালো করে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সমাজ বিশ্লেষণ এবং শ্রেণি সংগ্রামের স্বরূপ উপলব্ধি। তিনি মনে করেন শ্রেণি সংগ্রামের সঠিক পথ অনুসন্ধানের একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পন্থা মার্কসবাদ। সেই মার্কসবাদকে ভিত্তি করে তিনি তাঁর বক্তব্য থিয়েটারের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন। থিয়েটার উৎপল দত্তের কাছে নিছক অবসর বিনোদনের আশ্রয় ছিল না, সমাজের প্রলেতারিয়েত শ্রেণির কাছে সুচিন্তিত বক্তব্য পৌঁছে দেবার মাধ্যম হিসেবেই তিনি থিয়েটারকে দেখেছেন। এ বিষয়ে উৎপল দত্তের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তিনি মনে করেন নাটকের বিষয়বস্তু ছাড়াও নিশ্চয়ই একটা শ্রেণির প্রশ্ন আছে। সেটা কোন শ্রেণির? এর উত্তরে তিনি বলেছেন কোন শ্রেণির পক্ষে, কোন শ্রেণির বিপক্ষে তা নাটকটা পড়লেই বোঝা যায়। এটা তো শুধু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই নয়, নাটকের ফর্ম, আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও একটা শ্রেণিগত প্রশ্ন থাকে। একজন নাট্যব্যক্তিত্ব কীভাবে অভিনয় করবে, কীভাবে মঞ্চ সাজাবে, কীভাবে আলোক সম্পাত করবে-তার ভেতরেও থাকে তার শ্রেণিগত অবস্থান, শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গি।

বিশ শতকের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থিয়েটার করতে গিয়ে উৎপল দত্ত উপলব্ধি করেছেন থিয়েটার কাজটা আপাদমস্তক মতাদর্শগত। সেই মতাদর্শের জায়গা থেকে উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটার চর্চা চালিয়ে গেছেন। আর তাই তাঁর নাটকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক স্বর বারবার ধ্বনিত হয়েছে। একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উৎপল দত্ত কিন্তু ছিলেন আগাগোড়া একজন নাটকের মানুষ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তিনি নন। কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব দাঁড় করানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতনত করা আর সেই সচেতনতার মাধ্যম তাঁর নাটক। নাটক নিয়ে লড়াই করতে করতে তিনি রাজনৈতিক পথ বেছে নিয়েছেন। ফলে তাঁর নাটকে রাজনৈতিক বিষয় এলেও রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচারসর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। আসলে তিনি কমিউনিস্ট হলেও পার্টির প্রতি তাঁর অন্ধ আনুগত্য ছিলনা। সমাজে শ্রেণিদ্বেষের ক্ষেত্রে মেহনতি সাধারণ মানুষের

পক্ষ অবলম্বন করায় ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাই যখন তাঁর মনে হয়েছিল একটি কমিউনিস্ট দল শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থবিরোধী ভূমিকা নিয়েছে তখন তিনি নির্বিধায় নকশাল দলকে সমর্থন করেছেন। লিখেছেন ‘তীর’-র মত নাটক। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

“রাস্তায় ভায়ে-ভায়ে সংঘর্ষ চলছে, আর শত্রু হাসছিল। সিপিএমের সঙ্গে সিপিআই(এম-এল)-এর সদস্যদের রক্তাক্ত বিরোধ। ... মনে করেছিলাম প্রসাদুজোতে পুলিশের নৃশংস গুলিচালনার বিরুদ্ধে আমাদের মুখ খুলতেই হবে, যেই সরকারে থাকুক না কেন।”^{৪০}

এখানেই উৎপল দত্তের রাজনৈতিক থিয়েটারের সার্থকতা। তাঁর থিয়েটার কোন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রচার সর্বোচ্চ হয়ে ওঠেনি, তা হয়ে উঠেছে মেহনতী সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার অন্যতম হাতিয়ার।

উৎপল দত্ত মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, আলো ও সংগীতের প্রয়োগ অর্থাৎ নাট্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখেছেন। এই জন্য তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে অনেকে উৎপল দত্তের নাট্য আঙ্গিকের বিরূপ সমালোচনাই করেছেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, উৎপল দত্ত নাটকে যেখানে বৃষ্টি দরকার সেখানে বৃষ্টি নামান, যেখানে আগুন লাগানোর দরকার সেখানে আগুন। এক্ষেত্রে আমরা উৎপল দত্তের বক্তব্য তুলে ধরতে পারি। তিনি বলেছেন—

“থিয়েটার নানা শিল্পের মিলিত সৃষ্টি, আর এই মিলের ভিত্তি হল পরস্পরের সঙ্গে ক্রমশ একাত্ম হওয়ার প্রচেষ্টা। শব্দকে হতে হবে বর্ণ, বর্ণকে হতে হবে শব্দ। আর এ থিয়েটারের শত্রু হলেন বাস্তববাদীরা, অর্থাৎ ফোটোগ্রাফ পছন্দীরা। এঁরা ভুলে যান শিল্প ঠিক জীবন নয়; শিল্প জীবনোদ্বোধ, কালোদ্বোধ, দেশোদ্বোধ একটা কিছু। জীবন প্রবহমান; থিয়েটার স্থিত। জীবন সম্পূর্ণ, নাটক খণ্ডিত। এই খণ্ডিতের মধ্যে সম্পূর্ণতার চেহারাটা ধরতে গেলেই খণ্ডচিত্রকে একটা বাস্তবোত্তর রূপ দিতে হবে। রঙে, ছন্দে, বাঁধতে হবে তাকে।”^{৪১}

অর্থাৎ নাট্যায়নের প্রয়োজনেই তিনি নাট্য আঙ্গিকের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি কখনোই আড়ম্বরপূর্ণ মঞ্চসজ্জার দিকে যাননি। এক্ষেত্রে তিনি পেশাদারী থিয়েটারের গতানুগতিক ধারা থেকে সরে এসেছেন। পেশাদারী থিয়েটারে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত নাটকের দৃশ্যসজ্জায় আঁকা সিনেরই চল ছিল। যার মধ্যে না ছিল কোন বাস্তবের ইঙ্গিত, না ছিল কোন ব্যঙ্গনা। গণনাট্য সংঘ প্রথম এই ধরনের মঞ্চ ব্যবস্থা থেকে সরে এসে একেবারে

অনাড়ম্বর মঞ্চসজ্জার প্রচলন করে। খুব সহজেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নাটককে নিয়ে যাওয়ার সুবিধার্থে মঞ্চকে করা হয় অনাড়ম্বর। উৎপল দত্তও এই পথেই হেঁটেছেন। তবে তিনি মনে করেন অল্প খরচেও দৃশ্যসজ্জা সৃষ্টি করা যায়। কীভাবে তা সম্ভব? তিনি নিজেই বলেছেন—

“থিয়েটার এবং দর্শক পেলেই আমি যবনিকা বাদ দেব। তারপর বাদ দেব উইংস্, বর্ডার প্রভৃতি। ... মেঝেটাকে নানা আকারের বেদী দিয়ে ভরে দেব; এলোমেলো এদিকে ওদিকে সিঁড়ি সাজাব। অভিনেতা চলতে গেলেই যাতে সিঁড়ি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। উচ্চতর বেদী ব্যবহার করে মেঝে আর ব্যাটেন লাইটের মধ্যবর্তী বিশাল জায়গাটা ব্যবহার করব। ঝড় বোঝাতে ব্যবহার করব ক্রেগ-এর আঁকা রেখা কাটা একটি কালো পর্দা বা ব্রেখ্‌ট বর্ণিত বিদ্যুৎ-আঁকা একটা ধূসর পর্দা। জল বোঝাতে ব্যবহার করব নীল পোশাক পরা জনা কুড়ি নর্তকী। আগুন বোঝাতে হয়তো উদয়শঙ্করের প্রদর্শিত কিছু লাল রিবন নাড়ব। বৃষ্টি বোঝাতে গুটি দশেক ছাতা খুলে ধরব। যুদ্ধক্ষেত্র বোঝাতে পর্দা আর বেদীগুলোকে নাড়াব ভীম বেগে। মাতালের চোখে কলকাতা দেখাব: কার্ডবোর্ডের মনুমেন্ট আর হাইকোর্টকে চাকায় বসিয়ে ছুটিয়ে দেব মঞ্চের উপর দিয়ে, এলোমেলো ডগমগ কলকাতা-। যাক, করব অনেক কিছুই। কিন্তু যা করব তা থিয়েটারি ঢং-এই করব। চিত্রপটের খোকা-সুলভ বাস্তবতা আমদানি করব না। অন্যশিল্প থেকে ধার করে করব না।”^{৪২}

সুতরাং তাঁর বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তিনি মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে সবই ব্যবহার করেছেন কিন্তু সেটা বাস্তবতার কথা মাথায় রেখে। অধ্যাপক নাট্যসংগঠক সৌমিত্র বসু উৎপল দত্তের নাট্যায়নের মূল্যায়ন করতে গিয়ে যথাযথই বলেছেন—

“মনে রাখা চাই, ... একটি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শকে তীব্রভাবে প্রকাশ করেন তিনি, এবং সে কাজে আঙ্গিককে কখনই অবহেলা করেন না। তাঁর নাটক সব সময়েই উত্তেজক, আবহ বা অভিনয়ের সুর বাজে প্রখর তীব্রতায়। বহু মানুষকে নিয়ে বিশাল মঞ্চছবি তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর অসম্ভব আগ্রহ এবং দক্ষতা ছিল।”^{৪৩}

বাংলা থিয়েটারে শম্ভু মিত্র এবং তাঁর বহুরূপী গ্রুপ থিয়েটার শিল্পের জায়গা থেকে একটা অন্যত্র স্তরে নিয়ে গেছেন থিয়েটারকে, আর তারই সমান্তরালে উৎপল দত্ত রাজনৈতিক থিয়েটারের এক ভিন্ন দর্শনের প্রবাহ বইয়ে দিয়েছিলেন বাংলা থিয়েটারে। এখানেই উৎপল দত্তের থিয়েটারের

ধারা গতানুগতিক থেকে স্বতন্ত্র।

উৎপল দত্তের পর পরই বাংলা থিয়েটারে আর্বিভাব ঘটে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জন্ম: ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩, মৃত্যু: ১ অক্টোবর ১৯৮৩)। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন থিয়েটারে কাজ শুরু করেন, ততদিনে বাংলা থিয়েটারের ঐতিহাসিক পালাবদল ঘটে গেছে। চারের দশকে প্রথমে গণনাট্য সংঘ এবং তারপর ষাটের দশকে নবনাট্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পেশাদারী থিয়েটারের বিকল্প একটি অপেশাদার নাট্যের ধারণা বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিতা পেয়ে যায়। সেই সঙ্গে যুক্ত হল বিশ্ব থিয়েটারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার শৈল্পিক প্রয়াস। শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্তের মতো নাট্যব্যক্তিত্ব অভিনয়ের জন্য দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে কখনো ইবসেন, কখনো ব্রেখটের নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকেন। অবশ্য নব চেতনার অন্বেষণে কখনো মধুসূদন, কখনো গিরিশচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথেরও তাঁরা আশ্রয় খুঁজেছেন। বলাবাহুল্য বিশ্বনাট্যের সঙ্গে এই যোগ বাংলা থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করেছিল বৈকি। বিশেষ করে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের একেরপর এক সাফল্যে বাংলা থিয়েটার উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে যায়। তাঁদের সাফল্যে পরবর্তীকালে অনেকেই এইধারা অনুসরণ করেন। এই পরিমণ্ডলেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর থিয়েটার চর্চা শুরু করেন।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর নাট্য জীবন শুরু করেন গণনাট্য সংঘের ছত্রছায়ায়। মার্কসবাদে বিশ্বাসী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থা থেকেই গণনাট্যে অভিনয় ও নির্দেশনার কাজ শুরু করেন। গণনাট্য সংঘের উত্তর দমদম শাখার হয়ে মঞ্চস্থ করেন তাঁরই লেখা মৌলিক নাটক ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’। এরপর গণনাট্য সংঘের ‘নান্দীকার শাখা’ তৈরি করে কিছুদিন তাঁর নাট্যচর্চা চালিয়ে যান। কিন্তু নানা কারণে গণনাট্য সংঘের সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক যে সব দুঃখের কারণে একজন সৎ গুণী শিল্পীকে গণনাট্য ছাড়তে হয় অবশেষে অজিতেশকেও তাই করতে হয়। ১৯৬০-এর ২৯ জুন দুই সহ-অভিনেতা অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের সহায়তায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করলেন ‘নান্দীকার’ থিয়েটার গ্রুপ।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নান্দীকার থিয়েটার গ্রুপের জন্য প্রথম করলেন ইবসেনের ‘ঘোস্টস’ অবলম্বনে নাটক ‘বিদেহী’। নাটকটি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় প্রথম অভিনীত হয় ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০-এ রঙমহল মঞ্চে। পরপর করলেন ‘দাও ফিরে সে অরণ্য’ (১৯৬০-এর ৩০ সেপ্টেম্বর), ‘সেতুবন্ধন’ (১৯৬১-র ১১ ফেব্রুয়ারি), রবীন্দ্রনাথের ‘চার অধ্যায়’ (১৯৬১-র ১১ মে)। কিন্তু এইসব নাট্য প্রয়োজনাতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন স্বাক্ষর তিনি রাখতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক, নাট্যকার দেবাশিস মজুমদার মূল্যায়ন যথার্থ। তিনি লিখেছেন—

“এই শতাব্দীর (বিংশ) শ্রেষ্ঠ মানে, যে কটি প্রযোজনা আজ প্রতিষ্ঠিত তার প্রায় সিংহ ভাগই অজিতেশের কাজ শুরুর আগেই মঞ্চস্থ হয়ে গেছে— স্বাভাবিকভাবেই এই তুমুল সাফল্যের মধ্যে তাঁকে খুঁজে নিতে হয়েছে তৃতীয় একটি পথ।”^{৪৪}

রবীন্দ্রনাথের ‘চার অধ্যায়’ করার পর তিনি আবার ফিরে গেলেন বিদেশি নাটকে। ইতালিয় নাট্যকার লুইগি পিরানদেল্লো-র ‘সিক্স ক্যারেক্টারস ইন সার্চ অফ এন অথর’ অবলম্বনে করলেন ‘নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র’ নাটক। নাটকটির প্রযোজনা প্রসঙ্গে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত লিখেছেন,

“একদিন অজিতেশ আমার ঐ শ্যামবাজারের একান্ত ঘরটায় ... যখন বলছে, ‘কি করব কিছু বুঝতে পারছি না’ তখন বললাম আমার কাছে একটা manu-script আছে। 1st act-টা আমি পড়ে শোনালাম তখন রাত্রি ১টা। ও বলল আর পড়োনা, আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে script-টা দিয়ে দাও। ... ও script-টা নিয়ে চলে গেল। কদিন পরে আমরা script-টা নিয়ে দুজনে বসলাম,...”^{৪৫}

বাকিটা ইতিহাস। বস্তুত এই নাটকের প্রযোজনাই নান্দীকার-কে বাংলা থিয়েটারের জগতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। ‘বঙ্করূপী’, এল.টি.জি-র পর উঠে এলো ‘নান্দীকার’ গ্রুপ থিয়েটার। ১৯৬১-র ১২ নভেম্বর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রঙমহল মঞ্চে অভিনীত হলো ‘নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র’। নাটকে বাবার ভূমিকায় স্মরণীয় অভিনয় করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে ছিলেন অভিনেত্রী মায়া ঘোষ, কেয়া চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, বিভাস চক্রবর্তী প্রমুখ। এই নাটকের মূল বক্তব্য জীবনে অনেক অভিনয় হয়েছে, কিন্তু মৃত্যুতে যেন কোনও চাতুরী না থাকে। এই সৎ অভিপ্রায়ের ওপর নাটকটি গড়ে উঠেছে। মানুষের সমস্ত মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব যেহেতু আপেক্ষিক সেই কারণে শুভাশুভের মত সত্যাসত্যও আপেক্ষিক। পিরানদেল্লো-র সামাজিক নীতিবোধ সম্পর্কিত এই বক্তব্যই ‘নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র’ নাটকটিতে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই নাট্য প্রযোজনার কারণে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমালোচিত হতে হয়েছিল। কারণ পিরানদেল্লো এক সময় ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে তাঁর নাটক করার বিষয়টি কমিউনিস্ট পার্টি ভালোভাবে নেয়নি। কিন্তু আমাদের মনে হয় বিষয়টি সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে দেখা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে দেবাশিস মজুমদারের বক্তব্য আমরা এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি বলেছেন, “পিরানদেল্লো ইতালিয় নাট্যধারায় ভিন্ন স্বাদ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রধানত তিনি ‘রোমান্টিক ভাবলুতার বদলে মননশীলতা আনেন এবং মননশীল থিয়েটারের পথনির্দেশ করেন।’ ... অর্থাৎ আধুনিকতার রূপারূপ

চিহ্নিত হয়েছিল এই নাটককারের মধ্য দিয়ে ইতালিয় নাট্য নির্মাণে। সেই আধুনিকতা সেই যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিকেই সমপাতিক মনে হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর পর এই বাংলা তথা ভারতবর্ষে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।”^{৪৬} এখানে অজিতেশ একদিকে প্রথাগত মঞ্চকে ভাঙবার চেষ্টা করেছেন আর অন্যদিকে ষাটের দশকের দম বন্ধ করা পরিবেশকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেজন্য মঞ্চে এক অদ্ভুত ধরনের আলো-আঁধারির ধূসরতা নিয়ে আসা হয়। অভিনেতার পোশাকের মধ্যেও এক ধরনের বিবর্ণ রং ব্যবহার করে সেই সময়কার গোটা সমাজের মূল দ্বন্দ্বের অনেকটাই স্পন্দিত করার চেষ্টা করেছিলেন এই নাট্যে।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর করলেন রুশ সাহিত্যিক ও নাট্যকার অন্তন চেখভ-এর ‘দ্য সোয়ান সং’ শীর্ষক একাঙ্ক নাটক অবলম্বনে ‘নানা রঙের দিন’ (১৯৬১-র ডিসেম্বর)। রবীন্দ্রনাথের ‘বদনাম’ গল্প অবলম্বনে করলেন ‘বদনাম’ (১৯৬১-র ডিসেম্বর) নাটক। তবে সাফল্যের দিক থেকে এইসব প্রযোজনা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এরপর তিনি করলেন অন্তন চেখভ-এর আর একটি বিখ্যাত নাটক ‘দ্য চেই অর্চার্ড’ অবলম্বনে ‘মঞ্জুরী আমার মঞ্জুরী’। নাটকটি রূপান্তর এবং নির্দেশনায় ছিলেন স্বয়ং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১০ই নভেম্বর ১৯৬৪, মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে।

চেখভ-এর নাটকে জীবন সম্পর্কিত যে বেদনাময় অভিজ্ঞতা ও ফলহীন পরিণাম একটি বিবর্ণ অস্তিত্বের মতো সর্বময় হয়ে ওঠে, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রযোজনায় তা যথাযথ ভাবে তুলে ধরেছেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন চিন্ময় ঘোষ, চিন্ময় রায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিভাস চক্রবর্তী, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া ঘোষ, লতিকা বসু। তবে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র লালমোহনের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয়ের জন্য বাঙালি দর্শকের মনে চিরকাল জায়গা করে নিয়েছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নাটকের মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে তৃপ্তি মিত্র জানিয়েছিলেন—

“...আমি প্রথম দেখি মঞ্জুরী, আমার মঞ্জুরী, এবং আমি খুব মুগ্ধ হয়ে যাই।

প্রোডাশানালা ধরণও অন্যরকম ছিল, আর অনেকের অভিনয়ই ভাল ছিল, তবে কিছু কাঁচা অভিনয়ও যে ছিল না বলব না, অনেকের অভিনয়ই একটু কাঁচা লেগেছিল- তবে ওঁর নিজের অভিনয়ের কোনো তুলনা করাই শক্ত, বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে। ওরকম অভিনয় ক’জন ওরকম করে করতে পারে আমি ঠিক জানি না। কি বলব, আমাকে অভিভূত করেছিল।”^{৪৭}

শব্দ নির্বাচন এবং তার বিন্যাসে এক ভিন্ন নির্মাণের প্রয়াস ছিল এই রূপান্তরে। কী সেই ভিন্ন নির্মাণ? এক্ষেত্রে দেবাশিস মজুমদারের মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমরা সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

তিনি লিখেছেন—

“এই নাটকের চরিত্র অভিনয়ে অজিতেশ এক ধরনের সহজতা আনলেন-
প্রধানত যা নাগরিক নয়। আর এখানে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল-
সমসাময়িক বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা যে দু-জন তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ অন্য
এক স্বাদ পেল দর্শক সাধারণ যাঁকে অনেকটাই চেনা-কাছের বলে মনে হল।
দ্বিতীয়ত এখান থেকেই গল্প তৈরি হল অজিতেশ একেবারে চাষ-জমিনের
কাদামাটি পায়ে মেখেই মঞ্চে উঠেছে। ...‘মঞ্জুরী আমার মঞ্জুরী’, প্রয়োজনায়
আমরা দেখছি— অজিতেশ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষমতায় তাঁর
প্রয়োজনাকে বাঁধছেন এককের দূরন্ত আধিপত্যে।”^{৪৮}

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী সাড়া জাগানো নাট্যকর্ম ‘শের আফগান’। মূল নাটক
পিরানদেল্লো-র ‘এনরিকো কোয়ার্টো’। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৬-র ১২ জুলাই, মুক্তঅঙ্গন
মঞ্চে। স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের যে দোলাচলতা, যা কখনও কখনও কল্পনাকে
বাস্তব এবং বাস্তবকে কল্পনা করে তোলে এখানে সেটিই তুলে ধরা হয়েছে। এককথায় স্মৃতি তাড়না
ও রুঢ় বাস্তবের এক মিলিত সংরাগ ‘শের আফগান’ নাটক। নাটকে শের আফগানের ভূমিকায়
অসামান্য অভিনয় করেছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ সেন, দিপালি চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে।

‘শের আফগান’-র পর তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনা বেরটোল্ড ব্রেস্ট -এর ‘দ্য থ্রি পেনি
অপেরা’ অবলম্বনে রূপান্তরিত নাটক ‘তিন পয়সার পালা’। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ করেন ১৯৬৯-র
১৪ ডিসেম্বর, নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে। এরপর ‘রঙ্গনা’ থিয়েটার ভাড়া নিয়ে (১৯৭০) সেখানেই
এবার অজিতেশ তাঁর নাট্যকর্ম নিয়মিত ভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন। বলাবাহুল্য এই মঞ্চটি
পরবর্তীকালে প্রয়োজনার মাধ্যমে বহু পরিচিত হয়ে ওঠে। আসলে গ্রুপ থিয়েটারের দলগুলির
তখন মনে হয়েছিল মঞ্চ না থাকাটাই তাদের প্রধানত মৌলিক সমস্যা। এই একই কারণে শম্ভু
মিত্রের নেতৃত্বে ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণে ‘বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি’
(১৯৬৮) গড়ে উঠেছিল। বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির সহ-সভাপতি হিসেবে অজিতেশ যখন
ওই মঞ্চের জন্য সাংগঠনিক লড়াই করছেন, তখন প্রায় একই সময়ে ‘নান্দীকার-এর জন্য একটি
স্থায়ী মঞ্চেরও তিনি সন্ধান করছেন। রঙ্গনা থিয়েটার হল তৈরি হলে প্রথমেই নামান ‘তিন পয়সার
পালা’ এই প্রথম কোন গ্রুপ থিয়েটারের দল স্থায়ীভাবে থিয়েটার হল ভাড়া নিয়ে নিয়মিত অভিনয়
করার সিদ্ধান্ত নেয়। অজিতেশ ও তাঁর ‘নান্দীকার’ প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার নিয়মিত অভিনয়

শুরু করে এই প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া নিয়ে। (১৯৭০-এর সপ্তমী পূজার দিন) নাটক। নাটক হিসেবে ‘তিন পয়সার পালা’ সৃজন বিন্যাসে যেন বেশ কিছুটা ভিন্ন, একথা দর্শক সাধারণ কেমন করে যেন বুঝে গিয়েছিলেন। নাট্যকাহিনী বেশ উপভোগ্য। অথচ তাতে পড়তে পড়তে রয়েছে সমাজ জীবনের গভীর স্পর্শ। নাটকে অনিবার্যভাবে উঠে আসে সত্তরের দশকের সেই রাষ্ট্রীয় অভিঘাত। যেখানে দিন দুপুরে পথে-ঘাটে পড়ে থাকতে দেখা যেত মানুষের লাশ। এক কথায় সত্তরের দশকের সেই সামগ্রিক অবক্ষয়কেই এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে।

‘তিন পয়সার পালা’-র সাফল্যের পর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করেছিলেন ভিন্ন ধরনের আরো কিছু নাটক মঞ্চস্থ করতে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাঁর নিজের লেখা মৌলিক নাটক ‘হে সময় উত্তাল সময়’। এটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৭১-এর ২৬ সেপ্টেম্বর, রঙ্গনা নাট্যমঞ্চে। এ নাটকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঘটনার প্রবাহের সঙ্গে মহাভারতের মুষল পর্বের আখ্যানকে মিলিয়ে মিথ এবং একালের এক ছিন্নমস্তা সময়কে মেলাতে চেয়েছিলেন অজিতেশ। ক্লাসিক কাঠামো বজায় রাখার জন্য নাটকটিকে আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে নির্মাণ হয়েছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য অজিতেশ খুব একটা সফল হননি। তবে একথা বলতেই হয় যে একটি অস্থির সময়কে শিল্পোত্তীর্ণ করে তুলতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে তিনি সত্তরের দশকের যৌবনের অপচয়ের সমান্তরাল রেখা দুটি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর একসঙ্গে বেশ কয়েকটি নাট্য প্রযোজনায় হাত দেন। জার্মান নাট্যকার যোসেফ কেসেলরিং-এর ‘আর্সেনিক এণ্ড ওল্ড লেস’ অনুসরণে করলেন ‘বিতংস’ (২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১), ও জার্মান নাট্যকার ম্যাক্স ফিৎস্-এর ‘দ্য ফায়ার রেইজার্স’ অবলম্বনে ‘অগ্নিবিসয়ক সতর্কতা ও গৌতম’ (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২), চিত্তরঞ্জন ঘোষের ‘নটী বিনোদিনী’ (১৯৭২-এর ৬ ডিসেম্বর), আইরিশ নাট্যকার স্ট্রিন্ডবার্গ-এর ‘এরিক টুয়েলভ’ অবলম্বনে ‘শাহী সংবাদ’ (২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪) প্রভৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো নাটক করবার একমাত্র কারণ ‘রঙ্গনা’-য় তখন ব্যবসায়িকভাবে ‘নান্দীকার’ সপ্তাহে চারটি অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং সেই দায় মেটাতেই প্রযোজনার সংখ্যা বাড়াতে হয়। তবে এতো কিছু করেও শেষ রক্ষা হলো না। ‘তিন পয়সার পালা’ দিয়ে শুরু হওয়ার বছর পাঁচেকের মধ্যেই ব্যর্থতার বিপুল বোঝা নিয়ে রঙ্গনা থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়। এরপর অস্থায়ীভাবে হলঘর ভাড়া নিয়ে কিছুদিন তাঁর নাট্যচর্চা চালিয়ে যান। ১৯৭৫-এর ২৫ মার্চ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-র মঞ্চ ভাড়া নিয়ে সেখানে করলেন গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লিস-এর কাহিনী ‘আন্তিগোনে’। যদিও এই নাটকের নির্দেশনার কাজ করেছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। কিন্তু অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে

মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ওই একই মঞ্চে ১৯৭৬-এর ৩০ অক্টোবর অভিনীত হয় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক ‘সওদাগরের নৌকা’। অভিনেতা, নাট্যনির্দেশকের পাশাপাশি নাটককার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ এক চরম সিদ্ধি। এইভাবে কিছুদিন থিয়েটার করার পর ‘নান্দীকার’ ছেড়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিয়ে এলেন রাধারণ তপাদার, বীণা মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ চক্রবর্তী, সন্ধ্যা দে প্রমুখ গুটিকয়েক নাট্যকর্মীকে নিয়ে। প্রতিষ্ঠা করলেন ‘নান্দীমুখ’ (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭) নাট্যদল। শুরুতে নান্দীকার-এ অভিনীত নাটকগুলিই ‘নান্দীমুখ’-এর জন্য বেছে নেওয়া হয়। পুরোনো নাটকগুলি দিয়েই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পর্বে তাঁর নাট্যচর্চা শুরু করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ ‘নানা রঙের দিন’ নাটকের নাট্যায়নের মধ্যদিয়ে ‘নান্দীমুখ’-এর পথচলা শুরু হয়। এরপর করলেন ‘শের আফগান’, ‘শরতের মেঘ’ ও ‘সওদাগরের নৌকা’। তবে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বমহিমায় ফিরে এলেন টলস্টয়ের ‘পাওয়ার অব ডার্কনেস’ অবলম্বনে রচিত ‘পাপপুণ্য’ নাটকে। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৮-এর ২৮ আগস্ট, শিশির মঞ্চে। সম্ভবত তিনি এই নাটকটিকে ধরতে চেয়েছেন জীবনের নির্মম এক সন্ধিক্ষণে এসে। দেবাশিস মজুমদার এই নাটকের মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“... আত্মদর্শনের প্রভাব বা প্রকাশ এই প্রযোজনাটিতে অত্যন্ত বেশি। ... এক ঝাঁক নতুন নাট্যে অশিক্ষিত ছেলে মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করালেন নিজস্ব দক্ষতায়। সেই গ্রাম্য আবহাওয়ায় নাটক ছড়ালো সম্পর্কের অবৈধ বিস্তারে। শেষ পর্যন্ত সেই অন্যায় আত্মদক্ষে পুণ্য অর্জন করে। কিন্তু এক ধরনের ভয় ছড়িয়ে থাকে গোটা নাট্যটিতে। নির্দেশকের অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যে, শিল্পিত উদ্ভাবনে, নাট্য বিন্যাস্ত হয় একাধিক মাত্রায়।”^{৪৯}

নাটকটিতে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় টলস্টয়ের জীবন দর্শনকে স্মরণীয় ভাবে তুলে ধরেছিলেন গ্রাম বাংলার রুঢ় বাস্তবতার রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। পরিবেশ উপযোগী সংলাপ প্রায় প্রতিটি চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় ট্রাজিক চৈতন্যের অমোঘ বিস্তার এবং সর্বোপরি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালোত্তীর্ণ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ‘পাপপুণ্য’ বাংলা থিয়েটারে এক চিরায়ত মাত্রা সঞ্চার করে।

‘নান্দীমুখ’ পর্বে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী নাট্যকর্ম হ্যারল্ড পিন্টার-এর ‘দ্য বার্থ ডে পার্টি’ অবলম্বনে ‘৩৩-তম জন্ম দিবস’। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৮২-র ১৬ জুন, একাডেমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চে-এ। এও এক অসাধারণ মঞ্চসফল প্রযোজনা। এই নাটকের মঞ্চায়ন সম্পর্কে রথীন চক্রবর্তী যথার্থই লেখেন—

“৩৩-তম জন্মদিবস, গ্রুপ থিয়েটারের ভাটা পড়া চিন্তার ক্ষেত্রে এক দুঃসাহসী

প্রচেষ্টা। সমস্ত নাটকে কোথাও সামান্যতম আবহ নেই, আলোর চতুর প্রক্ষেপণ নেই, পোশাকের বাহাদুরী পর্যন্ত নেই। শুধুমাত্র ঘটনার নৈঃশব্দ এবং সংলাপের উচ্চারণ টেনে নিয়ে গেছে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটককে তার সফল পরিণতির দিকে। ... এই স্পর্ধা যা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন আমাদের সকলের কাছেই এক মস্ত সম্পদ হয়ে থাকবে। — ৩৩-তম জন্মদিবস গ্রুপ থিয়েটার প্রযোজনার ইতিহাসে এক সমৃদ্ধ সংযোজন”।^{৫০}

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ে নাট্যপ্রযোজনায় আমরা লক্ষ্য করি, তিনি প্রায় ধারাবাহিকভাবে বিদেশি নাটকই বেশি মঞ্চস্থ করে গেছেন। নান্দীকার প্রতিষ্ঠার পর বিদেশি নাটকের পাশাপাশি তিনি দু-একটি বাংলা মঞ্চস্থ করেছেন বটে কিন্তু প্রকৃত অর্থে সাফল্য পেয়েছেন বিদেশি নাটকে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের বক্তব্য ছিল—

“ভালো নাটক পাওয়ার অভাবে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর মৌলিক নাটক প্রযোজনার চেয়ে প্রথম শ্রেণীর বিদেশি নাটক প্রযোজনা অনেক বেশি করে কাম্য।”^{৫১}

কিন্তু এদেশেও তো প্রথম শ্রেণীর নাটকের অভাব নেই। ভারতের আধুনিক নাটককার হিসেবে তখন রবীন্দ্রনাথও স্বীকৃত। শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন। এছাড়াও সমকালে বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় লিখে চলেছেন একের পর এক উৎকৃষ্ট মানের নাটক। বাংলার নাট্যরচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনায় এঁদের অবদান তো অনস্বীকার্য। কিন্তু এঁদের কারোর নাটক সম্পর্কেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেমন আগ্রহ ছিল না। দেবশিস মজুমদার খুব সঙ্গত কারণে তাই বলেছেন, “ভাবতে হচ্ছে করে সত্যি যদি কখনও বাদল সরকার কিংবা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক নিয়ে কাজ করতেন অজিতেশ তবে কি সূচিত হতে পারত আর এক নতুন অধ্যায়? ... ধরমবীর ভারতী, গিরিশ করনড, মোহন রাকেশের কথা ভাবলেন না কেন? ... এই পরিপ্রেক্ষিতেই বোধ হয় অনেকে প্রশ্ন তুলছেন অজিতেশ তাঁর নাটক মঞ্চায়নে নির্দিষ্ট কোনো পথ রেখা কি গ্রাহ্য করতেন? খুঁজে পেতে চেয়েছেন নির্দিষ্ট কোনো দর্শনের মনন বিস্তার এই নির্বাচিত ‘বিদেশি’ প্রথম শ্রেণীর নাটক গুলির মধ্য থেকে?”^{৫২}

আমাদের মনে হয় এদেশিয় নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর কোথাও একটা গোপন বিরোধিতা ছিল। আসলে শম্ভু মিত্র বা উৎপল দত্ত দু’জনেই দীর্ঘদিন কলকাতার থিয়েটার মহলে একটা নাগরিক মঞ্চ অথবা নাগরিক সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াস অনুভব করেছিলেন এবং শিল্পচর্চার প্রয়োগ ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সুযোগও সেখানে ছিল। তাঁরা যেমন তাঁদের জীবৎকালের রবীন্দ্রপন্থী আদর্শ অথবা

রাজনৈতিক সচেতনতার গভীরে পৌঁছে বাংলা নাটককে নিয়ে ভেবেছেন ও তার এক বিবর্তিত রূপ তুলে ধরারও চেষ্টা করেছেন। তাঁদেরই কাছাকাছি থেকে অন্য আঙ্গিকে অথচ ঠিক তেমনটাই চেষ্টা করে গেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বিষয় বৈচিত্র্যে ও ভাবনাগত তাৎপর্যে নতুনত্ব আনতে চেয়েছেন তিনি। সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন বিদেশি নাটকে। তবে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল নাটক থেকে সরাসরি অনুবাদ করেননি, রূপান্তরও করেননি। তিনি স্থানীয়করণ বা লোকালাইজেশন করেছেন। মূল নাটকটিকে তার পটভূমি থেকে তুলে এনে তাকে বাংলার মাটিতে ফেলে দেশ-কাল পরিস্থিতি অনুযায়ী গল্পটিকে, তার চরিত্র, সংলাপ নির্মাণ করেছেন, এখানেই অজিতেশ স্বতন্ত্র। থিয়েটারে কোন বিপ্লব ঘটানো তাঁর অভিপ্রায়ও ছিল না, তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে তাই বলেছেন, “আমরা কেউ নাট্যবিপ্লব করছি না। আমরা মধ্যবিত্তের নাটক, একটু অন্য ধরনের নাটক, একটু ভালো নাটক করার চেষ্টা করছি মাত্র।”^{৬৩} আর নান্দীকার কেন শুধু বিদেশি নাটক করে? এ প্রশ্নে তাঁর স্পষ্ট উত্তর, “... একটা ভালো নাটক সারা পৃথিবীর সম্পদ। সেইটা আমি তুলে দিচ্ছি আমার দেশের মানুষের হাতে। দেশি বিদেশি ব্যাপারটা এখানে বড়ো নয়।”^{৬৪} অর্থাৎ নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি দেশি-বিদেশির ভেদাভেদ করতে চাননি। তাঁর কাছে ‘ভালো নাটক’ করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। এ প্রশ্নে নাট্যাভিনেতা ও নাট্যসংগঠক কুমার রায়ের মূল্যায়ন যথার্থ। তাঁর মতে, “অজিতেশ তার মত তার নিজস্ব ক্ষমতায় - নিজস্ব বোধের যে প্রকাশ থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে করতে চাইছিল সেটা জবরদস্ত ছিল। ঐ লোকটাও ছিল ঐ রকম, খানিকটা জবরদস্ত, Production-এর মধ্যে দিয়ে কোন কিছুকে Care না করেই করেছেন। ব্রেশট্ হল কি হল না তাতে কিছু যায় আসে না—....এবং মজা হচ্ছে ব্রেশটের থিয়োরী হল কি হল না- এই জাতীয় আলোচনা করেন তাঁরাই যাঁরা থিয়েটার করেন না। অর্থাৎ একটা প্রবল বেগ কিন্তু অজিতেশ নিয়ে এসে ছিল। ... সেটাও একটা ধারা তৈরি হলো কিন্তু।”^{৬৫}

থিয়েটারের পাশাপাশি যাত্রা শিল্পেও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। যাত্রাশিল্পে তাঁর প্রথম পদার্পণ পাতিপুকুর যুবনাট্য সমাজের হয়ে জনৈক জিতেন বসাক রচিত ‘মানুষ’ যাত্রাপালায়। সেকালের বিখ্যাত যাত্রাদলের মালিক ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র নট কোম্পানির জন্য তিনি লিখেছেন ‘নটী বিনোদিনী’ পালা। যে পালাটি অভিনয়ে ও অর্থাগমের কারণে যুগান্তকারী রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। যদিও একটা সময় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি থিয়েটারই করবেন, যাত্রা করবেন না। কিন্তু ১৯৭৭-এর শেষদিকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ও নাট্যজীবনে এক দুর্বিপাক নেমে আসে। এই সময় কেয়া চক্রবর্তীর প্রয়াণ ঘটে। নিজের হাতে-গড়া ‘নান্দীকার’ থেকেও বেরিয়ে এসেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন নতুন

নাট্যদল ‘নান্দীমুখ’। কিন্তু নতুন একটা দল করবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লোকবল কিংবা অর্থবল এমন কোনও সম্ভাবনাপূর্ণ নয় যে খুব দ্রুত তার পক্ষে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সম্ভব। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাঁকে যাত্রা দলে নামতে হয়। এই পর্বে শুধু অভিনয় নয়, তিনি একই সঙ্গে বিভিন্ন পালা-ও রচনা করেন। ‘প্রদীপ অপেরা’ নামে একটি যাত্রাদলে ‘রত্নাকর গিরিশচন্দ্র ও আনারকলি’ পালার নির্দেশক রচয়িতা হিসেবে তিনি যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর যোগদান করলেন ‘নাট্য ভারতী’-তে। সেখানে করলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে ‘রাবণ’।

যাত্রা সম্পর্কে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল—

“যাত্রা থেকেই বাঙালির নিজস্ব অ্যাকটিং-রীতি আবিষ্কৃত হতে পারে, তিনদিক খোলা মঞ্চে বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, বিবেকের গানের প্রয়োগ...মাইম ও কোরিওগ্রাফিক প্রয়োগ, দৃশ্যসজ্জার সরলীকরণ সম্পর্কে চিন্তা ও দর্শকদের কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশীল মননের প্রসারে সাহায্য করা ছাড়াও তাঁর সর্বশেষ প্রত্যাশা ছিল যাত্রাচর্চার মধ্য দিয়েই ন্যাচারালিজম থেকে থিয়েটারের সামগ্রিক মুক্তি ঘটানো।”^{৫৬}

একথা আজ স্বীকার করতেই হবে যাত্রাশিল্পের উপযুক্ত সম্ভাবনাগুলো কিছুটা স্পষ্টতর হয়েছিল তাঁর পরবর্তী বছর খানেকের মধ্যে প্রযোজিত ‘তিন পয়সার পালা’-য় কিংবা আরো পরে ‘নটী বিনোদিনী’-র নাট্য মতো প্রযোজনায়। এমনকি ‘সওদাগরের নৌকা’ নামে একটি মৌলিক নাটকও তিনি লিখেছেন, যার কেন্দ্রে রয়েছে একজন প্রবীণ যাত্রা অভিনেতা। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় উপলব্ধি করেছেন যে কলকাতার থিয়েটারের বাইরে, গ্রামেগঞ্জে পড়ে রয়েছে বিরাট জনতা। সেই জনতার কাছে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি যাত্রাদলে নেমেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল তাঁর যাত্রাশিল্পে যোগদানের পরিণতি সুখকর হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার দাস লিখেছেন,

“কলকাতার থিয়েটারকে বৃহত্তর গ্রামীণ দর্শকদের মুখোমুখি নিয়ে যাওয়ার কল্পনায় কীভাবে কাজ করতে হবে, সে-ভাবনায় অজিতেশ ভাবিত হয়েছেন নানাসময়ে। কিন্তু যাত্রায় যোগদান করে সে-আশা চরিতার্থ করা যায় এমন কোনও ভাবনা তাঁর ছিল না। যেজন্য যাত্রার আসরে *রাবণ*-এর ব্যর্থতার পর যে কঠিন প্রত্যাখানের আঘাত তাঁকে সহ্য করতে হলো, সেটা তাঁর কাছে নিদারুণ মর্মবেদনারই নামান্তর হয়ে উঠেছিল।”^{৫৭}

আসলে যাত্রা নিয়ে দীর্ঘদিন যে ধরনের সম্ভাবনার কথা তাঁর মাথায় ঘুরত, এই জনপ্রিয় নাট্যকলা নিয়ে সেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, কিন্তু ব্যবসায়িক রুচিগত প্রশ্নে বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি সে বিষয়ে সবসময়ই প্রায় সংকুচিত হয়ে থেকেছেন। যাত্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থতার দায়ভার নিয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি চেষ্টা করেছিলেন এত বড় শক্তিশালী মাধ্যমটাকে সঠিক অর্থে বোঝার, তার অগণিত দর্শকের প্রকৃত মনটাকে স্পর্শ করার। ‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকের এক বেদনাবিধুর দৃশ্যে পেশাদার এক যাত্রাকর্মীর সংলাপে অজিতেশের সেই আর্তি যেন আমাদের ভারাক্রান্ত করে :

“সূর্য বড়ো তাড়াতাড়ি ডুবে গেল হে- বিষাদসিন্ধুর উত্তাল ঢেউ বড়ো তাড়াতাড়ি
গ্রাস করে ফেলল সূর্যকে। কালো ঘোলা চিকচিকে সব ঢেউ- ময়াল সাপের
মতো ফুঁসিয়ে উঠছিলো চারদিকে।”^{৫৮}

অনেকেই মনে করেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত রুজি-রোজগারের জন্যই যাত্রাদলে নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু অজিতেশ সম্পর্কে এতটা সরলীকরণ ঠিক নয়। আসলে মানবিক মূল্যবোধের প্রতি এক আত্মগত অকৃত্রিম দীক্ষা নিয়ে তিনি থিয়েটারে কাজ করতে গিয়েছিলেন। মহান শিল্পীরা এভাবেই বোধ হয় নিজেদের বারবার পরখ করে দেখেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এর ব্যতিক্রম নন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যভাবনার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাঁর অনুজ নাট্যকর্মী দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত যথার্থই লিখেছেন,

“তাঁর দুই পূর্বসূরী শ্রীশঙ্কু মিত্র ও উৎপল দত্তের নাট্যধারায় তিনি রিয়ালিজম
এবং পোয়েট্রির মিশেল দিয়ে নাট্যের এক নবধারা সংযোজন করলেন। বাংলা
নাট্যকর্মের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত দুই পূর্বসূরী যদি হন স্রষ্টা, অজিতেশ তাহলে নাটকের
এক উজ্জ্বল রূপকার, নাট্যশিল্পের এক নির্মোহ স্থপতি।”^{৫৯}

বাংলা থিয়েটারের উক্ত সমকালীন নাট্যকর্মীদের মধ্যে বাদল সরকারের আবির্ভাব একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে। চল্লিশের দশকে গণনাট্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজন ভট্টাচার্য যে নাট্যধারার প্রবর্তন করেন পঞ্চাশের দশকে গিয়ে সেই ধারা প্রায় বিস্মৃত হয়ে যায়। তারপর শঙ্কু মিত্র, উৎপল দত্ত এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন প্রবল নাট্যব্যক্তিত্বের গ্রুপ থিয়েটারের ধারণা একটা সময় যে ব্যাপক উন্মাদনা নিয়ে বাংলা থিয়েটারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, আশির দশকে গিয়ে সেটাও প্রায় বিস্মৃত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে শেখর সমাদ্দারের মূল্যায়ন খুব প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন,

“আসলে ১৯৭৯-৮০ সালটাই খুব টালমাটাল বাংলা থিয়েটারের পক্ষে।
এটা শুধু নাট্য গবেষণার জায়গা থেকে নয়, আমাদের থিয়েটারচর্চার

জায়গা থেকেও বলা যায়। বাংলা থিয়েটারের তিন প্রধানের তখন কী অবস্থা? সদ্য বহুরূপী ছেড়েছেন শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত যাত্রা জগৎ পরিক্রমা শেষ করে এবার ব্যস্ত হিন্দি সিনেমা নিয়ে, বছর কয়েক আগে থেকে ডবল ভার্সন ছবি ‘অমানুষ’ ব্যাপক হিট করার পর কলকাতার থেকেও মুম্বাইতে ভীষণ চাহিদা তাঁর। অজিতেশ নান্দীকারবিচ্যুত হয়েছেন কিছু আগে, নতুন দল করেছেন ঠিকই কিন্তু রুজির জন্য তাঁকে যেতে হচ্ছে যাত্রায়।”^{১০}

বাংলা থিয়েটারের এইরকম একটি সময়ে বাদল সরকার আবির্ভূত হলেন তাঁর তৃতীয় থিয়েটার নিয়ে। যদিও বাদল সরকারের থিয়েটার জার্নিটা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রচলিত নাটকের আঙ্গিকে স্বীকার করে যেমন তিনি নাটক রচনা করেছেন, তেমনি প্রচলিত প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ধারাতেই প্রায় দীর্ঘদিন তিনি তাঁর নাট্যচর্চা করে গেছেন। সবারই একটা শুরু থাকে, বাদল সরকারের শুরুটা ওইখান থেকেই হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ বাদল সরকার প্রথাগত নাট্যধারা থেকে সরে এসে নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র পথ। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট; বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত কিংবা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যদর্শনকে আমরা কখনোই খাটো করে দেখতে রাজি নই। কোন তুল্যমূল্যের বিচার আমাদের লক্ষ্য নয়। আসলে তাঁদেরই প্রবাহমান ধারাবাহিকতায় বাদল সরকার যেটুকু নিজস্ব মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছেন, এখানে সেটুকুই শুধু আমাদের অন্বেষণ করার বিষয়। প্রথমত প্রচলিত নাটকের আঙ্গিক অস্বীকার করা বাদল সরকারের নাট্য আঙ্গিকের অন্যতম লক্ষণ। এটা শুরু হয় ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটক থেকে। কুমার রায় লিখেছেন,

“...‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ থেকে একটা অন্য phase আমরা দেখতে পেলাম এবং সেই phase-এর মধ্যে কিন্তু মানুষ, মানুষের সঙ্কট, individual, সমাজ— এসবগুলোই এল। আর যেটা আসা দরকার ছিল নাটকের মধ্যে। এবং যে প্রচলিত ধারাটা ছিল আমাদের— যে format-এ লেখা হতো তার থেকেও— ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাট্যসাহিত্য হিসাবে ওগুলোর একটা বিশিষ্টতা দেখা গেল। এখান থেকে বাদলবাবু কিন্তু form-এর দিক থেকে নাটকে কিন্তু একটা নতুন দিক আনলেন।”^{১১}

তাঁর নাটকে থাকল না প্রচলিত নাটকের মতো কোন অঙ্ক বিভাজন, নাটকে নেই কোন নির্দিষ্ট প্লট। চরিত্রের থাকলো না সুনির্দিষ্ট কোন চরিত্রায়ন। আছে শুধু কিছু নাট্যমুহূর্ত। চাইলেই অভিনেতা-

অভিনেত্রীরা ইচ্ছে মতো চরিত্র বাছাই করতে পারে, আবার নাটকের মাঝখানে চরিত্র বদল করতে পারে। তাঁর নাটকে চরিত্রদের ‘স্পেস’ বা ‘স্থানিক’ স্বাধীনতা থাকায় তারা ইচ্ছে মতো ঘুরে ফিরে অভিনয় করেন। তাঁর নাটকে দর্শকেরাও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে।

নাটকে দর্শকদের জোরালো ভূমিকা থাকে। যেমন ‘প্রস্তাব’ নাটকের শেষে একটি দড়ির গিট খুলতে দেওয়া হয় দর্শকদের। উদ্দেশ্য একটাই অভিনেতারা যেমন শারীরিক কষ্টের দ্বারা নাটক উপস্থাপন করেন দর্শকেরাও সেই কষ্টের কিছুটা ভাগীদার হোক। তাঁর নাটকের গঠন এবং সংলাপ পরিবেশনা কখনো কখনো অভিনয়ের মূল উপজীব্য হয়ে যায়। নাটকে ব্যবহার করেন একেবারেই ছোট ছোট সংলাপ। অনেক সময় দেখা যায় একই সংলাপ দুটো আলাদা চরিত্রকে দিয়ে বলানো হচ্ছে। আবার একই অভিনেতা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র অভিনয় করছে।

প্রচলিত নাটক রচনার রীতি থেকে বাদল সরকার যেমন সরে এসেছেন তেমনি নাট্যায়নের ক্ষেত্রেও প্রসেনিয়াম থিয়েটারের রীতি থেকে সরে এসেছেন, যা তৃতীয় ধারার থিয়েটার নামে পরিচিত। এ বিষয়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গ অন্বেষণ করেছি। এখানে শুধু এর উল্লেখ এই কারণেই আমরা করছি তাঁর প্রবর্তিত তৃতীয় ধারার থিয়েটার বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে অভিনব। সমকালীন ভারতীয় নাট্যকারদের মধ্যে সত্যদেব দুবে, কন্নর নাট্যকার প্রসন্ন, মহেশ এল কুঞ্চওয়ার, গিরিশ কারনাডের মতো নাট্যব্যক্তিত্বরা বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং কোনো না কোনো দিক থেকে তাঁরা যে বাদল সরকারের নাট্যায়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন সে কথাও স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার ভীষণ ভাবে স্বীকৃত। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সমকালীন নাট্যকর্মীদের মধ্যে প্রায় কেউই বাদল সরকারের নাট্যকর্ম নিয়ে যে খুব একটা উচ্চশিত প্রশংসা করেছেন এমনটা আমরা লক্ষ্য করি না। শম্ভু মিত্র বাদল সরকারের বেশকিছু নাটক তাঁর বহুরূপীর নাট্য দলে করেছেন— কিন্তু ওই পর্যন্তই। বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার নাটক সম্পর্কে তেমন কোন বক্তব্য আমরা শম্ভু মিত্রের থেকে পাইনি। বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার সম্পর্কে উৎপল দত্তের ধারণা কোন কালেই ভালো ছিল না, বরং তাঁকে নিন্দা করতেই আমরা দেখেছি। “উৎপলবাবু বলেছিলেন— লোকটা থিয়েটার করতে জানে না, তাই শারীরিক কসরৎ দেখিয়ে আসর দখল করতে চাইছে।”^{৬২} অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রায় একই রকম ধারণা পোষণ করেছেন বাদল সরকারের নাটক এবং নাট্যায়ন সম্পর্কে। তিনি লিখেছেন, “... আমাদের দেশে উক্ত থার্ড থিয়েটার চর্চার শ্লোগান চলতি থিয়েটারের বিকল্প হিসেবে স্বেচ্ছা ফ্যাসান বলে মনে হয়। ... আসলে থার্ড থিয়েটার আবার মধ্যবিত্তদের নয়া খেলনা।”^{৬৩} অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সময়ের সহকর্মী নান্দীকারের সদস্য রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

রথীন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে এক আলাপচারিতায় বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের সমালোচনা করে বলেছেন—

“বহু শতাব্দী ধরে বহু গবেষণা, বহু অধ্যয়ন এবং অজস্র চিন্তাভাবনার ... মধ্য দিয়ে মঞ্চ, আলো, আবহ সঙ্গীত, পোশাক, সংলাপ ইত্যাদির যাবতীয় আবিষ্কারকে নিয়ে গড়ে উঠেছে যে বিশেষ ধারা বা পদ্ধতি, তা কোনো ব্যক্তির কাছে অসুবিধে জনক মনে হওয়ায় অমনি সেটা তুলে দেও — এই সোরগোল তোলা নিছক প্রতিক্রিয়াশীলতা ছাড়া কিছুই নয়। ইট ইজ কমপ্লিটলি রিঅ্যাকশনারী।”^{৬৪}

এর বাইরেও সমকালে অনেকেই বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেন। এবং বেশিরভাগ সমালোচনাই হয়েছে বাদল সরকারের নাটক দেখে নয় তাঁর ‘থার্ড থিয়েটার’ গ্রন্থটির উপর ভিত্তি করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার বাদল সরকারের তৃতীয় ধারা থিয়েটার শেষ পর্যন্ত ওই একটি গ্রন্থের উপর আটকে থাকেনি। তার কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের প্রয়োগরীতিরও বহু পরিবর্তন ঘটেছে, সেই বিষয়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। একটা সময় থার্ড থিয়েটার নিয়ে যখন বাদল সরকারকে নানা রকম ভাবে আক্রমণ করা হয়, সেই সময় বাদল সরকার বলেছেন—

“... অহেতুক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, চরিত্রহনন, মিথ্যা রটনা, ব্যক্তি কুৎসা আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা একধরনের রুচিবিকার। থিয়েটার তো জীবন্ত কলামাধ্যম; দর্শক ও অভিনেতার সরাসরি যোগাযোগের সেতু। তাই মুষ্টিমেয় শ্রেণীর জগত থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে অগণিত মানুষের সত্যের গহনে আমি আত্মপ্রবেশ করেছি। প্রোসেনিয়ামের নিরাপদ দুর্গ থেকে ব্রাত্য হয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে ‘মুক্তমঞ্চ’ এবং ক্লিবিয়ান ‘অঙ্গনমঞ্চ’ ব্রতী হয়েছি। সেই হিসাবে আমার চরিত্র বদল হয়েছে। আমার শ্রেণী-অবস্থান পাল্টেছে। আমার গোত্রান্তর হয়েছে।”^{৬৫}

বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার সম্পর্কে যতই সমালোচনা থাকুক না কেন বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে তাঁর অবদান কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। থিয়েটারের বাঁধাধরা পথ থেকে সরে এসে তিনি নির্মাণ করেছেন নাট্য আন্দোলনের এক নতুন ইতিহাস। আমরা এই আলোচনার ইতি টানবো সুদৃষ্টি দেশপাণ্ডে-এর একটি মূল্যবান বক্তব্য দিয়ে। তিনি লিখেছেন, “... প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যভূমির বাইরে অন্য নাট্যভূমিতে উন্নত-মানের থিয়েটার নিয়ে যাওয়ার

কাজে তাঁর অবদান বিপুল। সফদার হাশমি যাকে ‘ভারতীয় থিয়েটারের গণতন্ত্রীকরণ’ বলেছেন, সেই প্রক্রিয়ায় বাদল সরকার ছিলেন এক দিগদর্শক ব্যক্তি।”^{৬৬}

তথ্যসূত্র:

১. দাশ, ভবেশ : অজিতেশ, ‘সম্পাদকের কথা’ অংশ থেকে উদ্ধৃত, পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৭, কল ৯, পৃ. ১৭
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র, বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ২০১১, কলকাতা, ৪৭, পৃ-৩৪
৩. তদেব : পৃ. ৩৫
৪. দে, সন্ধ্যা : অন্যধরার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪, কল-৩২, পৃ. ১৫
৫. তদেব : পৃ. ৭৯
৬. তদেব : পৃ. ২২৫
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র, বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ২০১১, কলকাতা, ৪৭, পৃ. ৩৬
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র, বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ২০১১, কলকাতা- ৪৭, পৃ. ৩৬
৯. রক্ষিত, মলয় : বাংলা থিয়েটার অন্য ইতিহাস, সিনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর, ২০১৭, পৃ. ১১৬-১৭
১০. রায়, কুমার : বহুরূপী, ৮৩ নং সংখ্যা, ১ মে-জুন, ১৯৯৫, শম্ভু মিত্রের সঙ্গে সুবীর রায় চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, পৃ-১৪৭
১১. Pradhan, Sudhi : Marxist Cultural Movement in India, Chronicles and Documents-Vol.-I, Pustak Bipanani, Kol, 1st Edition, July 1979, p-159
১২. সুবীর রায় চৌধুরীর সঙ্গে শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার, ২৫ এবং ২৬ আগস্ট ১৯৭৬, দুটি অধিবেশনে শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। বহুরূপী নাট্যপত্রে প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারটি, পুনর্মুদ্রিত হয় সায়ক নাট্যপত্রে, সেখান থেকেই শম্ভু, মিত্রের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা

- হয়েছে, নবপর্যায়, সংখ্যা, ৪ (১২), ২০০৫, পৃ. ৬৪
১৩. শম্ভু মিত্র : প্রসঙ্গ নাট্য, 'নাটুকে দলের সমস্যা' শীর্ষ প্রবন্ধ, সংস্কৃত
পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৭১, পৃ. ১৬
১৪. সুবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার, ২৫ এবং ২৬ আগস্ট ১৯৭৬, দুটি অধিবেশনে
শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। বহুরূপী নাট্যপত্রে
প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারটি, পুনর্মুদ্রিত হয় সায়ক নাট্যপত্রে,
সেখান থেকেই শম্ভু, মিত্রের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা
হয়েছে, নবপর্যায়, সংখ্যা, ৪ (১২), ২০০৫, পৃ. ৬৮
১৫. দে, সন্ধ্যা : অন্যধরার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম
প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪, কল ৩২, পৃ. ২৩
১৬. রক্ষিত, মলয় : বাংলা থিয়েটার অন্য ইতিহাস, সিনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ
ডিসেম্বর, ২০১৭, পৃ. ১৫০
১৭. তদেব : পৃ. ১৫০
১৮. দে, সন্ধ্যা : অন্যধরার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম
প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪, কল ৩২, পৃ. ২৯
১৯. দত্ত, সুনীল : নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর ১৯৪২-১৯৮৬, জাতীয়
সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ ১৩ই সেপ্টেম্বর '৭২, কল-
১২, পৃ. ৭৫
২০. মিত্র, শম্ভু : 'ফিরে তাকাই' বহুরূপী ৭০, বিশেষ বহুরূপী প্রযোজনা
২, অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ. ১৭০
২১. দে, সন্ধ্যা : অন্যধরার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম
প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪, কল-৩২, পৃ. ৩৮
২২. সুবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার, ২৫ এবং ২৬ আগস্ট ১৯৭৬, দুটি অধিবেশনে
শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। বহুরূপী নাট্যপত্রে
প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারটি, পুনর্মুদ্রিত হয় সায়ক নাট্যপত্রে,
সেখান থেকেই শম্ভু, মিত্রের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা
হয়েছে, নবপর্যায়, সংখ্যা, ৪ (১২), ২০০৫, পৃ. ৭৩
২৩. তদেব : পৃ. ৭১

২৪. সুবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার, ২৫ এবং ২৬ আগস্ট ১৯৭৬, দুটি অধিবেশনে
শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। বহুরূপী নাট্যপত্রে
প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারটি, পুনর্মুদ্রিত হয় সায়ক নাট্যপত্রে,
সেখান থেকেই শম্ভু, মিত্রের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা
হয়েছে, নবপর্যায়, সংখ্যা, ৪ (১২), ২০০৫, পৃ. ৮১
২৫. মিত্র, শম্ভু : প্রসঙ্গ নাট্য ‘বাঙলার নবনাট্য আন্দোলন’ শীর্ষক প্রবন্ধ
শীর্ষক প্রবন্ধ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ,
ডিসেম্বর, ১৯৭১, পৃ. ১৩০
২৬. তদেব : পৃ. ১২৯
২৭. তদেব : পৃ. ১৩০
২৮. রক্ষিত, মলয় : বাংলা থিয়েটার অন্য ইতিহাস, সিগনেট প্রেস, প্রথম
সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৭, ১৯৬২-তে বহুরূপী পত্রিকায়
শম্ভু মিত্রের সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ছদ্ম নামে ‘নব-নাট্য
আন্দোলন’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মলয়
রক্ষিত সেই প্রবন্ধের কিছু অংশ উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত
করেছেন। এখানে সেটি তুলে ধরা হয়েছে, পৃ. ১৬০
২৯. সাহা, নৃপেন্দ্র : নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৬, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক
ও থিয়েটার সংখ্যা ’৯৯,-এ প্রকাশিত সৌমিত্র বসুর
‘স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাট্য প্রয়োগের ধারা’ প্রবন্ধ থেকে
উদ্ধৃত, প্রকাশকাল মার্চ, ১৯৯৯, পৃ. ১৬৮
৩০. দত্ত, উৎপল : আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার, ‘লিটিল থিয়েটার ও
আমি’, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা,
জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ. ১৪
৩১. তদেব : পৃ. ২০
৩২. দে, সন্ধ্যা : অন্যধারার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম
প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪, কল-৩২, পৃ. ৪৮
৩৩. তদেব : সন্ধ্যা দে তাঁর উক্ত গ্রন্থে ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকার সমালোচনাটি
উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সেটি এখানে তুলে

ধরা হল। পৃ. ৫০

৩৪. ভৌমিক, তাপস : কোরক, বাংলা নাটক ও নাটক মঞ্চ, দর্শন চৌধুরী তাঁর ‘উৎপল দত্তের মঞ্চভাবনা ও অভিনয়’ শীর্ষ প্রবন্ধে ধূজটিপ্রসাদের মন্তব্য উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এখানে সেটিই তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম প্রকাশ, শারদ, ২০১৩, পৃ. ৩৯১
৩৫. দত্ত, উৎপল : আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার, ‘লিটিল থিয়েটার ও আমি’, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ. ২৮
৩৬. তদেব : পৃ. ৩৮
৩৭. ভৌমিক, তাপস : কোরক, বাংলা নাটক ও নাটক মঞ্চ, দর্শন চৌধুরী তাঁর ‘উৎপল দত্তের মঞ্চভাবনা ও অভিনয়’ শীর্ষ প্রবন্ধে ধূজটিপ্রসাদের মন্তব্য উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এখানে সেটিই তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম প্রকাশ, শারদ, ২০১৩, পৃ. ৩৯৩
৩৮. তদেব : পৃ. ৩৯৩-৩৯৪
৩৯. দে, সন্ধ্যা : অন্যধরার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪, কল-৩২, পৃ. ৬৮
৪০. দত্ত, উৎপল : আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার, ‘লিটিল থিয়েটার ও আমি’, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ. ৩৮
৪১. দত্ত, উৎপল : থিয়েটারের ভাষা, গদ্য সংগ্রহ ১, নাট্যচিন্তা, সম্পাদনা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ. ১১৭-১১৮
৪২. তদেব : পৃ. ৭৮-৭৯
৪৩. সাহা, নৃপেন্দ্র : নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৬, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক ও থিয়েটার সংখ্যা ’৯৯-এ প্রকাশিত সৌমিত্র বসুর ‘স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাট্য প্রয়োগের ধারা’ প্রবন্ধ থেকে

উদ্ধৃত, প্রকাশকাল মার্চ, ১৯৯৯, পৃ. ১৬৮-১৮১

৪৪. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহা সুশীল: অনুষ্ঠপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, চতুস্ত্রিংশ:

২য় ও ৩য়, যুগ্ম সংখ্যা ২০০০, অনুষ্ঠপ, দেবশিশ

মজুমদারের ‘অহঙ্কারের শেষ নায়ক; শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে
গৃহীত, পৃ. ৩৯৫

৪৫. তদেব : পৃ. ৩৯৫-৯৬

৪৬. তদেব : পৃ. ৩৯৬

৪৭. তদেব : পৃ. ৩৯৬-৩৯৭

৪৮. তদেব : পৃ. ৩৯৭-৩৯৮

৪৯. তদেব : পৃ. ৪০৩

৫০. দে, সন্ধ্যা : অন্যধারার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম
প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪, কল-৩২, পৃ. ২৮১। সন্ধ্যা দে তাঁর
‘অন্য ধারার থিয়েটার: উৎস থেকে উজানে’ গ্রন্থে
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘৩৩-তম জন্মদিবস’ নাটকটির
মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ১১ই নভেম্বর ১৯৮২ ‘সত্যযুগ’ পত্রিকায়
প্রকাশিত রথীন চক্রবর্তীর লেখাটি থেকে উদ্ধৃতি হিসেবে
ব্যবহার করেছেন। আমরা সেটি প্রায় অপরিবর্তিত রেখে
এখানে তুলে দিয়েছি।

৫১. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহা সুশীল: অনুষ্ঠপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, চতুস্ত্রিংশ:

২য় ও ৩য়, যুগ্ম সংখ্যা ২০০০, অনুষ্ঠপ, দেবশিশ

মজুমদারের ‘অহঙ্কারের শেষ নায়ক; শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে
গৃহীত, পৃ. ৪০৪

৫২. তদেব : পৃ. ৪০৫

৫৩. দাশ, ভবেশ : অজিতেশ, অভিক চট্টোপাধ্যায়ের ‘নিভৃত প্রাণের দেবতা’
শীর্ষক রচনাংশ থেকে উদ্ধৃত, পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ,
নভেম্বর ২০১৭, কল- ৯, পৃ. ৯৪

৫৪. তদেব : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘যতটুকু তাঁকে জানি’ শীর্ষক রচনা
থেকে উদ্ধৃত। পৃ. ১৩৭

৫৫. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহা সুশীল: অনুষ্ঠপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, চতুস্ত্রিংশ:
২য় ও ৩য়, যুগ্ম সংখ্যা ২০০০, অনুষ্ঠপ, দেবাশিস
মজুমদারের ‘অহঙ্কারের শেষ নায়ক; শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে
গৃহীত, পৃ. ২২৮-২২৯
৫৬. দাশ, ভবেশ : অজিতেশ, প্রভাত কুমার দাসের ‘অজিতেশ : তাঁর ক্ষণিক
যাত্রাজীবন’ শীর্ষক রচনাংশ থেকে উদ্ধৃত, পরম্পরা, প্রথম
প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৭, কল-৯, পৃ. ৩৪৪
৫৭. তদেব : পৃ. ৩৫৫
৫৮. তদেব : পৃ. ৩৬১
৫৯. তদেব : ‘সম্পাদকের কথা’ শীর্ষক অংশ থেকে রচনাটি উদ্ধৃত।
পৃ. ২১
৬০. ভাদুড়ি, সত্য : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমি পত্রিকা (১৬), বাদল সরকার
স্মারক সংখ্যা, শেখর সমাদ্দারের ‘বাদল সরকার ও তাঁর
থিয়েটার কোন এক বিপ্লববিস্ময়’ শীর্ষক প্রবন্ধ, প্রথম
প্রকাশ ২সেপ্টেম্বর, ২০১৪, পৃ. ২১৮
৬১. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহা সুশীল: অনুষ্ঠপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, চতুস্ত্রিংশ:
২য় ও ৩য়, যুগ্ম সংখ্যা ২০০০, অনুষ্ঠপ, ‘বিষয় নাট্যসৃজন:
নির্মাতার মুখোমুখি’ কুমার রায়, পৃ. ২৩০-২৩১
৬২. মিত্র বন্দীকিশোর ও মুখোপাধ্যায় সবুজ : বাদল সরকার-এর রুদ্ধশ্বাসে সাক্ষাৎকার, থিয়েটার
বুলেটিন পত্রিকার ১৯৮০-র জুলাই-আগস্ট সংখ্যায়
উৎপল দত্ত ছদ্ম নামে বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার
থিয়েটার সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বন্দী
কিশোরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার সেই
সমালোচনার কথা বলতে গিয়ে মন্তব্যটি করেছেন।
উনজন, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ২০১১, পৃ. ২১-২২
৬৩. রায়, দেবাশিস : থিয়েটারি তর্ক থিয়েটার বিতর্ক, কালিন্দী ব্রাত্যজন, প্রথম
প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৩, পৃ-৩১৯-৩২০

৬৪. দত্ত, সুনীল : নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর ১৯৪২-১৯৮৬, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ ১৩ই সেপ্টেম্বর ৭২, কল- ১২, পৃ. ৩৯৯
৬৫. তদেব : পৃ. ৩৫২
৬৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থাড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ২৩৯-২৪০

পঞ্চম অধ্যায় নাটককার বাদল সরকার

বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ‘নাটক লেখা, পরিচালনা করা আর অভিনয় করা এইটে হচ্ছে আমার সত্যিকারের পরিচয়।’^১ অর্থাৎ শুধু অভিনয় নয়, বাদল সরকার নিজের নাট্যদলের জন্য নিয়মিত নাটক রচনাও করে গেছেন। প্রসেনিয়াম আর অঙ্গন-মুক্তমঞ্চ মিলিয়ে ৫০-এর বেশি ছোট-বড় নাটক লিখেছেন। বাংলা থিয়েটারে সাধারণত দেখা যায় থিয়েটারের প্রয়োগের সঙ্গে যারা যুক্ত তাঁরাই নাটক লিখে থাকেন। যিনি নাটক লিখবেন তিনি নাটকের প্রয়োগকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকবেন, এই ধারা গিরিশচন্দ্রের সময় থেকেই হয়ে আসছে। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একেবারে সক্রিয় ভাবে অভিনয়— পরিচালনার মধ্যে নেই অথচ নাটক লিখেছেন এরকম দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। বিচ্ছিন্নভাবে আমরা মধুসূদন দত্ত ও দ্বিজেন্দ্রলালকে পেয়েছিলাম। সাম্প্রতিক কালের মধ্যে আমরা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলতে পারি। যিনি থিয়েটারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থেকেও নিয়মিত নাটক লিখেছেন। আসলে বেশিরভাগ নাট্যদল নিজেদের নাট্যাভিনয়ের তাগিদে নাটক তৈরি করে থাকেন। উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই নিজের দল তথা প্রোডাকশনের প্রয়োজনে নাটক তৈরি করে নিয়েছেন। এঁদের মত বাদল সরকারও তাঁর নাট্যদল ‘শতাব্দী’-র প্রয়োজনে নিয়মিত নাটক রচনা করেছেন। বাদল সরকার তাঁর থিয়েটার জীবন শুরু করেন অভিনয় দিয়ে। তারপর পরিচালনা এবং সেই পরিচালনার বা প্রয়োজনার জন্য যখন নাটক প্রয়োজন হয়ে পড়ল তখন নাটক লেখা আরম্ভ করলেন। বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

“প্রথম আমি শুরু করি অভিনয় করতে। তারপর একটু একটু করে পরিচালনা এবং শেষ পর্যন্ত আমি যে সব নাটকে অভিনয় করতে চাই তার অভাব দেখে নাটক লেখার চেষ্টা করা। সব শেষে এটা এসেছে। এমনকি কোনোদিনও নিছক সাহিত্য রচনার মত করে নাটক লিখে যাচ্ছি, অভিনয় করবে অন্যলোকে, এ অবস্থায় আমি যাইনি। নাটক করাটাই আমার নাটক লেখার প্রধান ইনসেনটিভ।”^২

অর্থাৎ বাদল সরকার নিজেকে একজন নাটককার রূপে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ। বাদল সরকার নিজে যতই বলুন না কেন বাংলা তথা সারা দেশ জুড়ে তাঁর প্রথম প্রতিষ্ঠা কিন্তু একজন নাটককার হিসেবে। এই অধ্যায়ে তাঁর নাটকের আলোচনা সূত্রে নাটককার বাদল সরকারের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব। একজন নাটককাররূপে বাদল সরকার কতখানি সফল, শিল্পমূল্যের বিচারে তাঁর

নাটকগুলি কতখানি উৎকৃষ্ট এই অধ্যায়ে সেই দিকটি আলোচনা করা হবে।

বাদল সরকারের লিখিত নাটকের সংখ্যা সাতান্ন। এর মধ্যে বাইশটি প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য আর বাকি সবকটি নাটক লিখেছেন অঙ্গন মঞ্চ ও মুক্তমঞ্চের কথা মাথায় রেখে। যদিও এই মঞ্চ বিভাজন থাকা সত্ত্বেও নাটকগুলির এদিক সেদিক হয়েছে, কয়েকটি প্রসেনিয়াম মঞ্চের নাটক প্রযোজিত হয়েছে মুক্তমঞ্চে আর কয়েকটি নাটক স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করেছে অঙ্গন থেকে বাঁধা মঞ্চে। এই বিষয়টি মাথায় রেখেও আমরা নাটককার বাদল সরকারের লিখিত নাটকগুলি দুটি পর্বে বিভাজন করতে পারি। প্রথম পর্ব তাঁর প্রসেনিয়াম থিয়েটার তথা বাঁধা মঞ্চে অভিনয়ের জন্য রচিত নাটক, আর দ্বিতীয় পর্ব হল, অঙ্গন মঞ্চ-মুক্তমঞ্চের নাটক অর্থাৎ তৃতীয় ধারার থিয়েটারের নাটক।

১.

বাদল সরকারের প্রথম পর্বের নাটকগুলির মধ্যে বেশ কিছু নাটক কৌতুক রসের, আর কিছু নাটক সিরিয়াসধর্মী। যেখানে হাসি বা কমেডির পরিবর্তে সমাজ, রাষ্ট্র এবং মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতাই মুখ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। এদিক থেকে তাঁর নাটক রচনার প্রথম পর্বকে দুটি অনুপর্বে বিন্যস্ত করে আমরা আলোচনা করতে পারি। তাঁর প্রথম নাটক ‘সলিউশন এক্স’ (১৯৫৬) থেকে ‘কবি কাহিনী’ (১৯৬৪) পর্যন্ত লিখিত নাটকগুলি মোটামুটি বিষয়গত দিক থেকে এক গোত্রের। আর ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ (১৯৬৩) থেকে ‘শেষ নেই’ (১৯৭০) পর্যন্ত নাটকগুলি একটি বিশেষ মূল্যবোধ এবং বিষয় বিন্যাসের আবেদনগত দিক থেকে স্বতন্ত্র গোত্রের। আমরা শুরুতে তাঁর কৌতুক নাটকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

এক.

বাদল সরকার তাঁর নাট্যজীবনের প্রথম পর্বে যেভাবে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রচলিত ধারাকে মেনে নিয়ে থিয়েটার জীবন শুরু করেছেন, নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তেমনি প্রচলিত ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। সাধারণ নাটকের মতোই অঙ্ক কিংবা দৃশ্য, বিশিষ্ট ঘটনাধর্মী কাহিনির উত্থান-পতন এবং ‘মধুরেণ সমাপেয়ৎ’ নাটকই ছিল আদর্শ। এই পর্বের নাটকগুলিতে হাস্যরসকে মূল রস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। হাস্যরস কিছু পরিস্থিতি নির্মাণ করে দর্শককে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। আমরা নাটকগুলি আলোচনার পূর্বে দেখতে চেষ্টা করব কেন হাস্যরসকে নাটক রচনার মূল আধার হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন। কেন তিনি এই পর্বের নাটকগুলিতে হাস্যরসকে মূল রস হিসেবে গড়ে তুললেন এবং ওই হাস্যরস নির্মাণের জন্য নাট্য পরিস্থিতি গড়লেন।

ছোটবেলা থেকেই বাদল সরকারের কমেডির প্রতি একটা আলাদা ঝোঁক ছিল। ছাত্রাবস্থায় থেকেই তিনি হাস্যরসের নাটক পড়তে ভীষণ আকর্ষণ বোধ করতেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নিজের বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন—

“অন্য বইয়ের থেকে নাটক পড়তে বেশি ভালো লাগত। দ্বিজেন রায়ের ‘শাজাহান’, ‘চন্দ্রগুপ্ত’, ‘মেবারপতন’, গিরিশ ঘোষের ‘জনা’, ‘পাণ্ডবগৌরব’, ‘আবু হোসেন’, ‘ক্ষীরোপ্রসাদের ‘চাঁদবিবি’ ইত্যাদি কতবার যে পড়েছি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ কয়েকটি চরিত্র মনে বেশি জায়গা করে নিয়েছিল তখনই— দিলদার, হামিদ সর্দার, কঞ্চুকী, বিদূষক, ঘেসেরা-ঘেসেটি, আবু হোসেন। মূল সুরটা হাসির।”^৭

এই ভালো লাগার জায়গা থেকে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার পর ধারাবাহিক লেখার দিকে যখন তিনি ঝুঁকলেন তখন প্রথমত হাসির নাটকেই বেছে নিলেন। বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

“সেই সময়ে আমার একটা ঝোঁক ছিল কমেডির উপর। এবং যে-কটা কমেডি করার মতো মনে হয়েছে, সব করা হয়ে গেছে। তার সবগুলো যে পুরোটা ভালো লেগেছে তাও নয়, তবু করেছি। আসলে বাংলায় তো স্ট্রেট কমেডি তেমন ছিল না— মানে প্রহসন নয়, স্যাটিয়ার নয় ... তখন একটা লেখবার ঝোঁক আসে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে নাটক করতে চাই।”^৮

উনিশ শতকে একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলা কমেডি নাটক লেখার প্রচলন হয়। মূলত ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন, ব্রাহ্মধর্মের উত্থান প্রভৃতির ফলে এতদিনের প্রচলিত বাঙলার সমাজ জীবনে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। তার সবটাই যে পরিত্যাজ্য এ কথা বলা যায় না, তেমনি অনেক কিছুই তৎকালীন নাটককাররা মেনে নিতে পারেননি। সমাজে প্রচলিত অনেক কুপ্রথা-কুসংস্কার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সেই সময়ের নাটককাররা বারবার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। নানা ভণ্ডামি, মদ্যপান, লাম্পট্য প্রভৃতি থেকে সমাজকে কলুষমুক্ত করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাঁদের কমেডি নাটকগুলির ভূমিকা, শিরোনাম, বিশেষ বিশেষ চরিত্রের নাম, সংলাপ বিশেষত যে চরিত্রগুলি নাটককারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছে তাদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে সম্যকভাবে নাটককারদের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হতো। যেমন— রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ মধুসূদনের ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’, ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ’, দীনবন্ধু মিত্রের ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’, ‘জামাই বারিক’, অমৃতলাল বসুর ‘বিবাহ বিভ্রাট’, ‘বাবু’ প্রভৃতি। এইসব কমেডি রচয়িতাদের নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় ছিল বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। সমাজের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও

যৌন জীবনের যে অনাচারগুলি তাঁদের পীড়িত করত সেগুলির উপর তাঁদের ব্যঙ্গের তীব্র কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল কমেডিকারই যে সামাজিক অসংগতির চিত্র অঙ্কণ করে গেছেন তা নয়। শুধুমাত্র সমাজ সংশোধনে বা রুচিবিকৃত মানুষের চাহিদাবৃত্তি, চরিত্র সংশোধনের জন্যই প্রহসন রচিত হতে পারে না, নিছক নির্মল আনন্দদানের উদ্দেশ্যেও কমেডি রচনা করা যায় তার প্রমাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাস্যকৌতুক নাটক। আর সেই ধারাকে আরো প্রসারিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৌতুক নাটকের মধ্যে। সমাজের উপর তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পরিবর্তে মানুষের অন্তর্লোকে আলো ফেলে তাদের চিন্তাভাবনার শিথিলতা, চরিত্রের দুর্বলতা, জীবনাচরণের অসঙ্গতি প্রভৃতি মার্জিত কৌতুকে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের কমেডি নাটকে। রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটকগুলি আশ্রমজীবনে সাময়িক বৈচিত্র্য আনার জন্য ও বালক বালিকাদের আমোদ-প্রমোদ দেবার জন্য রচিত। যেমন— ‘পেটে ও পিঠে’, ‘ভাব ও অভাব’, ‘আর্য ও অনার্য’, ‘গুরুবাক্য’, ‘সূক্ষ্ম বিচার’ প্রভৃতি। সামগ্রিক বিচারে তাঁর কৌতুকপ্রধান নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ব্যক্তি চরিত্রের অসংগঠিত, যেমন— বাতিক গ্রস্ততা, মুদ্রাদোষ, অতি সারল্য, অত্যাধিক চিন্তা করার প্রবণতা, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতি নিয়ে তিনি মূলত কৌতুক বা পরিহাস করেছেন, কিন্তু সেখানে সমাজের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রকাশিত হয়নি। নিছক কৌতুক বা ব্যঙ্গের ছলেই সমাজের অনাচার বা কোন অনড় অবস্থানের বিরুদ্ধে সদর্থক বার্তা দিয়েছেন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নির্মল কৌতুক নাটকের ধারা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলো না। আসলে বাঙালি হাসির প্রসন্নতার তুলনায় পছন্দ করে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা। অনেক বাঙালি অতিরিক্ত গোমড়ামুখো, তর্কিক, তাত্ত্বিক এবং বেরসিক, সবকিছুতেই গভীর অর্থ খোঁজা স্বভাব এবং দেশের ও দশের উপকার না হলে শিল্পসৃষ্টিমাত্র নিষ্ফল বলেই মনে করেন। তাই জ্যোতিরিন্দ্র-রবীন্দ্র অনুসৃত কমেডির ঐতিহ্য আমাদের তেমন গড়েনি। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’ অথবা অনুরূপ নাট্যকীর্তি বাংলায় প্রায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। অথচ সার্থক স্যাটারারদের সংখ্যা সেকালে অথবা একালে একেবারে উপেক্ষার মতো নয়। তুলনায় প্রসন্ন কমেডি বাংলায় নিতান্তই অপ্রতুল। বাদল সরকার যেন এই অভাব মেটানোর জন্যই লিখতে শুরু করেছিলেন হাসির নাটক। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

“আমরা বাঙালিরা কাঁদতে ভালোবাসি আর হাসতে লজ্জা পাই, এ কথাটাও আমার মানতে ইচ্ছা করে না। আমার বরং বলতে ইচ্ছে করে— আমরা চরম দুঃখেও হাসতে পারি, চূড়ান্ত ট্রাজেডিও হাসি দিয়ে ফোটাতে পারি, জটিলতম সমস্যাও হাসির মাধ্যমে উপস্থিত করে হেসে তার মোকাবিলা করতে পারি।

তাই হাসির দাম আমার কাছে কম নয়।”^৫

হিউমারহীন নাটক বা হাসি নেই এমন নাটক বাদল সরকার খুব একটা পছন্দ করতেন না। যদিও বাদল সরকার পরবর্তী জীবনে বেশ কিছু সিরিয়াস নাটক লিখেছেন কিন্তু হাসির নাটকের প্রতি তাঁর একটা অন্যরকম দুর্বলতা ছিল। তাঁর মতে হাসির নাটক লেখা সবচেয়ে কঠিন কাজ। একটি সাক্ষাৎকারে তাই বাদল সরকার লিখেছেন—

“হিউমার নেই, হাসি নেই এমন নাটক, আমার না ডাইরেকশান দিতে ইচ্ছে করে, না লিখতে ইচ্ছে করে। আর ওই ধরনের নাটক লেখাটা এত শক্ত যে ওটা আর বুড়ো বয়সে আমার ক্ষমতায় কুলোবে বলে মনে হয় না। ফলে সোজা কথা নাটক লেখায় ছেড়ে দিলাম।”^৬

বাদল সরকারের এই বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কমেডি তথা হাসির নাটক লিখতে তিনি কতটা পছন্দ করতেন। এবং তিনি এও জানাচ্ছেন যে হাসির নাটক লিখতে পারছেন না বলে তিনি নাটক লেখাই ছেড়ে দিয়েছেন! বাদল সরকার তাঁর থিয়েটার জীবনের প্রারম্ভে, ছোটখাটো নাট্যাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে যখন একটু একটু করে নিজেকে তৈরি করছেন তখন তিনি হাসির নাটককেই অভিনয়ের জন্য বেছে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাদল সরকার কিন্তু নিছক ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ, মুখবিকৃতির সাহায্য নিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করার কৌশল পছন্দ করতেন না। ‘নিছক ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ বা মুখবিকৃতির সাহায্য না নিয়ে’^৭ হাসাতে তিনি ভালোবাসেন। নিছক ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ বা মুখবিকৃতি বাংলা হাসির নাটকের মূল আলম্বন কিনা সে বিতর্ক থাকতেই পারে কিন্তু বাদল সরকারের হাসির আলম্বন যে এসব নয় তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে ‘সলিউশন এক্স’ থেকে ‘কবিকাহিনী’ পর্যন্ত রচিত নাটকগুলিতে। সমস্যার অনন্যতায় নয় চরিত্রগুলোর জটিলতায় নয়, এই নাটকগুলি পাঠকের মন দ্রুত অধিকার করে নেয় পরিস্থিতি নির্মাণের নিপুণ চাতুর্য ও সংলাপের অমোঘ প্রয়োগের অনিবার্যতায়। শিল্পের অন্যতম শর্ত হল সংযম। বাদল সরকার সেই সংযমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পরিমিতবোধ দিয়েই তিনি সংহার করেন যাবতীয় ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ বা মুখবিকৃতির সম্ভাবনাকে। তিনি কমেডি নাটকে সমাজের প্রতি কোন বক্তব্য কিংবা যুগ সমস্যার আলোচনা অথবা বাণী পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল শুধু ‘হাসি বা হাসানো’।^৮ বাদল সরকারের হাসির নাটকগুলি পড়লে মনে হয় তিনি নিজে এই ধরনের নাটক অত্যন্ত উপভোগ করেছেন এবং সেই উপভোগের অংশটা পুরোপুরি পাঠককে-দর্শককে ঢেলে দেবার চেষ্টা করেছেন। হাসির নাটক হিসেবে এই পর্বের নাটকগুলির মূল্য পাঠক-দর্শকের কাছে আর যাই হোক না কেন, বৃহত্তর নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বাদল সরকারের এই নাটকগুলিই ছিল অনিবার্য প্রথম অবলম্বন। এই

নাটকগুলিকে সম্বল করেই বাদল সরকার ক্রমশ নাটকের জগতে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেছেন আর সেই সঙ্গে একদিকে বিনোদন এবং অন্যদিকে দায়বদ্ধতার প্রস্তুতি নিয়েছেন এই পর্বে। সুতরাং নাট্যকর্মী বাদল সরকারের এই পর্বের নাটকগুলির প্রাসঙ্গিক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। আমরা প্রথমে তাঁর হাসির নাটকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

বাদল সরকারের প্রথম নাটক ‘সলিউশন এক্স’, ১৯৫৬-এ লেখা। যদিও এর আগেও তিনি নাটক রচনা করেছেন। নাট্যরূপও দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর স্বীকৃতি অনুযায়ী এটি-ই তাঁর লেখা প্রথম নাটক। নাটকটি একটি বিদেশী চলচ্চিত্র ‘মাক্সি বিজনেস’ (Monkey Business)-এর কাহিনি অবলম্বনে রচিত। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে সাপ্তাহিক ‘খাপছাড়া’ পত্রিকায়। এই নাটকটি সম্পর্কে বাদল সরকার লিখেছেন—

“...১৯৫৬ সালে বিলেত যাবার আগে ‘মাক্সি বিজনেস’ বলে একটা সিনেমা দেখেছিলাম, তার থেকে গল্পের একটা আইডিয়া পেলাম। সেই আইডিয়াটা নিয়ে আমি ‘সলিউশন এক্স’ লিখেছিলাম। ... ওটাই আমার প্রথম নাটক।”^{৯০}

একটি সলিউশনকে নিয়ে যে কীর্তি এবং বিভ্রাট তা এ নাটকের মূল বিষয়বস্তু। শম্ভুনাথ বিজ্ঞানী ভোলামনের মানুষ। তার গবেষণাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক বিভ্রাট ঘটে গেছে। মূলত বিভ্রান্তি থেকেই এই বিভ্রাট। বার্ষিক্য ঠেকবার ঔষধ বের করতে গিয়ে খরগোশের উপর পরীক্ষা করার জন্য একটা সলিউশন ব্যবহার করতে বলে এসেছেন সহকারী সোমেন চ্যাটার্জিকে। ফোনে খবর নিচ্ছেন শম্ভুনাথ। এই ফোনে খবর নেওয়াটা দারুণ উপভোগ্য এবং কৌতুকময়—

“... ইয়ে— সোমেন চ্যাটার্জী তো? ... মানে, ডক্টর সোমেন চ্যাটার্জী তো? ... যাক, ঠিক আছে তাহলে— বাঁচা গেল— কী হোলো বলুন তো? হ্যাঁ... হ্যাঁ... আর কিছু না? ... আচ্ছা, ঝটফট কতোক্ষণ করেছে ...? ছটফট নয়? লাফালাফি? ... দু’ মিনিট তেরো সেকেন্ড? কী রকম ধরনের? ... দু’পায়ে দাঁড়িয়েছিলো? ক’বার ... তিনবার? ... আচ্ছা শুনুন, আপনি ফিল্টার্ড সলিউশনটা একটু আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারবেন? না না, পাঠিয়ে নয়, আপনি নিজে যদি আসতে পারেন— আর কাউকে বিশ্বাস নেই। ... আসছেন? থ্যাঙ্কস্।”^{৯১}

এরপর ঘটতে থাকে একের পর এক ঘটনা। গবেষণাগার থেকে ঐ সলিউশনটা বাড়িতে এনেই বিপত্তিটা ঘটল। ঐ সলিউশনে মেশানো হয় গ্ল্যাণ্ড এক্সট্রাক্ট বি-ফোর। আর সেই মিশ্রিত সলিউশন পড়ে গিয়ে মেয়ে টুটুলের হাতে। ধরা পড়ার ভয়ে টুটুল সেটা জলের ট্যাঙ্কে ফেলে দেয়। কেউ জানতে পারল না। সেই জল যারা খেলেন তারা প্রত্যেকে সলিউশন-এর প্রভাবে একটু আধটু

আক্রান্ত হলেন। এলোমেলো কথা বলতে বা অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করে দিলেন। ডাক্তার শম্ভুনাথ ঐ মিশ্রিত সলিউশন খেয়ে ছাদে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এরই ফাঁকে পাশের বাড়ির একটি বাচ্চা ছেলে সকলের অলক্ষ্যে ঘরের মধ্যে ঢুকে বাথটবের কাছে খেলা করছিল। শম্ভুনাথকে খুঁজতে গিয়ে বাথরুমে তার ট্রাউজার্স দেখে এবং একপাশে শিশুটিকে দেখে শম্ভু-পত্নী অণিমা প্রায় পাগল হতে যায়। শম্ভু-পত্নী অণিমার মনে হয়, ঔষধের প্রয়োগে তার স্বামী শিশু হয়ে গেছে। অণিমা ভাবল এই শম্ভু।

“অণিমা: দেখেছেন সোমেনবাবু? ঠিক সেই নাক, সেই মুখ— শুধু গৌপটা নেই। ওগো শুনছো? তুমি একটু কথা বলতে চেষ্টা করো না? আমার কথা বুঝতে পারছো না ...ঐ দেখুন! আপনি ডাকতেই আপনার দিকে ফিরেছেন। নাম মনে আছে নিশ্চয়ই!”^{১১}

শম্ভুনাথ ঘুম সেরে ছাদ থেকে নেমে আসে। তিনি বিষয়টা নিয়ে খুব চিন্তিত কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে কি ঘটছে। বাড়িময় হৈ হৈ পড়ে গেছে। শেষে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটিত হয়।

সহজ সরল কাহিনি। কোন গভীর বক্তব্য নেই। নেই কোন সমাজের প্রতি বার্তা। এক রহস্য নাটকের পরিবেশ তৈরি হলো বটে তবে তা শুধু অভিনয়ের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের জন্য। সবটাই ঘটেছে দর্শকের চোখের সামনে। তাদের চোখের সামনেই টুটুল জলের ট্যাংকের মধ্যে সলিউশন বিকারটা ফেলেছিল। ফলে দর্শকের সবটাই জানা। অভিনেতারা যথেষ্ট উত্তেজিত অথচ দর্শক সানন্দে রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন। নাটকে যথেষ্ট টেনশন তবে কোথাও কোন অস্পষ্টতা বা জটিলতা নেই। এখানে বিজ্ঞানের গবেষণাকে কোনভাবে ব্যঙ্গ না করেই একটা অসাধারণ হাস্যকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। বিশুদ্ধ হাস্যরসের পরিস্থিতি বা কমিক সিচুয়েশন নির্মাণে বাদল সরকার এখানে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

নিজে নির্দেশক ও অভিনেতা হওয়ার কারণে বাদল সরকার অভিনয়ের ব্যাপারে খুব সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের সীমিত ক্ষমতার কথা তিনি জানতেন। ফলে কম খরচায় কী করে মোটামুটি চালিয়ে নেওয়া যায় তার প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। নাটকের একটি দৃশ্য। মধ্যবিত্ত ডাক্তারের বাড়ি। নাটকের শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছে কোথায় কী রাখা আছে—

“বৈজ্ঞানিক ডক্টর শম্ভুনাথ সেনগুপ্তের বাড়ি। ঘরটি তাঁহার নিজস্ব গবেষণাগার। মঞ্চের পিছন দিকে একটি বড়ো টেবিলে গবেষণা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, রসায়ন পদার্থ ইত্যাদি রহিয়াছে। নিকটে খান দুই টুল। সম্মুখের দিকে একপাশে একটি লিখিবার টেবিল ও চেয়ার, অন্যপাশে একটি বড়ো গদিসম্মিত চেয়ার। পিছনে

বড়ো টেবিলটির নিকটে একটি টুলের উপর একটি মাঝারি আকারের পানীয়
জলের ঢাঙ্ক, উপরে ঢাকনা ও সামনে ছোট একটি কল— যেমন সচরাচর থাকে।
কলের নিচে একটি বালতি অথবা অনুরূপ পাত্র। লিখিবার টেবিলে টেলিফোন।
ঘরের একদিকে বাহিরে যাইবার পথ, অন্যদিকে অন্দরের।”^{১২}

অভিনয়ের সময় কী কী লাগবে, সব উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বাদল সরকার নির্দেশকের কল্পনা
বা ইচ্ছের উপর নির্ভর না করে সবকিছুই বলে দিয়েছেন নাটকের মধ্যেই।

নাটকের ঘটনাগুলি এক রাতের মধ্যে ঘটে। দ্রুত গতিতে নাটক এগিয়ে চলে, কোথাও
এক মুহূর্তের জন্য থামবার ফুসরত নেই। নিশ্চিত রূপে এ নাটক প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জন্য
লেখা। এ নাটকে দর্শকের কোন রকমের সহযোগিতা দরকার নেই। তারা আসুন, টিকিট কাটুন,
আরামে বসে নাটক দেখুন, উপভোগ করুন, হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে যান। এইরকম স্ট্রেট কমেডির
অভাবই এতদিন বাদল সরকার অনুভব করেছিলেন। ‘সলিউশন এক্স’ এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে সেই
অভাব পূরণে সার্থক ভূমিকা পালন করেছে।

বাদল সরকারের দ্বিতীয় এবং পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক ‘বড়ো পিসীমা’। ‘বড়ো পিসীমা’ কমেডি
নাটক হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। এটি হিন্দিতে ‘বড়ি বুয়াজি’ নামে অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন প্রতিভা
অগ্রবাল। ‘বড়ো পিসীমা’ নাটকের রচনাকাল নিয়ে একটু বিভ্রান্ত হতে হয়। ‘রঙ্গনাট্য সংকলন’-এ
‘বড়ো পিসীমা’র রচনাকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে উনিশশো ঊনষাট সালের মাঝামাঝি সময়। কিন্তু
ঐ গ্রন্থের পরের পাতায় ভূমিকা লিপির শেষে পুনরায় রচনাকাল উল্লেখিত হয়েছে ১৯৫৮ সাল।
আবার ‘নানামুখ’ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে ১৯৫৯। তবে এটি বাদল সরকারের লগুন প্রবাসকালে
লেখা। ১৯৫৭-৫৯ পর্যন্ত তিনি লগুনে ছিলেন। ফিরে এসে ‘চক্র’-এর প্রযোজনায় ‘বড়ো পিসীমা’
নাটক মঞ্চস্থ করেন। বাদল সরকারের নির্দেশনায় ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০ সালে এ.বি.টি.এ-এর
হল ঘরে এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। বাদল সরকার এই নাটক সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

“বিলেতে প্রথম ফুল লেংখ মৌলিক নাটক লিখেছি ‘বড় পিসীমা’। মাইথনে

থিয়েটার করতে গিয়ে যে ঝামেলাগুলো হত সেটাকেই ভিত্তি করে লেখা।”^{১৩}

নাটকে আছে বিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত পরিবারের বিয়ের বয়সী মেয়েদের নাটকে অভিনয় করা
নিয়ে কি হাস্যামা না হত— তারই চিত্রণ। কলকাতার একটি কলোনিতে সবাই মিলে একটি নাটক
করবার উদ্যোগ নিয়েছেন। ‘কালবৈশাখী’ নামে একটি নাটকের রিহাসাল চলছে অন্যতম অভিনেত্রী
অনুর ফ্ল্যাটে। সেখানে নাট্য পিয়াসী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা জড়ো হয়েছেন। নাটকের রিহাসাল
চলছে। শুরুতেই বাদল সরকার এমনভাবে ঘটনা এবং তার উপযোগী সংলাপ রচনা করেছেন যে

নাটক সেখান থেকেই জমে ওঠে। বিপদগ্রস্ত নায়িকা যখন উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে মথিত, ঠিক তখনই নাটকের মহড়ার বাইরে বাড়ির ভেতর থেকে ভৃত্য নায়িকা অনুকে চিৎকার করে ডাকতে থাকে, ডাক দর্শকেরা শুনতে পাচ্ছেন— “দিদিমণি! মা ডাকছেন, আপনাকে খাবেন, আসুন।”^{৪৪} নায়িকার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের মুহূর্তেই এই রকম হাস্যকর একটি ভুল নাটকীয় সংলাপে মহড়া কক্ষে হাসির রোল ওঠে। কারণটা পরিচালকের কথায় স্পষ্ট, ‘পরশু থিয়েটার-মধ্যে আর একটা দিন! আজও মাকে মেয়ে খাওয়াচ্ছে? সেদিন একমাঠ লোকের সামনে কী কেচ্ছাটি হবে একবার ভেবে দেখেছো?’^{৪৫} অর্থাৎ নাটকের ভিতর নাটক। প্রথমেই নাটকীতা। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের পর উচ্চকিত হাসিতে পরিচালকের কথায় বোঝা গেল সেটা মহড়া। প্রথমে তা বলা হচ্ছে না। প্রথমেই হাস্যকর সিচুয়েশন পাচ্ছি। এই সিচুয়েশনটি আরও ঘনীভূত হয় পরিচালকের অত্যন্ত সিরিয়াস হওয়ার ফলে। বিরক্ত পরিচালক আবার ফিরে সেই সিনটি মহড়ায় ফেলতে চাইছেন। তিনি সবাইকে প্রস্তুত হয়ে সিনটি আবার করতে বলেন। এদিকে নায়িকা পড়েছে বড় বিপদে। এই সিনটি আবার করতে হলে তাকে তো আবার ডুকরে কাঁদতে হয়। বিরক্ত হয়ে নায়িকা বলে—

“আর আমি কাঁদতে পারবো না! কতোবার কাঁদা যায় বলুন? সবশুদ্ধ চারটে সীনে ছ’টা কান্না। শেষ দৃশ্যে তো প্রায় একনাগাড়ে কেঁদে যাওয়া। ভালো বই বের করেছেন বেছে— ‘কালবৈশাখী’”^{৪৬}

আমরা বুঝতে পারি যে নাটকের মহড়া চলছে সেই নাটকের নাম ‘কালবৈশাখী’। ‘কালবৈশাখী’ নামটা তাৎপর্যবহ। নাটকের রিহাসাল চলাকালীন হঠাৎ খবর এলো অনুর ফ্ল্যাটে তার বড় পিসিমা আসছেন। বড় পিসিমা প্রাচীনপন্থী এবং ভয়ঙ্কর জাঁদরেল মহিলা। বাড়িতে মেয়ে থাকবে হইহল্লা হবে, এ সমস্ত একদমই পছন্দ করেন না। থিয়েটার তো নয়ই, অথচ নাটকের রিহাসাল চলছে অনুদের ফ্ল্যাটে। সেটাই প্রকৃতপক্ষে নাট্যমঞ্চ। এদিকে অনাথ স্টেজ ও প্যাণ্ডেল বাঁধার নারকেল দড়ি রাখতে এসেছে, শম্ভু বাঁশ পোতা শেষ করেছে, সকলে প্রবল উৎসাহে নাটকের মহড়া দিচ্ছে। এমন সময় কালবৈশাখী ঝড়ের মত এলেন বড় পিসিমা। বাইরে পিসিমার ‘যোগীন’ ‘যোগীন’ ডাক শুনে হঠাৎ করে সকলেই ঘাবড়ে যায়। যোগীন অনুর বাবা। বড় পিসিমার ভাই। অনু ঘাবড়ে গিয়ে বলে ‘বড়োপিসী! শিগ্গির!!’^{৪৭} অর্থাৎ বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। নাটকীয় সেই মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে নাটককার লিখেছেন— “শিগ্গির যে কী করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কাহারও ধারণা স্পষ্ট না থাকা সত্ত্বেও ঘরে প্রচণ্ড ব্যস্ততা শুরু হইয়া গেল।”^{৪৮} পিসিমার হঠাৎ আগমনের কারণে এরপর যা যা ঘটলো তাতে দর্শক না হেসে পারেন না।

“স্মারক উদ্ভাস্ত ব্যস্ততায় একটি মোড়া সরাইতে গিয়া বারান্দার দরজাটি সম্মুখে

পাইয়া মোড়া ফেলিয়া পলায়ন করিল। পিছনে ধুবেশ। শব্দ একমাত্র শান্ত, সে
নারিকেল দড়ির কুণ্ডলীটি ডিভানের নিচে ঢুকাইল। তারপর চাপাস্বরে ‘অ্যাশট্রে’!
হাঁকিয়া পিছনের দরজা ভেজাইয়া দিতে গেল।... পিসীমা ... দুইবার সমস্ত ঘরে
সমস্ত অতিথিবৃন্দের উপর সার্চলাইটের দৃষ্টি ঘুরাইলেন।”^{১৯}

এরপর সবাইকে পিসিমা নামক উকিলের জেরার মুখোমুখি হতে হয়। কোন কথা না বলে অনু
কেবল জানায় যে তার বাবা এদের চা’য়ের নেমস্তন্ন করেছে। পিসিমার হুকুমে সকলে বসে পড়ে।
মজার ঘটনা ঘটে শশাঙ্ককে নিয়ে। নিরুপায় হয়ে সে একটি ছাইদানের উপর বসে পড়ে। নাম
জিঞ্জের করায় সকলে নাটকের রিহাসালের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে থমকে নিজস্ব নাম উচ্চারণ
করে। কিন্তু এরই মাঝে খানিক স্বস্তি, জানা গেল পিসিমা এবার তিন দিনের জন্য অন্য এক আত্মীয়র
বাড়িতে গিয়ে থাকবেন। সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। কারণ তার মধ্যে থিয়েটার হয়ে যাবে। পিসিমা
রক্তচক্ষুর ভীতিমুক্ত হয়ে এবার সকলে যে সমস্ত আচরণ করতে থাকে তা নিয়েও ঘটতে থাকে
বহুতর বিঘ্ন-বিপত্তি। নিতাই মনের আনন্দে ভুলে সিগারেট বের করেও সচেতন হয়ে লুকিয়ে রাখে।
শশাঙ্ক ছাইদানের কথা ভুলে গেছে। পিসিমা তারই উপরে বসেছেন। নাটকীয় সেই ঘটনা অত্যন্ত
দক্ষতার সঙ্গে নাটককার নির্মাণ করেছেন। “(পিসীমা বসিলেন দুর্ভাগ্যক্রমে ছাইদানের উপর, এবং
লাফাইয়া উঠিলেন) মা গো! (ছাইদান তুলিয়া) হুঁ! ভদ্রলোক! বসে বসে বিড়ির শ্রাদ্ধ করেছে।
তাও মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে বসে! (হাতুড়ি দেখিয়া হাতে তুলিলেন) এঁচোড়ে পাকা ছোকরা
যতো সব! (হাতুড়ি হস্তে একটি নৃশংস ভঙ্গী করিলেন এবং বারান্দার দরজা ঠেলিয়া নারিকেল দড়ি
হাতে সেই উদ্যত হাতুড়ির সম্মুখে অনাথের প্রবেশ। পিসিমা ভীষণ চমকাইয়া পিছু হঠিলেন।)
কে!! (অনাথ ততোধিক চমকাইয়া পিছু ফিরিল) এই খবরদার! দাঁড়াও!”^{২০} বাদল সরকার এখানে
খুবই দক্ষতার সঙ্গে নাট্য ঘটনাকে বিন্যস্ত করেছেন। নাটকের রিহাসালের মধ্যে দিয়ে এবং নাট্য
প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে একেরপর এক বিঘ্ন-বিপত্তি ঘটে চলেছে। অনাথ বড় পিসিমার নানান প্রশ্নের
উত্তরে থিয়েটারের কথা মহাউৎসাহে বলে ফেলেছে। এরপর আবার গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার
মতো শব্দের ভাইপো ভাইজি নাচতে নাচতে ক্রমে পিসিমাকে তাদের অনু মাসি কেমন নাটক করে
সেই সংলাপ শুনিতে গেছে। ফলে পেটের যন্ত্রণা বলেও অনুর রেহাই নেই। কোল্লগরের মধুদার
বাড়ি রওনা হয়েছে। নিরুপায় হয়ে মাস্টার ক্রিমিনাল শব্দ মধুবাবুর মেয়ের নাম করে অসুস্থতার
টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়ায় সেখান থেকে পিসিমা, পিসেমশাই ও অনেকে চলে আসতে হয়। শেষ
পর্যন্ত নিতাই-এর সঙ্গে অনুর বিয়ের সার্টিফিকেট জাল করার চিন্তা করে অনেকে থিয়েটার করানোর
চিন্তা করেছে শব্দ। তবে তার প্রয়োজন হয়নি শেষ পর্যন্ত। কারণ শব্দ স্ত্রী চরিত্র চিনতে ভুল করেছে,

সে ভেবেছিল নিতাই অনু পরস্পরের প্রতি দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে অনু শম্ভুর প্রতি দুর্বল। সেটি ভালো বোঝেন শম্ভুর বৌদি প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্ব প্রতিমাদেবী নিয়েছেন। কিন্তু তাতে আরো বেশি রহস্যময় ধন্দে পড়েছে শম্ভু ও নিতাই। দু'জনে শলাপরামর্শ করছে আর মধ্যে মধ্যে থিয়েটারের নানা বিষয় নিয়ে কেউ নিতাই-এর সঙ্গে কেউ শম্ভুর সঙ্গে কথা বলেছে। এইভাবে বাদল সরকার কথিত ‘সারপ্রাইজ্ আর সাস্পেন্স’^{২১} এ নাকটের কৌতুককর পরিস্থিতিগুলি নির্মিত হয়ে চলে।

অবশেষে বড় পিসিমা ফিরে এসেছেন। আর শম্ভুর বৌদির বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে শেষ পর্যন্ত পিসিমা শান্ত হয়েছেন। এমনকি নাট্যাভিনয়ের দিন নিজেই একেবারে সামনের সিটে বসে থিয়েটার দেখেছেন। সম্ভবত পিসিমাকে অনুর সঙ্গে শম্ভুর বিয়ের প্রস্তাব দিয়েই সব সমস্যার সমাধান করেছেন। তবে কোন মন্ত্রবলে শম্ভুর বৌদি এটা সম্ভব করলেন তার কোনো স্পষ্ট রেখাচিত্র নেই। বস্তুত শম্ভুকে পিসিমা প্রথম থেকেই হুঁচড়েপাকা জ্যাঠা ছোকরা বলে অপছন্দ করেছেন। আবার যাদের থিয়েটার নেশা তাদের ভালো মানুষ মনে করেন না। এই পিসিমা কীভাবে শম্ভুর সঙ্গে ভাইবির বিয়ে দিতে রাজি হলেন তাঁর কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। শম্ভুর বৌদি পিসিমাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছেন যাতে পিসিমা নিজস্ব বিশ্বাস থেকে সরে এলেন সেই বিষয়টিও স্পষ্ট নয়। আসলে এই ধরনের সিচুয়েশনাল কমেডি নাটকের মধ্যে ঘটে যাওয়া সব ঘটনার যেমন কার্যকারণ সম্পর্ক সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি নানাবিধ সিচুয়েশন বা প্রেক্ষিত-এরও সমর্থনযোগ্য ব্যাখ্যা মেলেনা। অবশ্য একথা ঠিক, এই ধরনের নাটকে সব ঘটনা বা প্রেক্ষিতের সব কিছু যুক্তিযুক্ত হবে তা কেউ দাবীও করে না। আসল কথা হল নাটকের মজাটা। এটা জমলেই এই ধরনের নাটকের সিদ্ধি।

এই নাটকের হাস্যরস পরিস্থিতি জনিত। কোন ক্যারিকেচার বা ভাঁড়ামো নেই আবার ব্যঙ্গের কশাঘাতও নেই। নিছক হাসানোর মূল্য যে নাট্যকারের কাছে কম নয় তা এই নাটক পড়লে বোঝা যায়। নির্মল হাস্যরস ফুটে ওঠে এই নাটকের সংলাপে। এই নাটকের সংলাপ পরিস্থিতির তৈরি একেবারে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। যেমন তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শম্ভু ও নিতাই কীভাবে পিসিমাকে সরানো যাবে সেই চিন্তা করে যখন বিভ্রান্ত ও গলদঘর্ম হয়ে পড়েছে তার মাঝেই স্মারক এসে কোন দিক থেকে প্রস্পট করবে জিজ্ঞেস করায় নিতাই উত্তর দিয়েছে বাঁ দিক থেকে। স্মারক পুনরায় জিজ্ঞেস করেছে— “অ্যাক্টরদের বাঁদিক না দর্শকদের বাঁ দিক?”^{২২}

“নিতাই : (বাঁঝিয়া) সব্বাইকার বাঁদিক। বললাম না এখন কাজের কথা হচ্ছে!”^{২৩}

সিচুয়েশনাল কমেডির এ এক সার্থক সংলাপ। এমনকি পরিবেশ যেমন তৈরি করা হচ্ছে সংলাপের ভাষাও তেমনি হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের ‘কালবৈশাখী’ নাটক চলছে। রাজীব তার

অভিনয় করে নিতাইয়ের কাছে সিগারেট চাইছে, বলছে— “ — আমার প্যাকেটটা যে কে মেরে দিলো!”^{২৪} অর্থাৎ নাটক একটা হচ্ছে এবং এখানে গ্রিনরুমে বসে ঘরোয়া ভাবে কথা বলছে। পরিস্থিতিই ‘মেরে দেওয়া’র মতো ভাষার জন্ম দিয়েছে।

সিচুয়েশনধর্মী কমেডির সংলাপের ভঙ্গি এবং ভাষা যথার্থ শিল্পসার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে এই নাটকে। তিন অঙ্কের এই নাটকটির দৃশ্য বিভাজনের একটা ক্রম আছে। প্রথম অঙ্কে দৃশ্য ভাগ নেই অর্থাৎ একটিই দৃশ্য। দ্বিতীয় অঙ্কে দুই দৃশ্য এবং তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য অর্থাৎ অঙ্ক অনুযায়ী তার দৃশ্য সংখ্যা। নাটকের ঘটনাগুলি এত সাবলীলভাবে এগিয়ে চলে যে দর্শকের এপাশ-ওপাশ করার সুযোগ থাকে না। যদিও দর্শক জানে শেষে সব সমস্যার সমাধান হবে এবং নাটকও হবে। নাটককার যেন সবকিছু আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন। তাই কোথাও কিছু আটকাচ্ছে না এগিয়ে চলছে। পিসিমা যে সশরীরে খুব বেশি সময় মধ্যে থেকেছেন তা কিন্তু নয়। কিন্তু দর্শক প্রতি মুহূর্তে তার উপস্থিতি অনুভব করে। মনে হয় যে কোন মুহূর্তে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়বেন। সবকিছুই ভেবেচিন্তে সাজানো, কোন কিছু অসুবিধা হলে নাটককার সেটাকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আপাতত ভাবে মনে হতে পারে ‘বড়ো পিসীমা’ নিতান্তই মনোরঞ্জে ভরা একটি কমেডি নাটক। কিন্তু নাটকটির গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় প্রতিদিনের জীবনের এক সামান্য ঘটনা থেকে শুরু করে নাটককার আর এক বৈচিত্র্যময় ছোট জগৎ আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে আমরা গুজরাটি ভাষার সুপ্রসিদ্ধ নট-নির্দেশক-নাটককার শিবকুমার জোশী ‘বড়ো পিসীমা’ নাটকের যে মূল্যায়ন করেছেন তা উল্লেখ করতে পারি—

“শ্রী বাদল সরকারের এই প্রহসন প্রথম দৃষ্টিতে এক সামান্য, নির্দোষ এবং মনোরঞ্জে ভরপুর নাটক মনে হয়। সেরকম ধারণা আমারও হয়েছিল প্রথম দু-একবার পড়ে। কিন্তু রিহাসাল শুরু হবার পরে, নাটকের এক একটি ভাঁজ খুলতে লাগলো আর সামান্য প্রহসনের জায়গায় নাটক একটি রসে ভরা বিশিষ্ট নাট্যকৃতিরূপে প্রকট হতে লাগল।”^{২৫}

এ নাটকে খুব যে বলিষ্ঠ বা অসাধারণ কিছু চরিত্র নির্মাণ করা হয়েছে এমন কোন দাবি করা যায় না। বাদল সরকার এখানে সাধারণভাবে লোকেদের নজরে পড়া আর নজর থেকে অগোচরে থাকা দু’রকম মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের চিত্র এঁকেছেন মাত্র। তবে একমাত্র শম্ভু চরিত্রটিকে যথাযথ রূপ দিয়েছেন নাটককার। ইঞ্জিনিয়ার সে, স্টেজের কাজ তার। নকশা তৈরি করে কাজ করেছে। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্বয়ং নাট্যকার, যিনি নিজেও ইঞ্জিনিয়ার। শম্ভু চরিত্রের মধ্যে স্বয়ং নাট্যকার

বাদল সরকারের ছায়া দেখতে পাই। বাদল সরকার এন্টালিতে থাকাকালীন পূজার সময় সকলকে নিয়ে একটা থিয়েটার করার চিন্তা করেছিলেন। শম্ভুর কথায়—

“আমরা সবাই মিলে হল্লা করেছি, স্টেজ বেঁধেছি, পাল খাটিয়েছি, চাঁদা তুলেছি, পাড়া প্রতিবেশীকে ডেকেছি— এক কথায় দল বেঁধে আনন্দ পেয়েছি, পাচ্ছি, দিতে চাইছি।”^{২৬}

এই নাকটের সম্পূর্ণ স্টেজ পরিকল্পনা এন্টালির সেই ‘এ’ ব্লকের একতলার ফ্ল্যাটের মতো। এন্টালী পর্বের কথা বলতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে নাট্যকার নিজেই বলেছেন—

“চারদিকে চারখানি তেতলা অট্টালিকা— ব্লক এ, বি, সি আর ডি। মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা। প্রতি ব্লকে বেশ কয়েকটা করে ফ্ল্যাট। ঢোকার পথ রাস্তার দিকে, খোলা জায়গাটা পড়ে পেছনে। ‘এ’ ব্লকের ফ্ল্যাটগুলো বড়, বারান্দাওয়ালা। একতলার বারান্দাটা পড়ে ভিতরের মাঠের দিকে। আমার বাস ‘ডি’ ব্লকের দোতলায়। আমার ‘বড়ো পিসিমা’ নাটকের অনুদের ফ্ল্যাটের চেহারাটা ‘এ’ ব্লকের একতলার ফ্ল্যাটের মতো, স্টেজ প্যাভেল ওই চারটে বাড়ি দিয়ে ঘেরা মাঠে।”^{২৭}

‘বড়ো পিসিমা’ নাটক রচনার মূলে নিঃসন্দেহে এন্টালির বাড়ির পারিবারিক নাটক অভিনয়ের প্রেরণা কাজ করেছে। সব মিলিয়ে বলা যায় তিন অঙ্কের এই পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটকটি রসসৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে।

বাদল সরকারের দ্বিতীয় মৌলিক নাটক ‘শনিবার’। এই নাটকের রচনাকাল অক্টোবর, ১৯৫৯। গতানুগতিক নাটকের মত এ নাটকে কোন অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন নেই। নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের স্বপ্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার প্রাবল্য এবং বাস্তবের সঙ্গে তার সংঘাত এখানে কতকগুলি সিচুয়েশনে উঠে এসেছে।

এই নাট্যকাহিনীতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। বর্তমানে একমাত্র চাকুরে বড় ছেলে দিব্যেন্দু। সে একটি বেসরকারি অফিসে কেরানির চাকরি করে। বোন সুনন্দা কলেজে পড়ে। ছোটভাই নবেন্দু ব্যস্ত হকি খেলা নিয়ে। এই নাটকের আরেকটি চরিত্র মা। একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মা যেমন হয়। এখানে নিম্ন বা মধ্যবিত্ত বড় কথা নয়, বড় কথা হল এর সিচুয়েশনগুলির হাস্যরস। নাটকের শুরু হয় স্নেহপ্রবণ মায়ের সন্তান স্নেহের মধ্যে দিয়ে। মা একটি গ্লাসে করে খানিকটা দুধ নিয়ে ছেলেকে ডাকছেন সেই দুধ খাওয়ার জন্য। কিন্তু দুধ কেউ খেতে চাইছে না। দুধের গ্লাস হাতে মায়ের এই সংকট নাটকে প্রথমেই হাস্যকর সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে। বাড়ির ছোট ছেলে

নবেন্দু খেলোয়াড় সুলভ মেজাজে হকি স্টিক হাতে বলে— “দুধ খাবো? ইন্ডিয়া এবার অলিম্পিকে হেরে গেছে খবর রাখো?”^{২৮} ইণ্ডিয়ার অলিম্পিকে হারার সঙ্গে দুধ খাওয়া না খাওয়ার সম্পর্ক মা বুঝতে পারেন না। নবেন্দু বলে “আরে হারলো তো ঐ দুধ খেয়ে! ভুঁড়ি নিয়ে কি হকি খেলা হয়?”^{২৯} নবেন্দু চলে গেলে এবার মা স্বামীকে ধরেন—যিনি দু’ঘণ্টা আগে ভাত খেয়েছেন এবং ওই সময় কখনও দুধ খান না। ভদ্রলোক যখন খুব মুশকিলে পড়েছেন ঠিক সেই সময় মেয়ে সুনন্দা কলেজ থেকে এসে মায়ের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত হয়ে পরলে সেই সুযোগে সটকে পড়েছেন। অগত্যা মেয়েকে হাতের কাছে পেয়ে দুধটা খেয়ে নেওয়ার জন্য জোর করে। কিন্তু তাকেও কোনভাবে দুধ খাওয়াতে পারে না। শেষ পর্যন্ত বাড়ির বড় ছেলে দিব্যেন্দু অফিস থেকে ফিরে এলে তাকে ধরেন দুধ খাওয়ার জন্য। কিন্তু মা এবারও ব্যর্থ হয়ে যায়। এইভাবে একেকজনকে মা ধরছেন, দুধের গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু প্রত্যেকে তার মত করে একেকটি অজুহাত তৈরি করছে এবং সেই অজুহাত দিয়ে মায়ের দেওয়া দুধ খাওয়া এড়িয়ে যাচ্ছে। এই অজুহাত তৈরি করা এবং এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই নাটককার একদিকে যেমন সংলাপের মজা তৈরি করেন তেমনি অন্যদিকে সিচুয়েশনের কৌতুক গড়ে তুলতে থাকেন।

এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র দিব্যেন্দু। হাসি এবং মজার পাশাপাশি নাটককার দিব্যেন্দুর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কিছুটা হলেও একটি নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানি জীবনের বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন। শনিবার অফিস থেকে ফিরেও কাজ করতে হচ্ছে দিব্যেন্দুকে। অফিসের বস বাসু সাহেব বিশ লাখ টাকার কন্ট্রাক্টের কাগজপত্র সমস্ত তৈরি করে রবিবার জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। দিব্যেন্দুর মাথা গরম হয়ে গেছে। ক্লান্ত দিব্যেন্দু কাজ করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আর অফিসের কাজের স্বপ্ন দেখে। অফিসের যাবতীয় কাজকর্ম, চাওয়া-পাওয়া, মান-অভিমান, উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এসব নিয়ে স্বপ্ন দানা বাঁধে। সে প্রমোশনের স্বপ্ন দেখে; স্বপ্নে একেবারে প্রমোশন পায় তিন ধাপ ওপরে—এ্যাসিট্যান্ট ডাইরেক্টর। এ নিতান্তই একজন কেরানির স্বপ্ন, কেরানির আকাঙ্ক্ষা। বোন সুনন্দার ডাকে হঠাৎ সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় দিব্যেন্দুর। সুনন্দা বলে তার বাম্ববী সাগরিকা এলে যেন সে তাকে ডেকে দেয়। সাগরিকার কথা শুনে দিব্যেন্দু চুল ঠিক করে জামা পরে বাইরে তাকায় কাজ করতে আর মন বসে না। মনে জেগে ওঠে অন্য এক স্বপ্ন। সাগরিকার উপস্থিতিতে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে যায় সে। ভেঙে যায় স্বপ্ন। এই স্বপ্ন ভাঙলে অফিসের বস বাসু সাহেবের উপর রাগ হয় প্রচণ্ড। শেষ পর্যন্ত অফিসের বেয়ারা এসে খবর দেয় যে দিব্যেন্দুকে ওই প্রজেক্টের কাজ করতে হবে না। অনেক বড় কন্ট্রাক্ট পেয়ে বাসু সাহেব বোম্বাই যাচ্ছেন। এ খবর পেয়ে দিব্যেন্দু মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। নাটকের মধ্যে কেরানির মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। দিব্যেন্দুর অনুযুগে অফিসের সহকর্মী পরিতোষের

মাধ্যমে অফিসের কর্মপদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তবে দিব্যেন্দু চরিত্রের মধ্যে কেবল কেরানির টাইপই পরিস্ফুট হয়নি, তার স্বাভাব্যও লক্ষণীয়। তবে এই স্বাভাব্যও ফুটে উঠেছে তার স্বপ্নময়তার ভেতর। সাগরিকাকে নিয়ে সে স্বপ্ন দেখেছে। সাগরিকাকে দিব্যেন্দুর তুমি সম্বোধন করতে ভয় করে। সাগরিকা জানতে চায় কিসের ভয়? দিব্যেন্দু সমুদ্রের বর্ণনার ভেতর দিয়ে তাকে বোঝায় ‘আপনি’ ও ‘তুমি’ সম্বোধনের তাৎপর্য। দিব্যেন্দু বলে—

“নীল অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে ছুটে আসে সে যে ঢেউ— তাতে অপরিচয়ের রহস্য, সে ‘আপনি’। তীরে এসে সাদা ফেনায় ভেঙে পড়ে যে প্রকাশ তাতে রসহ্য নেই, কিন্তু দীপ্তি আছে, সান্নিধ্য আছে। সে ‘তুমি’।”^{৩০}

এই অনুভবে দিব্যেন্দু ব্যক্তি স্বাভাব্য উজ্জ্বল। সে সম্বোধনের ভেতরে সম্পর্কের তাৎপর্যকে অপূর্ব কাব্যিকতায় তুলে ধরতে পারে। তার বিশেষ একটি চেতনা প্রকাশ পায় আর একটি সংলাপে— যেখানে সে বলছে যে সে কবিতা লেখে না, কবিতা ভাবে। “মনের মধ্যে কবিতা জমে ওঠে মেঘের মতো। যদি আঘাত পায়, ঘন বর্ষার ধারায় নেমে আসে।”^{৩১} ঐ আঘাত ‘আপনা’কে ‘তুমি’ বলতে পারার মতো আঘাত। এখানে হাস্যরস সিচুয়েশন নয়, আমরা পৌঁছে যাই অন্য এক দর্শনে। কেরানি যখন কবিতা ভাবে সে তখন কোন কর্মসূত্রে পরিচিত হয় না। প্রাণচঞ্চল এক মানুষ যার ভেতরে সেই আনন্দময় অনুভূতিপ্রবণ মন রয়েছে তাকে দেখতে পায়। দিব্যেন্দু ভেতরকার সেই অন্তরঙ্গ মানুষটিকে যেন ধরা যায় এই অংশে এসে। সিচুয়েশন আর কমেডির মজার মুহূর্ত পেয়ে যায় অন্য এক গভীরতর মাত্রা। ‘শনিবার’ তখন আর শুধুমাত্র একটি হাসির নাটক হয়ে থাকে না। আসলে এই নাটকে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব-অনটনের বেদনাকে অতিক্রম করে হাসি, মজা বড় হয়ে উঠেছে। নাটকটির দুঃখের সমস্যাকে হাসির মাধ্যমে উপস্থিত করে, হেসে তার মোকাবিলা করতে চেয়েছেন।

বাদল সরকার এরপর লেখেন ‘রাম শ্যাম যদু’ নাটক। নাটকটির রচনাকাল ১৯৬১। তবে ১৯৫৭ সালে নাটকটি লেখা শুরু করলেও শেষ করেননি তখন। অভিনয়ের জন্য নাটকের প্রয়োজন হলে তখন তিনি এ নাটকটি লেখা শেষ করেন। নাটককার নাটকের ‘বক্তব্য’ অংশে বলেছেন—

“একটি বিদেশি ছবি দেখিয়া ভাল লাগিয়াছিল। বাংলায় তাহার মঞ্চোপযোগী রূপ দিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলাম ১৯৫৭ সালে। তখন শেষ করতে পারি নাই।

চার বৎসর পরে ‘চক্র’ যখন আমার ‘বড়ো পিসীমা’, ‘সলিউশন এক্স’ ইত্যাদি নাটক লইয়া মঞ্চে হৈ চৈ আরম্ভ করিলেন, তখন কিছুটা নূতন উৎসাহে, কিছুটা

তাগাদায় পড়িয়া পুরাতন লেখাটি ধরিয়া শেষ করিয়া ফেলিলাম।”^{৩২}

তিন অঙ্কের একটি হাসির নাটক হিসেবে ততখানি উৎকৃষ্ট নয়। এর মধ্যে এমন কোন হাস্যকর পরিস্থিতি নির্মাণ নেই যা আমাদের ভাবিয়ে তুলবে বা বিশুদ্ধ হাস্যরসের মধ্যে শৈল্পিক আনন্দ মননে রেখাপাত করবে। নাটককার বলেই দিয়েছেন এই নাটকের কাহিনি একটি বিদেশি সিনেমার উপর আধারিত। একদিন চুরি করার মতলবে রাম-শ্যাম-যদু এই তিনজন সমাজ বিরোধী লোক ভবানী চৌধুরী নামক এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে পরে। ঘটনাচক্রে চুরির জায়গায় তারা হয়ে উঠে ওই পরিবারের সদস্য। ভবানীর পিতা যাকে এতদিন সন্তানবৎ মানুষ করেছিল সেই শুকদেবই আজ ভবানীকে ঠকিয়ে বড় ব্যবসায়ী হয় এবং ভবানী চৌধুরীকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। রাম শ্যাম যদু এটা জানতে পেরে শুকদেব এবং তার অর্থলোভী পুত্র জয়দেবকে উচিৎ শিক্ষা দেয়। ভবানীর কন্যা অরু রাম শ্যাম যদুকে কাকা বলে আপন করে নেয়। তারা অরুর মনোবাঞ্ছিত বর জোগাতেও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এক কথায় সমাজে যাদেরকে চোর বলে আখ্যায়িত করা হয় তাদের মধ্যেও যে মানবিক গুণ থাকতে পারে, তার একটা সোজাসাপটা গল্পকে বাদল সরকার এই নাটকে তুলে ধরেছেন। নাটকের সহজ সরল ভাষা, সহজ সরল চিন্তা-ভাবনা, সবকিছুই ধীরে ধীরে মস্তুর গতিতে এগিয়ে চলে। রাম-শ্যাম-যদুর কৌশলগুলো নাটকের মধ্যে হাস্যরসের ভাব এনে দেয়। তবে বিশুদ্ধভাবে শৈল্পিক বিন্যাস তেমনভাবে চোখে পড়ে না। প্রতিভা অগ্রবাল লিখেছেন—

“না কোনো জোর হাসির জায়গা, না হঠাৎ কোনো অঘটন ঘটান জোর ঝাঁকুনি।

সবকিছু ধীরে ধীরে মস্তুরগতিতে এগোয়।”^{৩৩}

নাটককারের বক্তব্যেই ফিরে এসে বলতে হয় অভিনয়ের অভাব পূরণের জন্য লেখা এ নাটক, এর ভেতর শিল্পভাবনা হয়ত সেকারণে তেমনভাবে ফুটে ওঠেনি। নাটককার তাই হয়তো রচনা শুরু করেও ফেলে রেখে দিয়েছিলেন শেষ না করেই। প্রয়োজনাই এ নাটক রচনার কারণ।

বাদল সরকারের হালকা লঘু রসের নাটকগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হলো ‘বল্লভপুরের রূপকথা’। এ নাটকের রচনাকাল ১৯৬৩-৬৪। প্রথম মঞ্চায়িত হয় ১৯৭০-এ প্রতাপ মেমোরিয়াল হল-এ। প্রয়োজনায় ‘শতাব্দী’, নির্দেশনায় ছিলেন বাদল সরকার নিজে। অক্টোবর ১৯৫৭ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯-এই দু’বছর বাদল সরকার লগুনে ছিলেন। সেখান বাসকালে একটি বহু পুরাতন বিদেশি সিনেমা— ‘ইউ আর নো এঞ্জেলস’ দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ নাটক রচনা শুরু করেন। তবে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে তখনকার মত লেখা শেষ করতে পারেনি। কয়েক বছর পর ১৯৬৩ সালে ফ্রান্সে থাকাকালীন অসমাপ্ত ‘বল্লভপুরের রূপকথা’

লেখা শেষ করেন। বাদল সরকার ফ্রান্স থেকে বোন মনুকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—

“লগুনে দেখা একটি বিদেশী ছবির গল্প নিয়ে এখানে আসবার কিছুদিন পরে নাটকটা শুরু করেছিলাম। প্রায় জোর করে। হাঙ্কা হাসির নাটক।”^{৩৪}

‘বল্লভপুরের রূপকথা’ বাদল সরকারের কমেডি নাটক রচনার ধারায় একটু অন্যরকম নাটক। রূপকথার একটা আঙ্গিক যেন তিনি নিজেই রচনা করতে চান। যে ধরনের রূপকথা প্রচলিত আছে তার মতো নয়, তাদের কোন কাহিনি নিয়ে নয়, এ নাটক বাদল সরকারের নিজস্ব তৈরি এক রূপকথার কাহিনি নিয়ে নির্মিত। নাটকের প্রথম দৃশ্যে সঞ্জীব বোসের আড়ালে নাটককার নিজেই সে কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

“বল্লভপুরের রূপকথা আপনারা শোনেননি, কারণ এটা ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদার ঝোলা, দাদুর দপ্তর— কোনোটাতেই নেই। ভূপতি আমাকে পাঠালো আপনাদের বল্লভপুরের রূপকথা শোনাতে। আমি খুব একটা দরকার দেখি না। কোনদিনই এটাকে খুব একটা জমাটি রূপকথা বলে মনে হয়নি আমার। ...

এক ছিল রাজা, তার নাম ভূপতি রায়। তার ছিল— না, তার রানি ছিল না। একটাও না। আসলে তাকে রাজপুত্র বলা উচিত রানি যখন নেই— কিন্তু তার বাবা-মা নেই। এইখানেই দেখুন— প্রথম গোলমাল। রূপকথায় কখনো দেখেছেন কোনো রাজা পুত্রের বিয়ে না চুকিয়ে মারা গেছে?”^{৩৫}

অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে এ রূপকথা নাটককারের মস্তিষ্ক প্রসূত। নাটকের নায়ক ভূপতি বারোভুঁইয়াদের বংশধর। আর্থিক সঙ্কটে পড়ে বাড়ি বিক্রি করতে চান। একদিন বিকেলে আগের থেকে কোনো খবর না দিয়ে ক্রেতা শ্রীহালদার তার স্ত্রী ও কন্যাসহ উপস্থিত হয় ভূপতির বাড়িতে। ভূপতি তাদের আতিথ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে হালদারের প্রতিস্পর্শী চৌধুরী এসে পড়েন, যাতে হালদার সন্তায় বাড়ি না কিনে ফেলেন। এদিকে নানা মজার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে একের পর এক সব থেকে মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো রঘুদাকে নিয়ে। রঘুদা হল ভূপতির পূর্বজ, যিনি বহু বছর থেকে মৃত হয়ে এই বাড়িতে বাস করছিলেন আর বাড়ি বিক্রি হলে মুক্তি পাবেন এই আশায় ছিলেন। যাইহোক সবশেষে বন্ধু সঞ্জীব আর আশেপাশের লোকেদের সাহায্যে বাড়ি বিক্রির পাকা কথাবার্তা হয়, রঘুদা মুক্তি পেল আর হালদারের কন্যা ছন্দা আর গ্রগতির মধুর সম্পর্ক পাকাকথার রূপ নেয়।

বাদল সরকারের ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ নির্মল হাসির নাটক, পরিস্থিতিজনিত হাস্যের একটি আদর্শ উদাহরণ। না ব্যঙ্গ না কটাক্ষ, না কোনো রকমের ভাঁড়ামি। আরেকটি বিষয় হলো সেট এ নাটকে অনিবার্য। যাতে সব সময় দর্শকের চোখের সামনে ভূপতির পুরনো মহল উপস্থিত থাকে,

সেখানে যিনি বাস করেছেন, ভূপতির পুরনো দিনের বৈভব আর বর্তমান পরিস্থিতি চোখের সামনে থাকে আর রঘুদার এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াতে কিংবা অদৃশ্য হতে সুবিধা থাকে। এ নাটকের যাবতীয় ঘটনা আবর্তিত হয়েছে রঘুদা চরিত্রকে কেন্দ্র করে। রঘুদা ছিল একটা ছোট ভূস্বামী বা ভুঁইঞার সন্তান। মুঘল আমলে বঙ্গদেশে বারোভুঁইঞাদের প্রবল প্রতাপ ছিল, যা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। রঘুনাথ বা রঘুদা অবশ্য সেই বারোভুঁইঞাদের কেউ না। তার পূর্বপুরুষ ছিল বারোভুঁইঞার বাইরেও যে ছোট ছোট ভুঁইঞারা বঙ্গদেশে ছিল তাদেরই একজন। যার সঙ্গে একেবারে এ প্রজন্মের মেয়ে ছন্দার প্রেম হয়। প্রাচীরের সঙ্গে বর্তমানের প্রেম আসলে আমাদের শেকড় বা উৎসের সঙ্গে সংযোগের বিশেষ ব্যঞ্জনা বয়ে আনে। অতীত এবং ভবিষ্যৎ-এর মিলন যে বর্তমানে কথাটি অসাধারণ ব্যঞ্জনা পায় এখানে।

নাটকের শেষের দিকে ঘটনার চমক সৃষ্টি হয়েছে রঘুদাকে কেন্দ্র করেই। রঘুদা মারা গেছে ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে। তার অতৃপ্ত আত্মা মুক্তি পাবে যদি তার সময়কার পাশের অঞ্চল প্রতাপগড়ের ইন্দ্রনারায়ণ ভুঁইয়ার কোন বংশধরকে ‘নাকখৎ’ দেওয়ানো যায়। ঘটনাক্রমে অন্য এক অনুসন্ধানী প্রতিযোগী চৌধুরী সাহেব প্রতাপগড়ের ইন্দ্রনারায়ণ ভুঁইয়ার বংশধর যারা আলিবর্দি খাঁর আমলে চৌধুরী খেতাব লাভ করেছে। সেই শিল্পপতি চৌধুরীকে দিয়ে নাকখৎ দিইয়ে রঘুদার মুক্তি হয়ে যায়। এই বিষয়টিকে খুব চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরী। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“অতীত-ভবিষ্যৎ এক হয়ে গিয়ে বর্তমান কালের নবরূপকথার সৃষ্টি করে বাদল সরকারের ‘বল্লভপুরের রূপকথা’। ভূস্বামীর শোষণের স্থালন ঘটলো উত্তরপুরুষের নাকেখৎ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে!!”^{৩৬}

এই পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে তাতে আমরাও প্রবিস্ট হয়ে যাই। আমাদের মনের মধ্যে এক অদ্ভুত সহানুভূতি ও পক্ষপাতিত্ব এসে যায় ভুঁইয়াদের জন্য। রঘুদা তখন সাহিত্যের সেই বৃহত্তম ব্যঞ্জনাময় সত্য হয়ে ওঠে। এখানেই নাটককারের সিদ্ধি।

বাদল সরকার যে কয়েকটি হাসির নাটক লেখেন তার মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী নাটক হলো ‘কবি কাহিনী’। আগের কমেডি গুলিতে শুধুই হাস্যরস রয়েছে তার বাইরে অন্য কিছু নেই। সমাজ ও সমকালের যুগসমস্যার কোন ইঙ্গিত নেই। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় এর আগের লেখা চারটি নাটকে ভালো করে বাঁধা গল্প আছে, এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে পৌঁছানো হয়েছে। নাটকের আরম্ভ আর শেষ স্পষ্ট আছে। ‘কবি কাহিনী’-তে সেটা নেই। শুরু থেকেই নাটকের দুটি দিক

আছে—একটা সাহিত্যিক অন্যটা রাজনীতিক। নাটককার দু-ক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত অতিরিক্ত উৎসাহ, মানুষকে ঠাকানোর প্রবৃত্তি, নিজের আনন্দের জন্য ভুল কাজগুলি করা প্রভৃতির জোরদার বর্ণনা করেছেন। এইসব করতে গিয়ে, কিছুদূর পর্যন্ত নাটক অনেকটা রহস্য নাটকের রূপ নিয়েছে। যদিও নাটককারের মূল লক্ষ্য হাসির নাটক লেখা, তবে হাসির পাশাপাশি এই নাটকে সাহিত্য রচনা, সাহিত্যিকদের স্বার্থপরতা ইত্যাদি বিষয়ও উঠে এসেছে। আবার ভোট রাজনীতির নোংরামিরও বর্ণনা আছে। ‘সলিউশন এক্স’, ‘বড় পিসিমা’, ‘রাম শ্যাম যদু’ কিংবা ‘বল্লভপুরের রূপকথা’র মতো ‘কবি কাহিনী’ বিশুদ্ধ হাসির নাটক নয়। নাটকের বক্তব্য একটু জটিল তবে গল্প এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে এখানে লাফ দিয়ে দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। ‘ভোটরঙ্গ’ এবং ‘আধুনিক কবিতা’ দুর্বোধ্য এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে হাসির পরিস্থিতি নির্মাণ করেছেন নাটককার।

নাটকে মোট দৃশ্য সংখ্যা চার। এর মধ্যে অনেকটা জুড়ে রয়েছে মণিভূষণ মজুমদার ও চিদানন্দ ব্রহ্মচারীর ভোটরাজনীতি নিয়ে নানা মজাদার ঘটনা। আর অন্যদিকে রয়েছে বাংলার শিক্ষক সনৎ ও কানাই দত্ত ওরফে কবি স্মরজিৎ সান্যালকে নিয়ে নানা হাসি মজার মুহূর্ত। মণিভূষণ মজুমদার এবং চিদানন্দ ব্রহ্মচারী দুই যুযুধান পক্ষ। নাটকে চিদানন্দ অনুপস্থিত হলেও তার উপস্থিতি এত অনিবার্য করে তুলেছেন নাটককার যা হাস্যরসের পরিস্থিতি নির্মাণে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। উভয়ই ‘স্কোপ’ খুঁজতে ব্যস্ত। কী করে একে অপরের ক্ষতি করতে পারে, বিপদে ফেলতে পারে এই চেষ্টা নিরন্তর করে চলে। চিদানন্দ মণি মজুমদারের কলেজ জীবনের ম্যাগাজিন থেকে তার সাহেব সেক্রেটারির গলায় মালা দেওয়ার দৃশ্য তুলে লিফলেট বিলি করেছেন, যেমনটা করে থাকেন বাস্তবের রাজনৈতিক নেতারা। অন্য লিফলেটে দেখিয়েছেন মণি মজুমদার পত্নী সুপ্রীতি দেবীর সাহিত্য প্রীতির নিদর্শন। ভাস্বতী পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় অমানিশা দেবীর (সুপ্রীতি কন্যার ছদ্মনাম) ‘হানিয়াছ মোরে’ কবিতায় ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসের কথা আছে এই অভিযোগ তুলে জোরদার প্রচার করে চিদানন্দ। এই সূত্র ধরে মণি মজুমদার তার উত্তর দেওয়ার জন্য তিনি যে স্কুলের সেক্রেটারি তার বাংলার শিক্ষক সনৎ বাবুকে ক্ষমতা প্রয়োগ করে আনে। তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাকে কাজে লাগান। সনৎ বাবু নিরুপায় হয়ে এই তাবেদারি করতে বাধ্য হয়। কারণ তিনি ‘প্রবেশনে’। এদিকে জনপ্রিয় আধুনিক কবি স্মরজিৎ সান্যালকে সাহিত্যসভায় এনে বিশেষভাবে মহিলা ভোটারকে স্বামীর পক্ষে টানতে চান সুপ্রীতি দেবী। ধুরন্ধর চিদানন্দের দল সে আমন্ত্রণপত্র গায়েব করে এবং তার কাগজের সাংবাদিক কানাই দত্ত স্মরজিৎ সান্যাল সেজে মণি মজুমদারের বাড়িতে আসে। কানাই দত্ত বাংলার শিক্ষক সনৎ-এর পরিচিত। ফলে পরিস্থিতি ঘনিষে ওঠে। অন্যদিকে মণি মজুমদারের লোক মোহন চিদানন্দের দাদা সদানন্দের কলেজ জীবনের কলেঙ্কারি বের করে এনেছে ছবিসহ। কিন্তু এটা

জানতো না, যে মহিলা তার সঙ্গে জড়িত সেই স্বর্ণলতা ভদ্র মণি মজুমদারের দলীয় টিকিটে অন্য একটি কনসিটুয়েন্সির (গামুনিয়া) ক্যান্ডিডেট। সে আর এক কাণ্ড। অটলবাবু যিনি মণি মজুমদারের দলের ওপর তলার নেতা, সে মণি মজুমদারের বাড়িতে কানাই দত্ত ওরফে স্মরজিৎ সান্যালকে দেখে ফেলে। পরিস্থিতি আরো জটিল হয়। কানাই দত্তকে চেনার দায়ে সনৎ-এর চাকরি প্রায় যায় যায়! এই আপাত আতঙ্কের মধ্যেই মজা জমতে থাকে এবং পরিস্থিতির কৌতুক অনবদ্য হয়ে উঠতে থাকে। কবি হয়ে গিয়ে কানাই ঘটনাচক্রে সুপ্রীতি-লিলির মন জয় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে— সবমিলিয়ে দারুণ হাস্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে নাটকে। পরিস্থিতিই কানাই দত্তকে কবি সাজতে বাধ্য করেছিল। যে কোনদিন কবিতা কী জিনিস জানে না, সে আজ কবি হয়ে, পড়েছে মহা ফ্যাসাদে। কানাই দত্ত অসহায় হয়ে তাই বলেছে— “কবিতা? আমার বাবাও কোনদিন কবিতা লেখে নি!”^{৩৭} তাছাড়া কবি স্মরজিৎ সান্যাল সেজে কবির বেশ ধারণ করলেও তার কোন কবিতাই কানাই জানেনা, মুখস্থ থাকা তো দূর অস্ত। সেই কানাইকে অর্থাৎ নকল স্মরজিৎ সান্যালকে প্যাঁচে পড়ে মণি মজুমদারের স্ত্রী সুপ্রীতি ও তার কন্যা লিলির মন রাখার জন্য কবিতা বলতে হয়। আর এই কবিতা লেখার কৌশল জানতে জানতে দর্শক কিংবা পাঠক হাস্যরসে উতরোল হয়ে ওঠে।

কানাই দত্ত ভাস্বতী পত্রিকা থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও লাইন একটু মিলিয়ে তৈরি করে নেয় এক নিজস্ব কবিতা। কবিতাটি এরূপ—

‘কোমল মসৃণ গাত্রচর্ম।
রুচি? সে তো অলঙ্কার—
বিশুদ্ধ ও খাঁটি।
অনুসন্ধান করো—
সম্পাদনা।
প্রীতি ও শুভেচ্ছা—
অতি-বেগুনী রশ্মির বিকীরণ
নিউট্রন
ইলেকট্রন
—দুঃসংবাদ!
সুজাতা তবুও স্তব্ধ,
অনেক রাত।
যদি জানিতাম তুমি আছ!

কিন্তু আজ

আগামী সংখ্যার সমাপিকা।”^{৩৮}

কীভাবে এই কবিতা রচিত হল তার রহস্য উন্মোচন করেছে সনৎ-এর কাছে—

“ছাপা রে বাবা, ছাপা, ভাস্বতীতে সব বেরিয়েছে। এই নে, ধর। (কবিতাটি পকেট হইতে বাহির করিয়া সনৎকে দিলেন, নিজে ভাস্বতী তুলিলেন।) পড়ে যা!

সনৎ: কোমল মসৃণ গাত্রচর্ম—

স্মরজিৎ: প্রথম পাতা-সাবানের বিজ্ঞাপন। তারপর?

সনৎ: রুচি? সে তো অলঙ্কার—

স্মরজিৎ: রুচিসম্মত অলঙ্কার— নন্দী জুয়েলার্স, প্রাইভেট লিমিটেড।

সনৎ: বিশুদ্ধ ও খাঁটি—

স্মরজিৎ: গব্যঘৃত।

সনৎ: অনুসন্ধান করো—

স্মরজিৎ: অনুসন্ধান করুন তিপ্পান নম্বর ইত্যাদি— বিজ্ঞাপন চলছে এখনো—

সনৎ: সম্পাদনা—

স্মরজিৎ: সুপ্রীতি মজুমদার।

সনৎ: অ্যাঁ?

স্মরজিৎ: আরে ভাস্বতীর সম্পাদনা। পয়লা পাতায় এসেছি।

সনৎ: প্রীতি ও শুভেচ্ছা—

স্মরজিৎ: সম্পাদকীয়র শেষ কথা।

সনৎ: অতি-বেগুণী রশ্মির বিকিরণ, নিউট্রন, ইলেকট্রন, দুঃসংবাদ।

স্মরজিৎ: ইলেকট্রন অবধি প্রবন্ধটা— ‘বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞান’।

‘দুঃসংবাদ’ পরের গল্পে।

সনৎ: সুজাতা তবুও স্তব্ধ। অনেক রাত—

স্মরজিৎ: গল্প চলছে।

সনৎ: যদি জানিতাম তুমি আছ—

স্মরজিৎ: অ্যাঁই! এইখানেই কেঁচে গেলাম। নইলে এর মালটাই চলে যেত বেশ!

তখন কি জানি ছাই, অমানিশাদেবী সম্পাদিকার কন্যা?”^{৩৯}

এইভাবে একটি পত্রিকার বিজ্ঞাপনের নানা পঙ্ক্তি ও গল্প প্রবন্ধের লাইন জুড়ে কবিতা বানানোর রসিকতা নাটকে নির্মল হাস্যরস তৈরি করেছে। একই সঙ্গে আধুনিক কবিদের দুর্বোধ্য কবিতা রচনাকে নাটককার এভাবেই মজাদার পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে খানিকটা শ্লেষাত্মক ভাবে তুলে ধরেছেন। এটা ঠিক যে শ্লেষ-ব্যঙ্গকে প্রাধান্য দেওয়ার নাটককার বাদল সরকার নন। তবে এই নাটকে সিন্টিয়েশনাল কমেডি মধ্যে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিটি আমাদের নজর এড়ায় না।

আমরা আলোচনার শুরুতেই বলেছি এই নাটক বাদল সরকারের অন্য কমেডি নাটকগুলির থেকে একটু অন্যরকম। বিশিষ্ট সমালোচক বিষ্ণু বসু তাঁর একটি প্রবন্ধে ‘রাম শ্যাম যদু’ নাটকের সঙ্গে তুলনা করে ‘কবি কাহিনী’ নাটককে বিশুদ্ধ কমেডি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন—

“... এ দুটি নাটক শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ কমেডিই থেকে যায়, স্যাটায়ারে আক্রান্ত হতে অস্বীকার করে।”^{৪০}

স্বয়ং বাদল সরকারও ‘কবি কাহিনী’ নাটকের ‘মুখবন্ধ’-এ প্রায় একই রকম দাবি করেছেন। তাঁর কাছে দরকার শুধু ‘হাসি বা হাসানো’^{৪১} কিন্তু ‘কবি কাহিনী’ কি শুধুই হাসি বা হাসানোর উদ্দেশ্যে রচিত? অন্য কিছু না! এ নাটক কি শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি বিশুদ্ধ কমেডিই হিসেবেই থেকে যায়? আমাদের মনে হয় তা কিন্তু নয়। আসলে বাদল সরকার এখানে সমাজের জটিলতম সমস্যাতে হাসির মাধ্যমে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। এর স্বপক্ষে প্রমাণ মেলে ‘কবি কাহিনী’ নাটকের ‘মুখবন্ধ’-এ বাদল সরকারের নিজের মন্তব্য। তিনি বলেছেন—

“আমরা বাঙালিরা কাঁদতে ভালোবাসি আর হাসতে লজ্জা পাই, এ কথাটাও আমার মানতে ইচ্ছে করে না। আমার বরং বলতে ইচ্ছে করে— আমরা চরম দুঃখেও হাসতে পারি, চূড়ান্ত ট্রাজেডিও হাসি দিয়ে ফোটাতে পারি, জটিলতম সমস্যাও হাসির মাধ্যমে উপস্থিত করে হেসে তার মোকাবিলা করতে পারি। তাই হাসির দাম আমার কাছে কম নয়।”^{৪২}

অর্থাৎ মানুষের জীবনে সমস্যা থাকবে তাকে হেসে মোকাবিলা করাটাই মানুষের কাজ, সেখানেই হাসির মূল্য অপরিসীম। কানাই দত্ত ওরফে স্মরজিৎ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধরা পড়লে প্রাণ সংশয় হতে পারে এ রকম জটিল সমস্যার মুখেও সনৎকে স্মরজিৎ ছদ্মবেশী কানাই দত্ত বলেন, ‘এই, ও রকম প্যাঁচার মতো মুখ করে থাকলে দুজনেই ডুববো। হাস তো একটু? ... ও রকম না, বেশ জোরে।’^{৪৩}

বস্তুত নাটককার সমস্ত বাঙালিকেই এর অংশীদার করতে চান। জটিল যৌগ সমস্যায় সুস্থভাবে হেসে সমস্ত মোকাবিলা করা উচিত। সে কারণে ‘... সে হাসি উদ্দেশ্যহীন বলে... মনে হয় না।’^{৪৪} নির্মল হাসির মধ্যেও নাটককারের নিজস্ব যুগ-সমস্যা বা বক্তব্য উঠে এসেছে এ নাটকে।

নাটকে দেখা যায় মণি মজুমদার দলের উপর নেতৃত্বকে তোষামোদ করে ক্যান্ডিডেট হয়, অন্যদিকে চিদানন্দ ভোটের প্রয়োজনে গেরুয়া ধরেন যিনি একটা সময় অশ্লীল কবিতা লেখাতে ওস্তাদ ছিলেন। আদর্শহীন রাজনীতিতে পরস্পর পরস্পরের চরিত্র দোষ খুঁজতে ব্যস্ত। কারণ ‘স্কুপ্ ছাড়া ইলেকশন হয় না।’^{৪৫} আর আদর্শ? অরবিন্দর ভাষায়— ‘হ্যাঁ, খাটে সিঙ্গার জন্য। পিছনে কোন ইডিওলজিক্যাল—’^{৪৬} আজকের দিনে একথা কতখানি প্রাসঙ্গিক তা সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আর এখানেই সমাজ সম্পৃক্ত বাদল সরকারের নিজস্ব জীবনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়, যে জীবন ক্রমশ নির্মাণ করেছে তাঁর নিজস্ব ভূমি বা ক্ষেত্র। কেন রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে তাঁর বিচ্ছিন্নতা এসেছিল। চল্লিশের দশকের শেষ পর্বের সুস্থির সহাবস্থানে মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজ, এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছাত্রজীবনে রাজনীতিতে ডুবে গিয়েছিলেন তিনি। বাদল সরকার জানিয়েছেন—“থিয়েটার তখন তুচ্ছ। সে সময়ও ছিলনা, পড়াশুনো আর অবসর সময়ে তখন রাজনীতিতে সময় দেওয়াই একমাত্র প্রধান কাজ ছিল। এই রকম বেশ কিছুদিন চললো। তারপর কোন কারণে রাজনীতি আর করা গেলনা। রাজনীতি করার আকর্ষণ একদম নষ্ট হয়ে গেল।”^{৪৭}

‘কবি কাহিনী’ নাটকে হয়তো এই কারণেই বাদল সরকার রাজনীতির নীতি আদর্শহীনতাকে তুলে ধরেছেন। কেন আশা ভঙ্গ হল সেই প্রসঙ্গে তিনি বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি, বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নীরবে নাটকের ভিতর। পরবর্তীকালে তৃতীয় ধারার নাটকে অনেকটা তা স্পষ্ট করেছেন, সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

রাজনীতির ওই আশাভঙ্গের প্রসঙ্গে তিনি অদ্ভুতভাবে নীরব থেকেছেন, এড়িয়ে গেছেন এসব প্রশ্নের উত্তর। এ বিষয়ে আমরা তাঁকে কখনো কোন আক্রমণাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করতে দেখিনি। যেমন নাটকেও কোন ব্যঙ্গের কশাঘাত নেই। অথচ নিজস্ব স্বরটি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

দুই.

এবার আসা যাক বাদল সরকারের সিরিয়াস নাটক প্রসঙ্গে। অনেকে মনে করেন যে বাদল সরকার প্রথমে হাসির নাটক রচনা করে কিছুটা হাত পাকিয়ে পরবর্তীকালে সিরিয়াস নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেছেন, কিন্তু নাটককার বাদল সরকার সম্পর্কে এই ধরনের মূল্যায়ন ঠিক নয়। ‘কবি কাহিনী’ নাটক তাঁর বহুচর্চিত ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের প্রায় এক বছর পরে রচিত। আসলে বাদল সরকারের কাছে হাসির নাটক এবং সিরিয়াস নাটক দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। যখন যেটা পেরেছেন তিনি

লিখেছেন। বাদল সরকার যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়ে লিখেছেন—

“অনেকে বলেছেন, আমি না কি হাসির নাটক লিখে হাত পাকিয়ে তারপর ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, ‘বাকি ইতিহাস’ ইত্যাদি ‘ভালো’ নাটক লিখতে শুরু করেছি। এ কথায় আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে— দু’টো কারণে। প্রথমত কথাটা পুরো সত্যি নয়। ‘কবি-কাহিনী’ এবং আরো কিছু হাসির নাটক আমি লিখেছি ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ লেখার পরে। পারলে আরো লিখবো।”^{৪৮}

সুতরাং বুঝতেই পারছি যে বাদল সরকার প্রথমে হাসির নাটক লিখেছেন এবং পরে সেখান থেকে পুরোপুরি সরে এসে সিরিয়াস নাটক লিখছেন— এমনটা নয়। বাদল সরকার যখন তৃতীয় ধারার নাটক লিখছেন তার মধ্যেও ‘খাট মাট ক্রিং’-এর মতো অসাধারণ হাসির নাটক লিখেছেন— যদিও আঙ্গিকগত প্রভেদ রয়েছে। সে আলোচনা অন্যত্র করা হবে। এই পরিচ্ছেদে আমরা বাদল সরকারের বাঁধা মঞ্চের জন্য লিখিত সিরিয়াসধর্মী নাটকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

এই অধ্যায়ের আলোচনার শুরুতেই আমরা বলেছি বাদল সরকারের প্রসেনিয়াম তথা বাঁধা মঞ্চের নাটকগুলির মধ্যে বেশকিছু নাটক আছে যেখানে সমাজ রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির দ্বন্দ্বময় জীবন প্রধান বর্ণিত বিষয়। কমেডি নাটক লিখছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে চলছে নানা ভাঙাগড়া। বাদল সরকার লিখেছেন— “এখন কমেডি লিখছি ঠিকই কিন্তু কতগুলো কথা তো ভেতরে বলবার থাকে...”^{৪৯} জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটা প্রবল নৈরাশ্য, প্রত্যয়হীনতা তাঁকে যেন তাড়িত করছে ভিতরে ভিতরে। তাঁর এই মানসিক অবস্থার সাক্ষ্য রয়েছে সেই সময় লেখা ডায়েরি ও চিঠিপত্রে। আমরা এখানে তাঁর ডায়েরি ও চিঠিপত্রের থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

ক. “... মধ্যে মধ্যে হঠাৎ যেন মনে বিদ্যুতের ঝলক লাগে। সেই চকিতের ঝলকে সব কিছুর অন্তঃসারশূন্যতা হঠাৎ অতি উজ্জ্বল অতি প্রকট হয়ে দেখা দেয়।”^{৫০}

—০৯.০১.৫৮ লেখা ডায়েরি।

খ. “চূড়ান্ত অস্থির লাগছে। মনে হচ্ছে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়েছি।”^{৫১}

—১৪.০৩.৫৮ লেখা ডায়েরি।

গ. “... আমার অস্তিত্ব একটা পিঁপড়ের একটা জীবাণুর অস্তিত্বের মত অকিঞ্চিৎকর। আমার জীবন অসীম কালের মধ্যে মুহূর্তমাত্র। আমার যতো কাজ, যতো চলাফেরা কাঁদা হাসা বিরাম পরিশ্রম— সব অকিঞ্চিৎকর, অর্থহীন, মূল্যহীন।”^{৫২}

—১৬.০৮.৫৮ লেখা ডায়েরি।

ঘ. “আমি অর্থহীন হয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। মিলিয়ে যাচ্ছি হাওয়ায়। উবে যাচ্ছি। মুছে যাচ্ছি। নিঃশেষ হয়ে মুছে যাচ্ছি।”^{৫৩}

—০৬.০১.৬৪ লেখা ডায়েরি।

ঙ. “...ভয়। একটা একটানা এক ঘোয়ের ভয়। একটা একটানা একঘেয়ে মিথ্যের মধ্যে বেঁধে রেখে দিয়েছে আমাকে। নিজেকে স্বীকার করতে না পারা। স্বীকার করি— ভিতরে। মনের ভিতরে। বাইরে নয়। কখনো নয়। ভয়।”^{৫৪} —২৮.০২.৬৪ লেখা ডায়েরি।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে মানুষটা জীবনটাকে হাসি দিয়ে মজা দিয়ে উপভোগ করতে চেয়েছেন, জীবনের চরম ট্রাজেডিকেও যিনি হাসি দিয়ে জয় করতে চেয়েছেন, তাঁর মনের ভিতরে এ কোন যন্ত্রণা বাসা বেঁধেছে! কেন এই অন্তঃসারশূন্যতা, জীবনের প্রতি অনীহা!

বাদল সরকারের এই ধরনের চিন্তা চেতনার মূলে রয়েছে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গোটা বিশ্বকে একটা ভয়ঙ্কর সংকটের মুখে ফেলে দেয়। এই সময় চলে নানা পালাবদল। বস্তুত পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশক-এই সময়পর্ব পৃথিবীর ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৬ সালে লণ্ডনে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করে ২৩ অক্টোবর নিউ ইয়র্কে সাধারণ পরিষদের বৈঠকে ন্যাৎসিদের দণ্ড দেওয়া হল। এর ঠিক এক বছর পর ১৯৪৭ সালে প্যালেস্টাইন ভাগ হয়ে গেল এবং ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে ইজরায়েল নামক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল। ১৯৪৯ সালে জেনারেল মাও জে দং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কথা ঘোষণা করলেন। ১৯৫০ কোরিয়ায় শুরু হলো দীর্ঘকালীন যুদ্ধ। ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যু। ১৯৫৯ সালে কিউবায় একনায়ক শাসনের অবসান এবং ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট সরকারের পত্তন। ১৯৬২ সালে ভারত চীনের যুদ্ধ। এদিকে ১৯৬৩ সালে গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত মায়ানমারের ক্ষমতা দখল করলেন নে উইন। ওই বছরই ভারত ও চীনের যুদ্ধ পরিসমাপ্তি। ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য পদ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। ১৯৬৫ সালে আমেরিকা ভিয়েতনাম আক্রমণ করে। দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোন স্থায়ী শান্তির আশা দিতে পারল না। একটা চরম অস্থিরতা এই সময় পৃথিবীকে গ্রাস করে। এর থেকে মুক্তির কোনো পথ কারো জানা ছিল না। সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেরও অবস্থা তখন করুণ। ভারতবর্ষ এবং তৎসঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির তখন চরম সংকটের মুখে। স্বাধীনতা, আনন্দ, স্বপ্ন পূরণ এবং স্বপ্নভঙ্গের অভিঘাত কাটিয়ে দেশ জুড়ে তখন রাজনৈতিক সংঘাত লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। খাদ্য আন্দোলন, দেশের উদ্বাস্তু সমস্যা, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় সংঘর্ষ, সরকারি বিরোধিতা ইত্যাদি অপেক্ষা করেই রাতারাতি কলকাতার শহরতলী অঞ্চলে গড়ে ওঠে অজস্র জবরদখল কলোনি। কলকাতা রাজপথ তখন বাস্তুহারার আর্তনাদে মুখরিত। স্বাধীন দেশের কমিউনিস্টদের ওপর নেমে এলো বর্বর অত্যাচার।

১৯৬২ সালের ভারত চীনের যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব পড়ে ভারতীয় রাজনীতিতে। ১৯৬৪

সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে গেল। এদিকে কৃষি বাণিজ্য বা শিল্পে নেমে এলো চরম বিপর্যয়। একের পর এক ছোট-বড় শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেড়ে চলেছে বেকারি সমস্যা। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল— আদি কংগ্রেস এবং ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস। আর ওই বছরই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভরাডুবি হল। সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের অনেক রাজ্যেই কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কার্যত প্রতিষ্ঠা ঘটে গেল। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে হারিয়ে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এলো। আর এই রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক হানাহানি, সংঘর্ষ, হত্যা, আক্রমণ। এককথায় পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক ভয়ংকরতম অধ্যায়। গোটা ভারতবর্ষে জুড়ে তখন এক চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়। এরই মাঝে ১৯৭৫ সালে ২৫ শে জুন, দেশে জারি হল জরুরি অবস্থা। একটা দমবন্ধ পরিবেশ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দিনগুলি-রাতগুলি ভরিয়ে রেখেছিল। এই সময়কালের মধ্যে বাদল সরকার বেশ কিছুটা সময় বিদেশে কাটিয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা আগেই করেছি। একদিকে নিজের দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতি এবং সারা বিশ্বের এক ভয়ঙ্কর সংকট বাদল সরকারকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। অনিবার্যভাবেই তার প্রভাব পড়েছে এই সময়ের লেখা বেশকিছু নাটকে। তাই সেখানে কৌতুক নয়, কৌতুকের পরিবর্তে উঠে এসেছে সমকালীন রাজনৈতিক সংঘাত আর সেই সংঘাতে পিষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্বের সংকট-কথা। অবশ্য শুধু বাদল সরকারের নাটকই নয়, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিশেষ করে ষাট-সত্তরের দশকের বাংলা নাটকে কমবেশি এই প্রবণতাগুলি মুখ্য বিষয় হিসেবে উঠে আসে। এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটকের বিষয় বিন্যাস সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক স্বপন মজুমদার যে মূল্যায়ন করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

“বিষয়গত ভাবে বিচার করলে এই পর্বের নাটকে অন্তত পাঁচটি প্রধান বিষয়—
পর্যায় লক্ষ করব আমরা : (ক) স্বাধীনতা-দেশবিভাগ-মহাস্তর-সাম্প্রদায়িকতা;
(খ) সামাজিক অন্যায়-অবিচার-বঞ্চনা ও মধ্যবিত্ত জীবন; (গ) প্রান্তিক জীবন
ও সামাজিক অনন্যয়; (ঘ) রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও প্রচার এবং (ঙ)
অস্তিত্বসংকটের নাটক।”^{৫৫}

বাদল সরকারের এই পর্বে লেখা সিরিয়াসধর্মী নাটকগুলিকে রাখা যেতে পারে শেষ বর্গে অর্থাৎ অস্তিত্ব সংকটের নাটক পর্যায়ে। প্রসঙ্গত আমরা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বেশকিছু নাটকের কথাও বলতে পারি, যেগুলি মূলত এই ভাবধারার। স্বপন মজুমদারের মতে, “এক বিপন্ন বিস্ময়, অস্তিত্বের সার্থকতা বিষয়ে সরল অথচ গভীর কিছু জিজ্ঞাসা এঁদের নাটককে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।”^{৫৬} এই জিজ্ঞাসা

হল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের। প্রশ্ন হলো কারা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি? এরা হল এমন একটি শ্রেণি যাঁদের জীবিকার জন্য কায়িক পরিশ্রম করতে হয় না। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে উচ্চবিত্ত আর শ্রমজীবী মানুষের মাঝখানে অবস্থান করে। এরা কায়িক পরিশ্রমী শ্রেণির তুলনায় বেশি সামাজিক সম্মান পেয়ে থাকে, যদিও আর্থিক বা রাজনৈতিক দিক থেকে প্রভাবশালী মানুষের তুলনায় তাঁদের সামাজিক অবস্থান অনেকটা নিচে। নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে এঁরা। বেশি মাইনে চাকরি, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সব রকমের সামাজিক নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে। এরা যেমন তার রোজগার নিয়ে, তেমনি তার সামাজিক সম্মান এবং সামাজিক প্রভুত্ব বিষয়ে সচেতন। বাদল সরকারের এঁদের সম্পর্কে বলেছেন—

“বিভিন্ন নামে এঁদের পরিচিতি। ... এঁরা বুদ্ধিজীবী, যদিও বুদ্ধি জীবিকা হলে অনেকেই অনাহারে মরতো। এঁরা শিক্ষিত, যদি ডিগ্রীকে শিক্ষা বলে ধরে নেওয়া চলে। এঁরা ভদ্রলোক, ছোটলোকদের থেকে নিজেদের পার্থক্যটা বোঝেন বলে।”^{৫৭}

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের আশা এবং আশাভঙ্গ জনিত এক বিস্ময়কর অস্তিত্বের সংকটের কথা বারবার উঠে এসেছে এই পর্বে লেখা সিরিয়াসধর্মী নাটকগুলিতে। যেন এক নতুন নাটককার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি এই পর্বে। এবার আমরা তাঁর এই সিরিয়াসধর্মী নাটকগুলি আলোচনা সূত্রে বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব এবং একই সঙ্গে এই ধরনের নাটক রচনায় তাঁর সিদ্ধি কতখানি তারও একটা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব।

বাদল সরকারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নাটক ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’। নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৩ সাল। কিন্তু নাটকটি লেখা শুরু হয় এরও বেশ কয়েক বছর আগে ১৯৫৭-৫৮ সালে লণ্ডন প্রবাসকালে। এই সময় বিদেশে বিভূঁইয়ে থাকা বাদল সরকারের মনে কতগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। লিখে চলেছেন ডায়েরি চিঠি পত্র এবং কবিতার পর কবিতা। আর একদিন সেই লেখাগুলিই কখন নাটকের রূপ নিয়েছে বাদল সরকার নিজেও বুঝতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন—

“সে তো আর শুধু পাঁচ হাজার মাইলের ব্যবধান নয়, দূর থেকে বসে নিজের জীবনটাকে দেখা। কলকাতায় বসে নানা সমস্যার মধ্যে সেসব খুঁটিনাটি চিন্তা তো মাথায় আসা সম্ভব না। সেই চিন্তাগুলো আমার ডায়েরিতে প্রকাশ পেত। তখনই একটু কবিতা লেখার চেষ্টা। ... ওই চিন্তাগুলোই আসত কবিতায়। ১৯৫৭

থেকে '৫৯ আমি লগুনে ছিলাম। ... 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর প্রথমাংশটা কিন্তু লেখা হয়ে গেছে '৫৭-'৫৮ সালেই।"^{৫৮}

১৯৬৩ সালে লেখা সম্পন্ন হলেও 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় 'বহুদর্শী' পত্রিকার জুলাই, ১৯৬৫ সালের ২২তম সংখ্যায়। এর পরের ইতিহাস নাট্যমোদী সকলেরই জানা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, কানাড়া, তামিল এবং আরো কয়েকটি ভাষায় অনূদিত অভিনীত হয়ে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে যায়। নাটকটি হিন্দিতে অনুবাদ করেন প্রতিভা অগ্রবাল ১৯৬৮ সালে। ইংরেজি ভাষায় অভিনীত হয়েছে মাদ্রাজে, অনুবাদ পরিচালনা করেছেন নাট্যকার গিরিশ কারনাড। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' কেবল বাংলা সাহিত্যেই নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটা ল্যাণ্ডমার্ক নাটক হয়ে রয়েছে। সমসাময়িক নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় তো বাদল সরকারকে নাট্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের আসনে বসিয়েছেন। বাদল সরকারের নাট্য জীবনে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের গুরুত্ব প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন—

“... এবং ইন্দ্রজিৎ যখন পড়লাম, আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। বিস্মিত হয়ে গেলাম যে একটা অন্য ধরনের নাটক এসে পড়ল, এবং আমরা সবাই জানি যে ওই একটা নাটকের পরেই বাদলদা সারা ভারতবর্ষের নাট্যসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে গেলেন।”^{৫৯}

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'দেখলাম' বলেছেন না, 'পড়লাম' কথাটির উপর জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ এই নাটকটি যে গভীরভাবে পড়বার নাটক তাও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে উঠে আসে। নাটক সাধারণত দৃশ্য শিল্প। এ ধারণার ব্যতিক্রম অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু নাটক নিবিষ্ট পাঠক দাবি করে, বাদল সরকারের নাটক তা প্রমাণ করে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে আরো দৃঢ় ভাবে সমর্থন করে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের প্রকাশক অঞ্জলি বসু লিখেছেন—

“ 'এবং ইন্দ্রজিৎ' একটি ভালো অভিনয়যোগ্য নাটক, এইটুকুই এর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। অনেকেই মনে করেন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ নাটক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। নাটক পড়ার অভ্যেস বাংলাদেশে এখনও বিশেষ প্রচলিত নয়, যার ফলে নাটক বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ হয়ে উঠতে পারে নি আজও। আশা করি, 'এবং ইন্দ্রজিৎ' এই ক্ষতিকর অবস্থার পরিবর্তনে অনেকখানি সাহায্য করতে পারবে।”^{৬০}

আমরা নিবিষ্ট পঠনে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' কে কীভাবে পাই? কী আছে এই নাটকে? এক্ষেত্রেও আমরা

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠ দিয়েই শুরু করতে পারি। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন—

“... মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্নের, মধ্যবিত্ত জীবনের অবসাদ, মধ্যবিত্ত জীবনের একঘোয়েমি, এবং তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের অন্বেষণ, যেটা *এবং ইন্দ্রজিৎ*-এর মধ্যে দেখে গেছে— অমল-বিমল-কমলের মধ্য থেকে একজন ইন্দ্রজিৎ উঠে আসবার যে তৃষ্ণা, এর মধ্য দিয়ে— আমি মধ্যবিত্ত জীবনের মানুষ ছিলাম— সেই মধ্যবিত্ত জীবনের গভীর সত্যকে, গভীর বেদনাকে, গভীর স্বপ্নকে, গভীর আকাঙ্ক্ষা-আকুলতাকে এমন একটা আঙ্গিকের মধ্যে পেলাম, এমন একটা বিন্যাসের মধ্যে পেলাম, এবং এমন গভীর ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ সংলাপের মধ্য দিয়ে সেটা পেলাম, যা আমাদের নাটকে এককথায় বলব, যে নতুন পথ খুলে দিল বলা যেতে পারে।”^{৬১}

‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের নির্দিষ্ট কোনো প্লট নেই। জোর করে কাহিনি বানানোর চেষ্টা না করাই ভালো। লেখক একটা নাটক লিখতে চাইছেন তার অন্বেষণ চলছে। বাদল সরকারের এ অন্বেষণ চলে নিভূতে। যাদের কথা জানেন না তাদের জানতে চান। সেই জানার ইচ্ছা এবং ভাবনাগুলো একটা কবিতার আকারে লিখে রাখেন। তারপর তাঁর ভাবনাগুলোকে একটা আকার দেন এবং তা ‘প্রাইভেট পিস অব রাইটিং’^{৬২} বলে মনে করেন। সে কারণে নিবিষ্ট সংযুক্তি এখানে লেখকের। অমল লেখককে জিজ্ঞেস করে— “প্লট কী? লেখকের উত্তর— ‘প্লট নেই’।”^{৬৩} কী থীম রয়েছে এ নাটকে? বিমলের সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে লেখক জানাল— ‘থীম? এই— আমরা!’^{৬৪} ‘আমরা’ অর্থাৎ গড়পরতা মানুষ আর ব্যতিক্রমী মানুষ। জানা মানুষ আর না জানা মানুষ। এদের কাহিনিও গড়পরতা। কোন নাটকীয়তা নেই। আর ব্যতিক্রমী ও না জানা মানুষদের লেখক জানেন না, কিন্তু অন্বেষণ করেন। তাদের ভেতর থেকে নির্মিত হবে নাটক, এ ভাবনা কাজ করে। অমল-বিমল-কমলদের মধ্যে তাই অন্বেষণ করেন, এবং নির্মলকে ব্যতিক্রমী মনে হয় বলে তিনি জোর করে বলে বসেন তার নাম নির্মল নয়। আর তখনই বেড়িয়ে আসে গডালিকা প্রবাহের এক জড়সর্ব্বস্ব সমাজের কথা, তাদের দেশের মতো যে দেশে গড়পরতা মধ্যবিত্ত মানুষ থাকে, তার কথা—

“লেখক ।।

কী নাম আপনার?

চতুর্থ দর্শক ।। ইন্দ্রজিৎ রায়।

লেখক ।। তবে কেন নির্মল বলছিলেন?

ইন্দ্রজিৎ || ভয়।

লেখক || কিসের ভয়?

ইন্দ্রজিৎ || অশান্তির। নিয়মের বাইরে গেলে অশান্তি।

লেখক || চিরকাল কি নির্মল নাম বলে এসেছেন?

ইন্দ্রজিৎ || না। আজ বলি। এখন বলি।

লেখক || কেন?

ইন্দ্রজিৎ || বয়স হয়েছে। বয়স আনন্দকে ভয় করে। সুখকে ভয় করে।
স্বস্তি চায়। শান্তি চায়। ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়াল দরকার
এখন।

লেখক || কত বয়স?

ইন্দ্রজিৎ || একশো। দুশো। জানি না কতো। ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের
হিসেবে পঁয়ত্রিশ।”^{৬৫}

আসলে এতো সমাজের বয়স, নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে স্থবিরতার ডাইমেনশন এতে উঠে এসেছে।
নাটকের অন্যতম নারী চরিত্র মানসীও তা থেকে বেরতে চায় না। ইন্দ্রজিৎকে নিয়মের কথা বলে
তাকে বিয়ে করা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কারণ সে স্থবির সমাজের নিয়ম মেনে চলে। এখান
থেকে উঠে আসে আরেকটি ভিন্ন ডাইমেনশন তা হলো গতানুগতিক একঘেয়ে জীবনের অর্থহীন
অনুবর্তন। কোন কিছু না জেনে না ভেবে না বুঝে কোন জীবন দর্শন নির্মাণ না করে সেই এক
গণ্ডিতে কাটানো মানুষ। নাটকে ইন্দ্রজিৎ বলে—

“এই যে চলছে— তার কোনো মানে নেই? একটা বিরাট চাকা কেবল ঘুরছে
আর ঘুরছে। আর আমরা তার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ঘুরছি আর ঘুরছি—”^{৬৬}

ঘর থেকে স্কুল, স্কুল থেকে কলেজ আর কলেজ থেকে চাকরি। বিয়ে-সন্তান সংসার সব মিলিয়ে
একটা ঘূর্ণায়মান জীবন। ইন্দ্রজিৎ-এর মতো লেখকও এই ঘূর্ণায়মান জীবনের কথা বলেন—

“অমল রিটায়ার করে। তার ছেলে অমল চাকরি করে। বিমল অসুখে পড়ে।
তার ছেলে বিমল চাকরি করে। কমল মারা যায়। তার ফেলে কমল চাকরি
করে। এবং ইন্দ্রজিৎ। এবং ইন্দ্রজিতের ছেলে ইন্দ্রজিৎ। ... খণ্ড খণ্ড টুকরো
টুকরো অণু পরমাণু সব যোগ করে নগরদোলার পরম আবর্তন।”^{৬৭}

অর্থাৎ এক স্থবির-গতানুগতিক জীবনই যেন ভবিতব্য। এজন্যই ইন্দ্রজিৎ বলেছিল তার বয়স একশো
দুশো কত ঠিক নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না। এদের কোন বিবর্তন নেই। মধ্যবিত্ত এই সমাজের

পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন—

“১৯৬১ সালের আদমশুমারীর হিসাবে কলকাতার বর্তমান লোকসংখ্যা ২৯,২৭,২৮৯। এর শতকরা প্রায় আড়াই ভাগ গ্র্যাজুয়েট বা আরো উচ্চশিক্ষিত। বিভিন্ন নামে এঁদের পরিচিতি। এঁরা মধ্যবিত্ত, যদিও এঁদের মধ্যে বিত্তের তারতম্য যথেষ্ট। ... এঁরা ভদ্রলোক, ছোটলোকদের থেকে নিজেদের পার্থক্যটা বোঝেন বলে। এঁরা অমল বিমল কমল। ...”^{৬৮}

এভাবে নাটকে মধ্যবিত্তের বিন্যাস তুলে ধরা হয়। সেই সাথে সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি, সাহিত্য চর্চা, ইতিহাস ও জীবনদর্শনের নানা মাত্রাও তুলে ধরা হয়—

“বিমল || Poetry, in a general sense, may be defined to be the expression of the imagination.

কমল || তাতে ক্ষতি কী? সাহিত্যে পলিটিক্স থাকবেই। না থেকে পারে না।

অমল || মোটেই না। সাহিত্য হবে সত্য, শিব, সুন্দরের প্রতীক। পলিটিক্সের মতো নোংরা ব্যাপারের সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

বিমল || নোংরা কথাটায় আমার আপত্তি আছে। ... সাহিত্য হবে জীবনের ছবি—রিয়েলস্টিক! ইন্দ্র কী বলিস?

ইন্দ্রজিৎ || আমি ঠিক বুঝি না। রিয়েলস্টিক হবে এটা মানি। কিন্তু নিছক জীবনের ফটোগ্রাফ হবে সেটাও—”^{৬৯}

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য যে কী হবে— তা নাটকের ভেতরকার ডাইমেনশনই বুঝিয়ে দেয়। রাজনীতি আসে অনিবার্যভাবে। বিভিন্ন সিস্টেমের বা মতবাদের প্রসঙ্গ উঠে আসে অমল-বিমল-কমলদের সংক্ষিপ্ত সংলাপে। যেমন অমলের বক্তব্যে উঠে আসে ক্যাপিটালিস্ট সমাজব্যবস্থার কথা—

“অমল || ক্যাপিটালিস্ট সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙতেই হবে।

বিমল || ফ্যাসিজম্ পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

কমল || কম্যুনিজম্ মানুষের স্বাভাবিক বোধকে লুপ্ত করে।”^{৭০}

অর্থাৎ প্রতিটি মতবাদের ফলাফল এক একটি ক্ষুদ্র সংলাপে তুলে ধরেছেন লেখক তা থেকে গণতন্ত্রও বাদ যায়নি। অমলের কণ্ঠে নাটককার বলেন ‘ডেমোক্র্যাসি দিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু করা যায় না’^{৭১} এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান ‘সাধারণ মানুষ সব সিস্টেমেই ভুগবে।’^{৭২} রাজনীতি বিষয়টি নোংরা বলেই এদের অভিমত। একেবারে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা হয়েছে রাজনৈতিক মতবাদগুলি। আসলে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তার মূল্যায়ন করতে এখানে তিনি ছাড়েননি।

জীবনের সঙ্গে কালের এক অদ্ভুত সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে এ নাটকে। কাল চলছে তার গতিতে আমরা যেন সেই কালের একটা অংশে দাঁড়িয়ে। তার সামনেও যা পেছনেও তাই। অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ব্যাপক অর্থহীনতা। কোথাও কোনো উত্তরণ নেই, প্রাপ্তি নেই বা সফল হওয়ার সমাপ্তি নেই বা এসবের আশাও নেই—

“লেখক ।। ... আমাদের আশা নেই, কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের জানা। আমাদের অতীত ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে গেছে। আমরা জেনে গেছি—পেছনে যা ছিল, সামনেও তাই।”^{৭৩}

যদিও এ সমস্ত কিছু একটা নেতিবাচকতার ইঙ্গিত দেয় তবুও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থেকে যায় তার মধ্যে। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে একজন ইন্দ্রজিৎ— অন্বেষণ লেখকের কাজ। মানুষ জানুক স্বপ্ন দেখুক, পরিবর্তিত হোক এই আশা রয়েছে নাটকের অভ্যন্তরে। নাটকে অস্তিত্ব সংকটের যন্ত্রণা রয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির কথাও বাদল সরকার তুলে ধরেছেন। আমরা যদি তাঁর সেই সময়কার লেখা ডায়েরি বা চিঠিপত্র দেখি, তাহলে দেখব যে, একটা হতাশা-নিরাশার যন্ত্রণার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন বাদল সরকার। ২৪.০৩.৫৯ তারিখে তাঁর বোন মনুকে লেখা একটি চিঠি তিনি লিখেছেন—

“Camus-এর মতো আমার এখনো ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নি, তাই আজও আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো মাঝে মাঝে অযৌক্তিক অবাধ্য আশা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চোখ ফেরাই। তবু তাতে মনে হয়— বেঁচে আছি, বেঁচে থাকাটা দরকার, এবং —কে বলতে পারে?— হয় তো ভালোও।”^{৭৪}

বাদল সরকার সবসময় আশার কথা বলেছেন। জীবনের কথা বলেছেন মানুষের বেঁচে থাকার কামনা করেছেন, মরণকে বরণের পক্ষে তিনি ছিলেন না। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের লেখক এই কারণে হয়তো সমস্ত নেতির মধ্যেও স্বপ্ন দেখেন। ‘... ঘুম ভাঙলেও স্বপ্নের জেদ ফুরোতে চায় না!’^{৭৫} তীর্থ না হলেও শেষ পর্যন্ত তীর্থ পথের কথা বলা হয়েছে নাটকে। যথেষ্ট আসার ইঙ্গিত দিয়ে নাটকটি শেষ হয়। নাটকের শেষের কয়েকটি পঙ্ক্তি তার প্রমাণ—

“বিনা দ্বন্দ্রে বিনা প্রশ্নে উন্মুক্ত দু’হাতে
তীর্থপথ মহাদীক্ষা করেছি গ্রহণ।
দিবসান্তে আজ যেন মন
নাহি ভোলে সেই দীক্ষা। তীর্থ নয়,
তীর্থপথ আমাদের— মনে যেন রয়।”^{৭৬}

‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের নামকরণ বড় অদ্ভুত। এই নামকরণে নাটকের থিম ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের ভেতর থেকে উঠে আসে। তবে এমনটাও কিন্তু নয় যে এই নামকরণে কেবল ইন্দ্রজিৎ-কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ‘এবং’ কথাটি মাত্রাবহ। ‘এবং’ এই শব্দ দিয়ে কোন কিছু শুরু হতে পারে না। ‘এবং’ অব্যয়টি পূর্বের কিছু কথা দাবি করে। এখন প্রশ্ন হলো ইন্দ্রজিতের পূর্বে তবে কে? তাদের কোনো উল্লেখ কি এর মধ্যে বোঝা যায়? অঞ্জলি বসু প্রকাশিত ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের যে প্রচ্ছদের উপর ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নামটি নাটকের পুস্তকে শোভিত হয় সেখানে কিন্তু ইন্দ্রজিতের পূর্বে রয়েছে আরও তিনজন যা কিনা অগণনের মাত্রাবাহী। আমরা তিনটি বিষয়ে কোন নাম বা অন্য কিছু উল্লেখ করে বলি ইত্যাদি ইত্যাদি। তৃতীয় সংখ্যাটি অনির্দিষ্টতার সূচক। তবে কি ইন্দ্রজিতের পূর্বে রয়েছে অসংজ্ঞাত সংখ্যা যাকে অঙ্কের ভাষায় বলে Infinite? এরা কারা? এক্ষেত্রে আমরা বিমলের বক্তব্য উল্লেখ করতে পারি—

বিমল ।। ইন্দ্রকেই হিরো করে ফেলো। আমাদের মরা সৈনিক করে রোখো।”^{৭৭}

লেখককে বিমল নিজেদের মরা সৈনিক বলে পরিচয় দেয়। তবে কি সেই মরা সৈনিকদের মধ্যে যে জীবন্ত মানুষ সে-ই ইন্দ্রজিৎ? সেকারণে ‘এবং’ অব্যয়ের সংযুক্তি! অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ এককভাবে অস্তিত্বহীন। তার স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই অন্য সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে অমল-বিমল-কমলদের সারিবদ্ধ নাম দেওয়া সম্ভব নয়। নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রে লেখকের ভাবনা ছিল ‘অমল, বিমল, কমল, ইন্দ্রজিৎ ও মানসী’^{৭৮} অমল বলে— ‘এ তো মলাটে কুলোবে না হে!’^{৭৯} এখানে মলাট কথাটি একটি ব্যঞ্জনা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে নামানুসারে সংখ্যাতিত ভাবে বোঝাচ্ছে। আবার ওই অগণন মানুষের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। ‘মরা সৈনিক’ কথাটি এক্ষেত্রে বেশ মানানসই শব্দবন্ধ। সৈনিক একটি নামবাচক শব্দ নয়। বিশেষ কোন ব্যক্তিকে বোঝায় না। এটি একটি সমষ্টিবাচক শব্দ। এই শব্দটি একটাই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। সৈনিকের কাজ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা, রক্ষক হিসেবে কাজ করা। মরা সৈনিক মানেই পরাজিত। যে সৈনিক নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। লড়াই করে বাঁচতে পারেনি। জ্যান্ত সৈনিক সে-ই যে লড়াই বেঁচেছে অথবা রক্ষা করার জন্য লড়ছে। এখানেই ‘মরা সৈনিক’ শব্দবন্ধটি একটি আশ্চর্য কৌণিক মাত্রা পেয়ে যায়। একদিকে একই জাতীয় অগণন সংখ্যার প্রতীক হয় আবার জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানে মৃত্যুর নামান্তর নয়। সৈনিক অতন্ত্র প্রহরী। জীবনকে পাহারা দেবে মানুষের চৈতন্য নামক সৈনিক। সে সমস্ত রকম মৃত্যু ঠেকাবে। আত্মিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে সে জীবন্ত করে রাখবে মানুষকে। সেই তো আসল নায়ক। সে কারণে বিমল ইন্দ্রজিৎকে হিরো করতে বলেছে। ‘হিরো’ শব্দটিও সেই সংগ্রামে জয়ের অভিনন্দিত ধ্বনি। ইন্দ্রজিৎ সেই হিরো। কীভাবে? অমল-বিমল-কমলদের মত অসংখ্য মানুষের সাপেক্ষে ইন্দ্রজিৎ হিরো, অগণন পরাজিত

মানুষের ভেতরে দাঁড়িয়ে সে জীবনের জন্য লড়াই করেছে, জীবনের মস্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে বেঁচে থাকার নয় টিকে থাকার জন্য লড়াই করে যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বিবর্তনহীন অমল-বিমল-কমলদের মতো জ্যান্ত-মরা মানুষেরা অনাটকীয়। তাদের ভূমিকা বোধ হয় আলোর মহিমাকে উজ্জ্বল করার জন্য অন্ধকার হয়ে থাকে। তাই তাদের নাটকে আনতেই হয় নইলে ইন্দ্রজিতের পূর্বে ‘এবং’ অব্যয়টি আসে না। গুরুত্বহীন গুরুত্বের জন্য এদের প্রয়োজন। লেখক তার নাটকে বিমলদেব নিতে চাইলে বিমল বলেছে— ‘আমাদের আর টানা কেন বাবা? আমরা তো কাটা সৈনিক।’^{৮০} এখানে মৃত্যুর কথা না বলে বিমল নিজেদের বলেছে কাটা সৈনিক। অর্থাৎ মৃত নয় কিন্তু বাঁচার তালিকা থেকে নাম কাটা হয়েছে। ফলে ‘মরা সৈনিক’ এবং ‘কাটা সৈনিক’ দুটিই তাৎপর্যবাহী শব্দবন্ধ। আবার নাম প্রসঙ্গে কমল বলে— ‘হ্যাঁ, তার চেয়ে রাখো— ইন্দ্রজিৎ ও মানসী’।^{৮১} কিন্তু এ নাম সেই ভালোবাসার মিষ্টি গল্প ভরা নাটকের নাম হয়ে যায়। নায়ক-নায়িকা সর্বস্ব নাটক। এরকম নাম থাকলে অমলরা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সমস্ত প্রতীকী তাৎপর্য বা ব্যঞ্জনা হারায়। এ নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে বাদল সরকার লেখককে দিয়ে বলেছেন—

“ইন্দ্রজিৎ আর মানসীকে নিয়ে দেশে দেশে যুগে যুগে বহু নাটক লিখিত হয়েছে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, মিলনান্ত, বিয়োগান্ত। ... সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে ইন্দ্রজিৎরা আর মানসীরা এসেছে, ভালোবেসেছে। কত আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিরহ, ঈর্ষা-অভিমান, কত জটিল মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে এদের নাটক গড়ে উঠেছে। ইন্দ্রজিৎ আর মানসীর প্রেম। একটি চিরন্তন নাটকীয় উপাদান।— ইন্দ্রজিৎ!”^{৮২}

না, এরকম চিরন্তন নাটকীয় উপাদান নাটককারের অভীষ্ট নয়, তাই ওই সংলাপের শেষে ইন্দ্রজিৎ-এর পর একটা বিস্ময়বোধক চিহ্ন। ইন্দ্রজিৎ কি তাই? তার নামপদটি তা বলে না। আবার ওই সংলাপে যত ধরনের নাটকের নাম উল্লেখিত রয়েছে সেরকম নাটক রচনাও উদ্দেশ্য নয়। এখানে গতানুগতিক কোন নাটক রচনার উদ্দেশ্য নয় বলেই গতানুগতিকতাকে আক্রমণ করা হয়েছে। ফলত এ নাটকের নাম ‘ইন্দ্রজিৎ ও মানসী’ হতে পারে না। আবার মানসী যে উল্লিখিত হতে পারে না তার আরও কারণ আছে। যে অর্থে ‘এবং’ অব্যয়টি এসেছে শেষ পর্যন্ত মানসীও তো সেই দলে পড়ে। সেও তো নিয়ম নামক এক অদ্ভুত বিষয়ের দাস। ইন্দ্রজিৎ জানতে চায় কোথায় নিয়ম লেখা আছে। মানসী উত্তর দেয়— ‘লেখা আবার কোথায় থাকবে? তাই নিয়ম।’^{৮৩} অলিখিত এক অদ্ভুত নিয়মের ও সংস্কারের বন্ধনে সে আবদ্ধ। সেও গতানুগতিক জীবনে অভ্যস্ত। ফলে মানসীও ওই ‘এবং’ এর দলে। সে কারণে অমলের ছেলে অমল, বিমলের ছেলে বিমলের মতই মানসী সম্পর্কে ইন্দ্রজিৎ

বলে: “তাই হয় দুনিয়ায়। কতো মানসী আসে। আবার চলে যায়। ... মানসীর বোন মানসী। মানসীর বন্ধু মানসী। মানসীর মেয়ে মানসী।”^{৮৪} সে কারণে মানসী নামের সংযুক্তি এ নাটকের নামকরণে আসতে পারে না। আমরা এবার দেখে নিতে চাই ইন্দ্রজিৎ কেন হিরো? নাটকে অনেক সময় আমরা দেখি বারবার সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, কখনো ব্যর্থ জীবনের জন্য মরণ কামনা করেছে তার মনে হয়েছে মৃত্যুই পরম সুখের। নিজের প্রতি কখনো কখনো সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তাই সে ভেবেছে—

“আসলে মরে যাওয়াটা পরম সুখের। কতো লোক মরে সুখে আছে। ... এখনই মরি না কেন?

... মানুষের বাঁচতে হলে বিশ্বাস দরকার। ভগবানের বিশ্বাস। ... মানুষে বিশ্বাস। বিপ্লবে বিশ্বাস। নিজের উপর বিশ্বাস। ভালবাসায় বিশ্বাস। এর মধ্যে কোন বিশ্বাসটা আজ আমার আছে বলে বলতে পারি?”^{৮৫}

এরকম নেতিবাচক চিন্তা থেকে আমাদের মনে হয় ইন্দ্রজিৎ এক জীবন যুদ্ধে হেরে যাওয়া সৈনিক। কিন্তু সত্যি কি তাই? আসলে জীবনের প্রতি বিশ্বাসহীনতার কথা বললেও ইন্দ্রজিৎ অনেক বেশি জীবনের প্রতি আশাবাদী।

“মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়লেও জীবনের প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ নয়। জীবনকে গভীরভাবেই সে উপভোগ করতে চায়। জীবন থেকে সে পালিয়ে যায়নি। ইন্দ্রজিৎ জানে জীবন মহামূল্যবান জীবন।”^{৮৬}

যে প্রচ্ছদটির কথা এর আগে আমরা উল্লেখ করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে মাত্র একজন এই বৃত্তের অর্থাৎ গণ্ডির বাইরে পা রাখতে চেষ্টা করেছে।



এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু।

প্রচ্ছদটিতে দেখা যাচ্ছে একটি পা সে বৃত্তের বাইরে রেখেছে এবং তার গতি বেরিয়ে যাওয়ার।
সেরকম একটা গতির ভাব কিন্তু ঐ বাড়ানো পায়ের ছবিতে আছে। এ যে ইন্দ্রজিৎ তা বলার অপেক্ষা
রাখে না।

ইন্দ্রজিৎ নিজের আইডেন্টিটি খোঁজে। তার মধ্যে বেড়া ভাঙার খেলায় মেতে ওঠা শক্তি
আছে। মাঝে মাঝে সেও নির্মল হয়ে থাকতে চায় স্বস্তির জন্য। কিন্তু পারে না। ইন্দ্রজিৎ প্রচলিত
পথ থেকে সরতে চায়, মধ্যবিন্দু নির্মিত গণ্ডির বাইরে বেরোতে চায়। নিয়ম কেন মানতে হবে
এটাই তার প্রশ্ন। বরং নিয়ম ভাঙবে সে। যে নিয়ম অর্থহীন, যে নিয়ম মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটায়, মানুষের
অবনমন ঘটায় সে নিয়ম সে ভাঙবে। ইন্দ্রজিৎের লড়াইটা তাই অনেক ব্যাপক। এ বিষয়ে মানসীর
সঙ্গে তার কথোপকথনটি উদ্ধৃতিযোগ্য—

“ইন্দ্রজিৎ ॥ সবই তো মানছি। কিন্তু নিয়ম মানাটাই উচিত এ কথাটাও কি মানতে
হবে?

...

মানসী ॥ কী করতে চাও তুমি?

ইন্দ্রজিৎ ॥ জানি না। দড়িটাকে ছিঁড়তে চাই। চারিপাশে এই যে বদ্ধ কানা দেওয়ালগুলো
ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিতে চাই।

মানসী ॥ কার সঙ্গে তোমার লড়াই?

ইন্দ্রজিৎ ॥ দুনিয়ার সঙ্গে। চারিপাশের লোকগুলোর সঙ্গে। তোমাদের ঐ যাকে
সমাজ বলো— সেইটার সঙ্গে, তার ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে।”^{৮৭}

এখানেই ইন্দ্রজিৎ স্বতন্ত্র। অমল-বিমল-কমলের মতো মানুষেরা নিয়ম খুঁটিয়ে দেখে। তা মানা
উচিত কিনা, সে নিয়ে ভাবেও না, চলতে হয় চলতে থাকে। নিয়মের গণ্ডিতেই থাকে। আর ইন্দ্রজিৎ
ওদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে চায়। সমাজের ব্যবস্থাগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়। কারণ
ইন্দ্রজিৎ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছে। ইন্দ্রজিৎ তাই বলেছে—

“যদি জ্ঞানবৃক্ষের ফল না খেতাম—তোমাদের এই নিয়মের সমাজে স্বর্গবাস

করতে পারতাম। এখন আর দেওয়ালে মাথা না খুঁড়ে উপায় নেই।”^{৮৮}

ফলে চিন্তা চেতনা ও দর্শন নিয়ে ইন্দ্রজিৎ স্বতন্ত্র হয়ে যায়। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ হয়ে যায়। আবার ওই
লড়াইয়ের তীব্র মানসিকতাই হয়তো তাকে পৌরাণিক ইন্দ্রজিৎ নামের সঙ্গে মিলিয়ে দেয় কিন্তু এই
নাটকের ইন্দ্রজিৎ দেবতা নয় মানুষ। নাটককার চরিত্রটিকে দেবত্ব উত্তীর্ণ করেননি। আকাঙ্ক্ষা
নিয়েও আকাঙ্ক্ষা পূরণে নৈরাশ্য নিয়ে সে মানুষ। তাই সমাজ, সভ্যতা, রাজনীতি, মানুষ দেখতে

দেখতে অনেক সময় হতাশ হয়ে পড়ে। অস্তিবাদী চেতনায় আক্লান্ত হয় সিসিফাসের কথা বলে।
কি করবে যেন ভেবে পায়না—

“দেবরাজ জুপিটারের অভিশাপে সিসিফাসের প্রেতাত্মা প্রকাণ্ড ভারি পাথরের
চাঁই ঠেলে পাহাড়ের চূড়ায় তোলে। যেই চুড়োয় পৌঁছায়, আবার গড়িয়ে নিচে
পড়ে যায় পাথরটা। আবার ঠেলে ঠেলে তোলে। আবার পড়ে যায়, আবার
তোলে।”^{৮৯}

আসলে মানুষ ইন্দ্রজিৎ কখনো কখনো যন্ত্রণায়, হতাশায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সেও আবার নির্মল হয়ে
যেতে চায়, সাধারণ হয়ে যেতে চায়। কিন্তু তার তো সে উপায় নেই। জীবনের পথে তাকে তো
চলতেই হবে। সে সাধারণ হলেও তার সেই অমল কমলদের সারিতে চলার উপায় নেই। লেখক
বলেন—

“তবু তুমি নির্মল নও। আমিও সাধারণ। তবু আমি নির্মল নই। তোমার আমার
নির্মল হবার আর উপায় নেই।”^{৯০}

এখানেই সাধারণ সারির সঙ্গে সংযুক্তি এবং বিযুক্তি আর সেজন্যই তো নামকরণ ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’
শুধু ‘ইন্দ্রজিৎ’ নয়।

‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের নির্মাণশৈলীর অন্যতম বিষয় হল কবিতা। নাটকে সংলাপের বিকল্পে
কবিতা বা কবিতায় সংলাপ, এ নাটকের প্রাণ বলা যেতে পারে। বাদল সরকার লগুনে থাকার সময়
বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন। যা প্রকাশের জন্য নয়, ভাবনাকে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে রাখার
জন্য। পরে ওই কবিতাগুলো সাহায্য করেছে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটক রচনায়। বাদল সরকার
লিখেছেন—

“... ওই কবিতাগুলোই সাহায্য করেছে আমাকে-কবিতাগুলো লেখবার সময়ে
যে ধরনের চিন্তাভাবনা মাথায় ছিল সেগুলো আমাকে ঠেলে নিয়ে গেছে।”^{৯১}

বাদল সরকার কবিতার মতো করেই ভেবেছেন ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’কে। কবিতার মতো করে সংলাপ
মিশ্রিত একটা ব্যক্তিগত রচনা হিসেবেই ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর আত্মপ্রকাশ। কবিতার ভাব নিয়ে
কবিতার মেজাজ ও শৈলী নিয়ে নাটক হয় কিনা তা নিয়ে অবশ্য স্বয়ং বাদল সরকারের মনেই
সংশয় ছিল। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

“কতগুলো কথা তো ভেতরে বলবার থাকে, সেগুলো নাটকে বলা যায় কিনা
এ প্রশ্নটা উঠেছে। বলা যায় না বলেই বিশ্বাসটা ছিল।”^{৯২}

তথাপি বাদল সরকার একটা চেষ্টা করলেন এবং বলেছেন সে চেষ্টাটাও ‘... একটা ডাইরির মতনই’।^{৯৩}

কীভাবে কবিতা এই নাটকের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে তা বাদল সরকারের বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। তিনি বলেছেন—

“...ওটা অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে যেন একটা অংশ পর্যন্ত লিখে তারপরে হয়তো একটা কবিতা সামনে রয়েছে, চার বছর-পাঁচ বছর আগের লেখা এই কবিতাটিতে পৌছাব সূতরাং মাঝখানের লেখাগুলো যেন ওই পরের কবিতায় পৌছানোর জন্য লেখা।”^{৯৪}

ফলে কবিতার আলোচনা ছাড়া যে এই নাটকের আলোচনা অসম্পূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তিন অঙ্কের এই নাটকে প্রথম অঙ্কে তিনটি, দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি এবং তৃতীয় অঙ্কে এ তিনটি, মোট এগারোটি কবিতা রয়েছে। এর মধ্যে আটটি কবিতা লেখক চরিত্রের উচ্চারণ। ১৯৫৭ সালে লণ্ডন প্রবাসকালে ২১.১২.৫৭ তে লেখা প্রথম কবিতা ‘তীর্থপথ’ সম্পাদিত রূপে এখানে নাটকের শেষে স্থান পেয়েছে। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের কাহিনিটি ভাব এবং দর্শন নির্ভর। তার প্রকাশ ভঙ্গিটিও আবার আত্মগত। ফলে কবিতা এখানে আত্মপ্রকাশের অন্যতম বাহন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যে ডাইমেনশন আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি ইতিমধ্যে, তার অনেকগুলোই কবিতার ভেতর উদ্ভাসিত।

প্রথম অঙ্কেই আমরা জীবনের একঘেঁয়ে অনুবর্তনের ভাবদ্যোতক কবিতা পাই। লেখক যাদের নিয়ে নাটক লেখার চেষ্টা করছেন, দেখলেন সেই অমল-বিমল-কমলদের নিয়ে একটা অংক বা ধারাপাতের সংখ্যায় পাওয়া যায়, নাটক লেখা যায় না। এক্ষেত্রে একটি কবিতা দিয়েই এই ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক একটা কবিতা লিখেছেন বলায় কমল শুনতে চেয়েছে এবং বলেছে ‘যদি বুঝতে পারি— ছিঁড়ে ফেলো। না পারলে মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিও।’^{৯৫}

প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হতে পারে এ বুঝি আধুনিক কবিতার প্রতি ব্যঙ্গ। আসলে তা নয়। এ হল জীবনের আঙ্গিক হিসাবে কবিতার মত বস্তুর না প্রবেশের কথা। কবিতাটি কেবল সংখ্যার আবর্তন—

“এক—দুই—তিন

এক—দুই—তিন—দুই—এক—দুই—তিন

চার—পাঁচ—ছয় ...”^{৯৬}

এভাবেই নির্মিত। অসংখ্য মানুষ এভাবেই সংখ্যা হয়ে থাকে যা অমল-কমল ইঙ্গিত করে। আমাদের মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ নাটকের কথা। সেখানেও মানুষগুলোকে সংখ্যা বা নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐ আঙ্গিক ক্রমের ভাষাময় উত্তর মেলে পরের কবিতাটিতে—

“ছন্দবাঁধনে আবর্তনের চলুক অনাদি খেলা,
আলো আঁধারির চক্রবাঁধায় কালের শোণিতধ্বনি

.....
কী হবে মিথ্যা সূক্ষ্ম হিসাবে পুরোনো সংখ্যা গুনে?
কী হবে স্বপ্নে ভবিষ্যতের তন্তু-আঁচল বুনে?”^{৯৭}

গতানুগতিক আবর্তনের চক্র এ জীবন। সময়ের তালে জীবনের স্পন্দন বাঁধা। জীবনকে এভাবে দেখলে কোন ঝামেলা নেই। কিন্তু পুরো অংকটা তবে অস্বীকার করা হয়। পুরো অংকের উত্তর যেন শূন্য। কেননা কোন আবর্তনে কিছু বিশেষ মাত্রা নেই। আমরা শূন্য উত্তর চাই না, তাই ক্ষুদ্রতার গণ্ডি টানি। নাটকের লেখক তাই কবিতায় বলে—

“নির্বোধ মনে অবুঝ অঙ্কে তবু উত্তর খোঁজা,
তবু সংখ্যার চক্র রাশিতে ভারি করে তোলা বোঝা।
অনেক দিনের হিসাবশূন্য— সে কথা যায় না মানা,
অল্পদিনের ক্ষুদ্র গণনে তাই তো গণ্ডি টানা।।”^{৯৮}

এরপরেই শুরু হয় একঘেয়ে জীবনের কথা, চাকরি সংসার আবার পড়া স্কুল-কলেজ আবার চাকরি। এরা বিমলের ছেলে বিমল, কমলের ছেলে কমল। নাটককার এই ছকবাঁধা জীবনকেই ভাঙতে চান। আর সে কারণেই তাঁর ইন্দ্রজিৎ অন্বেষণ। প্রথম অংকের তৃতীয় কবিতায় তাই বলা হয়েছে—

“আমি এলোমেলো আকাশে এনেছি নেশা
অজ্ঞ বাতাস চেতনার বিষে মেশা,

.....
সমাধি মৌন জড়তার নাগপাশে,
চিতাবহ্নিতে প্রদীপ্ত বাচালতা।।”^{৯৯}

জীবন তো খণ্ডিত। সেই খণ্ড জীবনের উপর বসে পূর্ণতার কথা ভাবা, কিংবা খণ্ডতাকে আঘাত করার কথা ভাবা যে হাস্যকর লেখক তা জানেন। তবুও তাঁর ভাবনায় পূর্ণতাময় হাতছানি দেয়। কিসের জন্য অন্তরের এই চাওয়া? লেখক নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন। নাটকের দ্বিতীয় অংকের প্রথম কবিতায় তাই লেখক বলেছে—

“এ মাটি পুরোনো। রিক্ত আকাশ।
বৃথা পরিকল্পনা।
আমি। বসে ভাবি। আজো ভাবি।

আজো কেন তবু ভাবি পুরো মানুষের কথা?

অংশ-চেতনা আজো কেন খোঁজে লিখনের অন্যথা।”^{১০০}

সবার ভাবনা তো এক হয় না। সবাই এভাবে ভাবেও না। তারা কেবল চলতে হয় তাই চলে। না ভেবেই নিয়ম রক্ষা করে চলে। কেন? কি? এমন কোনও প্রশ্ন তাদের ভাবনায় না। তারা নিজেরাও নিজেদের মুখোমুখি দাঁড়ায় না। একটা গডালিকা প্রবাহে তাদের দিন চলে যায়। তাদের কোনো আত্মদ্বন্দ্ব নেই। বাদল সরকার তথা লেখক চরিত্র সে কথা তুলে আনেন দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় কবিতায়—

“এই পেয়ে গেছি! সব্বাই করছে।

কেন তুমি হাঁচবে? কেন তুমি কাশবে?

দাঁত কটি মেলে ধরে কেন মধু হাসবে?

কেন তুমি দেবে তুড়ি, ওরা যদি তোলে হাই?

সব্বাই করে বলে, সব্বাই করে তাই!”^{১০১}

আঙ্গিকটি অনেকটা সুকুমার রায়ের ‘আবোল তাবোল’-এর মত। লেখক তথা নাট্যকার আর হয়তো এরকম জীবনকে ‘আবোল তাবোল’ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু লেখক কিংবা ইন্দ্রজিৎ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে জীবনের অর্থান্বেষণে ব্যাপ্ত। মহাপৃথিবীর সাপেক্ষে সে হয়তো ক্ষুদ্র, মহাকালের প্রেক্ষিতে সে হয়তো তুচ্ছ, তবুও তার থেমে থাকলে চলে না, তাকে চলতেই হবে—

“সৌরমণ্ডলের চক্রে পৃথিবীর নগণ্য ঠিকানা

কোথায় হারিয়ে আছে।

.....

ধরণীর অর্থহীন প্রাণ।

সে অনন্ত গণনাতে

আমি আছি সংজ্ঞাহীন সামান্য কণাতে।”^{১০২}

তবুও—

“প্রাণের উদ্ধত অধিকারে

অনন্ত ঘোষণা রাখি কণিকার মুহূর্তপ্রচারে।”^{১০৩}

এই ঘোষণা আসলে জীবনের জয়গান। এখানেই জীবনের অর্থময় হয়ে ওঠা। আর এ কারণেই সমস্ত ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতার পরেও লেখক আত্মগত ভাবোচ্ছাসের কবিতায় বলেন—

“ঐ মাঠে। ঐ ঝাঁকড়া-মাথা গাছটার নিচে।

ও মাঠে মাটিতে ঘাসে মেশা

অনেক পুরোনো নেশা

.....

ও মাঠে তরল দিন বহুদিন বহু কথা বোনা।

.....

কথা তো পুরোনো হয়ে যায়,

একই কথা ঘুরে ফিরে আসে।

তুমি চলো মাটি-মাখা ঘাসে

আজে বাজে দু'টো কথা রাখি,

দু'দণ্ড বসে থাকি

কাছাকাছি গোলাপী বাতাসে।”^{১০৪}

চলমানতাই জীবন। চলমান জীবনের ভেতর থেকেই জীবনকে পাওয়া যায়। এই কবিতায় সেই ভাবনার প্রকাশ পেয়েছে। এটা ঠিক যে লেখক কিংবা ইন্দ্রজিৎ কখনো কখনো বড় বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। জীবনের চলমানতার পাশাপাশি এক বিপন্ন বিষয়ের কথা উঠে আসে। দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম কবিতায় লেখককে বলতে শোনা যায়—

“কী হবে কথার রাশি দিয়ে?

কী হবে তর্কের বীজ বাতাসে ছড়িয়ে?

আমি ক্লান্ত যুক্তির জ্বালায়,

আমাকে ঘুমোতে দাও একা নিরালায়

ছায়ার গভীরে।”^{১০৫}

জীবনানন্দের ‘বোধ’ কবিতার নায়কের মতো ‘এক বিপন্ন বিষয়’ লেখককে তাড়িত করে। ‘সকল লোকের মাঝে থেকেও’ সে একা। এই একই একাকীত্বের যন্ত্রণা এখানে উঠে আসে বাদল সরকার তথা লেখকের উক্ত কবিতায়। পূর্বের ঐ শপথ ও জীবনান্বেষণের তীব্রতা তারপর এমন কবিতা আমাদের অবাক করে। তাহলে কি লেখক কিংবা ইন্দ্রজিৎ মানুষের আশ্চর্য সব দেখে ক্লান্ত! তৃতীয় অঙ্কের প্রথম কবিতায় এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

“জোলো সাস্ত্রনার বুলি ছেড়ে দাও,

.....

মানুষ আশ্চর্যতম প্রাণী;

ডুবো পাথরের ভিতে পাতালে সে পাতে রাজধানী।”^{১০৬}

এই ধরনের নেতিবাচক ভাবনা আমাদের হতাশ করে। যে উদ্দীপ্ত ভাব আমরা এ পর্যন্ত দেখেছি সবই আবার হতাশায় ডুবে যায়। ইন্দ্রজিৎকে বলতে শোনা যায়—

“এ প্রবাসে সবই মিথ্যে হোলো।”^{১০৭}

এই জাতীয় ভাবনা কবিতা পরম্পরায় এসে হঠাৎ আমাদের ধাক্কা মারে। তবে আশার বিষয় এই ভাবনা ক্ষণিক মুহূর্তের। কারণ ইন্দ্রজিৎ জানে, লেখক জানে, “আমরাও অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা। আমরাও জানি ও পাথর পড়ে যাবে।”^{১০৮}

কিন্তু ‘তবু ঠেলতে হবে’।^{১০৯} তৃতীয় অংকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতাতে তারই প্রকাশ দেখি। জীবনের পথ চলার গতি পায়। যে গতি পূর্বে ছিল, যে ভাবনা পূর্বে ছিল, তা পুনরায় ফিরে আসে ইন্দ্রজিৎের চেতনায়—

“আমি আছি। বেঁচে আছি। জেগে আছি।

মনে আছে সব। আরো তো জীবন আছে বাকি।”^{১১০}

সুতরাং চলতেই হবে, নইলে নিষ্কৃতি নেই। আশা-নিরাশা সব নিয়েই চলতে হবে। সিসিফাস-এর মত অস্তিবাদী চেতনায় আক্রান্ত হলেও তার থেকে বেরিয়ে আসার একটা চৈতন্যকে জাগ্রত রাখতে হবে। এভাবেই একটা স্বতন্ত্র জীবনদর্শন বোনা হয়ে যায় নাটকের শেষ কবিতায়—

“বিনা দ্বন্দ্বে বিনা প্রশ্নে উন্মুক্ত দু’হাতে

তীর্থপথ মহাদীক্ষা করেছি গ্রহণ।”^{১১১}

বলাবাহুল্য এই কবিতায় পৌঁছেই নাটকের সমাপ্তি।

‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ এই পর্বে লিখিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক হলো ‘সারারাত্তির’। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ লেখার পরেই বাদল সরকারের দ্বিতীয় প্রবাস জীবন। আবার সেই শূন্যতা। ২৪.০৭.৬৩ লেখা ডায়েরিতে বাদল সরকার লিখছেন: “সেই শূন্যতা। অতীতের কিছুই মনে পড়ছে না। ভবিষ্যতের কিছুই মাথায় আসছে না। ...।”^{১১২} এই সময় তিনি ফ্রান্সে। আর এই ফ্রান্সে বাসকালে লিখলেন ‘সারারাত্তির’ নাটক। নাটকের রচনাকাল ১৯৬৩। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, ডায়েরিতে লিখছেন—

“সারারাত্তির’ শেষ করলাম এইমাত্র। রাত পৌনে বারোটো এখন। ভালো লাগছে। শুতে যাচ্ছি।”^{১১৩}

এই নাটক একটা ঘোরের মধ্যে লেখা। এই নাটক লেখার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই একটা অদ্ভুত রকম অনুভূতি বাদল সরকারের মনে কাজ করে। ১৭ই আগস্ট ১৯৬৩, তিনি স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু

কিছু মনে পড়ছে। তিনি লিখছেন—

“রাত্রের স্বপ্ন টুকরো টুকরো হয়ে এতোক্ষণে বিস্তৃতির স্রোতে ভেসে যেতো। জাগা মন উপহাস করতো স্বপ্ন-দেখা মনকে। উপহাস করতো— যদি মনে পড়তো।... দুপুর কেটে আসছে।... স্বপ্নটা হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক কথা বলবো ভেবেছিলাম, বলা হোলো না।”^{১৪}

আবার পরের দিন ১৮ই আগস্ট লিখছেন—

“যখনই লেখার কথা ভাবছি, যখনই লেখার বিষয়বস্তু খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি, ইন্দ্রজিৎ এসে বাধা দিচ্ছে। আর যেন বড়োপিসীমা, রাম শ্যাম যদু সম্ভব নয়। অথচ ইন্দ্রজিৎ তোর বার বার হয় না। তবে কি ফুরিয়ে গেলো? ইন্দ্রজিতের পরে আর কী আছে?”^{১৫}

অর্থাৎ এই লেখা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বাদল সরকার নাটক লেখার উপযুক্ত বিষয়ে খুঁজছেন। সেই সঙ্গে এটাও বোঝা যায় যে তিনি ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের মতো আর একটি বিষয় খুঁজছেন, কিন্তু লিখতে পারছেন না। এই করে করে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর অবশেষে ২রা সেপ্টেম্বর তিনি নাটকের বিষয় খুঁজে পেলেন। কী নিয়ে ‘সারারাত্তির’ নাটক সে সম্পর্কে বাদল সরকারের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, তিনি লিখেছেন—

“দীপকরা রোজ যেতে বলে। কেন? কেন যাবো? ওরা রাগ করবে? ওরা কিছু মনে করবে? কী আসে যায়? আমার আর সময় কোথায়? আমি যে আটত্রিশ। কোথা থেকে শুরু করবো? গোড়া থেকে? ধৈর্য নেই। সময় নেই। তুলে নেবো ইতিহাস? ডুবে যাবো কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ কয়েকটি ব্যক্তিতে, তুলে নিয়ে আসবো ছাঁকা একটি অভিজ্ঞতা?

শূন্য ঘর। আধা অন্ধকার ঘর। বাইরে ঝড়। বাইরে প্রচণ্ড দুর্যোগ। কিন্তু ঘরে স্তব্ধতা, ঘরের স্থিরতা অবিচলিত। অব্যবহৃত ঘর। কাঠের বড়ো বড়ো তক্তা আড়ভাবে রাখা। লোহালকড়। প্যাকিং বাক্স। গুদাম? না, গুদাম নয়। কিছুই সাজানো নেই। তবু একটা সংহতি। তবু কোথায় যেন প্রাণের আভাস। কোনো একটা প্রাণ বেঁচে আছে, বাস করছে এই সংহত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে। কোনো একটা অস্তিত্বের গৃহকোণ এটা। একান্ত নিজস্ব গৃহকোণ।

ওরা বাইরের। এ ঘরে ওদের অনধিকার প্রবেশ। দুর্যোগের কবল থেকে পালাতে গিয়ে এই ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ক্ষণিকের জন্য। ভঙ্গ করেছে এ ঘরের

একান্ত নিজস্বতা। বাইরের কলরব, বাইরের ক্ষুদ্র বিবেচনা আলোচনা, বাইরের কর্মব্যস্ত অকিঞ্চিৎকর জীবন নিয়ে এসেছে এই জগৎছাড়া নির্জন সংসারে। ওরা কথা বলছে। ওরা নালিশ জানাচ্ছে ঘটনার দুর্গতিতে। ওরা মাথা ঘামাচ্ছে বহু ক্ষুদ্র সমস্যা নিয়ে। ওরা কলহ করছে— অবাস্তুর কলহ। ওরা ভালোবাসছে— প্রাত্যহিক ভালোবাসা।

ওরা স্বামী-স্ত্রী। ওরা নর-নারী। এই জগতের। বাইরের জগতের। এই ঘরের নয়। এ ঘর বাইরের ঘর নয়। এ ঘর ভিতরের।”^{১৬}

বলাবাহুল্য, এই ‘ভেতরের ঘর’ই ‘সারারাত্তির’ নাটকের ঘর এবং তার ব্যাখ্যা বাদল সরকার নিজেই দিয়েছেন। এই ভাবনা বাদল সরকারকে তাড়িত করে এ নাটক লিখতে। ২রা সেপ্টেম্বর লেখা শুরু করলেন আর শেষ হল ৮ই সেপ্টেম্বর। কী আছে এই নাটকে?

‘সারারাত্তির’ আমাদের বেশ কিছু ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। নাটকটিতে স্বাভাবিকধর্মিতার সঙ্গে অদ্ভুতধর্মিতাকে মেলানো হয়েছে। জনবসতি থেকে দূরে এক নির্জনতায় অবস্থিত একটি পোড়ো বাড়িতে নিয়ে যান দু’জন বাইরের নারী-পুরুষকে। স্ত্রী পুরুষ এবং বৃদ্ধ এই নামেই চরিত্রের নাম। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর মতো বা তার থেকেও বেশি ব্যঞ্জনাবহ প্রতীকী চরিত্র। এদের চরিত্র বলা যাবে কিনা সেটাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। কে বৃদ্ধ? সে কোনো স্ত্রীলোকের স্বামী! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তো বাইরের কেউ নয়। ভেতরের ঘরে তার বাস! অভিজ্ঞতার ফলে ‘বৃদ্ধ’। সে জেগে থাকে সারারাত। এই জাগ্রত চৈতন্যই আমাদের একটা প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেয়। নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরী ‘সারারাত্তির’-এর খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা এখানে তা উল্লেখ করতে পারি—

“রাতের অন্ধকারে আমরা প্রত্যেকেই এমন এক একটা নির্জন ঘরে বাস করি।

সেই সময়েই আমাদের চৈতন্য জেগে ওঠে। ভিতর-ঘরে বাসা বেঁধে থাকা

জ্ঞাত-অজ্ঞাত সব কিছু উঠে এসে দ্বন্দ্ব বাধায় ভিতর ও বাইরের ঘরে। এই

দ্বন্দ্বের আবহে বাইরের প্রকৃতির দুর্যোগ যেন আরও ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে।”^{১৭}

এখানে বাইরের দুর্যোগের সঙ্গে মানবচরিত্রের অবচেতন স্তরের দ্বন্দ্বময় সংঘাতকে নাটককার প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন।

নাটকে দেখা যায় স্ত্রী আর পুরুষের কথাবার্তায় একা থাকার কথা উঠলে তার প্রতিধ্বনিতে বৃদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। “... একা, একা, একা।”^{১৮} এরকম একটা ধ্বনি বৃদ্ধ যখন করতে থাকে চমকে উঠে স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রটি। একা থাকার ভয়ে তারা শিহরিত হয়ে উঠে। একাকিত্ব যেন গ্রাস

করে। প্রত্যেক মানুষই ‘সকল লোকের মাঝে বসে’^{১৯} একাকিত্বের এই ভাবনা উঠে আসে স্ত্রী-পুরুষ ও বৃদ্ধের ভাবনায়—

- পুরুষ ॥ আপনি—একা থাকেন এখানে?
বৃদ্ধ ॥ আপনি কথাটা ভুলতে পারছেন না দেখছি।
পুরুষ ॥ না, মানে, এখানে, এরকমভাবে—
বৃদ্ধ ॥ কেন থাকি, এই তো?
স্ত্রী ॥ আচ্ছা, কেন বারবার জিজ্ঞেস করছো? ওঁর হয়তো বলতে আপত্তি
 আছে। (বৃদ্ধ আবার স্ত্রীর দিকে চেয়ে হাসলেন।)
বৃদ্ধ ॥ না, বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সব কথা সহজে বলে
 বোঝানো যায় না।
স্ত্রী ॥ কেন যাবে না?
বৃদ্ধ ॥ আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি— আপনি কেন একা থাকেন?
 বলে বোঝাতে পারবেন?”^{২০}

সত্যি এরকম প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না। একটা নাড়া দেওয়ার মত প্রশ্ন। ফলে এ প্রশ্ন এখানেই থেমে যায়। কিন্তু এর পরেই নাটককার অন্যভাবে জীবনের নিগূঢ় জিজ্ঞাসায় ফিরে এসেছেন। নাটকে দেখা যায় বৃদ্ধের একটা অদ্ভুত থিওরি। এই থিওরির মূলে আছে একটা ম্যাজিক সংখ্যা। এই ম্যাজিক সংখ্যাটি হল সাত। তার যুক্তি হলো সাতের গুণিতক বয়সগুলো জীবনের এক একটা মাইলস্টোন। যেখানে একটা পুরনো চেতনার শেষ হয় এবং নতুন চেতনার আরম্ভ হয় অর্থাৎ বয়সের এক একটা সন্ধিস্থান—

- “বৃদ্ধ ॥ ... সাত বছর সম্বন্ধে আমার একটা থিওরী আছে। আমার মনে হয়, সাত-
 বছরটা মানুষের জীবনের একটা একক। একটা ইউনিট, বা মডিউল, বা
 মাপকাঠি— যা বলেন। সাত একে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ, তিন সাতে
 একুশ, চার সাতে আঠাশ, পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ—বয়সগুলো কল্পনা করুন?
 সাত, চোদ্দ, একুশ, আঠাশ, পঁয়ত্রিশ, বিয়াল্লিশ। বয়সের এক-একটা
 সন্ধিক্ষণ। একটা পুরনো চেতনার শেষ। নতুন চেতনার আরম্ভ।”^{২১}

ওই একদিনের ঝড়ের রাতে এই ম্যাজিক সংখ্যা দিয়েই বেরিয়ে আসে স্ত্রী-পুরুষ চরিত্র দুটির সাত বছরের বিবাহিত জীবনের ইতিহাস। বৃদ্ধের সামগ্রিকভাবে নিজেকে উপস্থাপনই হলো এ নাটকের নিগূঢ়তার বার্তাবাহী। স্ত্রী যেন সেই অপ্রকাশ্য নিগূঢ়তার টান অনুভব করে আর পৃথক হয়ে যায়।

সাত বছরের বিবাহিত জীবনের স্বামী তার খাত বুঝতে পারে না। কিন্তু বৃদ্ধ জানে আটাশ বছরের মেয়েরা কি করে—

“মেয়েদের বয়স আন্দাজ করতে নেই। নইলে বলতাম—যে বয়সে
মেয়েরা সমস্ত পুরোনো জীবনটা খতিয়ে হিসেব করতে বসে—
আপনার সেই বয়স।”^{১২২}

স্ত্রী এ সত্য উদ্ঘাটনে বিস্মিত হয়। বৃদ্ধ আরো অনেক কিছু জানে-সারারাত জেগে থেকে জেনেছে।
সেই জানাগুলো এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়। যেমন তাস খেলা নিয়ে স্ত্রী যা বেছে নিয়েছে
তা সব তাসের মাঝে রাখলেও পাওয়া যায় না আর। বৃদ্ধ এখানে বেছে নেওয়া শব্দটি ব্যবহার
করেছেন—

“স্ত্রী ।। তাসটা বার করবেন না, বা?

.....

বৃদ্ধ ।। ... আপনি বেছে নিয়েছিলেন। হারিয়ে গেছে। খুঁজলেই কি পাওয়া
যাবে?”^{১২৩}

বৃদ্ধের বক্তব্য থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি জীবন একটা তাসের মতো। যেখানে
অনেক কিছুই মেলানো যায় না। অনেক কিছু না পাওয়া থেকে যায়। সেই না পাওয়াকে শেষ পর্যন্ত
যদি পেতে হয়, তখন তা দোমড়ানো-মোচড়ানো হরতনের বিবির মতোই হয়:

“বৃদ্ধ : (পুরুষের দিকে তাকিয়ে) ফিরে না পেলে আপনার শান্তি হচ্ছে না?

পুরুষ : তা না হলে তো শেষ হয় না খেলাটা?

বৃদ্ধ : শেষ একটা চাই?

পুরুষ : নিশ্চয়ই?

বৃদ্ধ : সে যেমনই শেষ হোক? যদি তাসটা ফিরিয়ে দিই দুমড়ে মুচড়ে পিষে

থেংলে চটকে— তবু শেষ চাই?”^{১২৪}

এখানে হরতনের বিবি, ‘দোমড়ানো’, ‘মোচড়ানো’-এ সব কিছু জীবনের নিগূঢ় চেতনার সংকেতবাহী।
‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর সার্বিক জীবন জিজ্ঞাসা ‘সারারাত্তির’তে গাঢ়তর জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ
করেছে।

এই নাটকে একটি নাম প্রসঙ্গক্রমে এসেছে সেটা রঞ্জন। স্ত্রী তার ভালোবাসার মানুষ রঞ্জন
এর সঙ্গে বৃদ্ধের সাদৃশ্য পায়। বৃদ্ধ জানায় রঞ্জন তার উত্তর পরুষ। বৃদ্ধ রাত জেগে জেনেছে সব।
একদিকে বৃদ্ধের কবিত্ব ও ব্যক্তিত্ব, অন্যদিকে রঞ্জনের প্রেম, যৌবন—ওই উভয়ের মিলনে গড়ে

ওঠা ‘আনন্দ’ আর ‘শান্তি’ কথা বলে স্ত্রী। তবে এই আনন্দ তার স্বপ্নে বোনা। কিন্তু ট্রাজিক ব্যাপার হল আনন্দ আর শান্তি একসঙ্গে হয় না। নিরুদ্বেগের, শান্তির জীবনে স্ত্রী আনন্দ পায়নি! রঞ্জনের ব্যাপ্তিতে সে আনন্দ। রঞ্জন কে? স্ত্রীর কাছে রঞ্জন এক অখণ্ড আকাশ, এক ব্যাপ্তি, যা ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই অনুষঙ্গে কোথাও যেন রবীন্দ্রনাথের নন্দিনীর রঞ্জনের কথা মনে পড়ে যায়। সেও তো ধরা ছোঁয়ার বাইরেই ছিল। এই নাটকের স্ত্রী চরিত্রটি তার রঞ্জনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে—

“আমি যে রঞ্জনকে দেখি। সে রঞ্জন আকাশ, মাটি তাকে বাঁধতে পারে না। সে রঞ্জন বাতাস, স্পর্শ পাই, কিন্তু ধরতে পারি না। রঞ্জন এক ব্যাপ্তি। তার দু’চোখ চলে যায় মাটি পেরিয়ে, পৃথিবী পেরিয়ে, প্রতিদিনের মুহূর্তদের পেরিয়ে, দিগন্তের ওপারে। তার চোখে বিশ্ব, অনেক বড়ো বিশ্ব, এত বড়ো যে সে আমাদের প্রতিদিনের খুঁটিনাটিতে ধরা পড়ে না।”^{১২৫}

আবার বৃদ্ধ রঞ্জনকে ব্যাখ্যা করে বলেছে—

“... রঞ্জনের চোখে বিশ্ব, রঞ্জনের চোখে জ্বালা, আর রঞ্জনের মনে স্বপ্ন। রঞ্জনের চোখ, আর রঞ্জনের মন। চোখ যা দেখেছে, মন তা দেখতে চায়নি। চোখ যা মেনেছে, মন তা চিৎকার করে অস্বীকার করতে চেয়েছে। রঞ্জনের মন স্বপ্ন বুনেছে। দিনের পর দিন পরম যত্নে পরম ধৈর্যে স্বপ্ন বুনেছে। আর রঞ্জনের চোখ ছুরির ফলা হয়ে একদিনে সে স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন করে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে। একবার, দু’বার, বার বার। রঞ্জনের রক্তাক্ত মন প্রতিবার নতুন করে আবার বুনেছে স্বপ্নের জাল। জানে ছিঁড়ে যাবে। জানে থাকবে না। চেনে তার পরম শত্রু দু’টো চোখের ধারালো নির্মমতাকে। তবু এক নির্বোধ তাগিদে বারবার বুনে গেছে সেই একই স্বপ্নের জাল।”^{১২৬}

আমরা আগেই জেনেছি স্ত্রীর রঞ্জন বৃদ্ধেরই উত্তরপুরুষ। ফলে বৃদ্ধ-রঞ্জন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। স্ত্রী-রঞ্জন এবং বৃদ্ধ-রঞ্জন মিলেই এক পূর্ণরূপ।

এ নাটকে নাটককার বাদল সরকার আমাদের এক তীক্ষ্ণ প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছেন। যারা বেঁচে থাকতে চায় এবং আনন্দ চায় তারা কেউ শান্তি বিঘ্নিত হোক এটা চায় না। কিন্তু আনন্দ আর শান্তি একসঙ্গে পাওয়া সোনার পাথর বাটির মতো। একমাত্র পূর্ণ মানবের পক্ষে হয়তো এ দুটো একসঙ্গে পাওয়া সম্ভব। ক’জন আর রবীন্দ্রনাথের মতো মৃত্যুর মালায় জীবনের অমৃত গান গাইতে পারেন! নাটককার সঙ্গতভাবেই একটি বিষয় উত্থাপন করেছেন, তাহলে বেঁচে থাকতে চাওয়া মানুষ, কবিতা ভালোবাসা মানুষ, স্বপ্ন দেখা মানুষ কোনটা বেছে নেবে? আনন্দ বেছে নিতে

গেলে প্রতিদিনকার সম্পর্কের বাঁধন ছিঁড়বে যন্ত্রণায়। অভ্যাসের জীবন নিয়ে দীর্ঘ যন্ত্রণায় বেঁচে থাকতে হবে স্বপ্ন বুনে। বৃদ্ধের জীবনে যেমন ঘটেছে। নাটকের বৃদ্ধ সবচেয়ে বেশি করে জীবনের এই স্বপ্ন জাল বুনে গেছে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রাত্যহিক ক্লান্তি আর শুধু দিন যাপনের গ্লানি দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তার শান্তি দেখানো হয়েছে বৃদ্ধের আচরণের প্রেক্ষিতে। সেই প্রেক্ষাপটেই বৃদ্ধের অতীত জীবনরেখা ফুটে ওঠে। ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতার মানুষটির মতো তার সবই ছিল, তা কেন ও কীভাবে আজ শূন্য হলো তার অসম্ভব বিশ্লেষণ রয়েছে নাটকে। আর পরিশেষে স্ত্রী চরিত্রের সঙ্গে তার শেষ অবধি সম্পর্ক, তার স্বপ্নের বুননের ফসল এবং এখানে এসেই জীবনের কাব্য যেন পূর্ণ হলো। কবিতায় যাপিত জীবন মানে ছন্দে সুরে ও আনন্দে হিল্লোলিত হওয়া। বাদল সরকার এখানে অসম্ভব মুগ্ধিয়ানায় জীবনের সঙ্গে কবিতা কিংবা কবিতার সঙ্গে জীবনের সেতু নির্মাণ করেছেন। একটা পূর্ণ কবিতা বুনতে চেয়েছেন বৃদ্ধ— যা হয়তো সব কিছুর মধ্য দিয়েই পূর্ণ আনন্দের দিকে নিয়ে যাবে। কবিতার এক একটা স্তবক বোনা হয়েছে এক একটা স্তরে। এ তো নিছক কবিতার স্তবক নয়, এ হল জীবনেরই এক একটা স্তর। ব্যক্তি মানুষকে জীবনের এই সমস্ত স্তর অতিক্রম করতে হবে, বৃদ্ধেরই বলা সাত সংখ্যার স্তরের মতো। স্তবকের আকারে সাজালে স্তরগুলি দেখে নিতে পারবো আমরা। প্রথমত জানার স্তর, জানার মধ্যে যন্ত্রণার স্তর— প্রথম দৃশ্য এই দ্বিস্তরের বিন্যাস। অতীত বিন্যাস তৃতীয় স্তরে এবং তা নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় তথা শেষ দৃশ্য রয়েছে সমস্ত কিছু ভেতর দিয়েই অতিক্রম করে স্বপ্ন নির্মাণের ও তাকে বুকে গ্রহণ করে থাকার আনন্দ। নাটকে শেষ পর্যন্ত তা ঘোষিত হয়েছে—

“যা হবার হোক। সারারাত্তির
তবু তো দু’চোখ সারারাত্তির
মনের স্বপ্ন তবু তো দু’ চোখ মেনেছে।
শেষ হয় হোক। তবু তো রাত্রি—
অসম্ভবের সম্ভাবনাকে জেনেছে।”^{১২৭}

বাদল সরকারের সিরিয়াসধর্মী নাটকগুলির মধ্যে আর একটি অন্যতম নাটক হলো ‘বাকি ইতিহাস’ নাটক। নাটকটি রচনাকাল ১৯৬৫ সাল। সময়টা বড় বিপজ্জনক। সাহিত্যে তখন অস্তিবাদী চেতনার আলোড়ন আর অন্যদিকে হাংরি আন্দোলনের এক দুর্মর দুর্জয় সাহসী রূপ। স্বাধীনতার স্বপ্ন তখন ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রবল আকার ধারণ করেছে। চেতনাধর্মী মানুষ, বোধ সম্পন্ন মানুষ, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের সংকটে আবর্তিত মানুষ তখন

এক গভীর অসুখে ভুগছে। এই সময়চেতনার অন্যতম দলিল ‘বাকি ইতিহাস’। কি আছে নাটকে? স্বামী শরদিন্দু আর তার স্ত্রী বাসন্তী-সাধারণ একটি মধ্যবিত্তের সংসার। ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া হয়নি, বাসন্তী শরদিন্দুকে তা মনে করিয়ে দেয়। ছুটির দিনে বেড়াতে গেলে কেমন হয়—এই ভাবনা থেকে রাস্তাঘাটে ভিড় ট্রামবাসের ঝঙ্কি সব উঠে আসে। গড়পরতা জীবনের চিত্র দিয়ে নাটকের শুরু। শরদিন্দু সাহিত্যের অধ্যাপক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যের আধুনিকতা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। খানিকটা আত্মভোলা গোছের মানুষ শরদিন্দু। তার স্ত্রী বাসন্তী সাদাসিধে মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহবধু, কিন্তু অবসর সময়ে গল্প লেখো। আর বাসন্তীর গল্পের উপকরণ একেবারেই সাদামাটা। তার গল্প প্লট নির্ভর। তাই সে প্লট চায় স্বামী শরদিন্দুর কাছে।

বাসন্তী চায় সহজ গল্পের প্লট-নিস্তরঙ্গ মধ্যবিত্ত জীবনের ছুটির সকালে এভাবেই গল্প লেখার প্লট খোঁজার তাগিদ শুরু হয়। বাসন্তী মিষ্টি মিষ্টি গল্পের একজন লেখক। আর শরদিন্দু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখতে অভ্যস্ত। এভাবেই দাম্পত্য সুখ-চিত্রে যখন তারা পরস্পরকে মেলে ধরে তখন নিজেদেরই অজান্তে খবরের কাগজে হঠাৎ নজর পড়ে সীতানাথ চক্রবর্তীর ‘উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা’র ঘটনা। সীতানাথ ও তার স্ত্রী কণার সঙ্গে বাসন্তী-শরদিন্দুর পরিচয় হয়েছিল বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে। সেই স্বল্পপরিচিত দম্পতির একজন সীতানাথের আত্মহত্যার খবর বাসন্তী-শরদিন্দু উভয়কেই বিস্মিত, চিন্তিত ও আলোড়িত করেছে। কেন সীতানাথ আত্মহত্যা করল?

শরদিন্দু বাসন্তীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে এই ঘটনা বা সংবাদের অনুষঙ্গ তৈরি করতে চান নাটককার। শরদিন্দু এই পরিচয় সূত্র ধরে অপরিচয়ের রহস্যকে কল্পনায় ভরিয়ে বাসন্তীকে গল্প লিখতে বলে। বাসন্তী কিন্তু এই আত্মহত্যা থেকে গল্পের প্লট নির্মাণ করে একেবারে নিজস্ব অভিজ্ঞতায়। সেই গল্পে তার মনের ভেতর ভালবাসার ভাঙন উঠে আসে, উঠে আসে গৃহস্থালির অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রত্যাশা। একজন ছা-পোষা গৃহিণী আর মিষ্টি গল্পের কারবারি হিসেবে বাসন্তী তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব জীবনযাপনের ভেতর থেকেই নির্মাণ করে সে গল্প। জীবনের চলমান ঘটনাকে আশ্রয় করে রবিবারের ছুটির দিনে নিজেদের গৃহস্থালির কথোপকথন ও ঘটনাক্রম দিয়েই শুরু হয় গল্প; কিন্তু আত্মহত্যা যখন পুরুষের, তখন সমাজ স্বভাবতই ভাবেই স্ত্রীর দোষের কথা এবং গড়পরতা ক্ষেত্রে সমাজ একটা বিষয়কেই ভাবে, তা হল নারী-পুরুষ সম্পর্ক। বিশেষভাবে এরকম ঘটনায় খোঁজা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা সমাজের থাকে। এ এক অদ্ভুত সমাজ-মনস্কতা। আর সেই ভাবেই বাসন্তী গল্প নির্মাণ করে। তৈরি হতে থাকে বাসন্তীর চোখে সীতানাথ-কণার গল্প। মঞ্চে শুরু হয় সীতানাথ-কণার কাহিনি নিয়ে নাটক। সীতানাথের ভূমিকায় শরদিন্দু এবং কণার ভূমিকায় বাসন্তী। স্বামী-স্ত্রী শরদিন্দু-বাসন্তীর দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বিশিষ্টতার মধ্য দিয়ে বিশ্লেষিত

হতে থাকে ঘটনা, তৈরি হতে থাকে নাটক।

বাসন্তীর গল্পে যথারীতি সীতানাথ-কণার দাম্পত্য জীবনে উঠে আসে তৃতীয় ব্যক্তি নিখিল। স্বামীর বন্ধু নিখিলের সঙ্গে কণার একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যদিও কণা স্বামী সংসার এসবকেই প্রাধান্য দেয়। দুজনের কথোপকথনেই এমনটাই উঠে আসে—

“নিখিল : সেদিন যা বলেছি ভুলে যেতে পারো না? (কণা চুপ) আবার আগের মতো সব কিছু হয় না? (কণা চুপ) জানি না তোমাকে কী করে বিশ্বাস করাবো—
আমি সেদিন যা বলেছি, তা মনেপ্রাণে—

কণা : ও কথা থাক।”^{১২৮}

সেকথা থেকেই যায়। বলা হয় না। ব্যর্থ প্রেমিকের আত্মত্যাগের যে মহতি ভাবনা আমরা সচরাচর দেখি বাসন্তী তাকেই তার গল্পে ব্যবহার করে। নিখিলের শেষ বিনয়ী প্রত্যাশা যেন ভিক্ষা চায়—

“নিখিল: ... শুধু একটা কথা দাও। যদি জীবনে কোনোদিন—কোনোসময়ে—সত্যিকারের প্রয়োজন বোধ করো, আমাকে জানাবে (কণা নীরব)”^{১২৯}

.....

এর উত্তরে কণা বলে—

“কথা দিচ্ছি, কোনোদিন দরকার হলে জানাবো।”^{১৩০}

উপন্যাস হলে হয়তো দুজনের এই সমাজ বহির্ভূত সম্পর্ক অনুপুঙ্খ বিশ্লেষিত হত। কিন্তু এ নাটকে সেই পরিসর নেই। এছাড়া কণা-নিখিলের সম্পর্ক মূল বিষয় নয়। তবে কণাকে এক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে সমাজে নারীর অসহায়ত্ব তুলে ধরা হয়েছে। নারীর অসহায়ত্ব এবং আরো কিছু কৌণিক মাত্রা উঠে আসে কণার সংলাপে। কণার নিজের বাড়ির এত শখ কেন সীতানাথের এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলে—

“নিজের বলতে একটা জিনিস কখনো পাইনি। ঘর তো দূরের কথা, শাড়ি, জামা—কিছু না। নিজের বলতে একটা চিরুনি পর্যন্ত ছিল না। তিন বোনে সব কিছু ভাগ। সব কিছু! ক’টাই বা জিনিস ছিল? একটা ফাটা আয়না—ঐ আয়নাটা ভেঙে আমি নাকি খুব মার খেয়েছিলাম। আমার মনে নেই, আমার শুধু ফাটাধরা আয়নাটা মনে আছে। বড়দির কাছে শুনেছি। বড়দি মরে গেলো শ্বশুরবাড়িতে মার খেয়ে আর গাধাখাটুনি খেটে। মা কাঁদত। আর কাশতো। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতো। মা মরে গেলো। চিকিৎসার ভানটাও হোলো না। বড়দি মরে গেল।
মেজদি তো—”^{১৩১}

নিখিলের কাছে কণা আশ্রয় খোঁজে। সীতানাথ এই সম্পর্কের পাকে পড়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। এই হলো বাসন্তীর গল্প।

সীতানাথ-কণার জীবনের না জানা ইতিহাস যা অন্যদের কাছে ‘বাকি ইতিহাস’ তা নাটকীয় ভাবে বর্ণিত হয় বাসন্তীর গল্পে। কিন্তু গল্পের ভিতর নাটকীয়তা শরদিন্দুর পছন্দ হয়নি। অধ্যাপক প্রাবন্ধিক শরদিন্দু তার মতো করে ভেবেছে সীতানাথের আত্মহত্যার পেছনের ইতিহাস। শরদিন্দু যাপিত জীবনের দর্শিত ইতিহাস ছেড়ে মন ও মনের গহীন আঁধারে ঢুকে পড়ে। খুঁড়তে থাকে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের ইতিহাস। আদিম মানবের বন্য জৈব-যৌন চেতনাবাহী সভ্য মানবের ইতিহাস। নাটককার যেন এক গল্পকথক। চম্বলগড়ের গহনারণ্যে নিয়ে যান মনাক্ষকারের বীজ উণ্ট করতে। মধ্যভারতের এক জঙ্গল চম্বলগড়। যেখানে স্থান ও কালাতিক্রম করে ভ্লাদিমির নবোকভ-এর ‘লোলিটা’ আসতে পারে। পার্বতী আসে। দশ এগারো বছরের মেয়ে পার্বতীর স্পর্শে সীতানাথের গহণ জীবাণু জেগে ওঠে—

“... লোলিটা। পার্বতী। কণা জানে না। কণা জানে না—ঐ ডাকাত আমিও হতে পারতাম। হওয়া সম্ভব ছিল।

...

দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। একটা বিষাক্ত জীবাণু মনের মধ্যে হাজার হাজার, লাখ লাখ হয়ে উঠেছে। সমস্ত মন ছেয়ে ফেলেছে বিষ দিয়ে। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। যন্ত্রণায় ছটফট করেছি। প্রাণপণে লড়াই করেছি। পালিয়ে আসতে চেয়েছি। পারিনি। ওকে সরিয়ে দিতে চেয়েছি। মেরেছি! কিন্তু কী যে হয়ে গেলো! কেন মেরেছিলাম? কেন ও জঙ্গলে গেলো? কেন? কেন?”^{১৩২}

মারের আঘাতে সুতীর অভিমানে পার্বতী হারিয়ে গেল অরণ্যের অন্ধকারে। খুনি ডাকাতেরা যেখানে লুকিয়ে থাকে। যেমন দেহের অন্ধকারে থাকে সেই ‘অদস্’ পরিচালিত জৈব জীবাণু মুক্তি পেলেই খুন করে আমাদের উপরকার ভদ্রতার আবরণ বা পলেন্স্তারা— তেমনি খুনে ডাকাতেরা সম্ভোগ করে অরণ্যের ভয়ানক অন্ধকারে, আর খুন হয় পবিত্র পার্বতী, মাত্র দশ-এগারোর পার্বতী, কুমারী নারী পার্বতী। পার্বতীর এই পরিণতির জন্য সীতানাথ নিজস্ব অপরাধবোধে ভুগতে থাকে। বারবার ভুলতে চায় সেই চম্বলগড়ের ঘটনা। কিন্তু ভুলতে পারে না। স্কুলের সম্পাদক বিধুভূষণবাবুর নাতনি নাবালিকা গৌরী তার কাছে আসে পার্বতীর বেশে। সহকর্মী বিজয়ের কাছে সীতানাথের স্বীকারোক্তি—

“... শত অন্যায় সত্ত্বেও কণা আমাকে ত্যাগ করেনি। কণা ছিল। কিন্তু — কিন্তু বিজয়, পার্বতী আবার ফিরে এসেছে।

...

... প্রথমে আমি টের পাইনি, সাবধান হইনি। যখন টের পেলাম— তখন আর উপায় নেই। সেই বিষ আবার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে তুলেছে। বিজয়, আমি রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না! অশোককে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি, বিধুবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করছি— কিন্তু বিষ মরছে না। পার্বতী ফিরে আসছে বিজয়। পার্বতী ফিরে এসেছে!”^{১৩৩}

নিজের ভিতরে উপস্থিত ‘বিষ’ই ক্লাসে নাবোকোভের ‘লোলিটা’ পড়ার অপরাধে ফাস্টবয় অশোককে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়। বিষয়টি সীতানাথের বন্ধু বিজয় অনুধাবন করতে পেরে বলে—

“লোলিটার লেখককে হাতে পেলে ও ফাঁসি দিতো। না পেয়ে অশোকেই কঠিন শাস্তি দিচ্ছে, কারো বারণ না শুনে। আসলে লোলিটার ওপর, পার্বতীদের ওপর যারা অন্যায় করে— তাদের প্রতি সীতানাথের অস্বাভাবিক রকম তীব্র ঘৃণা। এতোটা তীব্র হতো না, যদি না পার্বতীর দুর্ঘটনার জন্যে ও নিজেকে দায়ী করতো।”^{১৩৪}

অপরাধী মনের এ এক অদ্ভুত বিপরীত শৃঙ্খলা। সীতানাথের নিজের প্রতি তীব্র ঘৃণা এসেছে। আট বছরের মেয়ে গৌরীর প্রতি আবার নতুন করে দুর্মর টান অনুভব করেছে সীতানাথ। অথচ তার সুপার ইগো তাকে সর্বদা বাধা দিয়ে চলেছে। ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে সীতানাথ। সমস্ত অপরাধবোধ নিয়ে সীতানাথ তাই আত্মহত্যা করে। কিন্তু সীতানাথের যত আলোড়ন তো মনের ভেতর। সীতানাথ তো মনোবিকলনের শিকার। মনোবিকলনই সীতানাথকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গেছে। এভাবে শরদিন্দু সীতানাথের আত্মহত্যার আরেকটি ইতিহাস গড়ে তুলেছেন।

শরদিন্দু একজন সাহিত্যের অধ্যাপক, যিনি প্রয়োজনীয় মনোবিকলন জানেন। বিশেষ করে হাংরি আন্দোলনের সময়কালীন ওই অধ্যাপক শরদিন্দু ভেতর সময়ের প্রভাব পড়েছে। শরদিন্দু কোথাও যেন এই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। আবার সম্পূর্ণ হয়ও না। বাসন্তীর ক্ষেত্রেও তাই। সাধারণ নারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে মিলে যায় কণার সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সৃষ্ট কণা সে না হয়ে তার কল্পনার এক সমাজবাস্তবের মেয়ে হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে সীতানাথের সঙ্গে শরদিন্দুর সংযুক্তি যেন একটু বেশিই। বাসন্তীর সঙ্গে শরদিন্দুর কথোপকথনের মাত্রা অন্তত সেদিকেই ইঙ্গিত করে। বাসন্তী জানে শরদিন্দুর গল্পটাও কল্পিত। কিন্তু শরদিন্দুর এতে আপত্তি। শরদিন্দুর ভাবনাটা

কেন সত্যি হবে না। এটা গল্প নয়। এভাবে তর্ক বিতর্ক করতে করতে শরদিন্দু-বাসন্তী ঢুকে যায় সীতানাথের আত্মহননের ভেতর। এত জোর দিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তার কথাগুলি যে শরদিন্দুর ভেতরকার রূপটাই চলে আসে। তবে কি শরদিন্দুর ভেতরেও এমন কোন সত্তা তাকে জ্বালায়। শেষ পর্যন্ত বাসন্তীর কাছে ধমক খেয়ে যেন আত্মস্থ হয়।

“আমি বোধহয়— আমরা বোধহয় সীতানাথের আত্মহত্যা নিয়ে একটু বেশি
মাথা ঘামিয়ে ফেলেছি।”^{১৩৫}

‘আমি বোধহয়’ শরদিন্দু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ফেলেছে। সে দিক দিয়ে শরদিন্দুর সঙ্গে সীতানাথের সংযুক্তি বেশি। শরদিন্দু তাই বলেছে, ‘... সীতানাথের ভূত ঘাড়ে চেপেছে বোধহয়।’^{১৩৬} ফলে বাসন্তী ঘুমোতে গেলে শরদিন্দু সীতানাথের মুখোমুখি হয়। এক দুঃস্বপ্নের ঘোর। কেবল শরদিন্দু নয় আমাদেরও যেন চাবুক মারে এ দুঃস্বপ্ন। শরদিন্দু তখন আর সীতানাথের স্রষ্টা নয়। সীতানাথ অদ্ভুত এক দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় আমাদের। সীতানাথ যেন সেই মানুষ—জীবনানন্দের ‘বোধ’ কবিতার অভিশপ্ত নায়ক। যার ‘মাথার ভিতরে/স্বপ্ন নয়,... কোন এক বোধ কাজ করে!’^{১৩৭} সেই বোধ তাকে বাঁচার অর্থানুসন্ধানে ব্যাপ্ত করেছিল। সেই বোধ থেকে সে সংগ্রহ করেছে ‘মানুষের ইতিহাস। জীবনের ইতিহাস’^{১৩৮} শরদিন্দুর যুক্তি ছিল এ আসলে মৃত্যুর ইতিহাস। কিন্তু ‘মৃত্যুকে বাদ দিয়ে কি জীবন হয়?’^{১৩৯} সে কারণেই সীতানাথের কাছে মৃত্যুই জীবনের একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে। সীতানাথ আত্মহত্যা করে।

এবার সীতানাথ মানুষের ইতিহাস তুলে ধরে শরদিন্দুর সামনে। না কোন ইতিহাস বইয়ের তথ্য সীতানাথ তুলে ধরেননি। সমস্ত ছবির কাটিং অনেকটা খবরের কাগজের কাটিং রাখার মত করে শরদিন্দুর সামনে তুলে ধরে। ছবির শুরু মহাভারতের ছবি দিয়ে, অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস, জীবনের ইতিহাসকে, মহাভারতের সময় থেকে শুরু করে আজকের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাসকে সীতানাথ শরদিন্দুর সামনে তুলে ধরে।

সত্যিটা হল মানুষের ইতিহাস অতীত কাল থেকেই শোষণ অত্যাচার আর হিংস্রতার নগ্ন ইতিহাস। মানুষের জীবনের ইতিহাস কেবলমাত্র মৃত্যুর কথা বলে, সেটা মহাভারতের কাল হোক আর বিশ শতকের এই সময় দাঁড়িয়েই হোক। ইতিহাস বিধৃত মানুষের অন্বেষক তথা জীবনের অন্বেষক সীতানাথ একেই বলে ‘বাকি ইতিহাস’। যে ইতিহাস—

“চাকরি নয়। কণা নয়। বাসন্তী নয়। বাকি ইতিহাস!

দাঙ্গার ইতিহাস! মহাযুদ্ধের ইতিহাস! রাশি রাশি বছরের হত্যা নির্যাতন যন্ত্রণার
ইতিহাস! কুরু-পাণ্ডব সিকন্দর নীরো চেন্সিস খা নেপোলিয়ন হিটলারের

ইতিহাস। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস পিরামিডের পাথরে, কলোসিয়ামের বালিতে, জালিয়ানওয়ালাবাগের দেওয়ালে, হিরোশিমার পোড়া মাটিতে লেখা রয়েছে। হাজার হাজার বছরের বাকি ইতিহাস!”^{১৪০}

সীতানাথ এই ইতিহাসের সামনে দাঁড় করায় শরদিন্দুকে, আর আমাদের নাটককার। শরদিন্দুর মতো আমরাও মুখোমুখি হই এক ইতিহাসের—মানুষের বাকি ইতিহাসের। অসহায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ শরদিন্দু যেন আমাদেরই প্রতিনিধি হয়ে আত্মস্বরে বলে ওঠে— ‘কিন্তু তার আমি কী করতে পারি?’^{১৪১} ইতিহাসের এই যন্ত্রণা আমাদের বহন করে চলতে হবে। মানব ইতিহাসে অমানবিকতাই যেন ধ্রুব সত্য। আমরা সবাই যেন এক চেতনাহীন জনগোষ্ঠী অথবা বোধহীন এক পরাভূত। সমস্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে অসহায় ভাবে ভাবি আমাদের কিছু করার নেই। সীতানাথ বলে—

“না। তুমি কিছু করতে পারো না। আমি কিছু করতে পারিনি। কারো কিছু করবার নেই। নির্যাতন হত্যা দাঙ্গা যুদ্ধ— সব কিছুই চলবে, সব কিছু মানুষই করবে— তবু মানুষের কিছু করবার নেই। যে মানুষ শান্তিতে দু’বেলা খেতে পেলো খুশি, সে-ই অন্য মানুষের পেটে বেয়নেট গুঁজে দেবে। যে বৈজ্ঞানিক একটা জন্তুর যন্ত্রণা চোখে দেখতে পারে না, সে-ই একসঙ্গে লক্ষ মানুষ ধ্বংসের অস্ত্র তৈরি করবে। এরা সবাই মানুষ। তোমার মতো। আমার মতো। এরা সবাই জীবনের এক একটা অর্থ খুঁজে নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে।”^{১৪২}

এই ভাবে বেঁচে থাকাকে সীতানাথ ঘৃণা করে। এইভাবে বাঁচার অর্থ হল একরকম বাঁচার ভান করা। অর্থাৎ মানুষের ইতিহাসের মতো এই আমাদের জীবনের ইতিহাসও মৃত্যুর? সীতানাথকে দিয়ে নাটককার কি সেটাই বলতে চান? প্রমাণ সীতানাথের সংলাপ—

“... তারা গলায় ফাঁসি দিয়ে বুলছে না। কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বলছে না। কোমরে পাথর বেঁধে ডুবছে না। তারা নিঃশব্দে নীরবে বাঁচা বন্ধ করে বসে আছে।”^{১৪৩}

সীতানাথ নিজের জীবন দিয়ে সেই জীবনমৃত হওয়ার ইতিহাস তুলে ধরে, যার সঙ্গে শরদিন্দু তথা আমাদের মতন সাধারণ মানুষের জীবন মিলে যায়। জীবনের হতাশা, যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তা আর অর্থহীনতার কথা সীতানাথের সংলাপে উঠে আসে: ‘রাশি রাশি বছরের অর্থহীনতার ইতিহাস। রাশি রাশি মানুষের, রাশি রাশি কীটের অর্থহীনতার ইতিহাস।’^{১৪৪} সভ্যতার এই অর্থহীন ইতিহাস, জীবনের এই অর্থহীন ইতিহাস সম্বল করে মানুষ কী করবে? সীতানাথের মতো মানুষদের যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে— ‘মানুষ হয় বাঁচবে, না হয় মরবে!’^{১৪৫} এ ক্ষেত্রে যেন যুক্তি, ক্রমে সিদ্ধান্তে

উপনীত হতে হয় যে মৃত্যুই একমাত্র সত্য। সমস্ত ভয়ানক ইতিহাসের ধারাকে আর অর্থহীন জীবনের টিকে থাকাকে বদলানোর ক্ষমতা মানুষের নেই। তাই আত্মহত্যা মানুষের ভবিতব্য। সীতানাথ যেন এই যুক্তি দেখিয়ে শরদিন্দুকে প্রশ্ন করে ‘তুমি আত্মহত্যা করোনি কেন শরদিন্দু?’^{১৪৬} এই প্রশ্নের উত্তরে শরদিন্দু স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে ‘কেন বাঁচতে চাই? বাঁচতে কে না চায়?’^{১৪৭} হাজার হাজার বছর ধরে এই অভ্যাসে মানুষ বাঁচে। স্ত্রী-পুত্র সংসার প্রভৃতি নিয়ে গড়ে ওঠে সেই অভ্যাসের জীবন। কিন্তু সীতানাথের কাছে এসব অর্থহীন। সেও জীবানন্দের ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতার নায়কের মতো যেন এক বিপন্ন নায়ক। যার কাছে ‘নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি;/ অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—’^{১৪৮}, ‘এক বিপন্ন বিস্ময়’^{১৪৯} তার রক্তের মধ্যে খেলা করে। এই বিপন্ন বিস্ময়ে প্রোথিত হয় মানব সভ্যতার বাকি ইতিহাস।

অর্থহীনতার উপলব্ধি থেকে সীতানাথের আত্মহত্যা কিন্তু জীবন থেকে পলায়ন নয় বরং প্রবল জীবনতৃষ্ণার সুতীব্র আর্তিই-এর কারণ। এরকম এক আশ্চর্য জীবন জিজ্ঞাসা সামনে উপস্থিত করে সীতানাথ তথা নাটককার শরদিন্দুর মতো আমাদেরও চেতনাকে নাড়িয়ে দেয়। শরদিন্দুর মতো ছাপোষা মানুষকে সীতানাথের ভাবনা তাড়িত করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে তো টিকে থাকতে চায়, বেঁচে থাকার ভান করে লক্ষ লক্ষ মানুষের মত। তাই সে আত্মহত্যা করে না। বাঁচার যুক্তি হিসেবে সে দাঁড় করায় ইতিহাসের অন্য পিঠ—

“না, এ হয় না! এ হতে পারে না! ইতিহাসের আর একটা দিক আছে! যুদ্ধের
ও পিঠে শান্তি আছে! নির্যাতনের ও পিঠে ভালোবাসা আছে। নিশ্চয়ই আছে!

না হলে- না হলে তো সবাইকে আত্মহত্যা করতে হয়।”^{১৫০}

শরদিন্দুর এই যুক্তি সীতানাথের কাছে আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। কারণ হিসেবে সীতানাথ বলেছে—
‘জীবনের অর্থ ফুরোলে ভাবে একদিন অর্থ ফিরবে। বেঁচে থাকা শেষ হলে ভাবে— একদিন আবার শুরু হবে। তাদের আশা আছে।’^{১৫১} সীতানাথের ইতিহাস চেতনায় ঐ আশা পোষণ করা সম্ভব নয়। তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব একাকার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শরদিন্দুর মতো মানুষের আশা আছে তার অতীত আছে, বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ আছে। এখানেই শরদিন্দু, সীতানাথ থেকে আলাদা হয়ে যায়। বন্ধু বাসুদেবের আগমনে শরদিন্দু দুঃস্বপ্ন মুক্ত হয়ে ফিরে আসে আবার বাস্তবের জীবনে। উচ্ছ্বসিত হয় চাকরির প্রমোশনে। শরদিন্দুর মনে হয়েছে—

“চাকরি নিয়ে, প্রমোশন নিয়ে— ক্ষ্যাপাই দরকার! এ ছাড়া বাঁচবার কোনো
রাস্তা নেই!”^{১৫২}

এতক্ষণ ধরে যে সীতানাথের মধ্য দিয়ে যে যুক্তি ঘনিয়ে তুলছিলেন নাটককার আর হাজার হাজার

লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের টিকে থাকা বা বেঁচে থাকার ভানকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন, সেখান থেকে শরদিন্দুর পৃথক হয়ে যাওয়া আমাদের খটকা লাগে বৈকি। কিন্তু একটু গভীর ভাবে দেখলে এটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না যে নাটকে শেষ পর্যন্ত শরদিন্দুর আশাকে তীব্রভাবে কষাঘাতই করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও। ফলে যারা মনে করেন এ নাটক শেষ পর্যন্ত আশার কথা শোনায়, সেটা আসলে একরকম আত্মপ্রবঞ্চনাই। আসলে শিল্পে শেষপর্যন্ত উত্তরণের একটা দিক খুঁজে বের করতেই হয়— তাই সীতানাথ থেকে শরদিন্দুকে পৃথক করার মধ্যে অনেকেই একটা ইতিবাচক দিক খোঁজার চেষ্টা করেন। এর একটাই কারণ আমরা প্রত্যেকেই অজান্তে সীতানাথকে এড়িয়ে শরদিন্দু হয়েই থাকতে চাই। নিজেদের প্রবঞ্চিত করে রাখতে চাই।

‘বাকি ইতিহাস’ এক অদ্ভুত ইতিহাস-বোধের নাটক। নাটকের নাম দেওয়া হয়েছে ‘বাকি ইতিহাস’। এখানে স্বভাবতই সীতানাথের খাতায় সাঁটা ছবিগুলিকে ধরেই বাকি ইতিহাস ভাবা হয়। কিন্তু শুধু ওইটুকুই ইতিহাস হলে তো নাটকের প্রথম দুটি অঙ্কের প্রয়োজন হতো না। নাটককার কি কেবলমাত্র ঐ শেষ অঙ্কের ইতিহাস চেতনায় পৌঁছানোর জন্য অন্য দুটি অঙ্ক এনেছেন? কেবলমাত্র সহযোগী হিসেবে? বস্তুত নাটক পাঠে আমাদের তা মনে হয় না। শরদিন্দু আর বাসন্তী কিংবা সীতানাথ ও কণার—তাদের প্রাত্যহিকতায় ক্লান্ত বেঁচে থাকা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত জীবনের মূলত ছা-পোষা মানুষের জীবনের ইতিহাস যেমন এই নাটকে উঠে এসেছে, তেমনি ফ্রয়েড আবিষ্কৃত জৈবজীবন ও যৌন চেতনার ইতিহাস, বিকৃত যৌন ভাবনার ইতিহাস, সভ্যতার বীভৎস মারণ ইতিহাস, আর সবচেয়ে বেঁচে থাকার অর্থান্বেষণে ‘বোধি’ মানুষের যন্ত্রণার ইতিহাস—এইসব বহুমাত্রিক ইতিহাসের বোধ নিয়েই ‘বাকি ইতিহাস’। নাট্য অভিনেতা, অধ্যাপক সৌমিত্র বসু ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকের মূল্যায়ন করতে গিয়ে যথার্থই লিখেছেন—

“বাদল সরকার দুর্মর এই বেঁচে থাকার পেছনে ঝুলিয়ে দেন অত্যাচারের ইতিহাসের কালো পর্দা, কিন্তু জীবনের বহমানতাকে তা কোনোভাবে অস্বীকার করে না। তাকেই হয়তো আমরা বলতে পারি বাকি ইতিহাস, ইতিহাসের সমস্ত মৃত্যুমুখী আবর্তনের পরেও যা বাকি থেকে যায়।”^{১৫০}

এইসমস্ত মিলেই হয় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, বাকি থেকে যায় জানতে কিংবা জানাতে। তাই ইতিহাস ‘বাকি ইতিহাস’, আমাদের পূর্ণাঙ্গ ‘বাকি ইতিহাস’।

বাদল সরকারের পরের নাটক ‘যদি আর একবার’। নাটকটি রচনাকাল ১৯৬৬ সালের ২রা এপ্রিল থেকে ৯ই এপ্রিল। এই সময় তিনি চাকরিসূত্রে নাইজেরিয়ায়। সেখানে বসেই লিখলেন এই

নাটক। এই নাটকের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে জে.এম.ব্যারির ‘ডিয়ার ব্রটাস’ নাটক। নাটকের মুখবন্ধে বাদল সরকার লিখেছেন—

“একটা ইংরেজি নাটক থেকে আরম্ভ করবার প্রেরণা পেয়েছিলাম। কাহিনি,

চরিত্র কবিতার ছন্দে লেখা সবই আমার নিজস্ব।”^{১৫৪}

নাটককার নিজে নাটকটিকে একটি হাল্কা মেজাজের নাটক বললেও নাটকের অভ্যন্তরস্থ যে বিষয় পাই অর্থাৎ যে বিশেষ দিকটি এখানে আলোকিত করেন তা কিন্তু মোটেও হালকা নয়।

জীবনের চলমানতায় মানুষের যে বাঁচার অন্বেষণ এবং শেষ পর্যন্ত তা যে কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হতে চায় না এমন কথাই এ নাটকের নাটককার তুলে ধরেছেন। নাটকের গল্প একসঙ্গে দুটো স্তরে এগোয়— লৌকিক আর অলৌকিক। বুডা জিন ও ছুট্‌কু জিনকে এনে অনেকটা অলৌকিকতার স্পর্শ দেন নাটককার। আর ওই অলৌকিক ম্যাজিকেই উদ্ঘাটিত হয় জীবনে না পাওয়া অপূর্ণ ইচ্ছেগুলো। বিষয়টি যথেষ্ট গম্ভীর। তবে নাটককার নাটকের চরিত্রগুলিকে বেশ একটা রোম্যান্টিক পরিবেশে রেখে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাওয়া দুই দম্পতি সঞ্জয়-অতসী এবং রতিকান্ত-করুণা নেপচুন হ্যাপি লজ নামে একটি হোটেলে ওঠে। ওই একই হোটেলে বনলতা নামে আর এক ভদ্রমহিলাও ওঠে। সঙ্গে রয়েছে হোটেলের ম্যানেজার সত্যসিন্ধু এবং চাকর ব্রজলাল। ভ্রমণের মেজাজে, এরকম একটি ভিন্ন পরিবেশে রেখে নাটককার একে একে চরিত্রগুলোর চাওয়া-পাওয়া, জীবনভাবনা ও যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। জীবনের এক সময়ে অতসী সঞ্জয়কে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। কিন্তু এখন এই বিবাহিত জীবনে এক অতৃপ্তির হতাশায় ভোগে। সঞ্জয়ের প্রতি অতসীর আকর্ষণ থিতিয়ে আসে তার অর্থহীনতার কারণে। বিলাসিতাহীন জীবনে ক্লান্ত অতসী ভাবে—

“... সব স্বপ্ন। সব মিথ্যে আশা।

জীবনের প্রথমেই গোলমাল হয়ে গেছে সব,

ফেরবার উপায় তো নেই!”^{১৫৫}

অন্যদিকে আবার বৈভব বিলাসে কাটানো রতিকান্ত ও করুণার জীবনে অন্যরকম অতৃপ্তি। তারা যেন এসবে হাঁপিয়ে ওঠে। করুণা অফিসার স্বামী নিয়েও সুখী নয়। অর্থ নয়, কীর্তি নয়— সুখে থাকার জন্য এসব যে যথেষ্ট নয় এটা করুণার কথায় স্পষ্ট হয়—

“রোজগার! টাকা! ভুলেও ভেবো না।

টাকাতেই সমস্ত অভাব মিটে যায়।”^{১৫৬}

করুণা চায় একটা নিরুদ্বেগ শান্তির জীবন আর বিবাহিত জীবনের দাসত্বের অপমান থেকে মুক্তি:

“... আমি শুধু চাই

যেটুকু বিদ্যে আছে সম্বল করে
কোনো এক নিরুদ্বেগ সাদাসিধে
চাকরির স্বাধীনতা। বিবাহিত জীবনের দাসত্বের অপমান থেকে
মুক্তি চাই শুধু। ...”^{১৫৭}

অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা সচ্ছল রতিকান্ত সে অন্যরকম অতৃপ্তিতে ভোগেন। করুণার মতো সাধারণ রমণীতে রতিকান্ত তৃপ্ত হয় না। সে খোঁজে বনলতার মতো সুন্দরী রমণী। রতিকান্তের শূন্যতা বনলতা অনুভব করে। বনলতা আবার একাকী জীবনের নিঃসঙ্গতায় পেতে চায় রতিকান্তের মতো পুরুষের সঙ্গ। অর্থাৎ প্রত্যেকেই একটা অতৃপ্তি নিয়ে চলে। প্রত্যেকেই যা নেই তার জন্যই ব্যাকুল। এদের জীবনের পাওয়া না পাওয়ার অতৃপ্তি তাদের ক্লান্ত করে।

এবার শুরু হয় ইচ্ছা পূরনের গল্প। এক বুড়ো জিন সমুদ্র থেকে উঠে এসে জ্যোৎস্নারাতের স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দেয় সবার জীবনের উপর। প্লাবিত জ্যোৎস্না ধারায় জীবনের ছন্দ জেগে ওঠে। এক মায়াময় কাব্যিক আবহ তৈরি করে ‘ধিংতি নাতিন ধিতাং তিন!’^{১৫৮} বলে। ভিন্ন এক আবহে, ভিন্ন এক জীবনালোকে নিয়ে যায়। সত্যসিদ্ধি শেঠ— ওরফে সত্য কেবল নামে নয় জীবনের সত্য উদ্ঘাটনে সাহায্যকারী ক্রিয়ার মতো ভূমিকা গ্রহণ করে। সেই সত্য চরিত্রের মুখে বুড়োজিনের নির্মিত আবহের নিগূঢ় সত্যটি তুলে ধরেন নাটককার—

“রাতের মানুষ নালিশ তোমার স্তব্ধ হোক
রাতের সাগরে ডুবুক তোমার ব্যর্থ শোক
ভুলের মাশুল দিও না আর
শুরু করে দেখো আর একবার
আবার জীবন সাজক তোমার নতুন চোখ
নতুন অতীত এনেছে রাতের কল্পলোক।”^{১৫৯}

বাদল সরকারের নাটকে বারবার এই অতীত চেতনা ফিরে আসে। আসলে হালকা মেজাজের নাটক হলেও এখানে বাদল সরকারের নিজস্ব স্বরটি চিনতে আমাদের অসুবিধা হয় না। বুড়ো জিন ও ছোট্ট জিনের কেরামতিতে একে একে সবার ইচ্ছা পূরণ হয়। এবারে প্রথম অঙ্কের চরিত্রগুলো যেমন পালটে যায়, তাদের অবস্থানের বিন্যাসও পালটে যায়। পারস্পরিক সম্পর্কের পর্যায়গুলিও নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়ে যায়। অর্থহীন জীবনের অনর্থ ভোগা অতসী ব্যবসায়ী ব্রজলালের বউ হয়ে যায়। বনলতা হয়ে যায় রতিকান্তের স্ত্রী। বিবাহের দাসত্বমুক্তি প্রার্থী করুণা এসে যায় বনলতার স্থানে, কিন্তু যে অপ্ৰাপ্তির অন্বেষণ এতদিন তারা করছিল এবার তা পেয়েও শুরু হয় আবার হতাশা

আবার বিষাদ। মূর্খ ব্রজলালের বউ হয়ে শিক্ষিত অতসী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে অনুভব করে বিলাসিতার ভেতর কোন অনুভূতি নেই। এখন সে অনুভব করে পূর্বের জীবনে বৈভব না থাকলেও সেখানে অনুভূতি ছিল, প্রাণ ছিল। অতসী নিজের ভুল বুঝতে পারে—

“অতসী: (দু’হাতে মাথা চেপে বসে) ওঃ কি ভুল করেছি!

সঞ্জয় : একখানি ভুল

জীবন নির্মূল করে রেখে যায়,

ফেরাবার উপায় রাখে না।”^{৬০}

এদিকে বনলতা রতিকান্তের স্ত্রী হয়ে করুণার মতোই অতৃপ্তিতে ভোগে। রতিকান্তও আবার বনলতার মধ্যে করুণার সেই সাদামাটা, অল্পশিক্ষিত অথচ উদার ও গভীর মমতাময়ী রূপকে না পেয়ে আবার সেই করুণাকেই ফিরে পেতে চায়। প্রত্যাশাপূরণ এবং প্রত্যাশাপূরণে আবার হতাশা ও অতৃপ্তি নাটকের বারবার ফিরে আসে। আসলে সবটাই যে আপেক্ষিক এই সত্যটি নাটককার এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বুড্‌টা জিন আবার সকলকে তাদের পূর্বের নিজ নিজ অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়। তবে প্রত্যেকে তাদের নিজেদের এই স্মৃতিগুলিকে নিজেদের কাছে সঞ্চিত রাখার অনুমতি পায়— নইলে যে তারা নিজেদের বিশ্লেষণ করতে পারবে না। নাটককার গভীর বিশ্লেষণে না গিয়ে এভাবে সহজ সমাধানে নাটকটি সমাপ্ত করেন। যেন দেখাতে চান যে এভাবে একরাতের ম্যাজিকে তারা বুঝে যায় অন্য আকাঙ্ক্ষায়ও সুখ নেই বা তা যেন ভুল করে চাওয়া হয়েছে। এখানেই শেষ পর্যন্ত নাটকের মেজাজটি হালকা হয়ে যায়। তবে ভেতরের বুনন সেই জীবন-যন্ত্রণারই বুনন। কোথাও যেন মিলে যায় ইন্ড্রজিৎ চরিত্রের সেই উপলব্ধি ‘পেছনেও যা, সামনেও তাই।’^{৬১}

কবিতায় সংলাপ রচনা এই নাটকের একটি লক্ষণীয় দিক। বাদল সরকার এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করেছেন ‘এবং ইন্ড্রজিৎ’ নাটকে। এই নাটকে আবার সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এইভাবে কবিতায় সংলাপ রচনা নিয়ে বাদল সরকার মজা করে একটি চিঠিতে লিখেছেন—

“... সেনগুপ্ত প্রচুর গালাগালি করছে। বলছে-কবিতায় মরতে লিখতে গেলেন

কেন? কেউ নেবে না। ... কাবুল তুবুলেরও নাটকে কবিতা ঢোকানোতে খুব

আপত্তি। যেমন আপত্তি Serious নাটকে।

কিন্তু যাই বলো— কাব্যে লিখতে মজা আছে।”^{৬২}

নাটককারের শুভানুধ্যায়ীদের মনে যতই সংশয় থাকুক না কেন এক্ষেত্রে বাদল সরকার ভীষণ ভাবে সফল। এই নাটকে কবিতার বুনন এবং গদ্যের মিশ্রণে একটা অন্যরকম মাত্রা পেয়েছে। নাটকে মোট দুটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে দুটি দৃশ্য কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কে কোনো দৃশ্য বিভাজন নেই। নাটকের পর্ব

পরম্পরা ধরলে এই দৃশ্য বিভাজনের প্রয়োজন ছিল না। প্রথম অঙ্কে প্রত্যেকের অপরাধ জ্ঞানিত হতাশা আর দ্বিতীয় অঙ্কে বুড়ো জিনের কেরামতি এবং শেষে পরিণতি— এটি যথাযথ হওয়া উচিত ছিল। প্রথম অঙ্কের সঙ্গে দ্বিতীয় অঙ্কের সংযোগ করেছেন ‘বিরতি’ ব্যবহার করে। কারণ ঐ ‘বিরতি’র পর সব অসম্ভবের সম্ভব ঘটিয়েছেন নাট্যকার। ‘হালকা মেজাজে’ গঠিত এ নাটক অন্তর্নিহিত ভাবনায় তখন পাঠক কিংবা দর্শকের সামনে বহুখামাত্রায় উদ্ভাসিত হয়।

বাদল সরকারের এই পর্বের নাটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের অভিঘাত বারবার ঘুরে ফিরে আসে। এই ধারার একটি নাটক ‘ত্রিশ শতাব্দী’। নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৬ সালে। প্রথম প্রযোজনা করে বহুরূপী, ১৯৬৯ সাল, নিউ এম্পায়ার হল-এ। এই নাটকে কোন অঙ্ক, দৃশ্য বিভাজন নেই। বিরামহীন এই নাটকের বিষয় হিরোশিমা-নাগাসাকির পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের বীভৎস ইতিহাস। এই নাটক রচনা প্রসঙ্গে বাদল সরকার লিখেছেন—

“‘ত্রিশ শতাব্দী’ নাটকটা লেখার একটা ইতিহাস আছে। এটা আমি লিখি ১৯৬৬ সালে নাইজেরিয়ায় বসে। একদিন হঠাৎ একটা বই পড়ি। ফরাসি সাংবাদিকদের লেখার ইংরেজি অনুবাদ। বইটার নাম ‘Formula for death, E=MC²’। ভদ্রলোক প্রচুর গবেষণা করে জাপান আমেরিকা ঘুরে তথ্য প্রমাণ জোগাড় করেছিলেন। যাঁরা বোমা ফেলেছেন, আমেরিকার সেই কর্নেল ফেরেবি, ইথার্লি, পল টিবেটস, চেশায়ার প্রমুখ, তাঁদের সবার ইন্টাভিউ নিয়েছিলেন। আবার বোমার যাঁরা ভুক্তভোগী, জাপানের সেই সব মানুষের সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন। বইটা আমায় ভীষণ নাড়া দেয়। মনে হয়েছিল বইটা বাংলায় অনুবাদ করা উচিত। অনুবাদ আমার আসে না। আমি যেটা জানি, সেটা ‘ত্রিশ শতাব্দী’-তে নাটকের আকারে বেরিয়ে এসেছে।... নাটকটার মূল কথা হল, আমাদেরও ভাববার দরকার আছে, কারণ পরমাণু মারণাস্ত্র মানুষই বানিয়েছে, বন্ধ করলে মানুষই করবে।”^{১৬৩}

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য শুধু এই নাটকই নয়, বাদল সরকারের লেখা এর আগে-পরের বেশ কিছু নাটকে বারবার পরমাণু বোমা তথা পরমাণু যুদ্ধের প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হতে দেখি। তাঁর ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ এবং ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকে পরমাণু বোমার প্রসঙ্গ এসেছে। ইন্দ্রজিৎকে আমরা বলতে শুনি ‘কল্পনা কর, ভুল করে কয়েকটা অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা পড়ে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে গেলো। ভাবতে পারিস?’^{১৬৪} ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে সীতানাথ শরদিন্দুকে দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের ইতিহাসের ছবি দেখিয়ে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দিকটি তুলে ধরে বলে—

“ঐ পড়ে থাকা বাচ্চা ছেলেটার ডান হাতটা নেই, ... হাতটা ছিঁড়ে বোমা খাওয়া
জঞ্জালে হারিয়ে গেছে। —ওটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছবি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের
অনেকগুলো ছবি পাবে— নানা দেশের। —হ্যাঁ, হিরোশিমা। ঠিক ধরেছো।
হিরোশিমা।”^{১৬৫}

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা বাদল সরকারকে কতখানি ভাবিত
করেছিল। ‘বাকি ইতিহাস’-এর সীতানাথের মত তিনিও যেন ইতিহাসাক্রান্ত। বাকি ইতিহাসের
সমাপ্তি নেই, সেই অতীত চর্চা করেই বর্তমান চলে। সেই অতীত চেতনার এই বৈচিত্র্যময় রূপ
‘ত্রিংশ শতাব্দী’।

এই নাটকের উপস্থাপক শরৎ চৌধুরী। কে এই শরৎ চৌধুরী? নাটকের শরৎ চৌধুরী বাংলা
সাহিত্যের এক ভূতপূর্ব অধ্যাপক যিনি বর্তমানে উন্মাদ। আমাদের মনে হয় ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকের
সীতানাথ যে বীজ শরদিন্দুর মধ্যে প্রোথিত করে দিয়েছিল শরৎ চৌধুরী যেন তারই প্রলম্বিতরূপ;
যে কিনা ‘ত্রিংশ শতাব্দী’ নাটকে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস চর্চা করে এবং অনিবার্যভাবে পাগল হয়ে
যায়। ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকের সমাপ্তিতে শরদিন্দু শেষ পর্যন্ত চাকরি প্রমোশন নিয়েই থাকতে চায়।
কারণ তার মনে হয়েছে এটাই একমাত্র বাঁচার পথ। কিন্তু দুঃস্বপ্নের আক্রমণ যে সংক্রমণ ছড়িয়ে
দিয়ে গেছে তা থেকে শরদিন্দু মুক্ত হতে পারেনি। শরদিন্দুর শরীরে তার আভাস ফুটে উঠেই শেষ
‘বাকি ইতিহাস’ নাটক—

“[শরদিন্দু দু’হাতের শক্ত মুঠোয় কপাল রেখে বসে। তার শরীর যন্ত্রণায় কঠিন।

বাকি ইতিহাসের চেতনা বহন করে বাকি জীবনটা বেঁচে থাকবার যন্ত্রণা।]

শরদিন্দু : ... বাকি ইতিহাস! বাকি ইতিহাস!”^{১৬৬}

স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায় এই যন্ত্রণাই কি শরদিন্দুকে ‘ত্রিংশ শতাব্দী’তে শরৎ করে দেয়,
করে দেয় উন্মাদ? ১৯৬৫-র লেখা নাটক শরদিন্দু একজন বাংলার মননশীল অধ্যাপক, বিশ্লেষক।
১৯৬৬ সালে লেখা ‘ত্রিংশ শতাব্দী’তে সেই শরদিন্দুই কী হয়ে যায় ‘শরৎ চৌধুরী’। বাংলা সাহিত্যের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক। বর্তমানে উন্মাদ।”^{১৬৭} নাটকের শুরুতে শরৎ চৌধুরীকে দিয়ে এই নাটক রচনার
উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাটককার বলেছেন —

“আজ থেকে ... বছর আগে, ১৯৪৫ সালের ৬ই অগাস্ট, মানুষের তৈরি
পারমাণবিক বোমায় মানুষের শহর হিরোশিমা ধ্বংস হয়েছিলো। সেই ঘটনার
এতো বছর পরে আজ আমরা ‘ত্রিংশ শতাব্দী’ নাটক উপস্থিত করছি। এ নাটকের

মূল প্রশ্ন— আমেরিকার বোমায় জাপানের শহর হিরোশিমা ধ্বংস হয়েছে, এ
ব্যাপারে আমাদের মতো সাধারণ ভারতবাসীর কোনো দায়িত্ব আছে কি?... এ
নাটক সুন্দর নয়। সুন্দরভাবে এ নাটক কী করে করা যায়, আমরা জানি না। ...
আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হোলো— নাটকের মূল প্রশ্নটাকে আপনাদের সামনে
তুলে ধরা।”^{১৬৮}

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মধ্যলগ্নে মানবতার উপর বর্ষিত হল যে দুটি ভয়ঙ্কর পরমানবিক
বোমা তা ছাপিয়ে গেল মানুষের ইতিহাসের যাবতীয় নৃশংসতাকে। এই নৃশংসতার দায় কার?
সঙ্গতভাবেই এই প্রশ্নটিই ভূতপূর্ব অধ্যাপক শরৎ চৌধুরীর আমাদের সামনে রেখেছেন। এই শতাব্দীর
সঙ্গে জড়িত সমস্ত ঘটনায় সমস্ত মানুষের দায় থাকা উচিত। এটা ঠিক যে ভারতবর্ষ জাপানে বোমা
ফেলেনি, যুদ্ধও বাধায়নি। কিন্তু তবুও সে দায় আমরা এড়াতে পারি না। কেন এড়াতে পারি না
শরৎ চৌধুরী তথা তথ্য প্রমাণসহ যেন বিশ্লেষণে মেতে ওঠে। ডকুমেন্টারি নাটকের মতো উঠে
আসে নানা তথ্য। ৬ আগস্ট ১৯৪৫-এর আটটা পনেরো মিনিট যে মুহূর্ত সৃষ্টি করেছিল আমাদের
সেই প্রেক্ষাপটেই নিয়ে যেতে চায় শরৎ চৌধুরী। বোমা ফেলার আবহ তৈরি করে এবং তার মধ্যে
থেকে ঐ কর্মের নায়ক প্রতিনায়কদের ধরে ধরে বিচার করে সে। আসলে মানুষের সামনে অভ্যন্তরীণ
ইতিহাসটা তুলে ধরা প্রয়োজন, সে কারণেই এই বিশ্লেষণ। প্রকৃতপক্ষে পরমাণু বোমা মানবসভ্যতার
উপর যে কী সর্বনাশ ডেকে এনেছিল তার বীভৎস ও ভয়ঙ্কর স্বরূপ বোঝানো যেন লেখকের দায়।
তাই অজস্র তথ্য এখানে নাটকের আঁধারে এবং উপযুক্ত আঙ্গিক বলা হয়েছে। কেন এই দায় তিনি
নিয়েছেন; আমাদের ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে এই সমস্ত তথ্য জানার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? আসলে
ভারতবর্ষও আজ পরমাণু শক্তিদ্বারা রাষ্ট্র। যার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ২৮ মে, ১৯৭৪ সাল, রাজস্থানের
মরুভূমিতে অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় বার ১৯৯৮-এর ১১ ও ১৩ মে
রাজস্থানের পোখরানে একইভাবে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা করে পরমাণু শক্তিদ্বারা রাষ্ট্র হিসেবে
ভারত গোটা বিশ্বের সামনে নিজেকে তুলে ধরে, কিন্তু এর কুফল ভোগ করে সেখানকার সাধারণ
মানুষ। কিছুদিনের মধ্যে অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, অথচ তারা তো কোন অন্যায় করেনি। বাদল
সরকার উপলব্ধি করেছেন ১৯৪৫-এর বীভৎস ঘটনার পরও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের
দেশেও কোনো শিক্ষা নেয়নি। সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায় না দুটি পেট ভরে খেতে চায়, চিকিৎসার
জন্য হাসপাতাল চায়। বাদল সরকার লিখেছেন—

“পোখরানের আশেপাশের লোকেরা ১৯৭৪ সাল থেকে বলছে— ৩২

কিলোমিটার হাঁটতে হয় হাসপাতালে পৌঁছবার জন্য, আমাদের যে অসুখগুলো

হচ্ছে তার চিকিৎসার জন্য একটা হাসপাতাল বানিয়ে দাও। ’৭৪ থেকে ’৯৮
হয়ে গেল, হাসপাতাল বানানো হয়নি।”^{১৬৯}

তাই এত কথা, এত অনুসন্ধান, এত তথ্য। এতে হয়তো নাটকের শিল্পমূল্য খানিকটা ব্যাহত হয়েছে, হয়তো ‘এ নাটক সুন্দর’^{১৭০} হয়ে উঠেনি কিন্তু এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। এদেশে যার কোন আঁচ লাগেনি অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে এই বীভৎসতার চিরচিহ্ন যেভাবে মানব-ইতিহাসকে অপমানিত করেছে তার স্বরূপ বোঝানো প্রয়োজন। শরৎ চৌধুরী সুন্দরভাবে তুলে এনেছেন সেই ঐতিহাসিক মানুষদের। সামগ্রিক স্বরূপ তুলে ধরতে সেই ঘটনার নায়ক-প্রতিনায়কদের— যারা আকাশে ছিল, যারা মাটিতে ছিল এবং সর্বোপরি পশ্চাৎপটে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রনেতা ছিল তাদের কিছু প্রতিনিধি তুলে এনে তাদের মুখ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তিন দিক থেকে বিভিন্ন কৌণিক মাত্রায় দেখা হয়েছে নাটকে। যারা সেদিন আকাশ থেকে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন হিরোশিমা ও নাগাসাকির বুকে, তাদের মধ্য থেকে তুলে আনা হয় পাইলট ফেরেবি ও ক্লডকে। একটি ক্রিয়া অন্যটি প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই দু’জনকে বাছা হয়েছে। ফেরেবির কাজ ছিল সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা। ফলে তার কাছ থেকে জানা যায় কেন জনবহুল বেসামরিক শহর নাগাসাকি-হিরোশিমাকেই পরমাণু বিস্ফোরণের জন্য বাছা হয়েছিল। শুধু তাই নয় কোন জায়গায় কোন মুহূর্তে বোতাম টিপলে ধ্বংসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হবে সেই পরিকল্পনাও উঠে আসে তার কথায়। পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে সেদিন নাগাসাকি-হিরোশিমার দিকে উড়ে যায় এগারোজনের একটি দল। তার বর্ণনায় ফেরেবি স্মৃতি রোমন্থন করে বলে—

“আমরা উড়ছিলাম প্রায় ত্রিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে। অন্য দু’টো বি-টোয়েন্টিনাইন প্রায় বারো মাইল পেছনে পাশাপাশি ছিল। সকাল হবার একটু পরে ডাঙা দেখা গেল। প্লেন আরো উঁচুতে তোলা হলো। ন্যাভিগেটরের দেওয়া কোঅর্ডিনেটসের সঙ্গে মিলিয়ে হিরোশিমার ত্রিভুজাকৃতি অন্তরীপ দেখতে পাওয়া গেল। র‍্যাডারের এর নির্দেশ না থাকলেও আমার চিনতে অসুবিধে হতো না।

....

দু’মিনিট সময় ছিল হাতে। ইনোলা গে ঘুরছিলো যখন, তখন বোমাটা ফাটলো, মাটি ছোঁবার কিছু আগে। ইনোলা গে যখন সম্পূর্ণ ঘুরেছে তখন হিরোশিমা অদৃশ্য হয়ে গেছে একটা ঘন মেঘের আড়ালে।”^{১৭১}

অসম্ভব তেজস্ক্রিয় শক্তিসম্পন্ন অ্যাটম বোমায় যে কল্পনাভীত ধ্বংসলীলা চলেছিল তাতে ফেরেবির যাই হোক না কেন, পাইলট ক্লড উন্মাদ হয়ে যায়। এখানে ফেরেবির প্রতিক্রিয়া বাহ্যিকভাবেই

ব্যক্ত হয়েছে, কারণ ফেরেবি পাইলট ক্লডের মতো উন্মাদ হননি। ফেরেবির খুব সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, মাত্র দুটি শব্দে ‘রেজাল্টস্ গুড’^{১২}। কিন্তু পাইলট ক্লড অপরাধবোধে ভুগতে থাকেন। ক্লডের স্ত্রী ইথারলির বয়ানে উঠে আসে সেই অপরাধবোধের কথা—

“ঐ সময়ে ক্লডের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে যেতো। সমস্ত মুখ যন্ত্রণা আর ভয়ে এমন বিকৃত হয়ে উঠতো— ওকে চিনতে পারতাম না। সারা শরীর কাঁপতো। সকালে দেখতাম— জ্বর এসেছে। কথা বললে শুনতে পেতো না। মাঝে মাঝে দু’চোখ বড়ো করে মেলে আমাকে বলতো— জিনিসপত্র গুছিয়ে দাও, হিরোশিমা যেতে হবে। পেন্টাগন হুকুম দিয়েছে, হিরোশিমা গিয়ে আমাকে দেখতে হবে— ওখানকার ছোট ছেলেমেয়েদের কী হয়েছে?”^{১৩}

মানচিত্র থেকে হিরোশিমা নাগাসাকি মুছে ফেলতে বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু ক্লডের মন থেকে তা মুছে যায়নি, মুছে যায়নি শরৎ চৌধুরী তথা লেখকেরও। আসলে সাফল্যের বিপরীত এই প্রতিক্রিয়া নাটকের মূল বক্তব্যকে ধরিয়ে দেয়। ক্লডের ঐ মানসিক যন্ত্রণার কারণ বুঝতে হলে আমাদের যেতে হবে সেই অভিশপ্ত পোড়ো জমিতে। তৎক্ষণাৎ দু’লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। আণবিক বোমা অমানবিক কাজে ব্যবহৃত হলো আর পারমাণবিক রোগের শিকার হলো পৃথিবীর মানুষ। যেখানে এখনো হাজার হাজার বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নেয়। এই ঘটনার জন্য শরৎ কাউকেই রেয়াত করে না। আইনস্টাইনকেও জেরা করা হয়। তার ১৯৩৯-এর ২রা আগস্ট লেখা চিঠি পেয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চব্বিশশো কোটি টাকার মানহাটন প্রজেক্ট তৈরি করেন। তাতে সারাবিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী যোগ দেন। তৈরি হয় আণবিক বোমা। হিরোশিমার ছবি দেখেন আইনস্টাইন। স্বীকার করেন হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল।

ইতিহাস, ভয়ানক এক ইতিহাস। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাসের দায় নেবে কে? বিংশ শতাব্দীর মানুষ শরৎ এর দায়ভার বহন করে। শরৎ যেন বিংশ শতাব্দীর বিবেক—

“... আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমি আসামী। আমাকে তোমরা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছো। বিংশ শতাব্দীকে তোমরা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছো।

.....

বিংশ শতাব্দী অভিযুক্ত। আমি বিংশ শতাব্দী।”^{১৪}

নাটকের শেষে দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর মানবসভ্যতার এই ভয়ঙ্কর ইতিহাসের কৈফিয়ৎ দিতে চায় শরৎ আগামী ত্রিংশ শতাব্দীর কাছে। যে অতীত নিয়ে ‘ত্রিংশ শতাব্দী’ আসবে তা যে ভয়ানক।

সেই অতীত তো তাকে চেহারা দেবে, সভ্যতার চেহারা। তাই শরৎ বলে—

“শোনো। ত্রিংশ শতাব্দীর অমৃতের পুত্ররা শোনো! তোমাদের অমৃত—আমি!
তোমাদের অমৃত মস্তিষ্ক হয়েছে আমার শতাব্দীর বিষে! তোমাদের জন্ম আমার
আমার শতাব্দীর যন্ত্রণাবিকৃত গর্ভবেদনায়। কাকে বিচার করছে? নিজের মাকে?
গর্ভধারিণীকে? বলো! জবাব দাও!

....

... আমি, শরৎ চৌধুরী, শতাব্দীর দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে বলছি— আমি জবাব
দেবো!”^{১৭৫}

‘ত্রিংশ শতাব্দী’কে আমরা ডকুমেন্টারি নাটক বলতে পারি, এর প্রকৃতি ডকুমেন্টারি নাটকের
মতন। একেবারে প্রামাণিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এই নাটক রচিত। আগাগোড়া অসম্ভব সিরিয়াস
এ নাটকের আঙ্গিকটিও লক্ষণীয়। বিষয় যেমন অত্যন্ত সিরিয়াস, তেমনি তার গঠনশৈলী। কোথাও
দর্শকের জন্য বিরাম নেই, রিলিফ নেই। কোনো অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন নেই। নির্মাণশৈলীতে অদ্ভুত
একটা প্রবাহ আছে। নাটকের বিষয় সময়ের সঙ্গে এতো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে ইতিহাস
সচেতন নাটককার যে দিন নাটকটি অভিনয় হবে তার তারিখ এবং সমসময়ের মারণাস্ত্রের ঘটনাকে
অঙ্গীভূত করার কৌশল রেখে দেন। নাটকের মুখ্য চরিত্র শরৎ একটা নাটক উপস্থাপন করছে এবং
তাতে অতীতের ঐ সমস্ত মানুষকে এনে জেরা করা হবে। সেই উপস্থাপন ভঙ্গিটির মধ্যে প্রথমেই
সুযোগ থাকে নাটকের অভিনয়ের তারিখ বলার এবং সেই সময় থেকে কত বছর পূর্বের ঘটনা
বলছে তাও বলে দেওয়ার। নাটক শুরুর মূহুর্তে শরৎ চৌধুরী ঘোষণা করে—

“শরৎ : আজ ...,* আজ থেকে ... বছর আগে মানবসভ্যতার ইতিহাসে
এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছিলো।”^{১৭৬}

ফুটনোটে ‘*’ চিহ্ন দিয়ে লেখা রয়েছে ‘অভিনয়ের দিনের তারিখ’।^{১৭৭} আর তখন থেকে বছর
হিসেব করে ওই শূন্য স্থান পূরণ করা হবে। বলাবাহুল্য ইতিহাসকে বর্তমান সময়ের সঙ্গে সংযোগের
এই আশ্চর্য কৌশলটি অসাধারণ আঙ্গিক সচেতনতার পরিচায়ক। শুধু তাই নয় ওই ইতিহাস কেন
আজও প্রাসঙ্গিক শরৎ চৌধুরীর বক্তব্যের মধ্যে উঠে আসে—

“১৯৬৬ সালে লেখা হয়েছিল এই নাটক। তখন থেকে প্রশ্নটা অনেক তীব্র
হয়ে উঠেছে ১৯৭৪ সালের ১৮ই মে, যেদিন রাজস্থানের মরুগর্ভে ভারতবর্ষের
অ্যাটমবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হলো। ঐ বছরই ৬ই আগস্ট এই নাটকের
প্রথম অভিনয় করেছিলাম। মনে হয় আজও এই নাটকের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব

কমেনি বরং বেড়েছে।”^{১৭৮}

আজকের দিনে যখন এই নাটক অভিনীত হবে সেখানে ১৯৯৮-এর পোখরানের প্রসঙ্গ আসবে। এভাবেই এদেশীয় ইতিহাসের সঙ্গে অনিবার্যভাবে গ্রথিত হয়ে যায় ১৯৪৫-এর সেই বীভৎস ইতিহাস। নাটকের শুরু এভাবেই হয় বলে এর ভেতরেই সময়ের প্রবাহকে এমনভাবে ধরা হয় যে তা যেন ত্রিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। নাটককার বাদল সরকার তাঁর অসাধারণ মুল্লিয়ানায় স্থান-কাল-পাত্রসহ সমস্ত অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক রৈখিক করে দিয়ে যখন যে মুহূর্তে আমরা আছি তার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। নাটকের অন্যতম চরিত্র পদার্থবিদ, শরতের বন্ধু সাধন শরৎকে বলে, “তোর কাগজপত্র তো সব এলোমেলো দেখছি। কোথা থেকে শুরু করবি?”^{১৭৯} উত্তরে শরৎ বলে—

“কী আসে যায়? এক জায়গা থেকে শুরু করলেই হোলো।

.....

ছয়ই আগস্ট ১৯৪৫ সকাল আটটা বেজে পনের মিনিট-একটা মুহূর্ত! সেই মুহূর্তে অনেক কিছু আরম্ভ, অনেক কিছু শেষ। যা আরম্ভ তা এখনো শেষ হয় নি। যা শেষ তা আরম্ভ হয়েছে মানব সভ্যতার জন্মদিনে। কী আসে যায়—
কোথা থেকে শুরু করলাম তাতে?”^{১৮০}

‘ত্রিংশ শতাব্দী’ নাটকে নাটককার বাদল সরকার ইতিহাসের সেই ঘটনাকে তুলে আনতে চেয়েছেন বর্তমানে, কিন্তু ফ্লাশব্যাকের মাধ্যমে নয়। একেবারে প্ল্যানচেষ্টার মতো একটা অদ্ভুত বিষয়কে গ্রহণ করা হয়, অতীতকে জাজ্বল্যমান করার জন্যে। এই কৌশলেই সেই ভয়াবহ ঘটনার সমস্ত অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নাটকে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। আসলে নাটককার যে বিষয়কে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন তাতে এটাই একমাত্র আদর্শ আঙ্গিক। অতীত ও ভবিষ্যৎকে বর্তমানে তুলে আনার ক্ষেত্রে এই আঙ্গিক নির্মাণ অত্যন্ত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। নাটকের বিন্যাসক্রমটিও সেই অনুযায়ী যথোপযুক্ত। আকাশে যারা ছিলেন, মাটিতে যারা ছিলেন আর যারা এর প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছেন প্রত্যেকের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ঘটনাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ‘ত্রিংশ শতাব্দী’ একটি অত্যন্ত উদ্দেশ্য সফল উপস্থাপনা।

বাদল সরকারের নাইজেরিয়া প্রবাস জীবনের শেষ নাটক ‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৭ সালের ২০শে জানুয়ারি থেকে ২৫ শে জানুয়ারি। এই সময় বাদল সরকারের মনে জন্ম আর মৃত্যু নিয়ে নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। যার বর্ণনা পাওয়া যায় সেই সময়ের লেখা ডায়েরি ও

চিঠিপত্রে। ১৫.১.১৯৬৭ লেখা ডায়েরিতে লিখছেন—

“ধরা যাক-একটা মেয়ে। তার জীবনের একটা মুহূর্ত। কিস্বা তার মৃত্যুর পরের মুহূর্ত। তার ছোটবেলা, তার বড়ো হওয়া, তার নানারকম সম্পর্ক, তার জীবনের নানান দিক-একটা ক্যালিডোস্কোপের টুকরো ছবিতে ফুটে উঠছে, আবার বিশ্লেষিতও হচ্ছে। আর মানুষ বেরিয়ে আসছে আর জীবন বেরিয়ে আসছে, কারণ মৃত্যুর মতো জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে আর কিছুই পারে না।

(শ্মশানবন্ধু? চারজন?)”^{১৮১}

বুঝতেই পারছি এ নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে এক নারী চরিত্র যাকে নাটককার ‘মেয়েটা’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার নির্দিষ্ট নাম নেই। কেন তার নাম নেই সে সম্পর্কে স্বয়ং নাটককারের বক্তব্য এইরকম—

“কী লিখছি আমি জানি না। কিন্তু একটা ঘোরের মধ্যে থাকি খানিকক্ষণ লেখার পর থেকেই। মালতী, মিলি, লছ্মি কেমন যেন জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে। সামনে দেখতে পাই যেন। এদের কাউকেই দেখেছি কি? আলাদা আলাদা করে দেখি নি। কিন্তু যাদের দেখেছি তাদের সকলের মধ্যেই এরা একটু একটু করে ছিল। মালতী, মিলি, লছ্মি— আর ঐ মেয়েটা যার কোনো নাম নেই, যে একাই মালতী মিলি লছ্মি সে নিজে— সব।”^{১৮২}

অর্থাৎ সঙ্গত কারণেই ‘মেয়েটা’ বলা হচ্ছে। আসলে এই ‘টা’ যোগ করে সমাজে নারীর যে অবমূল্যায়নই প্রকাশিত করা হয়েছে। বস্তুত বাদল সরকারের অন্য কোন নাটকে এই অর্থবহ ধ্বনি সাযুজ্যময় চরিত্র নেই। যদিও প্রতীকী চরিত্র তিনি এনেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নাম ছাড়াই। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের যে সম্বোধন ‘মেয়েটা’ কথাটির মধ্যে থাকে তাই যেন তীব্রভাবে কোথাও আয়রনি সৃষ্টি করে।

নাটকের ঘটনা ঘটে চলেছে শ্মশানে। সেখানে পুড়ছে একটা মেয়ে। এই মেয়েটাকে যারা শ্মশানে দাহ করতে এনেছে, তারা চিতা জ্বালিয়ে, মেয়েটিকে চিতায় ছড়িয়ে বসে আছে নীরব্র অন্ধকারের নীরবতায়। হিমাদ্রি, শশী, সাতু আর কার্তিক-এই চার শ্মশানবন্ধু। এরাও ওই মেয়েটির মতোই সাধারণ। একেবারেই সাদামাটা নিস্তরঙ্গ জীবন তাদের। অথচ এদের প্রত্যেকের ভেতরেই রয়েছে একটা জীবন-যে জীবন অবচেতন থেকে উঠে আসে সুযোগমতো। শ্মশানের পটভূমিতে, মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে সেই জীবনকে ধরতে চেয়েছেন নাটককার।

পশ্চিমী পুরাণকল্পে মৃত্যুর দূত হয়ে যে ঘোড়া আসে— এ নাটকে তার ক্ষীণ আভাস থাকলেও

সেই প্রতীকী চিত্র কলা এখানে নাটককার ব্যবহার করেননি। এখানে ‘পাগলা ঘোড়া’-র রূপকল্পে মানুষের ভালোবাসার সুতীর গতিময়তাকেই পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। প্রত্যেকের ভিতরে রয়েছে সেই পাগলা ঘোড়া। যা কিনা মেয়েটাকে টেনে নিয়ে গেছে মৃত্যুর দিকে। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে যে চিতা জ্বলছে, হারানোর, বেদনার, হাহাকারের—তাতেই তো পুড়ে চলছে প্রত্যেকের জীবন, তার চাওয়া-পাওয়া, তার প্রেম-ভালোবাসা। মেয়েটা হতে পারে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সাধারণ, কিন্তু সেও জীবনকে ভালবেসেছিল তার মধ্যেই বাঁচতে চেয়েছিল জীবনের প্রেমে পাগল হতে চেয়েছিল। কিন্তু পাগল প্রেমের অর্থহীনতায় ভুগে সে আজ চিতায় ওঠে। আর সেই আগুনে এক এক করে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকের ‘পাগলা ঘোড়া’ তাদের জীবনকে শ্মশানের দিকে নিয়ে যায়, জীবনকে শ্মশান করে—

“সাতু : ... মনে হচ্ছে যেন একটা গল্প আছে এর মধ্যে ?

.....

মেয়েটা: গল্প? কার গল্প নেই? কার রহস্য নেই? তোমরা? তোমাদের গল্প নেই? তোমাদের রহস্য নেই? বার করে নিয়ে এসো না গল্পগুলো! আমাদের সব গল্পগুলো। দেখবে সব গল্প মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তোমাদের গল্প, আমাদের গল্প—সব—মিলেমিশে একাকার—”^{১৮৩}

মেয়েটা ছায়া ফেলে প্রত্যেকের মনে। তাকে উপেক্ষা করতে পারে না কেউ। অন্ধকারে এবং শ্মশানের চিতার আগুনে উঠে আসে প্রত্যেকের নিজস্ব জীবন। মেয়েটার জীবনের সঙ্গে কোথাও না কোথাও তাদের সেই জীবন মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

হিমাদ্রি ছিল স্কুল টিচার। তার এই গতানুগতিক জীবনে একটি মেয়ে এসেছিল। কিন্তু একটা সিস্টেমের শিকার হয়ে হিমাদ্রি তার সঙ্গে প্রেমে পাগল হতে পারেনি। মেয়েটা চেয়েছিল জীবনের প্রেমে পাগল হতে, যার অভাববোধ তাকে বিপন্নতার দিকে নিয়ে গেছে। আর হিমাদ্রি তা পেয়েও নিতে পারেনি। হিমাদ্রির মতো সামান্য এক স্কুল টিচারের পক্ষে উচ্চবিত্তের মেয়ে মিলিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা সম্ভব হয়নি। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের শিকার হয়ে জীবনকে ঘোড়ার গতি দিতে পারেনি। অন্যদিকে মিলি হিমাদ্রির জগতে ঢুকতে চেয়ে পারেনি, চেষ্টা করতে করতে নিজের জগৎ খুঁয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে—

“মিলি : “না। আমার জগৎ নেই আর। তোমার জগতে ষোলো আনা ঢুকতে পারিনি, কিন্তু আমারটা খুঁয়েছি। কিন্তু তাতে তোমার কিছু আসে যায় না।”^{১৮৪}

সাতু একজন ঠিকাদার। সেই সুবাদে তার জীবনে কোনদিন কুলিকামিন মেয়ের অভাব হয়নি। এইভাবে জীবন উপভোগকেই সে জীবনের সবকিছু পাওয়া বলে ভেবেছিল। কিন্তু তার অন্তরের অন্তস্থলে যে পাগলা ঘোড়া রয়েছে সে তাকে জানান দেয় “ওসব কিছু নয়... আপনিও জানেন, আমিও জানি-আসল ব্যাপারটা আলাদা।”^{১৮৫} যে লছমি একদিন সাতুকে ভালোবেসে কাছে পেতে চেয়েছিল আজ এতদিন পর সেই লছমির জন্য তার মন কেমন করে। শ্মশানে একটি কুকুরের ডাক সাতুর মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনে অতীত স্মৃতিকে— লছমিকে। লছমির ছিল চিরসঙ্গী একটা কুকুর। সেই ডাক শুনে সাতু ফিরে যায় অতীত স্মৃতিতে। লছমি একটা ভালোবাসার নীড় গড়তে চেয়েছিল। থাকতে চেয়েছিল সাতুর কাছের। সে তার বাবু সাতুকে পাগলের মতো ঘিরে থাকতে চেয়েছিল—

“লছমি : আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও বাবুজি, আমি আড়ালে লুকিয়ে থাকবো। কেউ জানতে পারবে না— ... তবু—তবু—তোমার কাছে থাকতে দাও— তোমার কাজ করতে দাও— আমি কাউকে জানতে দেবো না—”^{১৮৬}

কিন্তু সেদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করে। তার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু মনের মধ্যে সেই প্রত্যাখ্যান দিনদিন বেড়ে চলে এবং একসময় সে বেঁচে থেকেও জীবন থেকে সরে যায়। এই প্রত্যাখ্যান যেন জীবনকে প্রত্যাখ্যান। আজ সাতু গভীর অপরাধবোধে ভোগে। তার জন্যই হারিয়ে গেছে লছমি। সাতুর সমস্ত অবিচারের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় কুকুর তার মালকিনের হয়ে। কুকুরের ডাক তাই সাতুর কাছে বিশেষ মাত্রা নিয়ে আসে, অতীত স্মৃতি মনে করিয়ে তাকে অপরাধ বোধে ডুবিয়ে দেয়। লছমির ভালোবাসা তাকে যতখানি জীবন দেখাতে পেরেছিল, মেয়েটার মৃত্যু আজ বেশি করে সেই ভালোবাসার গভীরতা তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই সাতু মেয়েটার জ্বলন্ত চিন্তা দেখে আজ উপলব্ধি করে, ‘... মরণ দেখলেই বোধ হয় জীবন দেখা সম্ভব।’^{১৮৭} সাতু শেষ পর্যন্ত একটা জীবনদর্শনে পৌঁছায়—

“দর্শন করে শুধু এই মনে হয়েছে যে জীবনটার কোনো মাথামুণ্ডু হয় না।

...

জীবনটা শুধু মৃত্যুই আনতে পারে।”^{১৮৮}

কার্তিক একজন কম্পাউন্ডার। সে জীবনকে দেখেছে অন্যভাবে। তার উপলব্ধি: ‘বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো হয় না কখনো।’^{১৮৯} কার্তিক তার জীবনের পাগলা ঘোড়ার গল্প ঘুরিয়ে বলে। সে এক রাস্তার মুচির গল্পের মোড়কে নিজের কথা বলে যায়। নাটকের কোন চরিত্রই সরাসরি নিজের গল্প বলে না। মুচির গল্পের মধ্য দিয়ে কার্তিক নিজের গল্প বলে চলে। তার সে প্রেম অনাস্বাদিত

এক স্বর্গীয় সুখমায় ঋদ্ধ। দুঃসাহসী নয়। কেবল দেখে যাওয়া। মনে তার নিত্য আসা যাওয়া। একদিন সেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। কিছুদিন পরে মেয়েটি আবার ফিরে আসে। মুচি খবর নিয়ে জেনেছে বিবাহিত জীবনে মেয়েটি কোন সুখ পায়নি। মুচি সবটাই দেখে চলে। কথা বলতে পারে না। সে ভিতরে ভিতরে জ্বলে। আবার মেয়েটিকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে নিজেকে জুড়ায়-ও। কার্তিক বলে: ‘আগে যদি জানতাম রে সই, প্রেমের এতো জ্বালা—’^{১০} যে মেয়েটির কথা কার্তিক বলে তার সঙ্গে ঐ ‘মেয়েটা’র জীবনের কী অদ্ভুত মিল! ‘মেয়েটা’র জীবনেও উন্মাদ স্বামীর পাগলায় পড়া আছে, বিবাহিত জীবনের অনাস্বাদ আছে, শেষাবধি পালিয়ে এসে মল্লিকবাবুর ‘মেয়ে চটকানো’ লোকের পাগলায় পড়া আছে। তাই শেষ পর্যন্ত জীবনের অর্থহীনতায় ভুগে পাগলা ঘোড়ার মতো পাগল প্রেমের অভাবে মেয়েটা মৃত্যু কামনা করে কার্তিকের কাছে বিষ নিতে আসে। কার্তিক মেয়েটাকে সাত দিন অপেক্ষা করতে বলেছিল। কোথাও যেন কার্তিকের মনেও পাগলা ঘোড়ার উন্মাদনা কাজ করেছিল, ‘বেঁচে থাকলে— সবই সম্ভব’^{১১} এরকম একটা ক্ষীণ আশা কার্তিকের ভিতর কাজ করেছিল। পাগলা ঘোড়ার মতো পাগল প্রেমের অভাবে মেয়েটা কার্তিককে সাতদিনও সময় দিল না। কিন্তু যদি মেয়েটা জানতে পারত যে দিনের পর দিন তারই প্রেমে একজন নিঃশব্দে, গোপনে প্রতীক্ষা করে আছে তাহলে কী সে মরতে পারত এভাবে! না, তাহলে মেয়েটা এভাবে মরতো না। মেয়েটা জীবন যন্ত্রণা চেয়েছিল, মরণ যন্ত্রণা নয়। কেবল জ্বলতে চায়নি জুড়াতেও চেয়েছিল—

“পাগলা ঘোড়া— কেন সেরকম করলে না? কেন আমাকে দিয়ে কারো মন ভরালে না? কেন কাউকে দিয়ে আমার মন ভরালে না? কেন তোমার চোখে ঠুলি? কেন? কেন?”^{১২}

চিতার আগুনে চড়ে, ‘মেয়েটা’ যখন জানতে পারল, তখন চিতা থেকে আতঁ চিৎকার করে বলে—

“...নামিয়ে নিয়ে এসো! এখনো পুড়ে শেষ হয়নি—

এখনো জ্বলছে— নামিয়ে নিয়ে এসো— পাগলা ঘোড়া! ফিরিয়ে

নিয়ে এসো— আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো— পাগলা ঘোড়া—!”^{১৩}

এটাই বাস্তব। মানুষ এভাবেই মরতে মরতেও বাঁচতে চায়। জ্বলতে জ্বলতে জুড়াতে চায়। মেয়েটা চরিত্রের ভেতর দিয়ে এক আশ্চর্য দর্শন তুলে ধরেন নাটককার কার্তিককে নাটকের শেষ পর্যন্ত সামিল করে। কার্তিক বিষ মিশ্রিত পানীয় ঠোঁটের কাছে ঠেকিয়ে ভাবে: ‘... বেঁচে থাকলে— সবই সম্ভব?’^{১৪} এভাবেই দর্শন পাল্টায়। এতদিন যে দর্শনে আস্থা ছিল এখন তা প্রশ্নের মুখোমুখি।

এই নাটকের কাহিনির বুনন সত্যিই অভাবনীয়। প্রত্যেকের গল্প এক রকম আবার সবার

গল্প মিলেমিশে একাকার। নাটকের মুখ্য চরিত্র ‘মেয়েটা’-ই যেন টেনে আনে সে গল্প। যেমন আবার শশীর জীবনের গল্প। শশী ভালোবেসেছিল মালতীকে। মালতী শশীর সমবয়সী খুড়তুতো ভাই প্রদীপের বাগদত্তা ছিল। প্রদীপ ছিল দুশ্চরিত্র। তাই প্রদীপকে মালতী ঘৃণা করে তাকে বিয়ে না করে শশীর কাছে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু শশী পারেনি-সমাজ ও মন এই দুইয়ের বাধায় শশী সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সে মালতীকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। শশীর এই উপেক্ষার কারণেই মালতীর মৃত্যু হয়। অথচ শশী মনে মনে মন থেকে তাকে ভালোবেসেছিল। প্রেমের ঘোড়া তাকেও আজ পাগলের মতো ভেতরে ভেতরে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। অপরাধবোধ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। পাগলা ঘোড়ার শিকার হয়ে আজ সে পুড়ে মরবে অন্তরে অন্তরে। এই অন্তরবহির রূপটা শ্মশানে মদের নেশায় খানিকটা বেরিয়ে আসে। ‘মেয়েটা’ মালতী হয়ে ছায়া ফেলে। শশী বারবার অতীত স্মৃতিতে ফিরে যায়। মালতীর করুণ আর্তি তাকে নাড়ায়। তবুও প্রেম তাকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে শেখায় না। যন্ত্রণায় সর্ব নিঃস্ব হতে শেখায়। মালতীর উপর অবিচারের জন্য শশী সারাজীবন যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। শশী নিজের প্রেমকে হত্যা করে মালতীকে হত্যা করেছে। দুশ্চরিত্র প্রদীপ মালতীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। যে রূপার ছুরিটি কিনা শশীরই দেওয়া উপহার। শশী নিজের কাছ থেকে পালাতে পারে না। এই না পারার যন্ত্রণায় শশী ক্লিষ্ট হতে থাকে। নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায় শশী। শশীর জীবনের গল্প আসলে শশীর একার হয়েও হয়ে যায় অনেকের, অসহায় মধ্যবিত্ত বাঙালির, যাদের হৃদয় এভাবেই পুড়তে থাকে। এইভাবে প্রত্যেকের গল্প পৃথক হয়েও শেষ জিজ্ঞাসায় এসে একইভাবে কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রত্যেকের হৃদয় চিতা জ্বলতে থাকে। অর্থহীনতায় ভোগে সবাই। যেন সমস্ত বিষয়ই এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততা নিয়ে আসে। তবে এতকিছুর পরেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারাননি নাটককার। তাই নাটকে দেখা যায় ‘মেয়েটা’ থেকে শুরু করে প্রত্যেকের মধ্যেই জীবনতৃষ্ণার কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসে। ‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকের মূল্যায়ন করতে নাট্যব্যক্তিত্ব শ্যামানন্দ জালান লিখেছেন—

“যতদূর মনে পড়ছে, নাটক শেষ করে বাদলদা নিজেই বলেছিলেন, এটা একটা মিষ্টি প্রেমের গল্প।

.....

—একটি নয়, চারটি। ... উনি নিজে ... এই বিশ্বাস করেন যে আমরা একটা জীবন পেয়েছি। আমাদের পিছনেও কুয়াশা, সামনেও তাই। কোথাও রাস্তাটা বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের শুধু হাঁটতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে। জীবনে দুঃখও আছে সুখও আছে। নিরাশার গহন অন্ধকারের মধ্যেও আশা আছে।

মৃত্যুকে খোঁজা নিরর্থক।”^{১৫৫}

শ্যামানন্দ জালানের উক্ত মূল্যায়নের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ সহমত। নির্লিপ্ততার মধ্যেও যে জীবন লুক্কায়িত তা ফুটে ওঠে শ্মশানের বহিঃচিতায়। তা যেমন রাত্রির মতো অন্ধকার, তেমনি আগুনের মতো সত্য। বাদল সরকার এই নাটকে সেই সত্যেরই উদ্ঘাটন করেছেন। আমরা যেন কার্তিকের মত বিষভরা পানীয় গ্লাস মুখের সামনে ধরেও বলতে পারি ‘বেঁচে থাকলে সবই সম্ভব!’^{১৫৬}

বাদল সরকার নিজের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে তাঁর লিখিত নাটকে খুব কম কথাই বলেছেন। কিন্তু এতদিনের অনুচ্চারিত সেই রাজনৈতিক জীবনই এবার উঠে এলো এই পর্বে লেখা তাঁর ‘সার্কাস’ এবং ‘শেষ নেই’ নাটকে। নাট্যাভিনেতা কুমার রায় ‘শেষ নেই’ নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

“...বাদলবাবুর যে চিন্তা, মোটামুটি খানিকটাপ এই যুদ্ধ, যুদ্ধ পরবর্তীকালের মানুষ এবং যুদ্ধের পরের সমস্যা—বিশ্ব সমস্যা যার জন্যেই উনি ‘ত্রিংশ শতাব্দী’ লিখতে পারেন। যার জন্যে ‘বাকি ইতিহাস’ লিখতে পারেন। যার জন্যে ‘শেষ নেই’ও লিখতে পারেন। এ সবগুলোই তো প্রায় একটা ট্রিলজি-র মত— এই তিনটে।”^{১৫৭}

১৯৬৫-তে লেখা ‘বাকি ইতিহাস’-এর সঙ্গে এবং ১৯৬৬-তে লেখা ‘ত্রিংশ শতাব্দী’ নাটকের বিষয়ের সঙ্গে যে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করে দেখেছি। কিন্তু এ দুটি নাটকের অনেক পরে লেখা ‘শেষ নেই’ (১৯৭০) নাটককে কুমার রায় কেন তার সঙ্গে যুক্ত করলেন আমাদের ভাবতে হবে বৈকি।

আসলে বাদল সরকারের নাটকে যুদ্ধ, যুদ্ধপরবর্তী সময়ের মানুষ এবং যুদ্ধের পরের সমস্যা বারবার ঘুরে ফিরে আসে। পরাস্ত মানুষের বেদনা বাদল সরকার ভুলতে পারেন না। এই বিষয়গুলির প্রতি ইঙ্গিত করে কুমার রায় বুঝিয়ে দেন, এই ধারাটিকে এভাবেই শেষ পর্যন্ত দেখা উচিত। সেই ধারায় অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে যায় ‘শেষ নেই’ নাটকটি। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, এই নাটক লেখার প্রায় এক বছর আগে বাদল সরকার ‘সার্কাস’ নামক একটি নাটক লেখেন। কিন্তু নানা কারণে নাটকটি অভিনয়ের মুখ দেখেনি। নাটকটি প্রকাশ করারও খুব একটা আগ্রহ ছিল না। এই নাটকের বিষয়কেই আত্মস্থ করে পরে তিনি এই ‘শেষ নেই’ নাটকটি রচনা করেন। বাদল সরকার তাই লিখেছেন—

“‘সার্কাস’ নানা কারণে অভিনয় করা হয়নি, প্রকাশ করতেও আমি চাইনি। পরে

‘শেষ নেই’ লেখা হয়েছে, সার্কাসের বিষয়বস্তুর অনেকটাই সেই নাটকে বলা হয়েছে।”^{১৯৮}

আমরা দুটি নাটকেই পাশাপাশি রেখে আলোচনা করব। দুটি নাটকেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময় ও স্বাধীনতা উত্তর ষাট-সত্তরের দশকের রাষ্ট্রীয় অভিঘাত উঠে এসেছে। ‘সার্কাস’ নাটকে দেখা যায় বিপ্লবী পার্টি তরুণ বিপ্লবী অজয় স্বাধীনতার অর্থহীনতায় ভীষণ হতাশ। অজয় দেখেছে তার গান্ধীবাদী বাবাকে, যিনি চরকা কেটেছেন, জীবনের অনেকটা অংশ ব্রিটিশের জেলে কাটিয়েছেন। কিন্তু অজয় বাবার পথে হাঁটেনি। অজয় বিপ্লবের পথে সমাজবদলের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বিপ্লবী পার্টির শ্রেণি চরিত্র স্পষ্টতই হতাশ করে অজয়কে। ‘শেষ নেই’ নাটকের সুমন্তুর ভেতরেও এই হতাশা কাজ করে। সেও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা বিপ্লবী পার্টির সদস্য। কিন্তু পার্টির ক্রিয়াকলাপে সেও হতাশ হয়ে পড়ে। মূলত ১৯৪৯-এর মার্চ দেশব্যাপী যে বৃহত্তম রেল ধর্মঘট হয়েছিল তাকে ‘সার্কাস’-এর বিশু এবং ‘শেষ নেই’-এর সুমন্তু সমর্থন করতে পারেনি। ‘সার্কাস’ নাটকে বিনোদের সঙ্গে বিশুর কথোপকথন এবং ‘শেষ নেই’ নাটকে প্রশান্তের সঙ্গে সুমন্তুর কথোপকথন প্রায় একই রকম। উভয় ক্ষেত্রে বিনোদ ও প্রশান্ত পার্টি লাইন মেনে চলেছে। কিন্তু বিশু বা সুমন্তু বিনোদদের মতো বিনা প্রশ্নে পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। আর সেখানেই পার্টির সঙ্গে তাদের দূরত্ব তৈরি হয়। ৯ই মার্চের রেল ধর্মঘট নিয়ে ‘শেষ নেই’ নাটকের সুমন্তু প্রশ্ন তুলে প্রশান্তকে বলে—

“তুই নাইন্থ মার্চ দেখেছিস! রেল স্ট্রাইক নিয়ে কি আমাদের বলা হয়েছিল, আর কি দাঁড়ালো—দেখেছিস! তারপর দিনের পর দিন এই সব মিটিং—মিছিল! কারা করছে? তোর আমার মতো কয়েকটা মধ্যবিত্ত ছেলে। তারা খুব ভালো ছেলে হতে পারে— জেলকে ভয় করে না, ঠ্যাঙ্গানিকে পরোয়া করে না— কিন্তু মজুর কোথায়? কৃষক কোথায়? বিপ্লব কি এই ছেলেগুলো করবে?”^{১৯৯}

সুমন্তু একটা সময়ে পার্টি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার কারণ হিসেবে বলেছে—

“যে পার্টি প্রশান্ত দাসের মতো ছেলেকে এই জিনিস বানায়, সে পার্টিতে আর যারই হোক আমার চলবে না।”^{২০০}

‘সার্কাস’ এবং ‘শেষ নেই’ নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে মনোনিবেশ করলে আমরা বুঝতে পারি যে বিশু এবং সুমন্তুর মধ্যে বাদল সরকার নিজেই উপস্থিত। কেবল এদের চিন্তায় নয়, ঘটনাক্রমে এবং শেষ পরিণতির হিসেবেও বাদল সরকার নিজস্ব আদলে নির্মাণ করেছেন এই দুটি চরিত্র। ‘পুরোনো কাসুন্দি’ ঘেঁটে আমরা জেনেছি ছাত্রজীবনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন ভাবে ডুবে গিয়েছিলেন বাদল সরকার যে অন্য কিছু ভাবেন নি। কিন্তু নানা কারণে পার্টির সঙ্গে বাদল

সরকারের দূরত্ব তৈরি হয়। একটা সময়ে তিনি পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, ডুবে যান নিজের পড়াশোনার জগতে আর অবসর সময়ে একটু একটু করে চলে থিয়েটার চর্চা। যে কারণে ‘সার্কাস’-এর বিশু বা ‘শেষ নেই’-এর সুমন্তর জীবনে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়, সে সমস্ত কারণগুলো বাদল সরকারের ক্ষেত্রে ঘটেছে। বাদল সরকারের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া কিংবা ডিবা নাড়িয়ে চাঁদা তোলা এসব আমরা তাঁর জীবনের ঘটনাগুলো থেকে পাই। বাদল সরকার রেল অবরোধেও অংশগ্রহণ করেন। তাতে পার্টির সতীর্থ অনেকেই ধরা পড়লেও বাদল সরকার ধরা পড়েন নি। ‘শেষ নেই’ নাটকের সুমন্তর ক্ষেত্রে এসব ঘটনা ঘটেছে। কীভাবে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা যে ভেঙে যাচ্ছে, বাদল সরকার সেটা বিশু ও সুমন্তকে দিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি এটাও দেখিয়েছেন যে ঠিক ভাবে সিস্টেম কাজ করলে, গ্রামকে ঠিকমতো করে গ্রহণ করলে, শিল্প যা আছে তাতেই বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ‘সার্কাস’ নাটকে রত্না ও কুমার চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে বাদল সরকার জানিয়েছেন কীভাবে চাষিদের উন্নতি করা যায়, গ্রামের উন্নতি করা যায়। কুমারের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার বাদল সরকারের সেই স্বর আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না—

“চাষির স্বার্থ হবে উৎপাদন বাড়ানো। সে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে নলকূপ বসাবে, সার কিনবে, উচ্চফলনশীল শস্যের চাষ করবে, তাতে তার হাতে পয়সা আসবে। এক চাষের জায়গায় তিন চাষ হবে, খেতমজুর সারাবছর কাজ পাবে, তার হাতেও পয়সা আসতে শুরু করবে। তার মানে মাল কেনার ক্ষমতা। এই তো বাজার। বাজার পেলে কলকারখানাগুলোর দু’শিফট তিন শিফট চালু করতে বাধা কীসের?”^{২০১}

এভাবেই রাজনীতি সচেতন, সমাজ সচেতন বাদল সরকারের বক্তব্য উঠে আসে। বিষয় এবং বক্তব্য যেভাবে ‘সার্কাস’ এবং ‘শেষ নেই’ নাটকে উপস্থাপিত হলো এরপর বাদল সরকারের নাটক যে অন্য খাতে বইতে শুরু করবে তার একটা ইঙ্গিত এখানে থেকে পাওয়া যায়। এই কারণেই নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরী বলেছেন—

“এইখানে এসেই নাট্যকার বাদল সরকারের অনুসন্ধান চলে নতুন সংযোগ মাধ্যমের। নতুন বিশ্বাসকে প্রতিস্থাপন করতে চান নতুন বিন্যাসের মাধ্যমে নতুন মাধ্যমে বিন্যাসের সংযোগে।”^{২০২}

‘এইখানে এসেই’ বাদল সরকারের নাটকের বিষয়বস্তু একটা নতুন সংযোগ ঘটে বৈকি। একটা অবসাদ, বিপন্নতাকে অতিক্রম করে নাটকে এলো একেবারে সাধারণ মানুষের কথা, কৃষকদের কথা শ্রমিকদের কথা। ‘বাকি ইতিহাস’-এর শরদ্দিন্দুর স্বার্থমগ্ন সুখস্বপ্ন; ‘ত্রিশ শতাব্দী’-এর শরতের

মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বেচ্ছা নির্বাসনকে অতিক্রম করে নাটকে উঠে এলো উৎপীড়িত সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের কথা। নাটক ধীরে ধীরে অনেক বেশি হয়ে উঠছে রাজনীতি সচেতন। আর এরই সাক্ষ্য পাওয়া যায় তার দ্বিতীয় তথা থার্ড থিয়েটার পর্বের নাটকে। সেই পর্ব নিয়ে আলোচনার আগে আমরা তার প্রসেনিয়াম পর্বের শেষ দুটি নাটক সম্পর্কে আলোচনা করব— একটি ‘আবু হোসেন’ আরেকটি ‘সাগিনা মাহাতো’।

‘আবু হোসেন’ নাটকটির রচনাকাল ১৯৭১। এটি গিরিশচন্দ্র ঘোষের কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য ‘আবু হোসেন’ নাটকের সচেষ্ট ‘বিকৃতি’। নাম অপরিবর্তিত। বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে নাটকের মুখবন্ধে লিখেছেন—

“গিরিশচন্দ্রের আবু হোসেন আমার অতি প্রিয় নাটক। ছোটবেলায় এর অভিনয় বেতারে বেশ কয়েকবার শুনেছি। গানের কথা সেকেলে হলেও সংলাপ আর হাস্যরস এখনো আধুনিক। আমাদের নাট্যগোষ্ঠী ‘শতাব্দী’ অভিনয় করবে বলে ১৯৭১ সালে এই নাটকটি তৈরি করি। ... আমাদের প্রযোজনার ঘোষণার যেমন ‘রচনা গিরিশচন্দ্র ঘোষ/বিকৃতি: বাদল সরকার’ বলা হত, প্রকাশিত নাটকেও তাই রইলো, কারণ সেটাই ঘটনা।”^{২০০}

বাদল সরকার ‘আবু হোসেন’কে বলেছেন মূল নাটকের বিকৃতি আর নিজেকে বলেছেন বিকৃতিকার। নাটকের গল্প আমাদের জানা। একটি আরব্য কাহিনি ‘এক দিনের বাদশাহ’কে নিয়ে। আবু হোসেন একজন গরিব মানুষ, খুবই অতিথিপরায়ণ। ফলে সব সময় অভাব আর পাওনাদারদের তাগাদা। তখনকার চলন অনুযায়ী বাদশাহ হারুণঅল রশীদ রাত্রে তাঁর প্রজাদের ভালো-মন্দ নিজের চোখে দেখবার জন্য, ছদ্মবেশে শহরে বেরোতেন। আর এভাবেই একদিন আবু হোসেনের সঙ্গে বাদশাহের দেখা হল। যথারীতি আবু তার স্বভাব অনুযায়ী বাদশাহের সেবা করলেন। বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে আবুকে কিছু দিতে চাইলেন। আবু তখন তার মনের সুপ্ত বাসনা প্রকাশ করে বাদশাহকে বলে—

“... আমার বড় উঁচু খাঁই।

একদিন যদি বাদশাইটা পাই, তো হুকুম চালাই।”^{২০৪}

পরের দিন ঘুম ভাঙতেই আবু নিজেকে বাদশাহের মহলে পেল। চারিদিকে চাকর-বাকরের ভিড়, খাওয়া-দাওয়ার বাহার। কি মজা। ডেকে পাঠাল অনেককেই, পুরস্কার কিংবা সাজা শোনা। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে দিনটা কোথায় কেটে গেল, টেরই পায়নি। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন ঘুম ভাঙলো নিজের কুঁড়েঘরে। একদিনের বাদশাহ-র আবার সেই পুরনো জীবনযাপন।

এককথায় বলা যায় বাদল সরকারের ‘আবু হোসেন’-এর ‘বিকৃতি’টি বেশ জমজমাট। একটি বিষয় উল্লেখ্য মূল নাটকের পাগলখানাকে বাদল সরকার এখানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। পাগলদের কথাবার্তার মাধ্যমে নাটককার আজকের যুগের সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে যা ভাবা কিংবা করা হচ্ছে সেগুলোর উপর বেশ কটাক্ষ করেছেন। যেন আজ মানুষ একটি বিশাল পাগলখানায় বাস করছে। পঞ্চম পাগলকে স্বয়ং বাদল সরকারের মুখপাত্র বলা যায়। আর সেই সঙ্গে উঠে এসেছে পেটিবুর্জোয়া প্রোলেটারিয়াট-সর্বহারা ইত্যাদি মার্কামারা কিছু শব্দ যা একেবারেই একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ঘোষিত শব্দবন্ধ। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা একদিনের বাদশাহ আবু ও তার সভাসদদের কথোপকথন উল্লেখ করতে পারি—

“সভাসদ।। হুজুর। এই একটা উদ্ভট নালিশ। এই লোকটা হোটেলওয়ারা-কাবাব

কোণ্ডা, তন্দুরি রুটি ইত্যাদি বেচে।

আবু।। ক্যাপিটালিস্ট।

সভাসদ।। হুজুর?

আবু।। কতো বড় হোটেল? কোন পাড়ায়?

সভাসদ।। আজ্ঞে বাজারে, ছোট হোটেল।

আবু।। বুঝেছি। পেটি বুর্জোয়া।

...

সভাসদ।। এই লোকটি একজন গরিব লোক, মুটেগিরি করে খায়।

আবু।। প্রোলিটারিয়েট।

সভাসদ।। আজ্ঞে?

আবু।। সর্বহারা।...”^{২০৫}

এইভাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘আবু হোসেন’ নাটকের বিকৃতির মধ্যে বাদল সরকারের নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শনটি উদ্ভাসিত হয়েছে। নাটকটি মৌলিক না হলেও নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের যে সংকটের কথা ইতিপূর্বে বেশ কিছু নাটকে উঠে এসেছে তার পরিবর্তে এখানে কিন্তু আবু হোসেন নামক এক সাধারণ মানুষকে তিনি নাটকের বিষয়ের মধ্যে নিয়ে আসছেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে পরবর্তীকালে বাদল সরকারের নাটকের গতিপ্রকৃতি কোন পথে প্রবাহিত হবে।

প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা নাটকের মধ্যে বাদল সরকারের শেষ নাটক ‘সাগিনা মাহাতো’।

তার কারণ ১৯৭১-এর ৮ আগস্ট, প্রসেনিয়াম মঞ্চে ‘সাগিনা মাহাতো’ মঞ্চস্থ করার পর আড়াই মাসের মধ্যে ২৪ অক্টোবর ১৯৭১-এ বাদল সরকার এই নাটক অঙ্গন মঞ্চে মঞ্চস্থ করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে তিনি আর প্রসেনিয়াম মঞ্চে নাটক করবেন না—

“আমি প্রসেনিয়ামে আর নাটক করব না, আমি পুরনো ধরনের নাটক লিখবও না আর সে স্টাইলে পরিবেশনও করব না। এখন থেকে আমি যা করব তা আমার থার্ড থিয়েটারের জন্য, আমার অঙ্গন মঞ্চের জন্য। আমার নতুন থিয়েটারের ভিত্তি হবে মানুষের মন আর সরঞ্জাম হবে মানুষের শরীর।”^{২০৬}

এই নাটকের কাহিনি গৌরকিশোর ঘোষের ‘সাগিনা মাহাতো’ গল্প থেকে গৃহীত। এই গল্পে গৌরকিশোর ঘোষ বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনা ও সংগঠন প্রক্রিয়াকে সমালোচনা করে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে অন্ধ বামপন্থা মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। সেই সাথে এই গল্পে তিনি দেখিয়েছেন যে বামপন্থী রাজনৈতিক দল মানুষের চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। যে কারণে স্বাধীনচেতা মানুষের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। এই বক্তব্য তিনি তুলে ধরেছেন উত্তরবঙ্গের চা বাগানের শ্রমিক সাগিনা মাহাতোর দৃষ্টান্ত দিয়ে। সাগিনা চা বাগানের শ্রমিকদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে জীবন অতিবাহিত করে। মালিকের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে তার মতো করে প্রতিবাদ জানায়। ক্রমশ একজন প্রতিবাদী শ্রমিক নেতা হিসেবে উঠে আসে সাগিনা মাহাতো। কমিউনিস্ট পার্টির সুনজরে পড়ে সাগিনা মাহাতো। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ তাকে দলের সঙ্গে যুক্ত করে। শুধু তাই নয় তাকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দায়িত্বও দেওয়া হয়। সাগিনা মাহাতো এতদিন নিজের মতো করে মত বিনিময় করতে পারত সাধারণ মানুষের সঙ্গে। শ্রমিকদের ভালো-মন্দের সঙ্গে সে তার মতো করে জড়িয়ে ছিল, কিন্তু এখন সে অনুভব করল সাংগঠনিক নিয়মতান্ত্রিকতা এই আন্দোলনের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার বেড়াজালে আটকা পড়ে গিয়েছে। পার্টির নেতৃত্বের অনুমোদন ব্যতীত কোন কিছুই সে করতে পারছে না। তার আচার-আচরণ, তার ব্যক্তিগত জীবন-যাপন, তার মূলবোধ সবকিছুই যেন পার্টি লাইনে নিয়ন্ত্রিত। সাগিনা একসময় অসহ্য জ্বালায় মর্মবেদনায় ও ধিক্কারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে স্বাধীন হতে চেয়েছে। একজন স্বাধীনচেতা মানুষের পক্ষে বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শকে মেনে নেওয়া কখনো সম্ভব নয় এই বিষয়টি গৌরকিশোর ঘোষ এই গল্পে বলতে চেয়েছেন।

গৌরকিশোর ঘোষের এই গল্পে বর্ণিত বক্তব্যের সঙ্গে বাদল সরকারের রাজনৈতিক জীবনের ঘটনা মিলে যায়। আর ঠিক এই কারণেই বাদল সরকার গৌরকিশোর ঘোষের মূল গল্পটি অবলম্বন

করে ‘সাগিনা মাহাতো’ নাটক রচনা করেন। বাদল সরকার এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন:

“গৌরকিশোর ঘোষ যে ছোটগল্পটা লিখেছিল, তার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভীষণ মিল আছে। আমি দেখেছি— আমাদের মতো মধ্যবিত্তরা কীভাবে ওয়াকারদের লিডার সাজিয়ে করাপ্ট করে দিয়েছে। যারা পরে এম পি হয়ে দিল্লিতে গিয়ে নানা করাপশনে ফেঁসে গেছে, তারা যখন তৈরি হচ্ছে তখন আমি তার সঙ্গে রাজনীতি করেছি। আমি নাম করব না। খুবই পরিচিত সেইসব লিডারদের তো আমি দেখেছি পার্টি কীভাবে ব্যবহার করেছে। সেই আইডেন্টিফিকেশনের জায়গা থেকেই ‘সাগিনা মাহাতো’ প্রযোজনা করেছি।”^{২০৭}

ইতিপূর্বে আমরা বাদল সরকারের রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছি। তাতে জেনেছি ছাত্রাবস্থায় বাদল সরকার নিজেও বামপন্থায় বিশ্বাসী হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। কিন্তু নানা কারণেই পার্টির সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে একেবারেই সরে আসেন। সত্তরের দশকের রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি সাম্যবাদী চেতনার দোসর হয়েও সাম্যবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ ও সংগঠনগত পদ্ধতির বিরুদ্ধে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। এখানেই ‘সাগিনা মাহাতো’ নাটকের ‘বিকৃতির’ সার্থকতা। তাঁর নিজের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েই গৌরকিশোর ঘোষের ‘সাগিনা মাহাতো’ গল্পের আশ্রয় নিয়েছেন।

২.

এবার আসা যাক তাঁর থার্ড থিয়েটার পর্বের নাটকের আলোচনায়। এই পর্বে বাদল সরকার একদিকে যেমন প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রচলিত ধারা থেকে তাঁর থিয়েটারকে মুক্ত করলেন, তেমনি নাটক রচনা ক্ষেত্রেও গতানুগতিক ধারাকে বর্জন করলেন। নাটকের বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে আঙ্গিক তথা কাঠামো নির্মাণ— সব ক্ষেত্রেই একটা আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এই পর্বে। যে মুহূর্তে তিনি অভিনেতা এবং দর্শকের মধ্যকার ব্যবধান ঘোচানোর কথা ভেবেছেন, সেই মুহূর্তে বদলে গেল নাটক রচনার অভিমুখ। মঞ্চ ছেড়ে নাটক নেমে এলো দর্শকের মধ্যে। এতদিন বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জন্য যে সমস্ত নাটক লিখেছেন, সেখানে গতানুগতিক ধারা অনুযায়ী টেক্সট মুখ্য ছিল। যেখানে একজন মননশীল পাঠক দৃশ্যায়নের পরিশ্রম ব্যতিরেকেও নাটক পাঠ করে আবিষ্কার করতে পারেন বয়ানের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অর্থাৎ নাটক ছিল অভিনয় (Play) মুখ্য।

কিন্তু থার্ড থিয়েটার পর্বে যেহেতু সরাসরি দর্শকের উদ্দেশ্যে নাটক পরিবেশিত হয় ফলে সেখানে টেক্সট অপেক্ষা তার দৃশ্যায়ন বা নাট্যায়নই (Score) মুখ্য হয়ে উঠে। নাটককারের বয়ানে এখন নির্মিত চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় অদৃশ্য দর্শক, তারাও লিখিত ভাষ্যের চরিত্র হয়ে ওঠে। এককথায় শুধু নাট্যানুষ্ঠান তথা নাট্যাভিনয়ে নয়, নাটকের জন্মমুহূর্তেই এখন উপস্থিতি দর্শক। একেই বলা যায় থার্ড থিয়েটার পর্বের নাটক রচনায় মৌলিক পরিবর্তন। অবশ্য প্রসেনিয়াম থিয়েটার পর্বে লেখা ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে আমরা দর্শক থেকে অভিনেতা উঠে আসতে দেখেছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে তা ছিল নাটকেরই দর্শক চরিত্র। আলাদাভাবে নির্দিষ্ট দর্শককে নাটকের অংশ করার কোন প্রচেষ্টা তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এই পর্বে যে দর্শককে নাটকের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরা হল, তারা সক্রিয় দর্শক। তারা নগর নাট্যের দর্শকের মত ভোক্তা, নয়, তারাও অংশগ্রহণকারী। যাকে তিনি বলেছেন রিচুয়ালের অনুরূপ। যেখানে টেক্সট-এর ভিতর ঢুকে যায় দর্শক। আর এভাবেই অভিনেতা এবং দর্শকের সক্রিয় অংশগ্রহণে নাটক হয়ে যায় একটা নাট্যানুষ্ঠান। তখন তার মধ্যে থাকে না নির্ভেজাল টেক্সট। টেক্সট অপেক্ষা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নাট্যায়ন। তৃতীয় ধারার নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাই নাট্যশৈলীর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাদল সরকারের মতে তৃতীয় ধারার থিয়েটারের “নাটক লেখাই যাবে না নাট্যশৈলীর কথা যথেষ্ট না ভেবে। অর্থাৎ নাট্যকারকে এক্ষেত্রে নাট্যায়নের অনেকখানি ধারণা করে নিতে হবে নাটক-রচনার সময়।”^{২০৮}

আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, এই পর্বের নাটক অনেক বেশি রাজনৈতিক। কোন অবসাদ, কোন নিঃসঙ্গতা কিংবা অস্তিত্বহীনতা নয়, এক বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন পর্বের নাটকে উঠে এসেছে। নাটক রচনার ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এই পর্বে। আমরা তাঁর এই পর্বের প্রধান কয়েকটি নাটকের আলোচনার সূত্র ধরে নাটককার বাদল সরকারের সেই ক্রমবিবর্তনটি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

থার্ড থিয়েটার তথা অঙ্গনমঞ্চের জন্য লিখিত বাদল সরকারের প্রথম নাটক ‘স্পার্টাকুস’। ১৯৭৩ সালের ২৮ জানুয়ারি ‘স্পার্টাকুস’-এর প্রথম অভিনয় হয় কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর তিনতলার অঙ্গন মঞ্চে। নাটকটি মৌলিক নয়। ঔপন্যাসিক হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর উপন্যাসের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে তিনি নাটকটি রচনা করেন। নাটকের মুখবন্ধ অংশে বাদল সরকার লিখেছেন—

“জীবনে যে ক’টি উপন্যাস সবেচেয়ে ভালো লেগেছে, হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকুস তার মধ্যে একটি। উপন্যাসকে থিয়েটারে আনবার কল্পনা বেশ

কয়েকবার করেছি, সাহসে কুলোয় নি।

সে সাহস শেষ পর্যন্ত পেলাম, যখন প্রচলিত ‘প্রোসেনিয়াম’ মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ‘অঙ্গনমঞ্চ’ ধরলাম। ‘অঙ্গনমঞ্চ’ অভিনেতাকে দর্শকের কাছে নিয়ে আসে, মাঝখানের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। স্পার্টাকুস অঙ্গন অঙ্গনমঞ্চের জন্য লেখা।”^{২০৯}

এই প্রথম যে বাদল সরকার অন্য একটি স্পেসের কথা ভেবে নাটক রচনা করেছেন, সে কথা জানিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছে—

“‘স্পার্টাকুস’ নাটকটা লিখি প্রথম অন্য স্পেস কল্পনা করে। সেখানে প্রোসেনিয়াম স্টেজের কনসেপ্টটা ছিল না। তারপর থেকে সব নাটকেই তাই।”^{২১০}

কেন তিনি অঙ্গনমঞ্চের জন্য এই নাটকটাই বেছে নিলেন? কি আছে স্পার্টাকুসের কাহিনিতে? এর উত্তরে বাদল সরকার বলেছেন—

“রোমান সাম্রাজ্যকে একেবারে গভীর থেকে কাঁপিয়ে দেওয়া দাসবিদ্রোহ নিয়ে হাওয়ার্ড ফাস্টের মহাকাব্যিক উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাস। আর আমি যখন সেই নাটকের নতুন অঙ্গনটা প্রত্যক্ষ করলাম, ঠিক তখনই সেই বিশাল ক্যানভাস থেকে নাটক তৈরির এক বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে ফেললাম। ... কারণ একটা নাটকের প্রস্তুতির মধ্যে আসলে কোনও একটা নতুন পথের খোঁজে চলছিল ...”^{২১১}

‘স্পার্টাকুস’-এর বিষয় রোমান সাম্রাজ্যের দাস বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ক্রীতদাস স্পার্টাকুস। এই ইতিহাস কমবেশি আমাদের জানা। দাসদের সঙ্গে অমানবিক অত্যাচার করত সম্রাট ও উচ্চশ্রেণির অভিজাত রোমানরা। কোন রকম প্রতিবাদ করলেই অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যেত এবং কখনো কখনো মেরেও ফেলা হত। তার উপরে এই সমস্ত বন্দি ক্রীতদাসদের নিজেদের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে রাজা এবং আমলারা সপারিসদ মজা উপভোগ করত। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাদের সে লড়াই চলতে থাকতো। এই দাসপ্রথা, দাসদের জীবনধারা, তাদের উপর অত্যাচারের ধারাবাহিক ইতিহাস পুঞ্জিভূত হতে হতে একসময় স্পার্টাকুসের নেতৃত্বে সমস্ত ক্রীতদাস একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং বন্দী সব ক্রীতদাসের মুক্তি ঘটে। কিন্তু সেই মুক্তি তো আর এমনি এমনি আসেনি, বিদ্রোহ দমন করার নামে তাদের উপর নৃশংস অত্যাচার করে সম্রাটেরা। দাসদের উপর সেই নির্মম অত্যাচার, দাসদের বিদ্রোহ— এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে ‘স্পার্টাকুস’ নাটক।

সত্তরের দশকের রাষ্ট্রীয় অভিঘাতের সময়কালে দাঁড়িয়ে সংগ্রামী মানুষের প্রতিবাদের ভাষা জোগানোর জন্য এর থেকে উপযুক্ত বিষয় আর কি বা হতে পারে! শাসকের হাতে অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হতে হতে এদেশের সাধারণ মানুষও যে শেষ পর্যন্ত এক সময় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, মুক্তির লড়াইয়ে সামিল হওয়ার শপথ গ্রহণ করেছে, সেই বিবরণ রোমান সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ ও মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন। তখন আর এ নাটকের কাহিনি সুদূর রোমান সাম্রাজ্যের দাসদের মুক্তির লড়াইয়ের কাহিনিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। এখানেই এই নাটকের সার্থকতা।

নাটকের প্রধান চরিত্র স্পার্টাকুসকে ব্যক্তিগত ভাবে নায়ক করে দেখানো হয়নি। স্পার্টাকুসকে একটা চরিত্র থেকে একটা শ্রেণিচরিত্র রূপায়িত করেছেন নাটককার। এই নাটকে একটানা কোন গল্পও নেই। নেই ঘটনার কোন নির্দিষ্ট পরম্পরা। নাটকে টুকরো টুকরো কিছু নাট্যমুহূর্ত তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডদৃশ্যে বাস্তবের বিভ্রম গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ভেঙে যায় একটি নতুন চরিত্রের উপস্থিতি। বাদল সরকারের নাটকে এই প্রথমবার আসে সূত্রধার। এর আগে অনেক নাটকেই সরাসরি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কথা বলেছে বিশেষ কোন চরিত্র। কিন্তু সেখানে সে বলেছে তার নিজের কথা অথবা বিশেষ কোন প্রসঙ্গে তার অভিমত। মোটের উপর ওই নাটকে তার যে চরিত্র, সেই ভূমিকায় সে চিহ্নিত। কিন্তু এই নাটকে সূত্রধার আসলে লেখকেরই প্রতিনিধি অথবা প্রকারান্তরে গোটা নাট্যদলের। সে গল্প-বলিয়ে-দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের সংযোগকারী অথবা ছেদক উপস্থাপনার ব্যাখ্যাকার। সূত্রধার যাতে নাটককারের প্রোটোটাইপ না হয়ে ওঠে সে কারণেই নাটকে সূত্রধার এক নয় একাধিক। এরা প্রত্যেকেই টুকরো নাট্য দৃশ্যে কোন না কোন চরিত্রে অভিনয় করে, কখনো কোন দাস অথবা ভারিনিয়া কিংবা হেলেনা। এরা যখন সূত্রধারের ভূমিকায় তখন নাটককার এদের চরিত্রের নাম ব্যবহার করেননি অথবা সূত্রধারের বয়ানে এরা কখনো নিজের কথা বলেনি। থার্ড, থিয়েটারের নাটকের এ এক অন্যতম কৌশল বৈকি।

এই নাটকে সংলাপ অপেক্ষা শারীরিক অভিনয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। যাকে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘ভাস্কর্যপ্রতিম শরীরবিন্যাস বা নির্বস্তুক ফর্ম’^{২১২}। যেখানে শব্দের ভাঙারকে যতটা সম্ভব সংকুচিত করে এনে একই বাণী বা বাক্য শব্দবিন্যাসকে নানাভাবে পুনরুচ্চারণ করে শারীরিক অভিব্যক্তির চিত্রকল্পে মূর্ত করা হয়। অত্যাচার ও পরিশ্রমে ক্লান্ত দাসের ঘাম ঘরে, অত্যাচারিত হতে হতে তারা একসময়ে বিদ্রোহ করে। সেখানে কোনো সংলাপ নেই, বক্তব্য বলা নেই, শুধু শরীরী অভিনয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীর শারীরিক নানা মুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে একেবারে দর্শকদের সমতলে ঘটে চলে অত্যাচারের ধারাবাহিক দৃশ্যাবলি। ক্রমে অঙ্গনমঞ্চকে ঘিরে বসা

দর্শক একাত্ম হয়ে যায় দাসদের পীড়নের সঙ্গে, তাদের সংগ্রামের সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার লিখেছেন—

“দাস, দাসের কষ্ট, দাসের বিদ্রোহ—সেটাই তো আসল স্পার্টাকুস। যেখানে বিদ্রোহটা প্রথম থেকে বেরোয় আর সেখানে কোনো স্পীচই নেই, ক্রেসেভোর প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে একটা ‘বাস্ট অব্ এনার্জী’ আছে। একটা প্রচণ্ড শব্দ এবং ভঙ্গি...”^{২১৩}

এই নাটক প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বাদল সরকার বলেছেন—

“আমার প্রথম ভাষাটা সবটা করতে গেলে বোধ হয় চার ঘণ্টা লেগে যেত। আমরা কাজ করতে করতে ওয়র্কশপ করতে করতে, মহলা দিতে দিতে দৃশ্যগুলোর সংলাপ কমাতে কমাতে তাদের অন্যভাবে পালটে দিই— ‘নন-ভারবাল্ কমিউনিকেশন’-এ। এটা একটা সংঘাতিক ইন্টারেস্টিং প্রক্রিয়া।”^{২১৪}

কিন্তু ‘স্পার্টাকুস’ যখন লিখিত ভাষ্য পাঠকের কাছে পৌঁছায় তখন ওই নির্বাক ভাব-বিনিময় লেখ্য পাঠে নাটকের সীমাচিহ্নের সঙ্গে যুক্ত কেবল প্রযোজনার অংশ নয়। থার্ড থিয়েটারের নাট্যশৈলী এভাবেই প্রভাবিত করে লিখিত নাটককে। প্লে আর স্কোর অর্থাৎ নাটক আর নাট্যায়ন-এর কাটাকুটিতে যে লিখিত বয়ানের নির্মাণ সেটিই এই থিয়েটারের জন্য লিখিত নাটক। এখানে অভিনয় শিল্পীদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য— যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ‘ভারবাল্ কমিউনিকেশন’ বদলে যায় ‘নন ভারবাল্’-এ। আসলে নন-ভারবাল্ বা নির্বাক কমিউনিকেশনের এই টুকরো খণ্ডগুলো দর্শক অনুপ্রবেশেরই গোপন পরিসর। এই পরিসরেই নাটকে অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের এক ভিন্নতর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কারণেই লিখেছেন—

“অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় স্পার্টাকুস-এই প্রথম আমি দর্শক অভিনেতার একটা অন্যতম সম্পর্কের যথার্থ স্বাদ পেলাম। ক্রীতদাসদের সঙ্গে আমার এমন একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল যাতে আমিও যেন ক্রীতদাসদেরই একজন বলে নিজেকে ভাবতে পারলাম।”^{২১৫}

বলা বাহুল্য অঙ্গনমঞ্চে স্পার্টাকুসের এই নাট্যায়ন সেদিন বাংলার দর্শককুলকে ভীষণ ভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী নাট্যকর্মী দেবাশিস চক্রবর্তী লিখেছেন—

“চারপাশে ৩ ফুট, ২ ফুট, ১ ফুট সব বসবার টেবিল। নানান উচ্চতায় বসবার স্থান। ফাঁকা স্থানগুলিতে চলছে অভিনয়। গ্ল্যাডিয়েটরদের যুদ্ধ। চারপাশে, মাঝে

দাসদের, রোমকদের নানান ঘটনা ঘটে চলেছে। সকলের শরীরের ছোঁয়া লাগছে
দর্শকের শরীরে। দর্শকরা যেন বসে আছেন সেই সময় রোমে। ... সে এক
অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।”^{২১৬}

এই একই রকম অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন সমকালের নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়—

“... আমাদের ঘিরে, আমাদের চারপাশ দিয়ে যখন চরিত্র আনাগোনা করছে—
তখন লক্ষ করলাম যে স্পার্টাকুস একজন মানুষ নয়— ... স্পার্টাকুস একটা
শ্রেণি, ... একটা প্রয়োজনার একটা বিশেষ ভঙ্গি, একটা প্রয়োজনার একটা বিশেষ
রকম যে এতভাবে আলোড়িত করতে পারে, তা আমি বুঝতে পারিনি।”^{২১৭}

এমনিভাবে সেদিন বাদল সরকার ‘স্পার্টাকুস’ নাটকের নাট্যায়নের মধ্য দিয়ে এক নতুন ইতিহাস
রচনা করলেন। নাটক কেন করব? নাট্যের মাধ্যমে কী কথা বলব? কাদের বলব? কেন বলব?
এমন সব নানা প্রশ্নের সামনে সেদিন বাংলার দর্শককূলকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। বলাবাহুল্য এই
‘স্পার্টাকুস’ নাটক থেকেই থার্ড থিয়েটারের অঙ্গন মঞ্চে বাদল সরকারের যথার্থ প্রতিষ্ঠা ঘটল।

বাদল সরকার তৃতীয় ধারার থিয়েটারের মধ্যে একটি অন্যতম নাটক ‘মিছিল’। নাটকটির
রচনাকাল ১৯৭৪ সাল। ওই বছরই ১৪ই এপ্রিল উত্তর চব্বিশ পরগনার রামচন্দ্রপুর গ্রামে প্রথম
অভিনীত হয়। অভিনয় করে বাদল সরকারের দল শতাব্দী। এই নাটকে উঠে এসেছে সত্তরের
দশকের সেই ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। চারিদিকে তখন এক ভয়াবহ অবস্থা। খুন, মৃত্যু, জিঘাংসা
তখন জীবনের নিত্য সঙ্গী। শাসকের নির্ধুর আক্রমণ, মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ, পারস্পরিক
অবিশ্বাস ও সন্দেহের বাতাবরণে সেই সময় মানুষের অস্তিত্বের এক চরম সংকট। সত্তরের দশকের
সেই ভয়াল উত্তাল জীবন আবর্তনের মাঝে পড়ে সবাই যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এই
বিপর্যয় থেকে সেদিন কেউ রেহাই পায়নি। রাষ্ট্রীয় আক্রমণ নেমে আসে সর্বস্তরের মানুষের উপর।
আক্রমণ নেমে আসে লেখক শিল্পীদের উপর। কলকাতার অলিগলিতে তখন হাজার হাজার
বেওয়ারিশ লাশ। এই ভয়ঙ্কর সময়কেই বাদল সরকার ‘মিছিল’ নাটকে তুলে ধরেছেন। নাটক
শুরুই হচ্ছে সত্তরের দশকের সেই অন্ধকারময় সময়কে ইঙ্গিত করে—

“এক ।। কী হোলো আলো নিভে গেলো কেন?

....

[হঠাৎ একটা গগনভেদী আর্তনাদ, কেউ খুন হোলো যেন]

এক ।। কী হোলো কী হোলো?

দুই || ও রকম করে চ্যাটালো কে?
তিন || খুন! খুন হয়েছে!
চার || না না গর্তে পড়েছে কেউ—
পাঁচ || ছুরি মেরেছে ছুরি— সাবধান!

...

পাঁচ || ছুরি মেরে লাশ সরিয়ে ফেলেছে—

...

পাঁচ || ঐ তো লাশ—

ছয় || ও মা গো—

কোটাল || (প্রচণ্ড ধমকে) চোপ!

[সবাই থেমে গেলো একসঙ্গে]

কেউ খুন হয় নি, যাও বাড়ি যাও।”^{২১৮}

কলকাতা মহানগর সত্তর এবং সত্তর পরবর্তী অভিজ্ঞতায় প্রতিনিয়ত শুনেছে এই আর্তচিৎকার।
তবুও আতঙ্কের কেন্দ্র থেকে সেদিন বেরিয়ে আসতে পারেনি, কেউ-বলতে পারিনি ওই ‘লাশ
আমার আত্মীয়’। সেই সত্তরের দশকের উত্তাল পরিবেশে শুরু হয় ‘মিছিল’ নাটক। একটি ছেলে,
যার নাম ‘খোকা’, সে বলে—

“আমি খুন হয়েছি। আমি। এই যে এখানে। আমি খুন হয়েছি। আমি! আমি!

এই যে—আমি! আমাকে মেরে ফেলেছে। আমি মরে গেছি। এইমাত্র। এইমাত্র

খুন হয়েছি আমি। আমি খুন হলাম আজ। আমি খুন হয়েছি গতকাল। আমি খুন

হয়েছি পরশু। তরশু। গত হপ্তায়। গত মাসে! গত বছর! আমি খুন হই রোজ।

রোজ রোজ খুন রোজ মৃত্যু রোজ!”^{২১৯}

এই যে রোজ খুন হয়ে যাওয়া, এর মধ্যে কোন রহস্য নেই। সত্তরের দশকে এরকম হাজার হাজার
খোকার লাশ পাওয়া গিয়েছিল অলিতে গলিতে। নাটককার ‘খোকা’র খুন হওয়ার মধ্যে দিয়ে সেই
বাস্তব সত্যটাকেই উন্মোচিত করেছেন। সেই উত্তাল সময়ে দাঁড়িয়েও বাদল সরকার ‘খোকা’দের
বেঁচে থাকার একটা পথের সন্ধান করেছেন। একটা পরিব্রাণের পথ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। নাটকে
দেখি, এক বৃদ্ধ ও এক যুবককে। তাদের নামও ‘খোকা’, মৃত যুবকটির নামও খোকা। বৃদ্ধ ও খোকা
সব একাকার। তারা সব হারিয়ে বেঁচে থাকার পথ খুঁজছে। তারা খুঁজছে এক নতুন বাড়ি, “পুরোনো
বাড়ি নয়, অন্য বাড়ি, সত্যি বাড়ি, সত্যিকারের সত্যি বাড়ি...”^{২২০} তারা দেখতে পায় এক

সত্যিকারের মিছিল। এই মিছিল কোন রাজনৈতিক মিছিল নয়। এ মিছিল মানবের মিছিল, মানুষের জীবনের মিছিল। বাঁচার বীজমন্ত্র ভরা আছে সে মিছিলে। তাতে যে সুর শোনা যায় তা জীবনের সুর, জীবনের আনন্দের সুর, মানুষ-মানুষে ভালবাসার বন্ধনের সুর। এ নাটক একটা অদ্ভুত উন্মুক্ত ইমপ্রেশন বা প্রতীতি তৈরি করে—

“খোকা || (অল্প আশা) সত্যি বলছো? সত্যি মিছিল?

বুড়ো || মনে হচ্ছে—সত্যি মিছিল।

খোকা || কাদের মিছিল?

বুড়ো || মনে হচ্ছে—মানুষের।

[কোরাস মিছিল হয়ে এলো। সঙ্গে গানের সুর। আশার গান। ভবিষ্যতের গান।

এ মিছিল স্বপ্নের। এ গান স্বপ্নের। বুড়ো আর খোকার স্বপ্ন। মিছিল হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। বুড়ো খোকার হাত ধরে কাছে গেলো, হাত ধরে মিছিলের সঙ্গে মিশলো, গানে কণ্ঠ মেলালো। সবাই দর্শকদের ইঙ্গিতে ডাকলো মিছিলে যোগ দিতে। যারা যোগ দিলেন, তাঁদের নিয়ে চললো মিছিল।]”^{২২১}

একটা আশার বাণী দিয়ে নাটকটি এখানে শেষ হয়।

নাটকের ‘মুখবন্ধ’ অংশে নাটককার বলেছেন—

“মিছিল স্টেজে করবার নাটক নয়। খোলা মাঠে চারিপাশে দর্শক বসিয়ে অথবা কোনো বড়ো ঘরে মেঝের উপর অভিনয় করবার নাটক। ঘরে হলে দর্শকদের চেয়ার বা বেঞ্চগুলি এমন ভাবে সাজানো থাকবে যাতে গোলকধাঁধার মতো একটি পথ ঘুরে ফিরে যাবে। এই পথটিই অভিনয়ের এলাকা, পথের দুপাশে দর্শকরা বসেছেন— মিছিল দেখতে যেমন রাস্তার দুপাশে দাঁড়াতে হয়।”^{২২২}

এ নেহাতই প্রযোজনার নির্দেশ নয়। নাট্যের অতি প্রয়োজনীয় লিখিত ভাষ্য। সংলাপ নির্মাণের আগেই নাটককার নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন অভিনয় পরিসরের বিন্যাস কী রকম হবে। কারণ হিসেবে বাদল সরকার বলেছেন তৃতীয় ধারার থিয়েটারে ‘নাট্যশৈলীর খাতিরে বিষয়বস্তু নির্বাচন নয়, বিষয়বস্তুর জন্য উপযুক্ত নাট্যশৈলী খোঁজা।’^{২২৩} দর্শক ‘মিছিল’ দেখতে রাস্তার দু’পাশে না বসলে নাট্যের লিখিত ভাষ্যও দুর্বোধ্য মনে হবে। দর্শকের এই ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি না ঘটলে নাটকের ভাবাল বা নন ভাবাল যে কোন ভাব-বিনিময় তার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় স্পর্শ করতে পারবে না। আর এ কারণেই নাটকের শুরুতেই নাটককারকে কঠোর অনুশাসনে নির্দিষ্ট করে দিতে হয় অভিনয়-পরিসরের কাঙ্ক্ষিত বিন্যাস। আর এই বিন্যাসের কাঠামোয় নির্মিত হয় নাট্যের লিখিত

ভাষ্য— ‘মিছিল’। তাই শুধু টেক্সট দিয়ে ‘মিছিল’ নাটকের মর্মোদ্ধার সম্ভব নয়।

নাটকের প্রথম সংলাপে বুঝতে পারি দর্শকের মাঝে অন্ধকারে বসবার আসন খুঁজছে ‘কোরাসের পাঁচটি ছেলে এবং একটি মেয়ে’। হঠাৎ আতঁচৎকার কেউ খুন হয়ে গেল। দর্শক অর্থাৎ কোরাসের দল তাকে খুঁজে— পায় না, আসে কোটাল। জানিয়ে দেয়, ‘সব মিথ্যে, সব গুজব’। এমন আঁটোসাঁটো বয়ানে নাটক বিন্যস্ত যে দর্শকের নাট্য ঘটনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই। কেননা নিজস্ব পরিসরের স্বস্তি নেই দর্শকের। পরিসরে বিন্যাসে প্রথমেই তাকে অস্বস্তির মধ্যে রেখেছেন নাটককার। এরপর তিনি নাটকের বিষয়বস্তু এবং নাট্যায়নে অস্থির করে তুলেছেন দর্শককে। খুন হয়ে যাওয়া খোকা বারবার দর্শককে জিজ্ঞাসা করে কেন তারা এখনো চুপ করে আছে? ‘হত্যা’ এখানে ঘটমান-বর্তমান। সমগ্র নাটকই সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলে কখনো বিরোধিতায় কখনো সমর্পণে। ‘মিছিল’ পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে না অথচ নিছক প্রতিবেদনও হয়ে ওঠে না। আজ-কাল-পরশু, প্রতিদিনের যাপনে খুন হয়ে যাওয়া ‘খোকা’ শুধুমাত্র এই অদ্ভুত নিস্পৃহতার কারণ জানতে চায়, কিন্তু কখনো প্রশ্ন করে না কেন তাকে খুন করা হল। কেননা এ প্রশ্নে যে ডিসকোর্স তাতে প্রয়োজন বিষয়গত ভাব-বিনিময়। বাদল সরকার এখানে একটি সত্যকে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন। দর্শকের একটা দায় থাকে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার। ‘মিছিল’ নাটকের আঙ্গিক প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক কাবেরী বসু লিখেছেন—

“এ নাটকে কোথাও শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় না নাটককার। একেবারে ব্যক্তিগত স্তরেই যেন প্রতিটি দর্শককেই তিনি বলেন এই ঘটনা আমি দেখেছি—আপনারাও দেখেছেন— ... আমি পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজে পাইনি—পাইনি সেই ‘মিছিল’ যার অপেক্ষায় রয়েছি—আমাকে কী বলবেন আপনারা—নৈরাজ্যবাদী?—বলুন—তবু শুনতে হবে আমার কথা—শুনতেই হবে কেননা আমি আপনাদেরই একজন।”^{২২৪}

বলাবাহুল্য এভাবেই থার্ড থিয়েটারের জন্য লিখিত নাটকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ‘মিছিল’-এর লিখিত ভাষ্য নির্মাণে।

বাদল সরকার প্রথমে অঙ্গনমঞ্চ এবং সেখান থেকে যতবেশি তিনি মুক্তমঞ্চের দিকে যাচ্ছেন ততবেশি তিনি সাধারণ দর্শকের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদের উপযুক্ত বিষয় এবং আঙ্গিককেই বেছে নিয়েছেন। যাদের জন্য নাটক তাদের মতো করে উপস্থাপন করতে হলে এই ধরনের আঙ্গিককেই তিনি উপযুক্ত বলে মনে করেছেন। এই কারণেই বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের

মধ্যে অনেকে লোকনাট্যে প্রভাব লক্ষ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। এই আঙ্গিক দেখা গেল ‘লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’র মতো বেশ কিছু নাটকে। ‘লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’ নাটকটি অনেকটা কবিগানের আঙ্গিক অনুসরণ করে লেখা। এই নাটকে কোন অঙ্ক দৃশ্য বিভাজন নেই। কবিগানে যেমন কবির লড়াইয়ের চাপান-উতোর থাকে তেমনি এখানেও সেই আঙ্গিকটি রয়েছে। তবে কবিগানের মতো আক্রমণের প্রতি আক্রমণের তীব্রতা নেই। কারণ বক্তব্য-বিষয় একেবারে ভিন্ন। এই নাটকের প্রধান দুটি চরিত্র পচা ও খুড়ো। এই দুজনের চাপান-উতোরের মধ্য দিয়ে নাটকের মূল বক্তব্য উঠে আসে। এদের চাপান-উতোর—

“পচা ।।

বলি ওহে কবিবর!

একটি কথা শুধাই তোমায় দাও দেখি উত্তর।

খুড়ো ।। একটা কেন দশটা শুধাও না!

(গান: পাঁচালীর সুর)

পচা ।। আমিও মানুষ বাবুও মানুষ দু’টোপ করে হাত দু’ পা দু’ চোখ তবুও কেন
আমরা ভিন্ন জাত?”^{২২৫}

কবিগানের আদলে এই নাটকের বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ধরনের লোকনাট্যের আঙ্গিকের মধ্যেই আসলে সমাজের শ্রেণি বৈষম্যকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এখানে একটি চরিত্রের নাম দেওয়া হয়েছে খুড়ো। এই খুড়ো কোন সম্পর্ক বোঝাতে নয়, আসলে খুড়োর কলের মতো এই গণতন্ত্রের সিস্টেমগুলোকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। খুড়ো তাই এই সিস্টেমের সমর্থনে সাওয়াল করে, অন্যদিকে এই সিস্টেমের শিকার হয়ে পচতে থাকা অতি সাধারণ মানুষ যাকে ‘পচা’ বলা হয়েছে, সে তার পেটের টানে খুড়ো নামক সিস্টেমকে প্রশ্ন করে। খুড়োও তার উত্তর দেয়—

“খুড়ো ।।

(গান: সুর—রামপ্রসাদী)

মা গো এদের বুঝিয়ে দে না।

এদের ধ্যান ধারণা নেইকো কিছুই, গণতন্ত্র তাও বোঝে না।

মা গো এদের বুঝিয়ে দে না।

গণতন্ত্রে সবাই স্বাধীন, সবাই থাকে বেঁচে বর্তে,

সাধ্য থাকলে বুদ্ধি থাকলে সবাই পারে খেতে পরতে।

যারা অবোধ, শুধু তাদের মা গো

এমন রাজ্যেও ভাত জোটে না।

মা গো এদের বুঝিয়ে দে না।

খোলা বাজার আছে পড়ে স্বাধীনভাবে বেচা কেনা,”^{২২৬}

খুড়ো খোলা বাজারের কথা বললেও পচারা খোলা বাজার চায় না। তারা এই সব বেচাকেনায় থাকতে চায় না। তারা বলে, “খোলা বাজার আমাদের দরকার নেই। বাজারই দরকার নেই আমাদের! আমরাই বানাবো, আমরাই খাবো, বেচা কেনার ধার ধারবো না।”^{২২৭}

বাদল সরকারের নিজস্ব দর্শনটি এখানে পচার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। বলা বাহুল্য একটা সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখায় ‘লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’।

বাদল সরকার একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে যুক্ত হয়েছিলেন সক্রিয় রাজনীতিতে। পরে যখন সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থিয়েটারে কিছু করার কথা ভেবেছেন, তখন সেই মাধ্যমেই তিনি তার দর্শনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সমাজের অসম বিন্যাসকে, গ্রাম-শহরের যাবতীয় অন্যায় বিভাজনকে বাদল সরকার মেনে নিতে পারেননি। নিজে কলকাতা মহানগরের নাগরিক, মধ্যবিত্তের চেতনা তার চোখে। এতদিনের নাটকগুলিতে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটের কথাই বারবার উঠে এসেছে। কিন্তু এবার সেই মধ্যবিত্তের গণ্ডিকে অতিক্রম করে যাওয়ার পালা। তিনি বারবার ছুটে গেলেন গ্রামে। এতদিন যা জানতেন না, এবার তিনি জানলেন। শুধু তাই নয় মধ্যবিত্তের আপাত নিরাপদ-জীবনে যারা স্বস্তিতে আছেন, তাদেরকেও তিনি জানাতে চান, যারা এখনো বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে তাদের কথা। এভাবেই একদিন রচিত হল নাটক ‘ভোমা’। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৬ সাল। এই নাটকটির কথা বলতে গিয়ে বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

“... ভোমা লেখার পেছনে একটা ইতিহাস আছে। এটা আমি একসঙ্গে নাটক হিসেবে লিখিনি। আমার যে অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে নাড়া দিয়েছে, উত্তেজিত করেছে, ক্ষেপিয়েছে, সেগুলো প্রায় ডায়রির মতো কতকগুলো দৃশ্যের আকারে বেরিয়ে এসেছে, বিচ্ছিন্নভাবে তিন বছরের ওপর সময় জুড়ে এই দৃশ্যগুলো আমার কাছে পড়েছিল। ... নাইজিরিয়া থেকে ফিরে এসে আমি বেকার ছিলাম, সেই সময় সপ্তাহে দেড়দিন দু-দিন করে রামচন্দ্রপুর, সিংজোল ... এই সমস্ত অঞ্চলটা বনগাঁ অঞ্চলে, ওইখানে ঘুরেছি। ... এইখানেই প্রথম গ্রামীণ ভারতের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়। ভূমি সম্পর্ক, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বলতে কী

বোঝায়, এইসব আমি প্রথম বুঝতে পারি।”^{২২৮}

এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা নাটক হল ‘ভোমা’। আমাদের দেশের মতো আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে গ্রামীণ জীবনের অর্থনীতির মূল ভিত্তিটা কোথায়— এই বিষয়ে বাদল সরকার তাঁর নিজের মতো করে একটা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এই নাটকে কৃষিভিত্তিক একটি দেশের ভূমি সমস্যার কোন মৌলিক সমাধান না করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কথা বলা যে কতটা অর্থহীন, গ্রামীণ ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে এটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। বাদল সরকারের এই ধরনের চিন্তা চেতনার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ‘ভোমা’ নাটকে। এই নাটকে গল্প নেই, ধারাবাহিকতা নেই। ‘যা বলার তা অভিনেতারা সরাসরি বলেন দর্শকদের, কথা দিয়ে, শব্দ দিয়ে, সারা শরীর দিয়ে।’^{২২৯} যে চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে এই নাটকটি গড়ে উঠেছে, নাটকের সেই ‘ভোমা’ সম্পর্কে নাটককার জানিয়েছেন—

“ভোম জঙ্গল। ভোমা আবাদ। ভোমা গ্রাম। ভারতবর্ষের বারো আনা লোক গ্রামে থাকে। কোটি কোটি ভোমা। ভোমাদের রক্ত খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি শহরে।”^{২৩০}

ভোমা আসলে গ্রামীণ, সে দেহাতি, দেশজ। সেই গ্রামকে বঞ্চিত করে গড়ে উঠেছে শহর। একদিকে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি, অন্যদিকে শিল্পনির্ভর নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির—এই দু’য়ের অসম বিন্যাস ও তার দ্বন্দ্বিক রূপকে নাটককার ভোমার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন—

“এক ।। শুনুন শুনুন-আমি আজ আপনাদের একটা গল্প শোনাবো।

.....

একটা ছোট্ট গ্রাম, গ্রামের নাম ভাদুরিয়া, অঞ্চল শিমুলপুর, জেলা চব্বিশ পরগনা... গ্রামে আড়াইশো পরিবার, তার ষাটটা পরিবারের জমি তিন বিঘের কম, নব্বইটা পরিবারের কোনো জমিই নেই, তারা পরের জমিতে জন খাটে, দিনে চার টাকা মজুরি পায়। ... চার টাকা রোজের কাজ রোজ জোটে না,... আজকাল তবু নলকূপের কল্যাণে কিছু রবিশস্য গম বোরোধান হচ্ছে ... কিন্তু ইলেকট্রিসিটি নেই, ডিজেল পাম্প, ডিজেল মেলে না, সার মেলে না, সারের দাম দ্বিগুণ হয়ে গেলো, ইউরিয়া কন্ট্রোলে আগে ছিল এক টাকা পনেরো পয়সা কেজি, এখন এক টাকা পাঁচানব্বই পয়সা কেজি—

দুই ।। রাস্তায় জল জমছে প্রতি বছর, কলকাতা গ্রাম না শহর?

তিন ।। কলকাতায় আছও কম্পোজিট স্টেডিয়াম হলো না, ছি ছি ছি!

- চার || হুগলি নদীর দ্বিতীয় সেতু নিয়ে খালি টালবাহানা, কবে কাজ হবে?
- পাঁচ || পাতাল রেল কলকাতায়— ভারতে প্রথম, কিন্তু হচ্ছে কই?
- এক || ... ইলেকট্রিসিটি নেই, কিন্তু খুঁটি আছে তার আছে— আজ তিন বছর।
খুঁটি হেলে গেছে, তার খুলে এনে গেরস্থ কাপড় শুকোয়! যদি ইলেকট্রিসিটি
আসে, যদি খালটা সংস্কার হয়, যদি আরো নলকূপ বসে— মাত্র সাঁইত্রিশ
লক্ষ টাকা খরচ, তবে সোনা ফলে যাবে সারা শিমুলপুর অঞ্চলের দশ
হাজার বিঘে জমিতে—
- দুই || দ্বিতীয় সেতু— কবে হবে?
- তিন || স্টেডিয়াম— কবে হবে?
- চার || পাতাল রেল— কবে হবে?”^{২৩১}

গ্রামে থাকা বারো আনা লোকের সঙ্গে শহরে থাকার চার আনা লোকের আকাশ-পাতাল ব্যবধান নাটককার অনুভব করেন। বাদল সরকার নিজেও একজন মহানগরের মানুষ। মধ্যবিত্ত সেই গণ্ডিতেই এতদিন আবদ্ধ ছিলেন, জানতেন না এতোসব। ‘এক’ সংখ্যক চরিত্রের মতোই জেনেছেন বলে এবার তিনি জানাতে চান। আর সেখানেই ‘ভোমা’ একটা অবলম্বন। ‘ভোমা’র গল্প একটা মোচড় এ নাটকে। তবে “চারিপাশে যা দেখে যা শিখে যা অনুভব করে ধাক্কা খাই, আঘাত পাই, রেগে যাই, তাই বেরিয়ে এসেছিল নাটকের চেহারার টুকরো টুকরো ছবিতে।”^{২৩২} এই টুকরো টুকরো ছবির মালায় গ্রাম-শহর সম্পর্ক বিন্যাস একটি অন্য মাত্রায় তুলে ধরেছেন নাটককার। গ্রাম-শহরের এই এলিয়েনেশনের আশ্চর্য স্বরূপটির কথা বলতে গিয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

“তঁার নাটকের মধ্যে যে এলিয়েনেশনের ছবি আমরা দেখি, গ্রাম-শহরের মধ্যে যে এলিয়েনেশন আমরা দেখি, একই দেশে থেকেও আমরা যেন দূরের মানুষ হয়ে আছি; শহরের মানুষ আর গ্রামের মানুষের একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। একটা ভয়ঙ্কর এলিয়েনেশন তৈরি হয়ে গেছে ... তাই বাদলদা যখন তঁার নাটকে দূরত্বের কথা বলেন, এবং ঘনিষ্ঠ হবার জায়গাটা অনুসন্ধান করেন, তখন মনে হয় যে একটা বড়ো কাজ হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে ...।”^{২৩৩}

‘ভোমা’ নাটক এবং তার নাটককার সম্পর্কে এর থেকে আর ভালো মূল্যায়ন বোধ করি হয় না। মোহিত চট্টোপাধ্যায় নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুধাবন করতে পেরেছেন যে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে রয়েছে একটা ভয়ঙ্কর গ্যাপ। বাদল সরকার সেই গ্যাপটাকে দূর করতে চেয়েছেন। ষোলো বছর বয়সে ভোমা সুন্দরবনে বন হাসিল করতে এসেছিল। কুড়ি বছর বয়সে ভোমা তিন ঘন্টায়

একা যে গাছ ফেলতো, দু'জনকে সারাদিনে তা পারতো না। বাহান্তর বছর বয়সে সে দু'কিলো চালের ভাত খেতে পারত। সে বাঘের সঙ্গে লড়েছিল। ভোমার বাবা, মা ভাই কেউ তেতুলগোলা জল খেয়ে মরে গেছে, কাউকে কুমিরে টেনে নিয়ে গেছে। ভাত নেই, চারিদিকে শুধু নোনা জল। ভোমা মিথ হয়ে ওঠে। প্রতীকী ব্যঞ্জনা পায়। বারো আনা মানুষের মনের মিথ ভোমা। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য ভোমা কথার অনুষঙ্গে 'ভূমি' বা 'ভূমা'ও আসে মনে। কেতকী কুশারী ডাইসন তাই লিখেছেন—

“... বাদলবাবুর বক্তব্য আমাদের চৈতন্যে fermenting yeast-এর মতো কাজ করেছে।

ভোমা'য় বাদলবাবু রূপক এবং প্রতীকের ব্যবহারে স্মরণীয় দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'ভোমা কে বা কী'-এই প্রশ্নটা বারবার তুলে ধরে, নানান দিক থেকে আলোকপাত করে, আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করেছেন। ভোমার অর্থ এবং স্বরূপ আমাদের মানসে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ভোমাকে কখনও ভূমির কখনও ভূমার অনুষঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। ভোমা মাটির কাছাকাছি খেটে-খাওয়া প্রাকৃত মানুষ, আইরিশ কবি প্যাট্রিক কাভানা-র বিখ্যাত দীর্ঘকবিতা The Great Hunger-এর নায়ক প্যাট ম্যাগুইয়ারের মতো ভূখা মানুষ, সভ্যতার ভিত্তি। কখনও দর্শকদেরই চেয়ারের মাঝখানে ভিখারির গোঙানির মধ্যে তার আর্তি শ্রুতিগোচর হয়ে ওঠে।”^{২৩৪}

ভোমা দর্শকের মনে একটা ভিন্ন মাত্রা তৈরি করে। ভোমার ক্ষুধা ও যন্ত্রণার ভেতর ভারতবর্ষের বিচিত্র অর্থনীতির জটিল পাকে ও শোষণে রিক্ত নিঃস্ব গ্রামীণ মানুষের গোটা চেহারাটা আভাসিত হয়ে ওঠে। ভোমার আর্তনাদ বস্তুত এই আধাসামন্ততান্ত্রিক দেশের ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুরদের আবহমানকালের আর্তনাদ। কিন্তু এই আর্তনাদই শেষ নয়। নাটককার 'ভোমা'-য় শেষ পর্যন্ত জীবনের ব্যক্তি ও অখণ্ডতার উপরেই জোর দিয়েছেন। তাই নাটকের শেষে দেখি ভোমারা আবার জেগে ওঠে, চারপাশে নানা জঙ্গল হাসিল করে তারা আবার জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভোমা মনুষ্যত্বের পরাভব নয়, মনুষ্যত্বের জাগরণ। নিপীড়িত শোষিত মানুষের উত্থানের স্বপ্ন হলো 'ভোমা'। নাটককারের এই স্বর উচ্চারিত হয়েছে 'এক' সংখ্যক চরিত্রের মধ্য দিয়ে—

“... ভোমা আছে! আমি জানি ভোমা আছে! জানি, তাই আমার স্বপ্ন আছে।
স্বপ্ন। ভোমা উঠছে। ভোমা উঠছে। মরচে ধরা কুড়ুল কুড়িয়ে নিচ্ছে হাতে,
শান দিচ্ছে। চারিপাশে জঙ্গল। ভোমার চোখে জঙ্গল। হাত শক্ত হচ্ছে ভোমার!

সাঁড়াশি আঙুল কুড়ুলের হাতলে চেপে বসছে। ছেঁড়া চোখে বাঘমারা আগুন
জ্বলে উঠছে! ভোমা উঠছে! আমরা উঠছি!”^{২৩৫}

‘ভোমা’ নাটকের পর তৃতীয় ধারার আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক ‘সুখপাঠ্য ভারতের
ইতিহাস’। নাটকটির রচনাকাল ১৯৮৬। একটি সাক্ষাৎকারে এই নাটকের রচনা প্রসঙ্গে বাদল সরকার
বলেছেন—

“এই সমাজটা বলবৎ রাখার জন্য প্রথম কথা কতগুলো সত্য গোপন করা হয়।...
আমাদের থিয়েটারের একটা কাজ হচ্ছে এই যে-সত্যগুলো চাপা দেওয়া হচ্ছে
বা বিকৃত করা হচ্ছে বা যেখানে অর্ধ-সত্য বলা হচ্ছে সেগুলোকে উদ্ধার করে
প্রচার করা। আর একটা হচ্ছে মিথগুলো ফাইট করা। এখন এটা করতে গেলেই
কিন্তু অনেকগুলো আসপেক্ট বেরিয়ে পড়ে। অর্থাৎ জাস্ট সমাজকে বদলাও তা
নয়, বিভিন্ন আসপেক্ট। একটা যেমন সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাসে-এ বেরিয়ে
এসেছিল। কেন? কারণ খুব স্বাভাবিকভাবে একটা লেখাপড়া জানা হয়তো
ইউনিভারসিটি পাস করা ছাত্র-ছাত্রীকেও যদি জিগ্গেস করা যায় আমাদের
দেশে ব্রিটিশরা কী করেছিল? অত্যাচার করেছিল, শোষণ করেছিল। কিন্তু
কীরকম ভাবে শোষণ করেছিল বললে তা অনেকেই জানে না।... এগুলো
বেশিরভাগ লোকই জানে না। তখন মনে হল ওটা একটা আসপেক্ট, ওটা বলার
দরকার আছে। তা সেটা একটা সুখপাঠ্য বেরোলো।”^{২৩৬}

নাটককারের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে তিনি ইতিহাসের ভেতর যে সমস্ত সত্য লুক্কায়িত থাকে
তিনি তা বের করে আনার তাগিদ অনুভব করেছেন। প্রচলিত ইতিহাসে যেভাবে মানুষকে অতীত
জানানো হয়, তা যে সত্য নয়, তার ভেতর যে আরো গভীরতর সত্য লুক্কায়িত আছে একথাই তিনি
বলতে চান। এই নাটকে মূলতঃ ব্রিটিশ পিরিয়ডকে ধরা হয়েছে। তবে ইতিহাসকে নাটকের ভিতর
দিয়ে জানাতে গেলে তার আঙ্গিক যায় বদলে। শিক্ষক ইতিহাসের ক্লাস নিচ্ছেন— এভাবেই শুরু
হয় নাটক। জনগণকে ইতিহাস জানানো মূল উদ্দেশ্য বলে নাটকে দর্শকদের ক্লাসের অংশ করে
নেওয়া হয়েছে। কোন টিকিট কাটা দর্শক নয়, সর্বসাধারণ এখানে দর্শক। যেমন একটি ক্লাসে ফাস্ট
পিরিয়ড, সেকেন্ড পিরিয়ড থাকে নাটকেও তিনটি পিরিয়ড রয়েছে। ক্লাসের এই তিনটি পিরিয়ডে
প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার সময়কালকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। আবার তিন
দিকের দর্শকদের তিনটি ক্লাসের ছাত্র বলে ভাবা হচ্ছে। বাদল সরকার মঞ্চ নির্দেশনায় স্পষ্ট করে

বলেছেন—

“এ নাটক প্রচলিত মঞ্চ অভিনয়ের জন্য নয়। খোলা মাঠে অথবা ঘরের মেঝেতে অভিনয় করতে হয়। দর্শকরা বসবেন অ্যারিনার মোটামুটি তিন দিকে। চতুর্থ দিকে একটি প্ল্যাটফর্ম, তার দু’পাশ থেকে প্রবেশ পথ। প্ল্যাটফর্মের পিছনে একটি পর্দা বা পার্টিশন, যার আড়াল থেকে সরাসরি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করা যায়।

তিন দিকের দর্শক যেন তিনটি ক্লাসের ছাত্র। প্রতি ক্লাসে কমপক্ষে দু’জন করে অভিনেতা ছাত্রের ভূমিকায়— দর্শকদের প্রথম সারিতে বসা গোড়া থেকেই।”^{২৩৭}

নাটককারের মঞ্চ নির্দেশনায় দেখা যাচ্ছে, থার্ড থিয়েটারের আঙ্গিকে জনগণকে থিয়েটারের অংশ করে নিয়েই তাদের ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস জানানো হচ্ছে। নির্মাণশৈলীর দিক থেকে এই নাটকের বিষয়কে এভাবেই তুলে এনেছেন নাটককার। নাটকে দেখা যায় ক্লাসে ফাস্ট পিরিয়ড হবে ইন্ডিয়ান ফাস্ট পিরিয়ড অর্থাৎ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া।

“শি-২ ॥ স্যার, কোন্ পিরিয়ড?

কর্তা ॥ ফাস্ট পিরিয়ড।

শি-৩ ॥ না স্যার, ভারতের ইতিহাসের কোন্ পিরিয়ড?

কর্তা ॥ ডার্ক পিরিয়ড। অন্ধকার যুগ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। কিন্তু ইন্ডিয়ান ইতিহাসের?

কোন্ পিরিয়ড? কে বলতে পারে?

শিক্ষকরা ॥ স্যার, ফাস্ট পিরিয়ড।

কর্তা ॥ রাইট। গুড টিচার্স। ইন্ডিয়ান ফাস্ট পিরিয়ড। নাও-টু ক্লাস!”^{২৩৮}

এখানে ভারতের নয় ইণ্ডিয়ান ইতিহাসকে ফাস্ট পিরিয়ড বলা হচ্ছে। যেন বলতে চাওয়া হচ্ছে যে ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষ থাকছে না। ব্রিটিশদের দখলে ইণ্ডিয়া হয়ে যাচ্ছে। প্রথমত বাণিজ্য করতে আসার সময়কে ধরা হচ্ছে। ইংরেজ ফরাসি ওলান্দাজ, পর্তুগিজরা যখন বাণিজ্য করতে আসে তখন ভারতবর্ষ নিজস্ব শিল্পে সমৃদ্ধ। চাষের জমির মালিক ব্যক্তি নয়, গ্রাম সমাজ। গ্রামে কুটির শিল্পী হিসেবে ছিলেন—তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতোর, কাঁসারি, স্যাকরা ইত্যাদি। গ্রামের খাদ্য, গ্রামের সব কিছু গ্রামেই হতো। এককথায় সেই সময় ভারতবর্ষের গ্রাম ছিল সমৃদ্ধ। কিন্তু যেদিন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হল সেদিন থেকে গ্রাম-শহরের মধ্যে তৈরি হলো অন্যায় বিভাজন। গ্রাম-শহরের এই অন্যায় বিভাজনের কথা বাদল সরকার ইতিপূর্বেও ‘ভোমা’ নাটকে

বলেছেন। এই নাটকে যেন ইতিহাসের সত্য উদ্ঘাটনে তার একটা কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। এই নাটকেও ভূমি, ভূমির সঙ্গে কৃষকের সম্পর্কের কথা এসেছে।

ভারতবর্ষের ইন্ডিয়া হওয়ার ইতিহাসের সূত্রে চলে আসে বিশ্বের ইতিহাসের অনিবার্য প্রেক্ষাপট। বণিক শাসক হয়ে যায়। বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি তাদের হাতে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে খাজনার উর্ধ্বসীমা চৌত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড বেঁধে দেওয়া হয়। একদিকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব, আমাদের দেশে তখন চলছে মন্বন্তর। ভারত লুটের টাকায় পুঁজি জমলো ব্রিটেনে, হলো শিল্প। এই পর্বটিকে নাটককার বলেছেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সেকেন্ড পিরিয়ড—

“হিস্টোরি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া। সেকেন্ড পিরিয়ড। মার্কেটাইল ক্যাপিটাল ইজ্
রিপ্লেস্‌ড্‌ বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল।”^{২৩৯}

এভাবেই ইতিহাসকে দেখেছেন বাদল সরকার। যে শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ডে হলো তার জন্য বাজার চাই। ভারতের মতো উপনিবেশে বাজার দখল করতে হলে ভারতবর্ষীয় শিল্পকে ধ্বংস করতে হবে। ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান দেশ করতে হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ—

“ব্রিটানিয়া ॥ ... উহারা চাষ করিবে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এই ইতিহাস।

কর্তা ॥ সে কি কথা? কৃষি-প্রধান?

ব্রিটানিয়া ॥ হ্যাঁ, এই ইতিহাস। আজ হইতে। কালক্রমে ভারতবাসীরাও তাহা
বিশ্বাস করিবে।”^{২৪০}

এর ফলে যে ইতিহাস নির্মিত হলো তা হল ভয়াবহ। ভারতের কুটির শিল্পীরা বেকার হলো। সমস্ত জাতিই চাষের দিকে গেল। জমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জমিদার নামক এক দারুণ কল তৈরি করে মুনাফা লুটতে শুরু করল। স্যাকরা, কামার, কুমোর সবাই চাষি। শিল্পের বাজার দখল করল ব্রিটিশ। সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে গেল শিল্পজাত দ্রব্য। সংযোগ মাধ্যম প্রয়োজন হলে তৈরি হল রেলপথ। এভাবেই এল বাণিজ্যের প্রসার। এই পর্বকে নাট্যকার চিহ্নিত করেছেন থার্ড পিরিয়ড হিসেবে— “হিস্টোরি থার্ড পিরিয়ড। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল চেঞ্জিং টু ফিন্যান্স ক্যাপিটাল।”^{২৪১}

এর ফলে বাংলার বুকে নেমে এলো ছিয়ান্তরের দুর্ভিক্ষ। হাজার হাজার মায়ের কোল খালি হলো।

“মা ॥ ... ছিয়ান্তরে গেল এক কোটি খোকা। তারপর এক শ পঁচিশ বছরে একত্রিশটা
দুর্ভিক্ষ। তাতে মরেছে কম করে তিন কোটি খোকা। ... শুধু খাজনা খাজনা
খাজনা। আর খোকা শুধু মরছে মরছে মরছে।”^{২৪২}

ভারতে তখন ব্রিটেনের মহারানীর রাজত্ব। নয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শুরু হলো প্রতিযোগিতা। বাজার দখলের প্রতিযোগিতা। ফল মনোপলি ক্যাপিটাল। নাটকে ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবের কথাও

এসেছে। যে বিপ্লব পুঁজিবাদের অবসান চেয়েছিল কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। কারণ হিসেবে বাদল সরকার বলেছেন— “পুঁজি দুনিয়াতে এসেছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্ত আর পুঁজ মেখে!”^{২৪৩} উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে গেল কিন্তু এই পুঁজিকে বাঁচিয়ে রেখেই। এখানেই আমাদের ইতিহাসের অমোঘ নিয়তি তৈরি হলো। আমরা আমাদের যে ইতিহাস পড়ি তা অনেকটা সুখে পড়ি। ‘সুখপাঠ্য’ হয়ে ওঠে ভারতের ইতিহাস। এই ইতিহাসকে এখানে কষাঘাত করা হয়েছে অন্য ইতিহাসের প্রকৃত ইতিহাস এনে। সে ইতিহাস সুখে নয়, অসুখে পরিপূর্ণ। এটাই নাটকের মূল বক্তব্য। এইভাবে একদিকে প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ঘাটন, অন্যদিকে সেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম-নিষ্ঠুর দিকটি নাটককার এই নাটকে তুলে ধরেছেন। সব মিলিয়ে বলা যায় একজন শিল্পীর ইতিহাস চেনার এক অসাধারণ দলিল ‘সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস’।

বাদল সরকার সবসময় শ্রেণিবৈষম্যহীন এক সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখেন। এই চিন্তা ধারার একটি অন্যতম নাটক ‘হট্টমালার ওপারে’। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৭। নাটকের কাহিনি লীলা মজুমদার এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিশোর উপন্যাস ‘হট্টমালার দেশে’ থেকে লিখিত। নাটকের মুখবন্ধ অংশে সে কথা জানিয়ে বাদল সরকার লিখেছেন—

“শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী লীলা মজুমদারের যৌথ-ভাবে রচিত কিশোর উপন্যাস ‘হট্টমালার দেশে’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ‘সন্দেশ’ পত্রিকায়। পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা হাতে এসেছিল, মাঝখানে দু’একটি সংখ্যা বাদ, শেষটা একেবারেই পাইনি। এই অসম্পূর্ণ পাঠ ‘হট্টমালার ওপারে’ নাটকটির প্রেরণা।”^{২৪৪}

নাটককার নাটকটি লেখার প্রেরণাটুকুই পেয়েছেন। মূল কাহিনি গ্রহণ করলেও ভাবনা এবং বক্তব্য তার নিজস্ব। এই নাটকে একটা টানা গল্প বা কাহিনি আছে। বলা ভালো নাটকটি মূলতঃ কাহিনিপ্রধান। নাটককারের সহজাত স্বভাবধর্ম অনুযায়ী গল্পের গাঁথুনির মধ্যে দিয়েই মজা সৃষ্টি করেছেন। আর মজা করতে করতেই তিনি তাঁর বক্তব্যের কিনারে পৌঁছাবার চেষ্টা করে গেছেন। একটা রূপকের আদলে নাটককার তাঁর মূল ভাবনা বা বক্তব্য তুলে ধরেছেন। একদিকে গল্পের মজা এবং অন্যদিকে নাটককারের বক্তব্য— এ দুটির মধ্যে অসম্ভব সমন্বয় রেখে নাটকের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ফলে দর্শক বা পাঠক দুটোই সমানভাবে উপভোগ করেছেন। কী আছে এই নাটকে? চুরি করে বেড়ায় দুটি চোর। চুরি করা তাদের স্বভাব নয়, অন্নসংস্থানের কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি বলেই

তারা চুরি করে। একবার চুরি করতে গিয়ে তাদের প্রায় ধরা পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। লোকের তাড়া খেয়ে কোনোক্রমে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সেবার প্রাণ বেঁচে যায়। নদী পার হয়ে তাদের খেয়াল হয়, তারা এক অজানা দেশে এসে পড়েছে। হট্টমালার যে দেশে তারা এতোদিন বাস করেছে, এই অজানা দেশটি সেরকম নয়। এইরকম দেশ তারা এর আগে কখনও দেখেনি। এই অজানা দেশটিতে আইনের কোনো কড়াকড়ি নেই। আষ্টেপৃষ্ঠে কোন বিধির বাঁধন নেই, প্রাণ খুলে ঘুরে বেড়ানো যায় এখানে। কোন বেড়াজালে আটকে পড়ার আশঙ্কা নেই। দেশটিতে সব খোলামেলা। খাওয়া-পড়ার কোনো অভাব নেই। সুতরাং চুরি করারও কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখানে সকলকেই কাজ করতে হয়—

“ডাক্তার।। ... আমরা সবাই কাজ করি, সাধ্যমতো কাজ করি। তাই সবাই দরকারমতো সব কিছু পাই। কাজ না করলে কিছুই পেতাম না।”^{২৪৫}

হট্টমালার ওপারের অজানা দেশটির সবাই আনন্দের সঙ্গে কাজ করে। ফলে খাওয়া-পড়ার জন্য হট্টমালার দেশের মতো উজ্জ্বলতা করার দরকার পড়ে না। তারা তাদের মত শ্রম দেয়। বিনিময়ে খাদ্য, বাসস্থান, জামাকাপড়, স্বাস্থ্য-শিক্ষা—সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যায়। দেশটিতে তাই মুদ্রা বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে মুদ্রাসঞ্চয় এবং ধনবৃদ্ধি বা বঞ্চনার কোন ব্যাপার নেই। সবকিছুতে সবার সমান অধিকার। বাঁধনহীন খোলামেলা এই দেশে চোর দুটি প্রাণের আনন্দে বাস করতে থাকে। এই হলো নাটকের কাহিনি।

আপাতত ভাবে নাটকের এই কাহিনি হতে পারে রবীন্দ্রনাথের ‘সব পেয়েছির দেশ’। আসলে এই কাহিনির রূপকে বাদল সরকারের নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন সেটি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে দেশের কথা এখানে বলেছেন তা হল কল্পনার রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক। নাটককার কল্পনায় সেই স্বপ্নের দেশের গল্প বলেন। এপারের দেশের ব্যবস্থাই একজন মানুষকে চোর হতে বাধ্য করে। হট্টমালার ওপারের দেশে পৌঁছে গেলে আর চৌর্যবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। চোর দুটি স্বপ্নে সেই দেশে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কিভাবে সেই স্বপ্ন পূরণ সম্ভব? সেটিও নাটককার সাঁতার কাটার রূপকের দ্যোতনায় বলেছেন। অনেক বাধা-বিপত্তি এবং সংগ্রাম-লড়াই-মেহনত পেরিয়ে ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে তবে সে দেশে পৌঁছানো যেতে পারে। সত্তরের দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নাটককারের এই বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বটে। নাটককারের বক্তব্য হল, মানুষের ইতিহাস যদি শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস হয়, তাহলে কোন সংগ্রাম ছাড়াই শ্রেণিহীন সমাজে পৌঁছানো যায় না। নাটককার এখানে এই শ্রেণিহীন সমাজ গঠনেরই স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন সাম্যবাদের। আর সেখানে তাঁর নাটকই হয়েছে অন্যতম হাতিয়ার। ‘হট্টমালার ওপারে’ নাটক তাঁর সেই সাম্যবাদী চেতনা বহিঃপ্রকাশ।

বাদল সরকারের নাটকগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় একদিকে যেমন তিনি মৌলিক নাটক রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তেমনি, যখন যেমন প্রয়োজন মনে করেছেন বহু বিদেশি নাটকও বাংলায় অনুবাদ করে মঞ্চায়ন করেছেন। এই জাতীয় একটি নাটক হলো ‘গঞ্জী’। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৯ সাল। ‘গঞ্জী’ একটি অনুবাদ মূলক নাটক। অবশ্য বাদল সরকার অনুবাদ না বলে একে ভাষান্তর বলেছেন। মূল নাটক বের্টোল্ট ব্রেশ্টে-এর ‘দ্য ককেশিয়ান চক্ সার্কল্’। বাদল সরকার এ নাটক সম্পর্কে বলেছেন—

“ ‘গঞ্জী’ নিয়ে একটা নতুন পথ চলা শুরু হল। যেহেতু বিষয়বস্তুই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাই যে সূত্র থেকেই হোক, ভারতীয় বা বিদেশী, সেটা নেওয়ায় আমাদের কোনও বিবেকযন্ত্রণা ছিল না (এবং এখনও নেই)। অবশ্য সেটাকে আমাদের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। ... ব্রেশ্টের নাটক করব বলেই এটা করা নয়, আমি দেখলাম, এটা একই সঙ্গে ভারতীয় ও সমকালীন।”^{২৪৬}

নাটকটিতে কোন ‘অঙ্ক’, ‘দৃশ্য’ বিভাজন নেই। অবশ্য থার্ড থিয়েটার পর্বের প্রায় সব নাটকেই নাটককার সচেতনভাবে ‘অঙ্ক’, ‘দৃশ্য’ বিভাজনের প্রথাগত ধারণা থেকে সরে এসেছেন। নাটকটির মূল বার্তা হলো, যে মা শিশুটিকে ভালোবাসবে তারই শিশুটিকে পাওয়া উচিত। মায়ের শিশুর প্রতি অধিকারের এই তুলনায় নাটকে চলে আসে ভূমির প্রতি কৃষকের অধিকারের প্রশ্ন। যে অধিকারের প্রশ্ন আমরা ‘ভোমা’ নাটকে উত্থাপিত হতে দেখেছি। এই নাটকে আবার সেই অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছেন সাধারণ দর্শকের সামনে। যে কৃষক জমি চাষ করে তারই সেই জমিতে অধিকার থাকা উচিত। এটিই নাটকের মূল বক্তব্য। নাটকটির উদ্দেশ্য স্পষ্ট—

“এই কথাটা যেহেতু আমাদের দেশের ক্ষুদ্র চাষি ও ভূমিহীন কৃষক-শ্রমিকদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া খুব দরকার, তাই নাটকটা সমকালীন ও ভারতীয়—আমার এই ধারণাটা সমর্থন পেল।”^{২৪৭}

নাটক কেবল একজন রচনা করবেন আর দলের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করবেন সেই ধারণা থেকেও বাদল সরকার এই পর্বে বেরিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ সমবেতভাবে নাটক রচনার ধারণাও এই পর্বে উঠে এলো। ‘বাসি খবর’ নাটক এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাদল সরকার ও তাঁর শতাব্দী নাট্যদলের অন্যান্য সদস্যদের মিলিত কাজের ভিত্তিতে তৈরি হয় ‘বাসি খবর’। নাটকের

মুখবন্ধে তাই বাদল সরকার বলেছেন—

“ ‘বাসি খবর’ নাটকটি শতাব্দীর মিলিত কাজের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। সংবাদ

ও তথ্য সংগ্রহ, দৃষ্টিকোণ নির্ধারণ, মিলিত আলোচনায়, মিলিত চেষ্টায় হয়েছে।

অবশেষে সেই মিলিত চেষ্টার ফলটাকে আমি নাটকের আকারে লিখেছি।”^{২৪৮}

এই নাটকের বিষয়ও নির্দিষ্ট কিছু নয়। বাদল সরকারের অন্যান্য অনেক নাটকের মতো এখানেও ইতিহাস-ভূগোল-পুরাণ, রাজনীতি শ্রমিক স্বার্থের কথা আছে। এই নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে ইতিহাসের ঘটে যাওয়া সাঁওতাল বিদ্রোহ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্তে সাঁওতালদের নিজস্ব ভূমি থেকে উৎখাত হতে হয়েছিল। শুধু ব্রিটিশরাই নয় এদেশের জমিদার, মহাজন, ও মালিক শ্রেণিরা ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাঁওতালদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে গেছে নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য। ইতিহাসের সেই ঘটনার হাত ধরে তিনি ফিরে যান আদিবাসী সমাজের কাছে। এই নাটকে সাঁওতাল শব্দ ‘ছল’ অর্থাৎ বিপ্লবকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন মাত্রা দেওয়ার প্রচেষ্টা আছে। ‘দিকু’ অর্থাৎ বাবু তথা শোষকের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা ও বিপ্লব করার ইঙ্গিত রয়েছে এই নাটকে। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলতে চান যে, বিদ্রোহ এখনও শেষ হয়ে যায়নি। ইতিহাস সচেতন নাটককার তাঁর নাটকে বিভিন্ন দিকের ইতিহাস তুলে আনেন। কৃষি সভ্যতায় আদিবাসীদের অবদানের কথা বলেন। যে আদিবাসীরা ভূমির আসল মালিক তারাই আজ বঞ্চিত। এই নাটকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে প্রান্তিক মানুষের শোষণ-বঞ্চনার কথা বলেছেন। শুধু তাই নয় সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের সম্ভব বিদ্রোহের কথাও তিনি এই নাটকে তুলে ধরেছেন। বাদল সরকার এই নাটকে তথ্যসহকারে সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ ও স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

নাটকার বাদল সরকার এখানে সংক্ষেপে সেই সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ ও স্বরূপ তুলে ধরেছেন। সেই বিদ্রোহের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—“শোষণ অত্যাচার অবিচার থেকেই বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়।... সাঁওতাল পরগণার ধুমায়িত বিদ্রোহের মধ্য থেকে বার হয়ে এলো ঐতিহাসিক সাঁওতাল ছলের নায়ক সিধো, কান্হো, চান্‌রায়, ভৈরো।”^{২৪৯}

১৮৫৫ সালে ৩০ শে জুন সাঁওতাল ছলের আগুন দাবান্নের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পরে। সেদিন ভাগনাডিহি গ্রামে জমা হয়েছিল চারশো গ্রামের প্রতিনিধিসহ দশ হাজার সাঁওতাল। অত্যাচারী কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, দারোগা, জমিদারদের চরমপত্র দেয় তারা। ১৬ই জুলাই ভাগলপুর জেলার পিয়ালপুরে কাছে পীরপাঁইতি ময়দানে বন্দুক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। বন্দুক বাহিনী তীর-ধনুকের কাছে হার মানে। কিন্তু এরপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়ে। গণহত্যা শুরু হয়। ‘এক’ সংখ্যক চরিত্রের

সংলাপ উঠে আসে সেই ভয়াবহ ইতিহাস—

“এক ।। সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের উপর দিয়ে অবর্ণনীয় অত্যাচার, ধ্বংস আর হত্যার তাণ্ডব চললো। হাজার হাজার সাঁওতাল যুবক বৃদ্ধ নারী শিশু প্রাণ হারালো। পঞ্চাশটি হাতিকে উন্মত্ত করে ছেড়ে দেওয়া হলো, তাদের পায়ের নিচে পিষ্ট হলো গ্রামের পর গ্রামের সাঁওতাল নরনারী, ধূলিসাৎ হলো শতসহস্র কুটির!”^{২৫০}

সাঁওতালরা কোনোভাবেই আত্মসমর্পণ করেনি। সবাই প্রাণ দিয়েছে না হয় ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ধরা পড়েছে। সংগ্রামের স্পিরিট দেখানোই নাটককারের উদ্দেশ্য। অবশ্য এই ইতিহাস খুবই পরিচিত। লেখক এই বিদ্রোহের ফলশ্রুতির ইতিহাসটিকে তুলে আনতে চান। ইতিহাসকে তিনি নাটকের মোচড়ে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চান—

“...সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলো যে যারা অনায়াসে প্রাণ দেয়, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে না, তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবাধ মেলামেশা হলে চারিদিকে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে পড়বে।

.....

সুতরাং সাঁওতালদের ভারতের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে

সাঁওতাল পরগণাকে একটি স্বতন্ত্র জেলা বলে ঘোষণা করা হলো।”^{২৫১}

এই যে সাঁওতালদের উপর ব্রিটিশ রাজশক্তির নির্মম অত্যাচারের ইতিহাস, এটা একদিন থেকে ‘বাসি’, ‘... এ সব অনেকদিন আগে হয়ে গেছে!’^{২৫২} কিন্তু বাসি নয় নাটককারের সমকাল। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার সত্তরের দশক। তাই নাটকে দেখা যায় একজন, ব্রিটিশের অত্যাচার নিপীড়নের বর্ণনা করে, অন্যজন সত্তরের দশকের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও আক্রমণের কথা বলে চলে। দু’টি কাহিনি সমান্তরাল থেকে শাসকের অত্যাচার নিপীড়নের ধারাবাহিক ইতিহাসটিকে নাটককার তুলে ধরেন।

“তিন ।। ১৯৭৮ সালের প্রথম ন’মাসে হরিজনদের উপর অত্যাচারের ঘটনা সংখ্যা ৩ হাজার ১৯।

.....

পাঁচ ।। উত্তর প্রদেশের পন্থনগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৮, ১৩ই এপ্রিল ৫০০ শ্রমিকের এক শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ সামনে ও পিছনে পথ বন্ধ করে গুলি চালায়। ... মৃতদেহগুলি একটি আখের ক্ষেতে জড়ো করে

আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

.....

এক।। ১৯৭১ আগস্টে বরানগরে পুলিশের আনুকূল্যে দু’দিনের দেড়শ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়। মৃতদেহগুলি প্রকাশ্যে দিবালোকে রাস্তার উপরে পড়ে ছিল। পরে সেগুলি রিক্সা আর ঠেলাগাড়ি করে নিয়ে গিয়ে হুগলি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। ...

.....

তিন।। ১৯৭১ জানুয়ারিতে ডায়মণ্ড হারবারে গঙ্গার ধারে পাওয়া যায় ছ’টি মৃতদেহ।

... ১৯৭১ জুনে কোল্লগরে মাটি খুঁড়ে ন’টি মৃতদেহ বার করা হয়। প্রায় সব কটির মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং শরীরে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন ছিল।”^{২৫৩}

এই ‘খবরগুলি’ টাটকা। আসলে বিদ্রোহ-বিপ্লব কখনো বাসি হয় না। ফুরিয়ে বা হারিয়ে যায় না। শোষিত, নিপীড়িত মানুষের কাছে যে-কোন মুক্তির লড়াই-ই টাটকা খবর। আর এদিক থেকে অতীতের সাঁওতালদের উপর ব্রিটিশ রাজশক্তির অত্যাচারের এবং তাদের সংগ্রামের ইতিহাসও টাটকা। সেখানে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দুই শতকের দুটি ঘটনা একাকার হয়ে যায়। নাটককার দেখাতে চাইছেন যে, শাসক বদলালেও শোষণ ও অত্যাচারের চেহারা খুব একটা বদলায় না। সুতরাং সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো একটা বিদ্রোহের স্পিরিট প্রয়োজন। জীবন দিয়ে তাদের অদম্য লড়াই এবং কঠিন পণকে সমকালের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের স্মরণ করাতে চেয়েছেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও বিপ্লব প্রয়োজন। নাটককারের বক্তব্য নাটকের শেষে ‘এক’ সংখ্যক চরিত্রের সংলাপ স্পষ্ট—

“মৃত্যু, রক্ত আর ভীতি শাসন করছে এই ভূমি। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কী ঘটছে আর কী ঘটবে, সবাই জানে। এখনো চিৎকার করে উঠছে না কেন? সময় কি আসেনি? আসেনি?”^{২৫৪}

এইভাবে একটা প্রতিরোধ, সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে নাটকটি শেষ হয়।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে বাদল সরকারের নাটক যে চমকপ্রদক এবং প্রথা বহির্ভূত সৃষ্টি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, “বাংলা নাটক একই রাস্তায় চলে না, একই পথে চলে না, বাংলা নাটকও নাটকের ভাঙা পথ আবিষ্কার করতে পারে, নানা মাত্রা দেখাতে পারে।”^{২৫৫} এটা ঠিক যে, একটা সময় পর্যন্ত তাঁর নাটক নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যার বৃত্তে আবদ্ধ ছিল। মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন, মধ্যবিত্ত জীবনের

একঘেঁয়েমি এবং তার মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের গভীর সত্যকে, বেদনাকে, স্বপ্নকে, আকাঙ্ক্ষাগুলোকে তিনি তাঁর নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই মধ্যবিত্তের বৃত্তকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন। নাটক ক্রমশ হয়ে উঠেছে প্রান্তিক মানুষের জীবনের, তাদের অধিকারের, তাদের সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার। অর্থাৎ কোন একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে তাঁর নাটকে আমরা বেঁধে ফেলতে পারি না। এককথায় আমরা বলতে পারি না যে তাঁর নাটক বড় বেশি মধ্যবিত্তের। যদিও বাদল সরকার সম্পর্কে এরকম ধারণা অনেকেই পোষণ করে থাকেন। এর একটা অন্যতম কারণ বাদল সরকারের ‘পাখিরা উড়ে যায়’ শীর্ষক তথ্যচিত্রে তাঁর নিজের একটি স্বগোষ্ঠি—

“... আমি কলকাতা মহানগরের নাগরিক। আমার চেতনার চোখে যত ছবি
ভাসে, তার পনেরো আনা নগরচিত্র।”^{২৫৬}

বাদল সরকারের এই কথার সূত্র ধরেই অনেকে তাঁকে নাগরিক জীবনের নাটককার বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাদল সরকারের নাটকের কথা বলতে গিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে মণিপুরি নাট্যনির্দেশক হৈন্সাম কানহাইলাল বলেছেন—

“বাদলদার সীমাবদ্ধতা নগরবদ্ধ চেতনা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতায়। এই চেতনা
থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে চান, কিন্তু পারেন না, তারই মধ্যে আবদ্ধ থেকে
যান। ... তিনি আটকে আছেন তাঁর সেই নগরবদ্ধ চেতনায়, ...”^{২৫৭}

কিন্তু সত্যি কি তাই? বাদল সরকারের নাটক সম্পর্কে এই মূল্যায়ন যথায়থ নয় বলেই আমাদের মনে হয়। কারণ ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, ‘বাকি ইতিহাস’-এর মধ্যবিত্ত গণ্ডিকে অতিক্রম করে বাদল সরকার শেষ পর্যন্ত হাজির হয়েছেন ‘ভোমা’-র মতো গ্রামীণ ভারতবর্ষে। বাদল সরকার একজন নগরের মানুষ। ফলে তাঁর নাটকে মধ্যবিত্ত জীবন ও তার সংকট উঠে আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাগরিক মধ্যবিত্তের চেতনায় বাদল সরকার আটকে থাকেননি। একদিন শুনলেন ‘ভোমা’র কথা, দেখলেন ‘ভোমা’-কে বাস্তবে। একথা যেমন তাঁর থিয়েটার নির্মাণের ক্ষেত্রে সত্য তেমনি তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও সত্য। যেকোনো স্রষ্টাই অভিজ্ঞতার ক্রম সম্পূর্ণতার পথে চলতে চলতে তাঁদের সৃষ্টির এক পরিণতির দিকে এগোতে থাকেন। বাদল সরকার এর ব্যতিক্রম নয়। একটু একটু করে তিনি এগিয়েছেন সম্পূর্ণতার দিকে। তৈরি করেছেন নিজের ভূমি।

বাদল সরকারের নাটক, বিশেষ করে তাঁর থার্ড থিয়েটার পর্বের নাটক সম্পর্কে বলা হয় তাঁর নাটকে সংলাপের বড় অভাব। অর্থাৎ তিনি তার দর্শক মণ্ডলীর সঙ্গে কোন সংলাপে জড়াতে অস্বীকার করেছেন। এটা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, এর কারণ তিনি প্রথাগত আখ্যানকে স্বীকার করেন নি। তাঁর প্রথম পর্বের হালকা কৌতুক নাটকগুলির কথা বাদ দিলে, পরবর্তী পর্বের প্রায় সব

নাটকেই আখ্যানকে অস্বীকার করা হয়েছে। নাটকে তিনি কথার অর্থে বিশ্বাস করেননি। তিনি সংলাপ অপেক্ষা শরীরের ব্যবহারের মাধ্যমে দর্শকের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে চেয়েছেন ‘ঘনিষ্ঠ’ থিয়েটারে। তাই এই প্রথাগত সংলাপহীনতা তাঁর রচনার দুর্বলতা নয়, বরং এটা তাঁর নাট্যআঙ্গিক পরিকল্পনারই অন্তর্গত। এ প্রসঙ্গে আমরা তামিল নাট্য নির্দেশক প্রসন্ন রামস্বামী-র গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি বলেছেন—

“বাদল সরকার এক মতাদর্শগত অবস্থান থেকেই শব্দকে বর্জন করেন। ... তিনি যখন তাঁর থিয়েটারকে ‘দারিদ্র থিয়েটার’ অভিধা দেন, তখন তিনি ইঙ্গিত করেছেন তাঁর সংরূপের প্রতি। তাঁর সংরূপ বলতে আখ্যান, অর্থ ও টেক্সট বিরহিত এক রিক্ত সংরূপ।”^{২৫৮}

তবে তাঁর নাটকে প্রথাগত সংলাপ একেবারেই নেই এটাও ঠিক নয়। একটু গভীরে প্রবেশ করলেই বুঝতে পারা যায় এক অনুপম নির্মিত সংলাপের বারবারে বিন্যাসে এগিয়ে যায় তাঁর নাটকের কাহিনি। বাদল সরকারের সেই সহজ অথচ বিস্ময়কর মুগিয়ানা তাঁর প্রতিটি নাটকেই বিদ্যমান। বাদল সরকার তাঁর নাটকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত অনেক ক্ষেত্রে তুলে ধরেছেন কবিতার সংলাপে। শব্দের বুননে, বাচন-ভঙ্গিমায়, চিত্রকল্পের ভিন্নতায় তাঁর নাটকের সংলাপ অপূর্ব কাব্যময় হয়ে উঠেছে। সংলাপের এই কাব্যময়তা কেবল প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লিখিত নাটকে বিদ্যমান, আর মুক্তমঞ্চের জন্য লিখিত নাটকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এমন নয়। নাট্য সমালোচক ভবেন দাস যথার্থই বলেছেন—

“... তিনি (বাদল বাবু) যখন ‘প্রচলিত’ মঞ্চের মায়া কাটিয়ে তৃতীয় ধারার নাট্যের খোলা আকাশের নিচে মুক্ত আঙিনায় নেমে এলেন তখনও বিভিন্ন নাটকের সংলাপে বেজে চলেছে কবিতার ধ্বনি।”^{২৫৯}

আসলে থিয়েটারে কবিতা যখন অচল বলে বিবেচিত হয়ে গেছে তখন প্রবল আত্মবিশ্বাসে ভর করে বাদল সরকার কবিতায় নাটকীয় একভাষণ রচনা করেছেন। বাংলা থিয়েটারের এই জাতীয় একভাষণের যে পরম্পরা ছিল, আসলে তাকেই তিনি ফিরিয়ে এনেছেন, তবে সম্পূর্ণ অন্য লক্ষ্য সাধনে, অন্য আঙ্গিকে, যা দৈনন্দিন ভাষার কাছাকাছি। গদ্য সংলাপ থেকে কাব্যে হঠাৎ স্বরাস্তর চরিত্রের মেজাজ ও অনুভবের পর্বাস্তরের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। সুতরাং বাদল সরকারের নাটক সংলাপহীন, এরকম সিদ্ধান্তে আসা যথার্থ নয় বলেই আমরা মনে করি।

বাদল সরকার নাটকের চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রথাগত ধারণাকে ভেঙেছেন। তিনি মনস্তত্ত্বজারিত পূর্ণায়ত চরিত্র চিত্রণের লক্ষ্যে থেকেই সংশয়ের সঞ্চারণ করেছেন। অমল, বিমল, কমল কি তিনজন স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তি নাকি বিভিন্ন সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে দৃষ্ট একই

ব্যক্তি? কিংবা মানসী, কিংবা শরদিন্দু, সীতানাথ, বাসন্তী, কণা, ‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকের মেয়েটা? তারা বরাবরই একই চরিত্রের মধ্যে ঢুকে যায়, আবার বেরিয়ে আসে। এক একটা মুহূর্তে অনুপুঙ্খ ভাবে তাদের স্পষ্ট চেনা যায়। আবার তারা ফোকাস-এর বাইরে চলে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে যায়। কোন ব্যক্তির সত্তাপরিচয় যে কখনই নির্দিষ্ট করে বেঁধে ফেলা যায় না, তা যে ক্রমাগত অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। এখানেই বাদল সরকারের চরিত্র নির্মাণে স্বাভাবিক। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাদল সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান। নিজের জীবন এবং নাট্যচর্চায় তো বটেই তাঁর নাটকেও রাজনৈতিক দলের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার ঘটনাটিকে তিনি নস্যাৎ করেছেন বারবার। রাজনৈতিক দর্শক থেকে তিনি বিচ্যুত হন না কখনও, কিন্তু দর্শনের দলচরবৃত্তি তাঁর কাছে সর্বাত্মক পরিতাজ্য। তাই দেখা যায়, তাঁর নাটকে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু ব্যবহৃত হলেও নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের মতামত সেখানে প্রাধান্য পায় নি। তার কারণ বাদল সরকারের কাছে রাজনীতি কথাটার মানে হলো একটা দর্শন, যা প্রত্যেকটি মানুষেরই আছে। তাঁর জীবন দর্শনই তাঁর রাজনীতি। বাদল সরকার সেই ভাবেই তাঁর নাটকে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু তুলে ধরেছেন।

বাদল সরকারের নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেকেই বলে থাকেন যে তাঁর বেশকিছু নাটকের বিষয় অস্তিত্ববাদ। যার অভ্যন্তরে রয়েছে জীবনের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা এবং অর্থহীনতা। এক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়া হয় তাঁর ষাটের দশকে লেখা ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, ‘পাগলা ঘোড়া’-র মতো নাটকের। যেমন দর্শন চৌধুরী বলেছেন—

“তাঁর নাটক পড়তে পড়তে বা অভিনয় দেখতে দেখতে প্রাথমিকভাবে একটা আশাবাদী দর্শন বা বক্তব্য আমাদের উৎসাহিত করে। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায়, তাঁর নাটকে আশাবাদী বক্তব্যের আড়ালে নেতিবাদী জীবনদর্শনই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। অনেককেই তা হতাশ করেছে।”^{২৬০}

আমরা কিন্তু এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত হতে পারছি না। আধুনিক চিন্তায় অর্থহীনতার দর্শন কিন্তু কোনোভাবেই ভীষণতার সমার্থক নয়। আসলে এর মূলে আছে নেতিবাচক এক রক্ষণাত্মকতা। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে কাম্যুর ‘আউটসাইডার’ লেখা হয়েছিল। নির্দয় ধ্বংসীলা উপন্যাসের সমগ্র বিন্যাসে। তুলনায় ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এ ব্যবহৃত সিসিফাসের পুরাণকথা এক বহিরঙ্গের চিত্রকল্প হিসেবেই কিন্তু রয়ে গেছে। ‘আউটসাইডার’ প্রেমেও বিশ্বাস করে না, খুনেও বিশ্বাস করে না। মনোজগতের সমগ্র কাঠামো এক অ্যাবসার্ড পরিসর মেলে ধরে, যার সূচিমুখ দয়াহীন ধ্বংসলীলার দিকে ধাবিত। এমন নির্দয় ও মেদহীন অভিমুখ ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এ নেই। নাট্যভিনেতা তীর্থঙ্কর চন্দ যথার্থই লিখেছেন—

“... ইন্দ্রজিৎ নাটকে নিশ্চিতভাবে আশার সঙ্কেত আছে কারণ ওতে তীর্থের

পথ দিয়ে আগে এগোবার কথা আছে। তীর্থের পথ মঙ্গলময় হওয়া জরুরি।
এভাবেই বাদলবাবুর নাটকে আমরা আশার সংকেত সব জায়গায় পেয়েছি,
মরণকে বরণ নয়।”^{২৬১}

আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি গতানুগতিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত মানুষ বাদল, অভিনেতা বাদল, নাটককার বাদল, কর্মী বাদল মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন— ‘ভোমাদে’র উঠোনে। নিজেকে অতিক্রম করবার এমন দুর্যোগপূর্ণ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে খুব কম মধ্যবিত্তই পারে। বাদল সরকার নিজস্ব স্বর উচ্চারণে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন প্রথাগত প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সীমাবদ্ধ বৃত্ত। বাদল সরকার ও তাঁর ‘শতাব্দী’ নাট্যাগোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য তার নিজস্ব স্বর মিশিয়ে দিয়েছিলেন। সেই প্রথাভাঙা নাট্য উচ্চারণে। তাই বাদল সরকারের নাটক অস্তিত্ববাদী চেতনায় আক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া আসলে বাদল সরকার ও তাঁর নাটকের অবমূল্যায়ন করা। একজন সম্পূর্ণ সমাজ সচেতন মানুষ ছিলেন বাদল সরকার। সেইভাবেই নাটক রচনায় তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাতে কখনো কখনো তাঁকে ‘মরবিড’ নাটককার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাতে তিনি মনোবেদনাও পেয়েছেন। কিন্তু থেমে যাননি। কাজ করে গেছেন। নিজের বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে যাননি। বাদল সরকারের বহু নাটক অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়েছে ভারতের নানা ভাষায়। ভারতবর্ষের বাইরেও তাঁর নাটক নিয়ে, তাঁর নাট্য নির্মাণ নিয়ে চর্চা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। হয়ে উঠেছেন সর্বভারতীয় নাট্যজগতের একজন।

তথ্যসূত্র:

১. বাদল সরকারের সঙ্গে দেবাশিস মজুমদারের সাক্ষাৎকার: বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, ৬
বর্ষ ২ সংখ্যা, পৃ. ৯৯
২. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, গুরুচণ্ডাল ৯ প্রকাশনা, দ্বিতীয়
সংস্করণ, বইমেলা ২০১৮, বলরাম বোস ঘাট রোড,
কলকাতা-৩২, পৃ. ২৫
৩. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ‘থিয়েটারি গল্প:
আদিপর্ব’ ঋতদীপ, ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয়
প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডি ডি ১৮/১১ সল্টলেক,
কলকাতা-৬৪, পৃ. ১০-১১

৪. বাদল সরকার-এর সাক্ষাৎকার: দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ৩৮
৫. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ‘কবিকাহিনী’ নাটকের মুখবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪৫০
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৫৩
৭. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ‘কবিকাহিনী’ নাটকের মুখবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪৫০
৮. তদেব : পৃ. ৪৫০
৯. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার, নাট্যপত্র স্যাস, সংকলন ১৬, ১৯৯৯, ৬৮ ফিয়ার্স লেন, কল-৭৩, পৃ. ২৪৯
১০. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সলিউশন এক্স, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৬।
১১. তদেব : পৃ. ২৮
১২. তদেব : পৃ. ৫
১৩. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার, নাট্যপত্র স্যাস, সংকলন ১৬, ১৯৯৯, ৬৮ ফিয়ার্স লেন, কল-৭৩, পৃ. ২৪৯
১৪. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ‘বড় পিসীমা’ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪০
১৫. তদেব : পৃ. ৪০
১৬. তদেব : পৃ. ৪১
১৭. তদেব : পৃ. ৪৫
১৮. তদেব : পৃ. ৪৫
১৯. তদেব : পৃ. ৪৫-৪৬

২০. তদেব : পৃ. ৫১
২১. তদেব : পৃ. ৭৫
২২. তদেব : পৃ. ৮৯
২৩. তদেব : পৃ. ৮৯
২৪. তদেব : পৃ. ১০৩
২৫. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, ‘প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নাটককার বাদল সরকার’ প্রবন্ধে প্রতিভা অগ্রবাল শিবকুমার যোশীর মন্তব্য ব্যবহার করেছেন, এখানে সেটি অপরিবর্তিত রেখে তুলে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি-১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৭০
২৬. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ‘বড়োপিসীমা’ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪৪
২৭. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ‘থিয়েটারি গল্প: আদিপর্ব’ ঋতদীপ, ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডি ডি ১৮/১১ সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ২৪
২৮. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ‘শনিবার’ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, কলকাতা-৪৭, পৃ. ১১৫
২৯. তদেব : পৃ. ১১৫
৩০. তদেব : পৃ. ১২৩
৩১. তদেব : পৃ. ১২৩
৩২. তদেব : ‘রাম শ্যাম যদু’ নাটকের ‘মুখবন্ধ’, পৃ. ১৩৪
৩৩. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, প্রতিভা অগ্রবালের ‘প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নাটককার বাদল সরকার’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি-১৬, তথ্য

ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর
২০১৪, পৃ. ৭১

৩৪. সরকার, বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড,
কল-৭৮, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১৯৩
৩৫. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ মিত্র ও
ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬,
কলকাতা-৪৭, পৃ. ৩৬১
৩৬. চৌধুরী, দর্শন : নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ
দে স্ট্রীট, কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃ. ৩০
৩৭. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ‘কবিকাহিনী’ মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, কলকাতা-৪৭,
পৃ. ৫০১
৩৮. তদেব : পৃ. ৪৯১
৩৯. তদেব : পৃ. ৫০২-৫০৩
৪০. অমৃতলোক, বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩১
৪১. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ‘কবিকাহিনী’ মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, কলকাতা-৪৭,
মুখবন্ধ, পৃ. ৪৫০
৪২. তদেব : পৃ. ৪৫০
৪৩. তদেব : পৃ. ৪৯৯
৪৪. তদেব : পৃ. ৪৫০
৪৫. তদেব : পৃ. ৪৬৮
৪৬. তদেব : পৃ. ৪৬২
৪৭. অনুষ্ঠাপ, নাট্যবিষয়ক সংখ্যা, চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ২০০, ‘বিষয় নাট্যসৃজন : নির্মাতার
মুখোমুখি’ বাদল সরকার, পৃ. ২১৯
৪৮. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ‘কবিকাহিনী’ নাটকের মুখবন্ধ
অংশ থেকে উদ্ধৃত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ,
শ্রাবণ ১৪১৬, কলকাতা-৪৭, মুখবন্ধ, পৃ. ৪৫০

৪৯. বাদল সরকার-এর সাক্ষাৎকার: দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ৩৯
৫০. সরকার, বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ২২
৫১. তদেব : পৃ. ৩৩
৫২. তদেব : পৃ. ৫১
৫৩. তদেব : পৃ. ২২৩
৫৪. তদেব : পৃ. ২৪৩
৫৫. মজুমদার, স্বপন : সাত দশকের থিয়েটার ও অন্যান্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৫৮
৫৬. তদেব : পৃ. ৬১-৬২
৫৭. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, পৃ. ৫
৫৮. বাদল সরকারের সঙ্গে দেবশিস মজুমদারের সাক্ষাৎকার : বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, ৬ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৃ. ১০৬-১০৭
৫৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৭৭
৬০. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, 'প্রকাশকের বক্তব্য' অংশ থেকে উদ্ধৃত
৬১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৭৮
৬২. বাদল সরকার-এর সাক্ষাৎকার: দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ৩৯
৬৩. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, পৃ. ১৫
৬৪. তদেব : পৃ. ১৫
৬৫. তদেব : পৃ. ৩-৪
৬৬. তদেব : পৃ. ২১

৬৭. তদেব	:	পৃ. ৩৭
৬৮. তদেব	:	পৃ. ৫
৬৯. তদেব	:	পৃ. ৭-৯
৭০. তদেব	:	পৃ. ৬৩
৭১. তদেব	:	পৃ. ৬৩
৭২. তদেব	:	পৃ. ৬৩
৭৩. তদেব	:	পৃ. ৮১
৭৪. সরকার, বাদল	:	প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১৩১
৭৫. সরকার, বাদল	:	এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, পৃ. ৬৫
৭৬. তদেব	:	পৃ. ৮২
৭৭. তদেব	:	পৃ. ১৬
৭৮. তদেব	:	পৃ. ১৭
৭৯. তদেব	:	পৃ. ১৭
৮০. তদেব	:	পৃ. ১৭
৮১. তদেব	:	পৃ. ১৭
৮২. তদেব	:	পৃ. ১৮
৮৩. তদেব	:	পৃ. ২৫
৮৪. তদেব	:	পৃ. ৭০
৮৫. তদেব	:	পৃ. ৬৬
৮৬. রায়, অমর চন্দ্র	:	বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের ইন্দ্রজিৎ: তীর্থপথের চিরপথিক' শীর্ষক প্রবন্ধ, মদমোহন বেরা, এবং মহুয়া, ফেব্রুয়ারি, ২০২০, ২২তম বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা, পৃ. ৬৪
৮৭. সরকার, বাদল	:	এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, পৃ. ২৬
৮৮. তদেব	:	পৃ. ২৮

৮৯. তদেব	:	পৃ. ৮০-৮১
৯০. তদেব	:	পৃ. ৮০
৯১. বাদল সরকার-এর সাক্ষাৎকার: দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ৩৯		
৯২. তদেব	:	পৃ. ৩৯
৯৩. তদেব	:	পৃ. ৩৯
৯৪. তদেব	:	পৃ. ৩৯
৯৫. সরকার, বাদল	:	এবং ইন্ডিজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, পৃ. ১৪
৯৬. তদেব	:	পৃ. ১৪
৯৭. তদেব	:	পৃ. ৩২
৯৮. তদেব	:	পৃ. ৩৩
৯৯. তদেব	:	পৃ. ৩৭
১০০. তদেব	:	পৃ. ৪৫
১০১. তদেব	:	পৃ. ৪৭
১০২. তদেব	:	পৃ. ৫৫
১০৩. তদেব	:	পৃ. ৫৬
১০৪. তদেব	:	পৃ. ৬০
১০৫. তদেব	:	পৃ. ৬২
১০৬. তদেব	:	পৃ. ৬৯
১০৭. তদেব	:	পৃ. ৬৯
১০৮. তদেব	:	পৃ. ৮১
১০৯. তদেব	:	পৃ. ৮১
১১০. তদেব	:	পৃ. ৭৫
১১১. তদেব	:	পৃ. ৮২
১১২. সরকার, বাদল	:	প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১৬৬
১১৩. তদেব	:	পৃ. ১৮২
১১৪. তদেব	:	পৃ. ১৭৩-১৭৪

১১৫. তদেব	:	পৃ. ১৭৪
১১৬. তদেব	:	পৃ. ১৭৯-১৮০
১১৭. চৌধুরী, দর্শন	:	নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃ. ৩১
১১৮. সরকার, বাদল	:	নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সারারাত্তির, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৩১৯
১১৯. দাশ, জীবনানন্দ	:	জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বোধ, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ১৯
১২০. সরকার, বাদল	:	নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সারারাত্তির, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৩২৩
১২১. তদেব	:	পৃ. ৩২৪
১২২. তদেব	:	পৃ. ৩২৪
১২৩. তদেব	:	পৃ. ৩২৮
১২৪. তদেব	:	পৃ. ৩২৮
১২৫. তদেব	:	পৃ. ৩৪৮
১২৬. তদেব	:	পৃ. ৩৪৯
১২৭. তদেব	:	পৃ. ৩৫৬
১২৮. সরকার, বাদল	:	নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বাকি ইতিহাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৫১
১২৯. তদেব	:	পৃ. ৫২
১৩০. তদেব	:	পৃ. ৫২
১৩১. তদেব	:	পৃ. ৫৫
১৩২. সরকার, বাদল	:	নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বাকি ইতিহাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৮০

১৩৩. তদেব : পৃ. ৮০
১৩৪. তদেব : পৃ. ৭৬
১৩৫. তদেব : পৃ. ৮৫
১৩৬. তদেব : পৃ. ৮৫
১৩৭. জীবনানন্দ দাশের ‘বোধ’ কবিতা, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ২০
১৩৮. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বাকি ইতিহাস, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ
দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৮৮
১৩৯. তদেব : পৃ. ৮৮
১৪০. তদেব : পৃ. ৯৩
১৪১. তদেব : পৃ. ৯৩
১৪২. তদেব : পৃ. ৯৪
১৪৩. তদেব : পৃ. ৮৮
১৪৪. তদেব : পৃ. ৯৩
১৪৫. তদেব : পৃ. ৮৯
১৪৬. তদেব : পৃ. ৮৮
১৪৭. তদেব : পৃ. ৮৮
১৪৮. জীবনানন্দ দাশের ‘আটবছর আগের একদিন’: ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩,
পৃ. ৭১
১৪৯. তদেব
১৫০. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বাকি ইতিহাস, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬,
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৯৪
১৫১. তদেব : পৃ. ৯৪
১৫২. তদেব : পৃ. ৯৬
১৫৩. বসু, সৌমিত্র : বাকি ইতিহাস অন্য ভাবনায়, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ:
আগস্ট ২০০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০১৪,
পৃ. ৯৫

১৫৪. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ‘যদি আর একবার’ নাটকের মুখবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ১৭৬
১৫৫. তদেব : পৃ. ২০৪
১৫৬. তদেব : পৃ. ২০২
১৫৭. তদেব : পৃ. ২০৩
১৫৮. তদেব : পৃ. ২০৬
১৫৯. তদেব : পৃ. ২০৭
১৬০. তদেব : পৃ. ২১৩
১৬১. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, পৃ. ৭৪
১৬২. সরকার, বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ২৭৪
১৬৩. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ‘পারমাণবিক অস্ত্রের বিভীষিকা’ ঋতদীপ ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডি ডি ১৮/১১, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ৯৮-৯৯
১৬৪. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, ‘প্রকাশকের বক্তব্য’ অংশ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৫৪
১৬৫. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বাকি ইতিহাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৮৮
১৬৬. তদেব : পৃ. ৯৭
১৬৭. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ‘ত্রিংশ শতাব্দী’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ২৯৯
১৬৮. তদেব : পৃ. ২৯৯

১৬৯. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ‘পারমাণবিক অস্ত্রের বিভীষিকা’ ঋতদীপ ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডি ডি ১৮/১১, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ৯৭
১৭০. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ‘ত্রিংশ শতাব্দী’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ২৯৯
১৭১. তদেব : পৃ. ৩০৭
১৭২. তদেব : পৃ. ৩০৮
১৭৩. তদেব : পৃ. ৩১২
১৭৪. তদেব : পৃ. ৩০০
১৭৫. তদেব : পৃ. ৩৩৪
১৭৬. তদেব : পৃ. ২৯৯
১৭৭. তদেব : পৃ. ২৯৯
১৭৮. সরকার, বাদল : নানামুখ, প্রকাশকাল, নভেম্বর ১৯৮৮, ‘ত্রিংশ শতাব্দী’, পৃ. ৭২
১৭৯. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ‘ত্রিংশ শতাব্দী’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৩০৩
১৮০. তদেব : পৃ. ৩০৩
১৮১. সরকার, বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ৯০০ পূর্বাঞ্চল, মেন রোড, কলকাতা-৭৮, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ২৮৮
১৮২. তদেব : পৃ. ২৮৯
১৮৩. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ‘পাগলা ঘোড়া’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৩৮৩
১৮৪. তদেব : পৃ. ৪২৩
১৮৫. তদেব : পৃ. ৩৮৭

১৮৬. তদেব	:	পৃ. ৪২৮
১৮৭. তদেব	:	পৃ. ৪১১
১৮৮. তদেব	:	পৃ. ৪১১
১৮৯. তদেব	:	পৃ. ৪১০
১৯০. তদেব	:	পৃ. ৪১৮
১৯১. তদেব	:	পৃ. ৪৩৬
১৯২. তদেব	:	পৃ. ৪৩৬
১৯৩. তদেব	:	পৃ. ৪৩৮
১৯৪. তদেব	:	পৃ. ৪৩৮
১৯৫. ভাদুড়ি, সত্য	:	বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, 'প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নাটককার বাদল সরকার' প্রবন্ধে প্রতিভা অগ্রবাল শিবকুমার যোশীর মন্তব্য ব্যবহার করেছেন, এখানে সেটি অপরিবর্তিত রেখে তুলে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি-১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৮৫
১৯৬. সরকার, বাদল	:	নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'পাগলা ঘোড়া', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪৩৬
১৯৭. অনুষ্ঠাপ, নাট্যবিষয়ক সংখ্যা, চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ২০০, 'বিষয় নাট্যসৃজন :		নির্মাতার মুখোমুখি' কুমার রায়, পৃ. ২৩১
১৯৮. সরকার, বাদল	:	নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'সার্কাস', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪৪০
১৯৯. সরকার, বাদল	:	নাট্য সংগ্রহ, 'শেষ নেই' নাটক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৪১৪, পৃ. ২০৩
২০০. তদেব	:	পৃ. ২০৪
২০১. সরকার, বাদল	:	নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'সার্কাস', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ

- দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪৮৩-৪৮৪
২০২. চৌধুরী, দর্শন : নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ
দে স্ট্রীট, কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃ. ৮৬
২০৩. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'আবু হোসেন', মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৬২
২০৪. তদেব : পৃ. ৭৮
২০৫. তদেব : পৃ. ৮৮
২০৬. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, 'প্রসেনিয়াম থিয়েটারের
নাটককার বাদল সরকার' প্রবন্ধে প্রতিভা অগ্রবাল
শিবকুমার যোশীর মন্তব্য ব্যবহার করেছেন, বাদল
সরকারের মন্তব্যটি ব্যবহার করেছেন। এখানে সেটি
অপরিবর্তিত রেখে তুলে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য
আকাডেমি-১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ
সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৮৯
২০৭. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, গুরুচণ্ডাল প্রকাশনা, দ্বিতীয়
সংস্করণ, বইমেলা ২০১৮, বলরাম বোস ঘাট রোড,
কলকাতা-৩২, পৃ. ২৯
২০৮. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৩৯০,
পৃ. ৫৫
২০৯. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'স্পাটাকুস' নাটকের মুখবন্ধ,
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ
১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১২২
২১০. বাদল সরকারের সঙ্গে দেবশিস মজুমদারের সাক্ষাৎকার: বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০,
৬ বর্ষ ২ সংখ্যা, পৃ. ১১০
২১১. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দা থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঋতদীপ
ঘোষ, নাট্যচিন্তা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ৩১ জানুয়ারি
২০১২, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৪২-৪৩

২১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১২৬
২১৩. বাদল সরকার-এর সাক্ষাৎকার: দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ৪২
২১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১২৩
২১৫. তদেব : পৃ. ১২৩
২১৬. ভাদুড়ী, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, দেবশিস চক্রবর্তীর ‘প্রসঙ্গ বাদল সরকার’ শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি-১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১১৬
২১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৮০
২১৮. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘মিছিল’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২১০-২১১
২১৯. তদেব : পৃ. ২১১
২২০. তদেব : পৃ. ২১৯
২২১. তদেব : পৃ. ২৩৯
২২২. তদেব : মিছিল নাটকের মুখবন্ধ, পৃ. ২০৮
২২৩. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ‘তৃতীয় থিয়েটারের বাঙালি দর্শক’ শীর্ষক প্রবন্ধ, ঋতদীপ ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডি ডি ১৮/১১, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ৭২
২২৪. কাবেরী বসু : ‘নাটককার বাদল সরকার’ এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে ‘ভোমা’ শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি-১৬, তথ্য ও

সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪,
পৃ. ১৮৭

২২৫. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’ নাটক,
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ
১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩,
পৃ. ২৪৬-৪৭

২২৬. তদেব : পৃ. ২৫২

২২৭. তদেব : পৃ. ২৫৩

২২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা
২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬,
পৃ. ১২৭-২৮

২২৯. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘ভোমা’ নাটকের মুখবন্ধ, মিত্র
ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯,
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৯৪

২৩০. তদেব : ‘ভোমা’ নাটক, পৃ. ৩২১

২৩১. তদেব : পৃ. ৩০১

২৩২. তদেব : ‘ভোমা’ নাটকের মুখবন্ধ, পৃ. ২৯৪

২৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা
২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬,
পৃ. ২০৩-২০৪

২৩৪. অমৃতলোক, বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৫৯

২৩৫. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘ভোমা’ নাটক, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৩১

২৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা
২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬,
পৃ. ১৩৫-৩৬

২৩৭. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস’

		নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৩৭
২৩৮. তদেব	:	পৃ. ৩৩৭
২৩৯. তদেব	:	পৃ. ৩৫২
২৪০. তদেব	:	পৃ. ৩৫৩
২৪১. তদেব	:	পৃ. ৩৫৯
২৪২. তদেব	:	পৃ. ৩৫৯
২৪৩. তদেব	:	পৃ. ৩৭২
২৪৪. সরকার, বাদল	:	নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'হট্টমালার ওপারে' নাটকের মুখবন্ধ অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৭৬
২৪৫. তদেব	:	পৃ. ৪০৪
২৪৬. সরকার, বাদল	:	ভয়েজেস ইন দা থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ৩১ জানুয়ারি ২০১২, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৭১
২৪৭. তদেব	:	পৃ. ৭৪
২৪৮. সরকার, বাদল	:	নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'বাসি খবর' নাটকের মুখবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৭২
২৪৯. তদেব	:	পৃ. ৪৯৫
২৫০. তদেব	:	পৃ. ৫০৩
২৫১. তদেব	:	পৃ. ৫০৫-৫০৬
২৫২. তদেব	:	পৃ. ৫০৪
২৫৩. তদেব	:	পৃ. ৫০৭-৫০৮
২৫৪. তদেব	:	পৃ. ৫১০
২৫৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক	:	বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা

- ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬,
পৃ. ১৭৮
২৫৬. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ‘পাখিরা উড়ে যায়’ ঋতদীপ ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডি ডি ১৮/১১, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ৮০
২৫৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ২২৭
২৫৮. তদেব : পৃ. ২২৪
২৫৯. ভাদুড়ী, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, তীর্থঙ্কর চন্দ্রের ‘এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়...’ শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি-১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৫৮
২৬০. চৌধুরী, দর্শন : নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃ. ২০৭
২৬১. ভাদুড়ী, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, তীর্থঙ্কর চন্দ্রের ‘এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়...’ শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি-১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৪৮

ষষ্ঠ অধ্যায় পরবর্তীকালীন নাট্যচর্চায় বাদল সরকারের প্রভাব

বাদল সরকারের নাট্যকর্ম বিশেষত তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটার নিঃসন্দেহে বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। প্রথাগত প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বাইরে বিকল্প একটি নাট্যধারার প্রবর্তক হিসেবে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। যার অনিবার্য প্রভাব পড়ে পরবর্তীকালীন নাট্য চর্চায়। বাদল সরকারের পরবর্তী বহু নাট্যকর্মী তাঁর নাট্যাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাঁর নাট্যদর্শকে সামনে রেখে তাঁদের নাট্যকর্ম অব্যাহত রেখেছেন। একথা বলতে অসুবিধে নেই, গণনাট্য সংঘ কিংবা শম্ভু মিত্রের নবনাট্য আন্দোলনের পর একমাত্র বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার হলো সেই থিয়েটার, যার প্রভাব পরবর্তী নাট্যচর্চায় সূদূরপ্রসারী। আমরা এই অধ্যায়ে এ রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরের কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বের নাট্যকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বাদল সরকারের নাট্যদর্শের প্রভাব অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো। এর পাশাপাশি বেশকিছু নাট্যদলের নাট্যকর্মের আলোচনা করার চেষ্টা করবো, যারা বাদল সরকারের নাট্যাদর্শকে পাথেয় করে, তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। বাদল সরকার একজন সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরের নাট্যকর্মী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে দেশে এবং দেশের বাইরে তাঁর থিয়েটারের প্রভাব যে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। আমরা তাই প্রথমেই এই রাজ্যের বাইরে পরবর্তীকালীন বিশিষ্ট কয়েকজন নাট্যকর্মী ও নাট্যদলের নাট্যচর্চার আলোচনা সূত্রে বাদল সরকারের নাট্যাদর্শের প্রভাব অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো।

ভারতীয় থিয়েটারে গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিশিষ্ট কয়েকজন নাট্য ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা ভারতীয় থিয়েটারকে একটা ভিন্ন মাত্রা দান করে। “তাদের জীবন ও সৃষ্টিশীল কাজে যেমন রয়েছে গ্রামীণ লোকজ উৎপাদনের প্রভাব, তেমন রয়েছে শহরের সমাজজীবনের ছবি, যা কিনা ভারতীয় চেতনার প্রতিরূপ।”^১ যেমন-মণিপুরের রতন থিয়াম, এইচ. (হৈন্সাম) কানহাইলাল, মহারাষ্ট্রের বিজয় তেডুলকর, মহেশ এলকুঞ্জওয়ার, বিলাস পুরের সত্যদেব দুবে, কর্ণাটক তথা কন্নড় থিয়েটারের গিরিশ কারনাড, তামিল নাট্যকার প্রসন্ন রামস্বামী। এঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয় থিয়েটারের প্রাণবান এক-একটি পরম্পরা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের নাট্যপ্রতিভাকে এতটুকুও খাটো না করে আমরা বলতে পারি এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নাট্যব্যক্তিত্ব আছেন বিশেষ করে যাঁরা বাদল সরকারের পরবর্তীকালে বা সদ্য পরবর্তীকালে নাট্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁরা কোন না কোনভাবে বাদল সরকারের থিয়েটারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। যেমন —

গিরিশ কারনাড (১৯৩৮-২০১৯)। বাদল সরকারের সদ্য পরবর্তীকালে ভারতীয় থিয়েটারে আবির্ভাব ঘটে গিরিশ কারনাডের। দিল্লির মোহন রাকেশ, এ রাজ্যের বাদল সরকার, মারাঠি নাট্যকার বিজয় তেঙুলকর আর দক্ষিণে কন্নড় নাট্যকার গিরিশ কারনাড, ভারতীয় থিয়েটারে একটা সময় এই চারজনের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হতো। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতম হলেন কারনাড। প্রতিভা অগ্রবাল লিখেছেন, “চারজনের বয়সের মধ্যে ১৩ বছরের পার্থক্য। রাকেশ আর বাদল সরকারের জন্ম ১৯২৫ সালে তেঙুলকরের ১৯২৮ আর গিরিশ-এর ১৯৩৮-এ।”^২ অর্থাৎ গিরিশ কারনাড বয়সে এঁদের কনিষ্ঠতম। কন্নড় তথা ভারতীয় থিয়েটারের একজন খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্ব গিরিশ কারনাড। মুম্বাই ও দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্র জগতে দাপটের সঙ্গে যেমন কাজ করেছেন তেমনি নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য প্রতিভার সাক্ষ্য রেখেছেন। চার দশক ধরে কারনাড সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির মোকাবিলায় নাট্য নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তাঁর অবলম্বন ছিল ইতিহাস এবং পুরাণ। বিশেষতঃ পৌরাণিক আখ্যানের উপর নির্ভর করেই তিনি নাট্যরচনা করেছেন। প্রথমেই ১৯৬১ সালে লেখেন ‘যযাতি’। মহাভারতে পরিচিত চরিত্র যযাতির দর্পণে আধুনিক সমাজের ছবি তুলে ধরেছেন এই নাটকে। তাঁর দ্বিতীয় নাটক ‘তুঘলক’। রচনাকাল ১৯৬৪ সাল। এরপর গিরিশ লিখে ফেললেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক ‘হয়বদন’। নাটকটি ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’র দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও কন্নড় লোকনাট্যের আঙ্গিকের অনবদ্য প্রয়োগে তা ভারতীয় নাট্যধারায় এক উৎকৃষ্ট সৃষ্টির নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। কিন্তু এ হেন নাট্য নির্মাণে গিরিশের নাট্যচেতনায় গভীর প্রভাব ফেলে বাদল সরকার। বিশেষ করে বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের প্রভাব গিরিশ কারনাড এড়িয়ে যেতে পারেন নি। ‘হয়বদন’ নাটকটি লেখার আগে তিনি বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং তাঁর নির্দেশনায় ‘ম্যাড্রাস প্লেয়ার্স’ নাটকটি অভিনয় করে। বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি ‘হয়বদন’ নাট্য নির্মাণ করেন একথা জানিয়ে গিরিশ কারনাড লিখেছেন, “আমি অনেক বছর ধরেই স্বপ্ন দেখছিলাম, এমন একটা নাটক লিখব যাতে নাট্যক্রিয়া হবে স্বচ্ছন্দবহতা, যাতে আমি বর্জন করতে পারব বাস্তবমুখী থিয়েটারের মরণান্তক প্রথাসমূহ, বিশেষ করে চরিত্রায়নে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা ও আখ্যানকে দৃশ্যবিভাজনে খণ্ডিত করার রীতি। অথচ কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিলাম না, কী করে তা সম্পন্ন করব। এবং ইন্দ্রজিৎ পরিচালনা করতে গিয়েই আমি সেই সূত্র পেয়ে গেলাম।... ‘প্রথা ব্যবহারে আমি নানা উৎসে গেছি, কিন্তু আমার সংরূপ (from) আমি পেয়েছিলাম এবং ইন্দ্রজিৎ-এ’।”^৩ আসলে বাদল সরকার তখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একজন প্রতিষ্ঠিত নাট্য ব্যক্তিত্ব। ফলে তাঁর প্রভাব যে কনিষ্ঠ গিরিশ কারনাডের উপর পড়বে এটাই স্বাভাবিক। শুধু

তো গিরিশ কারনাডই নয় বাদল সরকারের নাট্যের দ্বারা বিশেষ করে তাঁর ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন আরেক ভারতীয় নাট্যব্যক্তিত্বদের পুরোধা পুরুষ, সত্যদেব দুবে (১৯৩৬-২০১১)। ভারতীয় থিয়েটারে যে কয়েকজন নাট্যব্যক্তিত্ব সত্যদেব দুবের থিয়েটার গঠনে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বাদল সরকার। বাদল সরকারের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ তৈরি হয় ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের সূত্র ধরেই। প্রতিভা অগ্রবাল-এর ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ হিন্দি অনুবাদ পড়ে তিনি ভীষণ অনুপ্রাণিত হন। দেবাশিস রায়চৌধুরী লিখেছেন, “বাদল সরকারের এবং ইন্দ্রজিৎ নাটকটি যখন তাঁর হাতে আসে, ... তাঁর মনে হয়েছিল, বাদল সরকারের নাটকটির হিন্দি অনুবাদের মধ্যে দিয়ে তিনি যেন আধুনিক হিন্দির সঙ্গে পরিচিত হলেন। ... প্রতিভা আগরওয়াল অনূদিত এবং ইন্দ্রজিৎ নাটকটির সুমিষ্ট হিন্দি সংলাপ তাঁকে মোহিত করে দিল। বিজয় তেগুলাকরের মারাঠি নাটকগুলির অসাধারণ হিন্দি অনুবাদ তাঁর ভালো লাগল। সত্যদেব দুবের নাট্যচর্চায় বাদল সরকার এবং বিজয় তেগুলাকর দুজনেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন।”^{৪৪} প্রথমে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটক পাঠ এবং পরবর্তীতে নাটকটির নির্মাণ তাঁর থিয়েটারি অভিজ্ঞতাকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেল। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ ছিল তাঁর নিজেকে প্রকাশ করার অন্যতম হাতিয়ার। সত্যদেব দুবে বরাবরই প্রথা-পরম্পরা না মানা লেখার প্রতি দুর্বল ছিলেন। তাই যখন কলকাতার ‘অনামিকা’ নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত শ্যামানন্দ জালান নির্দেশিত ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাট্য প্রযোজনাটি দেখলেন, তখন তিনি এই নাটকের প্রতি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লেন। নাটকটি সম্পর্কে তাঁর জমে থাকা অনেক প্রশ্নেরই উত্তর পেয়ে গেলেন। অনামিকার ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাট্য প্রযোজনা থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। তিনি ‘ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসে’ লিখেছিলেন, “তাঁর দেখা শব্দ মিশ্রের নাট্যপ্রযোজনার পরে এটাই একমাত্র নাট্যপ্রযোজনা যেখানে কিছু থিয়েটারি অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন।”^{৪৫} সত্যদেব দুবে পরবর্তীকালে নিজেও ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটক মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু শ্যামানন্দের সঙ্গে সত্যদেব দুবে-এর নাট্য উপস্থাপনাগত বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে দেবাশিস রায়চৌধুরীর মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমরা এখানে তা উদ্ধৃত করছি, “শ্যামানন্দ — অমল, কমল, বিমল এবং লেখকের ওপর মনঃসংযোগ করেছিলেন। কিন্তু সত্যদেবের প্রযোজনায় মানসীর চরিত্রের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল বেশি। মানসী আর ইন্দ্রজিৎ-এর মধ্যে গড়ে ওঠা পরিস্থিতিগুলো সম্বন্ধে একটা যে অত্যন্ত তীব্র বোধ যেখানে সত্যদেব নিজেকে ইন্দ্রজিৎ ভাবতে প্রস্তুত ছিলেন, আত্ম-বিভ্রমের শিকার হতেও তৈরি ছিলেন যে তিনিই ইন্দ্রজিৎ এবং তাঁর জীবনে মানসীরা রয়েছে, ... সত্যদেব যখন শ্যামানন্দের এবম ইন্দ্রজিৎ নাট্যপ্রযোজনায় কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত হিসেবে অভিনয় করেন তখন প্রযোজনার শুরুর

চরিত্রভাবনা সব পালটে দেন, সত্যদেব অভিনীত ইন্দ্রজিৎ যেন এক অন্য ভূমিকায়, তাদের সংগ্রাম যেন একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্রতার মর্যাদা পায় সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে। ... ইন্দ্রজিৎকে আজীবন নিজের অস্তিত্বের অঙ্গ হিসেবে ভাবতেন, অস্বাভাবিক আসক্তি ছিল তাঁর ইন্দ্রজিৎ-এর প্রতি।”^{১৬} সত্যদেব দুবে-এর থিয়েটার জীবনে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাট্যপ্রযোজনা সুগভীর প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে সুধন্য দেশপাণ্ডে তাই লিখেছেন—

“এবং ইন্দ্রজিৎ নাটক নির্দেশনার পর যত নাটক তিনি নির্দেশনা করেছেন, প্রত্যেকটির উপরেই এই মহৎ রচনার ছায়া পড়েছে।”^{১৭}

আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি মণিপুরের নাট্যকার হৈন্সাম কানহাইলাল -এর কথা। ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মণিপুরের ইম্ফলে হৈন্সাম কানহাইলালের জন্ম ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪১। পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগে কলেজে পড়াকালীন শুরু হয় তাঁর নাট্যজীবন। ১৯৬৯সালের ১৯শে জুলাই গড়ে তুললেন তাঁর নিজস্ব নাট্যদল ‘কলাক্ষেত্র মণিপুর’। এইদল গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, “‘থিয়েটারের মাধ্যমে মণিপুর এবং তার শিল্পকলাকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা, যাতে সে মানানসই হয়ে উঠতে পারে শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথেও।’”^{১৮} তাঁর থিয়েটার নির্মাণ পদ্ধতি অনেকটা কর্মশালা ভিত্তিক। কানহাইলাল বিশ্বাস করেন যে থিয়েটার কর্মশালা হবে নাট্যনির্মাণের একটি অন্যতম ক্ষেত্র। তাই নাট্যকর্মশালা এমনভাবে সংঘটিত করতে হবে যাতে সেখানে শুধু মাত্র নাট্য প্রশিক্ষণই হবে না। এই বিশ্বাসে ভর করে তিনি তাঁর কাজকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমাজের সর্বস্তরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। তাঁর নাট্য প্রযোজনাগুলির বেশিরভাগই ছিল কর্মশালাভিত্তিক। তিনি সমাজের বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তথাকথিত স্টার অভিনেতা-অভিনেত্রীর উপর তিনি নির্ভরশীল ছিলেন না। আর ঠিক এই কারণেই দেখা যায় ইম্ফলের মীনা বাজারের একশোজন মহিলা ব্যবসায়ীকে নিয়ে তিনি ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে নির্মাণ করলেন ‘নুপিলান’ নাটক, যার ভিত্তি ছিল ১৯৩৯ সালের মণিপুরের বিখ্যাত মহিলা বিদ্রোহ। তাঁর দ্বিতীয় নাট্য ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ মণিপুরের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা অভিনীত ‘সন্জেন্নাহ’ (মেঘপালক)। ১৯৮০সালের মার্চ মাসে চুড়াচাঁদপুর গ্রামের পেইচিং উপজাতীয় যুবদের নিয়ে প্রযোজনা করলেন ‘থাংগুলে লিয়াগু’। তাঁর এইসব নাট্যকর্মের মধ্যে আমরা বাদল সরকারের নাট্যদর্শনের এক সুগভীর সংযোগ খুঁজে পাই। বাদল সরকার ইম্ফলে যান ১৯৭২। সে বছর বাদল সরকার ইম্ফলে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করেন। এই সময় থেকে বাদল সরকারের সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং ধীরে ধীরে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। পরের বছরই কলকাতায় এক মাস কাটিয়ে বাদল সরকারের নাট্য আঙ্গিকের নানা কৌশল তিনি আয়ত্ত করেন।

যেমন অভিনেতার শরীরকে ব্যবহার করার নানা কৌশল, তাকে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি— এসব তিনি বাদল সরকারের কাছ থেকেই শিখেছেন। এ প্রসঙ্গে সুধন্ব দেশপাণ্ডে, লিখেছেন, “প্রত্যাশিত ‘উচ্চমার্গীয়’ হিন্দি বা ভালো ইংরেজি, দুটোয় কোনোমতেই তেমন পারংগম না হওয়ার অপরাধে রাষ্ট্রীয় নাট্যবিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে বাদলবাবুর সঙ্গে একটি কর্মশালায় যুক্ত হয়েই কানহাইলাল তাঁর একান্তই নিজস্ব নাট্যভাষার হৃদিস পান। বাদলবাবুই মণিপুরি থিয়েটারে বাক্যরহিত কায়িক নাট্যভাষার সম্ভাবনা প্রথম উন্মোচন করেন।”^{৯০} কানহাইলাল নিজেই স্বীকার করেছেন সে কথা। তিনি বলেছেন, “তিন বছর ধরে আমি আমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে থাং-তা, আমাদের নটসংকীর্তন, চোলোম, মারশিয়াল আর্টস্, মাইবি নাচ ও গান শিক্ষা করি। আমি যতদিন পুরোপুরি ইনসাইডার ছিলাম, ততদিন যা লক্ষ্য করিনি, বাদলবাবুর সঙ্গে কাজ করার পর তা আমি অন্য দৃষ্টিতে দেখতে শিখি, তাকে বিশ্লেষণ করতে পারি। শরীরের যে বেসিক সায়েন্স আমি বাদলবাবুর কাছে শিখেছিলাম, তার জোরেই আমি আমার এই পরম্পরার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারি।”^{৯১} তিনিও বাদল সরকারের নাট্যভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রাম শহরের নাটকের একটা সমন্বয়ের প্রচেষ্টা করেছেন মণিপুরী নাট্যে। একথা বলতে দ্বিধা নেই “বাদলবাবুর নিয়ামক প্রভাব ছাড়া প্রথম পর্বের ক্লাসিকসম ‘পেবেত’ বা ‘মেমরিজ্ অভ্ আফ্রিকা’ বা পরবর্তীকালে ‘দ্রৌপদী’ ও ‘ডাকঘর’-এর মতো কানহাইলালের সব অসামান্য কীর্তি সম্ভবত হতই না।”^{৯২} বাদল সরকারের কাছ থেকেই তিনি শিখেছিলেন প্রসেনিয়াম মঞ্চের বৈভব ছাড়াও থিয়েটারের মধ্য দিয়ে জটিল সমস্যা ও ভাবনা প্রকাশ করা যায়। নাটককে সবসময় বাক্যবহুল হতে হবে তারও কোনো মানে নেই। আসলে অভিনেতাদের শরীর যদি বাঙ্গুয় হয়, দর্শকদের কল্পনাকে যদি উসকে দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে যে কোন ফাঁকা নাট্যভূমিই যথেষ্ট।

বাদল সরকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব নাট্যচর্চার বীজ বপন করা, নাট্যচর্যাকারীদের প্রশিক্ষণ দান। সত্তরের দশক জুড়ে তিনি সারাদেশ এমনকি দেশের বাইরেও তাঁর থিয়েটার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর নাট্যআঙ্গিক নিয়ে পৌঁছে গেছেন, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। প্রচুর নাট্যকর্মশালা করেছেন। ফলে পরবর্তীতে অনেকেই তাঁর নাট্যাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। যেমন কল্লভাষী বামপন্থী নাট্যগোষ্ঠী ‘সমুদায়া’। এই নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নাট্যনির্দেশক প্রসন্ন রামস্বামী, বি ভি কারস্ প্রমুখ। তাঁদের আমন্ত্রণে বাদল সরকার কুম্বুলগড়-এ দু-সপ্তাহের একটি নাট্যকর্মশালা করেন। বাদল সরকারের সঙ্গে এই যোগাযোগ থেকেই সমুদায়া মুক্তমঞ্চের আদলে পথনাট্যকার পথ বেছে নেয়। যার ফলে পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই সমুদায়া হয়ে ওঠে পথনাট্যকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। শুধু এদেশ কেন, বাদল সরকারের নাট্যদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় প্রতিবেশী

রাষ্ট্র বাংলাদেশেও। আশির দশকের বাংলাদেশের বেশ কিছু নাট্যগোষ্ঠী বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের আদলে নাট্যচর্চার একটা নতুন ধারা শুরু করে। সেখানেও প্রসেনিয়াম থিয়েটারের গণ্ডি ছাড়িয়ে নাটককে নাগরিক বদ্ধতা থেকে মুক্ত করে গ্রামগঞ্জে থিয়েটারকে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে বেশ কিছু নাট্যদল। যেমন-ঢাকার ‘আরণ্যক’ নাট্যদল, ‘ঢাকা থিয়েটার’। মূলত এই দুটি নাট্যদলের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের আঙ্গিকে নাট্যায়নের একটা প্রবল উন্মাদনা শুরু হয়। এবং ধীরে ধীরে তারাও নাটককে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ‘আরণ্যক’ নাট্যদলের বিবৃতি থেকে জানা যায়, “নাটককে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়মিত প্রযোজনাগুলিকে নিয়ে শুরু হল ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী। কিন্তু তাতেও প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হলো না। এই ঘটনাটি ঘটে সত্তরের দশকের শেষ প্রান্তে। শুরু হল বিকল্প অনুসন্ধান— নাটককে মুক্ত করতে হলে চাই জনগণের অংশগ্রহণ।...পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলল শেকড়ের সন্ধান। এ দলের নতুন প্রজন্মের তরুণ কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল এক অসম্ভব যজ্ঞে। যার ফলাফল মুক্ত নাটক।”^{১২} এই ধরনের নাট্যচিন্তার সঙ্গে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের যে গভীর সংযোগ রয়েছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুক্ত নাটক এই বিষয়টিই বাংলাদেশের নাট্যচর্চার একটি নতুন ধারার সংযোজন। প্রথাবদ্ধ প্রসেনিয়াম থিয়েটার চর্চার শৃঙ্খল থেকে নাটক বেরিয়ে এল মাঠে, ঘাটে বিভিন্ন অঞ্চলে। ক্রমে বহু নাট্যদল এগিয়ে এলো এই কাজে। গড়ে উঠলো মুক্ত নাটকের দল। এইভাবেই ১৯৮৬ সালে গঠিত হলো সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সহযোগী জাতীয় বাংলাদেশ মুক্তনাটকের দল। সেলিম আল দীন ও নাসিরউদ্দিন ইউসুফের ‘ঢাকা থিয়েটার’-এর ‘কিন্তু নখোলা’, ‘কেরামতমঙ্গল’, ‘হাত হদাই’ নাট্য প্রযোজনায় আমরা দেখতে পাই প্রসেনিয়ামের সীমাবদ্ধ গণ্ডি থেকে নাটককে মুক্ত করতে তাঁরা সচেষ্ট। তাঁরা শিকড়ের সন্ধানে প্রসেনিয়ামকে ছাপিয়ে থিয়েটারকে গ্রামগঞ্জে নিয়ে গেলেন। গড়ে উঠল ‘গ্রাম থিয়েটার’ তথা মুক্ত থিয়েটার। এই গ্রাম থিয়েটারের উদ্দেশ্য কী? গ্রাম থিয়েটারের প্রবর্তক সেলিম-নাসিরউদ্দীন তাঁদের ঘোষণাপত্রে এই থিয়েটারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন—

“গ্রাম থিয়েটার মেরুদণ্ডহীন আপোসকামী নাট্যচর্চার বিরুদ্ধে প্রাণবন্ত ও প্রাণদায়ী নাট্যচর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।... গ্রাম থিয়েটার আধুনিক নাট্যকলার সঙ্গে বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্য-আঙ্গিকের সমন্বয় সাধনে বদ্ধপরিকর। গ্রাম থিয়েটার শহরকেন্দ্রিক নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে নাটকের দল গঠন ও মেলা পত্তনে দৃঢ়সংকল্প।”^{১৩}

বাংলাদেশের এইসব থিয়েটার কর্মের সঙ্গে বাদল সরকারের থিয়েটারের সরাসরি সংযোগ

না থাকলেও প্রতিবেশী দেশেও যে তাঁর প্রভাব পড়েছে এগুলি তার অন্যতম প্রমাণ। নানা সময় বাদল সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের বেশ কিছু নাট্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের একটা যোগাযোগ তৈরি হয়। ১৯৬৮-সালে বাংলাদেশের ‘স্বনন’ নামের একটি আবৃত্তি সংগঠন কলকাতায় আসে। সেই সময় তারা কলকাতায় প্রত্যক্ষ করেন বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটারের নাটক। বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নিশাত জাহান রানা লিখেছেন—

“আমরা ৪ সদস্যের একটি দল কলকাতায় গেলাম। অনেক অনুষ্ঠান হল। অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হল। আমাদের কলকাতা ভ্রমণের সার্বিক ব্যবস্থাপক সুশীল সাহা, একদিন আমাদের নিয়ে চললেন অঙ্গন মঞ্চে নাটক দেখাতে— ‘শানা বাউরির কথকতা’। সেই প্রথম আলাপ হল বাদল সরকারের সঙ্গে। অন্যরকম নাটক, অন্যরকম নাট্য-উপস্থাপনা, অন্যরকম মানুষ। আমাদেরও এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা।”^{১৪}

বাদল সরকারও বাংলাদেশ গণসাহায্য সংস্থা ও বাংলাদেশ শিল্পকলা অ্যাকাডেমি আয়োজিত ‘উন্মুক্ত নাট্য উৎসব’-এ আমন্ত্রিত হয়ে সেদেশে যান। এই নাট্যোৎসব চলে ২৩-২৮ অক্টোবর, ১৯৯৮। তাঁর নিজের নাট্যদল শতাব্দী এবং অনুসারী নাট্যদল শতক, আয়না ও পথসেনা তাদের মুক্তমঞ্চের বেশ কিছু নাটক মঞ্চস্থ করে। বাংলাদেশের বিখ্যাতসোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত সেই নাট্যোৎসবে ২৫ অক্টোবর, শনিবার, অভিনীত হয় বাদল সরকারের মুক্তমঞ্চের নাটক ‘হটুমালা ওপারে’। প্রযোজনায় শতক নাট্যদল। ২৭ অক্টোবর আয়না প্রযোজনা করে ‘বাঘ’। ওই একই দিনে শতক নাট্যদল প্রযোজনা করে ‘ভোমা’। ২৮ অক্টোবর অভিনীত হয় ‘ভুল রাস্তা’ নাটক। এই নাটকে বাদল সরকার একক অভিনয় করেন। শুধু তাই নয়, এই নাট্য উৎসবে যোগদানের অনেক আগে থেকেই বাদল সরকারের থিয়েটারের সঙ্গে বাংলাদেশের নাট্য জগতের অনেকেরই একটা পরিচয় ঘটে। বাদল সরকার বাংলাদেশে প্রথম যান ১৯৭৯ সালে। ‘দেশনাটক’ নামক এক নাট্যসংস্থার আমন্ত্রণে ২-৩ নভেম্বর, ১৯৭৯ সালে সাতদিনের একটি নাট্যকর্মশালায় যোগ দিতে তিনি ঢাকায় যান। এভাবেই বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটারে সঙ্গে সেদেশের নাট্য ব্যক্তিত্বদের একটা সম্যক ধারণা তৈরি হয়। সেদেশের অনেকেই তাঁর নাট্যকর্মশালার দ্বারা প্রভাবিত হন। উক্ত নাট্যকর্মশালায় অংশগ্রহণকারী দেশনাটক-এর নাট্যাভিনেতা ইশরাত নিশাত লিখেছেন—

“... থিয়েটারকে মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগের লক্ষ্যকে সফল করতে ব্যক্তি অহং ত্যাগ করে বহুর সাথে ক্রিয়া করবার মানসিকতা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া হিসেবে বোধ, বাদলদার সাতদিনের কর্মশালায় আমার প্রাপ্তি। অর্থাৎ,

আদর্শগত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্বহীন করে তোলা ও আদর্শ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত সৃজনশীলতাকে কাজে লাগানোর শিক্ষা আমি অর্জন করলাম।”^{১৫}

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলাদেশের নাট্যব্যক্তিত্ব শিশির দত্তের কথাও। তাঁর ‘বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ থিয়েটার’ বা ‘বিটা’র নাট্যকর্মশালার পদ্ধতিও অনেকাংশে বাদল সরকারের দ্বারা প্রভাবিত। কী সেই পদ্ধতি? বাদল সরকার যেমন তাঁর তৃতীয় ধারার নাট্যনির্মাণ করেন কর্মশালার মধ্যে দিয়ে, ঠিক একই পদ্ধতিতে কর্মশালার মাধ্যমেই মুখেমুখে নাটক তৈরি করে নেন শিশির দত্তের ‘বিটা’ নাট্য সংস্থা। বিটার সেই নাট্য নির্মাণ পদ্ধতির কথা বলতে গিয়েবিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অরুণ সেন লিখেছেন—

“..তাদের কর্মশালায় গিয়ে দেখি কখনো পতেঙ্গা বন্দরের জেলেদের নিয়ে, কখনো চট্টগ্রামে শহরেরই রিকশাওয়ালা-মজদুর-ছোট দোকানদারদের নিয়ে থিয়েটারের মহড়া চলেছে, নাটকের কুশীলবেরা নিজেরাই মুখে-মুখে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচনা করে চলেছে সেই নাটক।”^{১৬}

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি হল, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বহু নাট্য ব্যক্তিত্বের নাট্যকর্মের মধ্যে বাদল সরকারের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও এ রাজ্যে সেই রকম দৃষ্টান্ত খুব কম। আমরা এখানে বলতে চাইছি তথাকথিত সেইসব থিয়েটার দলের নাট্য ব্যক্তিত্বদের কথা, যাঁরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু বর্তমান প্রজন্মের স্বনামধন্য নাট্যকার ও নাট্যনির্দেশক অধ্যাপক সৌমিত্র বসু (জন্ম ১৯৫৬, ২৫শে নভেম্বর)। বলা ভালো এরাজ্যে তিনি একমাত্র নাট্যব্যক্তিত্ব, যিনি বাদল সরকারের নাট্যকর্মকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মান করেছেন এবং তাঁর নাট্যাদর্শকে মেনে নিয়ে নাট্যচর্চার ধারাকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে চলছেন। তিনিও প্রথাগত নাট্যমঞ্চকে অস্বীকার করার কথা বলেন। নাটক মানেই চোখের সামনে একটা স্টেজ ভেসে উঠবে, আর দর্শকের সামনে একটা ছবির ফ্রেমের মতো মঞ্চ পর্দা ফেলা থাকবে এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষপাতী তিনি। তিনি একটি প্রবন্ধে বলেছেন, “নাটকের ভাবনাটা প্রথাগত অর্থে যাকে মঞ্চ বা অভিনয়ক্ষেত্র বলি, তার বাইরেই বা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারব না কেন?”^{১৭} তিনি মনে করেন প্রসেনিয়ামই একমাত্র নাটকের মঞ্চ নয়। তাঁর মতে থিয়েটারের অভিনয় স্থলটি হবে নাটকের দাবি মেনে। তিনি লিখেছেন—

“মঞ্চ বলতে যে নির্দিষ্ট আয়তনের জমিখণ্ডকে বুঝি, তাকে না মেনে অনির্ণেয় সব উদ্ভাবন বার করা যায় না? যেমন ‘মুড়কির হাঁড়ি’ কি সত্যি সত্যি একটা

ছোটো জঙ্গলের মধ্যেই অভিনয় করা যায় না, বা ধরা যাক ইবসেনের ‘*A dolls House*’, এর বাংলা রূপান্তর হল কোনো একটি ফ্ল্যাট বাড়িতেই, নির্বাচিত দর্শকের সামনে। কত রকম করেই তো ভাবা যায়, শিল্পকাজকে করে তোলা যায় অপ্রথাগত, এমনকী অনির্গেয়।”^{১৮}

সৌমিত্র বসুও থিয়েটারে দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার জল-অচল বিভাজনকে বিশ্বাস করেন না। দর্শক-অভিনেতার বিভাজনকে ভাঙতে চান তিনি। এক্ষেত্রেও তিনি বাদল সরকারের দর্শক-অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপরেই জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, তিনিও লোকনাট্যের খাঁচে থিয়েটারে মানুষের জীবনচর্চাকে তুলে ধরার পক্ষে সাওয়াল করেছেন। তিনি লিখেছেন—

“লোকনাট্য আলাদা করে তার উদ্দিষ্ট উপভোক্তার বিনোদনের বিষয় নয়, তা সেখানকার মানুষের জীবনচর্চা বা কৃত্যের অন্তর্গত। আমরা আমাদের থিয়েটার দিয়ে বিকল্প একটা জীবনচর্চার খাঁচা বা কৃত্য গড়ে তুলতে পারিনি, অথচ সে সুযোগ ছিল আমাদের সামনে, ... আজকের থিয়েটারের অন্তত চেষ্টা কি থাকতে পারে না, নাট্যাভিনয়কে একটি সামূহিক অভিজ্ঞতার জায়গায় নিয়ে যাবার? আর তার জন্যে দর্শকের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন নতুন সেতু তৈরির চেষ্টা করার?”^{১৯}

সৌমিত্র বসু মনে করেন অ্যাকাডেমি ইত্যাদি ঠাণ্ডা ঘরে দুশো, পাঁচশো টাকা দিয়ে থিয়েটার দেখতে পারেন না এমন মানুষের সংখ্যা বিস্তর। তাদের কথা ভেবে দেখা দরকার। এইজন্য তিনি থিয়েটারকে নির্দিষ্ট একটি প্রেক্ষাগৃহ থেকে বের করে আনার পক্ষপাতী। এদিক থেকে তিনি বাদল সরকারের পথকেই বেছে নিয়েছেন। বাদল সরকারের মতো তিনিও মনে করেন—

“যে কোনো একটা খোলা জায়গা হতে পারবে অভিনয়ক্ষেত্র, সামান্য কিছু পয়সা দিয়ে, অথবা আগে থেকে না দিয়ে সেখানে এসে বসবেন মানুষজন, নাটক দেখে তাঁদের যা মনে হবে তাই দিয়ে যাবেন অভিনয় শেষে। একটা গড় আলোতে দিব্য চলে যেতে পারে অভিনয়, সে আলো বাড়ানো কমানোর দরকার নেই, রঙ বেরও তো বহু দূরের কথা—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, দৃশ্যশেষে আলো নেভানোটাও আবশ্যিক নয়, দর্শক ঠিক বুঝে নেন কোথায় দৃশ্য শেষ হলো,...”^{২০}

সৌমিত্র বসু অবশ্য সরাসরি বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারকেই যে মনে নিয়েছেন

এমনটাও নয় কিন্তু তাঁর আদর্শকে প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করেছেন। বাদল সরকারের উত্তরসূরী হিসেবে সৌমিত্র বসু তাঁর দেখানো পথকেই বেছে নিয়েছেন, কিন্তু একটু ভিন্নভাবে। থিয়েটারকে আরো বেশি প্রসারিত করার কাজে তিনি নিজেকে প্রতিনিয়ত নিযুক্ত করছেন। না প্রসেনিয়াম, না থার্ড থিয়েটার—কোন একটা জায়গায় আটকে থাকার পক্ষপাতী তিনি নন। তিনি বিশ্বাস করেন, “কোনো একটা জায়গায় আটকে যাওয়াটা স্বাস্থ্যকর নয়.... নানা ধরনের পথ বার করাটাই জরুরি”^{২১} তিনি থিয়েটারের অভিনয় পদ্ধতিকে নির্দিষ্ট একটা বর্গীকরণের পক্ষপাতী নন। প্রসেনিয়াম একটা পদ্ধতি, থার্ড থিয়েটার কিংবা অঙ্গনমঞ্চ মুক্তমঞ্চ অথবা পথনাটক এটা একটা পদ্ধতি। যে পদ্ধতি নাটকের ক্ষেত্রে উপযুক্ত মনে হবে সেটিই কাম্য।

বাদল সরকারের নাট্যাদর্শনের প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর নাট্যাদর্শকে প্রসারিত করার লক্ষ্য নিয়ে পরবর্তীকালে বহু নাট্যদল এগিয়ে আসে। আমরা লক্ষ্য করি এ রাজ্যে আশির দশকে বেশকিছু নাট্যদল একত্রিত হয় বাদল সরকারের নাট্যাদর্শকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রসারিত করতে। বাদল সরকার বিশ্বাস করতেন থিয়েটার সাধারণ মানুষের। যেমন করে চাল ডাল তেল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, ঠিক সেভাবেই থিয়েটারকে পৌঁছাতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে। তিনি পৌঁছাতে চেয়েছেন শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের কাছে, তুলে ধরতে চেয়েছেন তাদের স্বর। আর সেই উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পড়েছিলেন গ্রাম পরিক্রমায়। ১৯৮৬ সালের ২৮ মার্চ থেকে ৩০শে মার্চ শুরু হল গ্রাম পরিক্রমা। বাদল সরকারের শতাব্দী নাট্যদলের সঙ্গে সেই পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ে ‘এরিনা থিয়েটার গ্রুপ’, ‘পথসেনা’, ‘পিপলস্ আর্ট থিয়েটার অশোকনগর’, ‘ঋতম’, ‘ঠাকুরনগর সাংস্কৃতিক পরিষদ’, ‘তীরন্দাজ’, হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা’। গোটা নব্বই-এর দশক জুড়ে চলে সেই গ্রাম পরিক্রমা। শুরু হয় থার্ড থিয়েটার আন্দোলন। ক্রমশ এই আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে গ্রামে। পুরোনো এবং বেশ কিছু নতুন নাট্যদল এখনও তাঁর নাট্যাদর্শকে পাথেয় করে অঙ্গন-মুক্তমঞ্চ নাটক করে চলছে। মাঝে মধ্যে গ্রাম পরিক্রমাও করে চলছে। প্রসঙ্গত আমরা এখানে নব্বই-এর দশকের পরবর্তী বেশকিছু নাট্যদলের গ্রাম পরিক্রমার একটা পরিসংখ্যান তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

২০০১ সালের ৩-৪ নভেম্বর আয়না নাট্যগোষ্ঠী একক উদ্যোগে হাওড়ার রাজবলহাট, নস্করডাঙ্গা স্কুলমাঠ, মনসাতলা, শীলবাটি, রহিমপুর ও নবগ্রামে দু-দিনের গ্রাম পরিক্রম করে। সঙ্গে নিয়ে যায় তাদের নিজস্ব নাটক ‘বোকার স্বপ্ন’, ‘সিঁড়ি’, ‘শোক প্রস্তাব’ ও ‘ঝগড়া বৃত্তান্ত’। এর পর দেখা যাচ্ছে ২০০৮ এবং ২০০৯ পরপর দু’বছর বেশকিছু নাট্যদল তাদের নাটক নিয়ে গ্রাম পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ে। ৮-৯ ই মার্চ ২০০৮ ‘পথসেনা’ ও ‘হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা’ হুগলির

শ্রীপুর দোলতলা রাসমঞ্চ, মিলনগড় শ্রীপুর বাজার স্মৃতিমন্দির, বলাগর বৃন্তি অঞ্চল পরিক্রমা করে। তারা যৌথভাবে প্রযোজনা করে বাদল সরকারের ‘ক চ ট ত প’, ‘হট্টমালার ওপারে’, ‘বেহুলা’, ‘চাঁদ বণিকের পালা’। ৬-৮ ই নভেম্বর, ২০০৯ শতাব্দী, পথসেনা, আয়না ও শতক, হাওড়া-হুগলির পার্শ্ববর্তী গ্রাম পরিক্রমা করে। ‘পরিক্রমার তিন দশক’ গ্রন্থে এই পরিক্রমার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়—

“বাগান্ডা, বুড়োশিবতলা, সীতাপুর, ভাঙাদালান মাতৃমন্দির, শিবতলা, নক্ষরডাঙা, শিলবাড়ি, রাজবলহাট মন্দির চাতাল-এ পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়।... শতাব্দী, পথসেনা ও আয়না সমবেত সংগীত পরিবেশন সহ নাট্যাভিনয় করে শতাব্দী-র ‘চডুইভাতি’, ‘ওরে বিহঙ্গ’, ‘নয়ন কবিরের পালা’, পথসেনা-র ‘মহাজ্ঞানী’, ‘বেহুলা’। আয়না-র ‘শাইলক’, ‘তির্যক’, ‘বাঘ’, ‘শোক প্রস্তাব’, এবং শতক-এর ‘হট্টমালার ওপারে’।”^{২২}

২০০৯ সালের পর অবশ্য এই গ্রাম পরিক্রমা বিষয়টি কিছুটা ভাঁটা পড়ে। এর একটা অন্যতম কারণ বাদল সরকার তখন বয়সের ভারে ক্লান্ত। অসুস্থও বটে। যে সমস্ত নাট্যদল গ্রাম পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের প্রাণপুরুষ ছিল বাদল সরকার। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনেকেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তবে এর বাইরেও আর একটি অন্যতম কারণ হল এই সময়পর্বে এসে ‘সত্তরের দশকের উদ্যোগ ও রাজনৈতিক কমিটমেন্ট ক্রমেই ঢিলে হতে থাকে।’^{২৩} আর ২০১১ সালে বাদল সরকারের মৃত্যুর পর স্বাভাবিক কারণেই বেশ কয়েক বছর গ্রামপরিক্রমা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২-৩ দু’দিনের পরিক্রমা করে হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা। গন্তব্যস্থল নদীয়ার ধুবুলিয়া, চরমাদপুর, সোনাতলা শালিগ্রাম, গাছবাজার নাকাশীপাড়া, তেঘাড়ী গ্রাম। নাটক পরিবেশিত হয়, ‘অন্ধকারের নদী’ ও ‘বেহুলা’। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৯-১০ দু’দিনের গ্রাম পরিক্রমা করে শতাব্দী, পথসেনা, আয়না। এবার তাদের গন্তব্যস্থল— “হাওড়া ও হুগলীর শিবতলা, কালীতলা, অযোধ্যা-জাঙ্গীপাড়া, দেপাড়া, দাসপাড়া ও গুলটিয়া, রাজবলহাট। দু-দিনের এই পরিক্রমায় অভিনীত হয় শতাব্দীর ‘উদ্যোগপর্ব’ ও ‘হট্টমালার ওপারে’। ‘পথসেনা’ অভিনয় করে ‘মহাজ্ঞানী’, ‘ঘোড়া’; আয়না অভিনয় করে ‘বাঘ’, ‘গাধায়ন’ ও ‘আরাবের অরিন্দার’।”^{২৪}

একটি বিষয় লক্ষণীয় ১৯৮৬ তে শতাব্দীসহ আটটি নাট্য-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গ্রাম পরিক্রমা শুরু করলেও পরবর্তীতে বেশকিছু নতুন নাট্যগোষ্ঠী এগিয়ে আসে। যেমন আয়না এবং আরও পরে ‘দৃশ্যান্তর’ ও ‘চেনা আধুলি’, ‘কোরাস’, ‘কল্যাণী কলামগুলম’ প্রভৃতি। ২০১৬ সালের ৭-৯ই

মার্চ, তিন দিনের গ্রাম পরিক্রমা করে ‘দৃশ্যান্তর’ ও ‘চেনা আধুলি’। গন্তব্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথর প্রতিমা ব্লকের মেহেরপুর। ৭ ই মার্চ মেহেরপুর তুলসীরাণী বিদ্যাপীঠ স্কুলের মাঠে তারা অভিনয় করে ‘হট্টমালার ওপারে’, ‘ভুল রাস্তা’। ৮ই মার্চ, কালীবাজার, নারায়ণপুর বাজারে জনতার সামনে অভিনয় করে ‘হট্টমালার ওপারে’, ‘বাঘারে’, ‘স্পার্টাকুস’। ৯ই মার্চ মেহেরপুরের পোদ্দারপাড়ায় অভিনীত হয়— ‘হট্টমালার ওপারে’, ‘বাঘারে’ নাটক। সেখান থেকে কাছারিপাড়ায়। অভিনীত হয়, ‘ইচ্ছে করে’, ‘হট্টমালার ওপারে’। ওই একই বছর আরও দুটি নাট্যদল গ্রাম পরিক্রমা করে— একটি আয়না এবং অন্যটি কল্যাণী কলামগুলম। ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৬, আয়না নাট্যগোষ্ঠী তাদের নাটক নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে সুদূর সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া গ্রামে। সেখানে তারা অভিনয় করে তাদের নিজস্ব নাটক ‘শাইলক’, ‘গাধায়ন’।

আয়না নাট্যগোষ্ঠীর মতোই অঙ্গন-মুক্তমঞ্চ-এ দীর্ঘদিন ধরে নাট্যচর্চা করে চলছে কল্যাণী কলামগুলম। দেবশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, “কল্যাণী কলামগুলম তাঁদের নাট্যদলের মধ্যে একটি দল তৈরি করেছেন শুধুমাত্র অঙ্গন মঞ্চ ও মুক্ত মঞ্চ নাটক পরিবেশনার জন্য। এঁদের প্রথম নাটক *অঙ্গনারা*।”^{২৬} ২০১৬ সালের ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর কল্যাণী কলামগুলম তাঁদের নাটক ‘অঙ্গনারা’ নিয়ে দু’দিনের পরিক্রমা করে বীরভূম ও বর্ধমানের প্রত্যন্ত গ্রামে। ১৭ই ডিসেম্বর প্রথমে চেল্লা কামার পাড়ার, ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল ওয়ার্ক-এর মহিলা সমিতির স্কুল প্রাঙ্গণে এবং পরে বর্ধমানের সাতকাকাহানীয়ার তেপান্তর নাট্যগ্রামে অভিনীত হয় ‘অঙ্গনারা’ নাটক। আর ১৮ ডিসেম্বর বীরভূমের লাভপুরের বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর ব্যবস্থাপনায় তাঁদের উঠোনে তারা অভিনয় করে ‘অঙ্গনারা’। শুধু এ রাজ্যেই নয়, রাজ্যের বাইরেও বিগত কয়েক বছরে বেশকিছু পরিক্রমা করে কল্যাণী কলামগুলম। ২০১৭ সালের ২৫-২৬ জানুয়ারি কল্যাণী কলামগুলম তাদের নাটক নিয়ে রওনা দেয় পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরা। ২৫ তারিখ প্রথমে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাক্রম সাব ডিভিশনের হরিণা বাজার এবং পরে সোনাই বাজার -এর উন্মুক্ত মঞ্চে কল্যাণী কলামগুলম তাদের ‘অঙ্গনারা’ নাটক মঞ্চস্থ করে। পরদিন ২৬ জানুয়ারি ওই একই নাটক অভিনীত হয় আগরতলার শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাস, আগরতলা সিটি সেন্টার-এর চাতালে।

দীর্ঘদিন ধরে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের নাট্যাদর্শকে সামনে রেখে নাট্যচর্চা করে চলছে আসামের শিলচরের ‘কোরাস’ নাট্যসংস্থা। নাট্যায়নের পাশাপাশি আয়োজন করে চলছে নাট্য উৎসবের। কোরাসের উদ্যোগে ২০১৭ সালের ২৬ থেকে ২৯ জানুয়ারি চার দিনের বরাক উপত্যকা সাংস্কৃতিক পরিক্রমার অঙ্গ হিসেবে চলে বিভিন্ন নাট্যদলের অংশগ্রহণ। কোরাস নাট্যদলের নাট্যকর্মীদের প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি, “মুক্ত মঞ্চ মানুষের সাথে মুক্তির লক্ষ্যে

চতুর্থ বারের মতো কোরাস বরাক উপত্যকা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক পরিক্রমের কর্মসূচি হাতে নেয় ২০১৭ সালে। পরিক্রমের দ্বিতীয় দিনে অংশগ্রহণ করেন ...দেবাশিস চক্রবর্তী ও ‘কল্যাণী কলামণ্ডলম — ... নাটক ‘অঙ্গনারা’ নিয়ে। প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের এই নাটক নারীমুক্তি, চেতনা ও অধিকারের লড়াইয়ের বার্তা দর্শক মনে পৌঁছে দেয়। কোরাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সহজযাত্রী ছিল ‘ফোরাম ফর সোস্যাল হারমনি’ ও ‘আখর বাউল’। সাথে ছিল দুলাল করের নাটক ‘মহাজ্ঞানী’, সমরেশ বসুর গল্প থেকে ‘আদাব’ বাদল সরকারের ‘হট্টমালার ওপারে’..।”^{২৬} কোরাস নাট্যদল বাদল সরকারের আদর্শকে পাথেয় করে আজও তাঁরা তাঁদের নাট্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। নাটক করার পাশাপাশি করে চলেছেন নাট্যকর্মশালা। তাঁরা গত ৩১ জুলাই ২০২২ থেকে ৭ই আগস্ট ২০২২, সাত দিনের কর্মশালার আয়োজন করে। তাদের একটাই লক্ষ্য,

“...মানুষে মানুষে ঐক্যের বার্তা পৌঁছে দেওয়া, মানুষের সাথে মানুষের যোগসূত্র স্থাপন করা, সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নতির অনিশ্চয়তার বিষয় নিয়ে আলোচনা ও থিয়েটারের মাধ্যমে তা থেকে মুক্তির পন্থা আবিষ্কার করা এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সমঝে দিয়ে বুকে আশার আলো জ্বালিয়ে দেওয়া।”^{২৭}

২০১৭সালের পর ২০১৮ সালের ২৬ শে জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি আবারও কোরাস আয়োজন করে বরাক উপত্যকা সাংস্কৃতিক পরিক্রম ২০১৮। তারা বরাকের বিভিন্ন প্রান্তিক অঞ্চলে নাটক নিয়ে পরিক্রম করে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় ‘আখর বাউল’ ও দীর্ঘদিনের সহযোগী ‘ফোরাম ফর সোস্যাল হারমনি’। কোরাস নাট্যদলের দীর্ঘদিনের কর্মী জিৎ সিকদারের একটি প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি, প্রথম দিন ২৬ জানুয়ারি স্থানীয় মান্ডি সংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে বড়শিঙ্গা চা বাগান দিয়ে শুরু হয় পরিক্রম। নাচ গানের পাশাপাশি কোরাস নামায় বাদল সরকারের ‘হট্টমালার ওপারে’। তারপর ২৭ জানুয়ারি ‘তিনটিকরি’ নামক গ্রামে নাটক করার পর তারা পৌঁছায় ‘লাঠিমায়া’ জনতা হাইস্কুলের অঙ্গনে। সেখানে অভিনীত হয় কোরাসের নতুন নাটক ‘কোথায় আমার দেশ’। ২৮ জানুয়ারি কটিগড়া চৌরঙ্গী, বোয়ালিপাড় বাজার তারপর রংপুর গ্রাম দিয়ে এই তিনদিনের পরিক্রম শেষ হয়। জিৎ সিকদার লিখেছেন—

“... একরাস উজ্জ্বল স্মৃতি নিয়ে আমাদের এবারের পরিক্রম শেষ হল। এই তিন দিন সবকিছু ছেড়ে থিয়েটার ও জনশ্রোতের সাথে মিশে মনে হচ্ছে, এই ধারার নাটক যারা করি, কোন ভাবেই আমরা জনতার থেকে আলাদা নই, ... দুটো জিনিস অনুধাবন করলাম, গ্রামীণ জনতা সহজে আপন করে নেওয়াটা

জানে। ...সেখানকার মানুষ শান্তিতে বাঁচতে চায়। বিভিন্ন ধর্ম-জাতের জন্য
এখনও আমাদের বরাকের গ্রামে কোনো গরিবের অটো রিক্সা পোড়ে না, ঘর
পড়ে না।।”^{২৮}

সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই নৈকট্যই তো বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের মূল লক্ষ্য। সেই
আদর্শকেই এগিয়ে নিয়ে চলছে কোরাস। নিয়মিত গ্রাম পরিক্রমার পাশাপাশি করে চলছে
নাট্যকর্মশালা।

এই মুহূর্তে তৃতীয় ধারার থিয়েটার দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নিয়মিত নাট্যাভিনয়
করে চলেছে বেশ কিছু নাট্যদল। যেমন— বহরমপুরের ‘ব্রীহি’ নাট্যসংস্থা। ২০১৭ সালের ২রা
ফেব্রুয়ারি কলকাতার আয়না নাট্যদলের সঙ্গে মিলিতভাবে মুর্শিদাবাদের তিনটি গ্রাম-গোকর্ণ, রণগ্রাম,
নবগ্রাম পরিক্রমা করে। সঙ্গে নাটক ব্রীহি-র ‘মনের ব্যাধি’, ‘হেমবতী কন্যা’, ‘আস্তিগোনে আজও’
আর আয়নার ‘আরারের আরিন্দারা’। এছাড়াও তমলুক ব্রাইট থিয়েটার, বাটানগর থিয়েটার ওয়ার্কশপ,
কোচবিহারের বর্ণনা, পানাগড়-বর্ধমানের রুরাল লিভিং থিয়েটার, বহরমপুরের যুগাঙ্গি প্রভৃতি নাট্যদল
বাদল সরকারের আঙ্গিকেই অঙ্গন মঞ্চ-মুক্তমঞ্চে অভিনয় চালিয়ে যায়। কৃষ্ণনগরের ‘তীরন্দাজ’
একটা সময় জেলা শহর এবং গ্রামে নাটক অভিনয় করে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। পরবর্তীতে
‘তীরন্দাজ’ ভেঙে নতুন নাট্যদল গঠিত হয়। নাম হয় অঙ্গনমঞ্চ নাট্যপ্রয়াস। এরা মূলত বাদল
সরকারের দেখানো পথেই তাদের থিয়েটার চর্চার ধারা অব্যাহত রাখে। খড়দহের লিভিং থিয়েটার
একসময় অঙ্গন-মুক্তমঞ্চে একের পর এক অভিনয়ে প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এক সময় এরা
খড়দহের একটি স্কুলের ঘরে সপ্তাহে একদিন অঙ্গনমঞ্চে অভিনয় করত। তারপর মুক্তমঞ্চে অভিনয়
শুরু করে। পরবর্তীতে এই দল ভেঙে তৈরি হয় — অল্টারনেটিভ লিভিং থিয়েটার। নাট্যব্যক্তিত্ব
প্রবীর গুহের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে তারা বাদল সরকারের থিয়েটার ভাবনাকে রূপায়ণের চেষ্টা
করে চলেছেন। অল্টারনেটিভ লিভিং থিয়েটারের নেতৃত্বে এগারোটি নাট্যদল নিয়ে তৈরি হয়
পানাগড় থিয়েটার ফোরাম। তারা দীর্ঘদিন মুক্তমঞ্চে অভিনয় করেছে। এছাড়াও ছয়টি দল নিয়ে
তৈরি হয় বিহার থিয়েটার ফোরাম। এইসব নাট্য সংস্থা বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের আদর্শ
পাথেয় করে তাদের নাট্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছে।

অতি সাম্প্রতিককালে শতাব্দীসহ বেশকিছু নাট্যগোষ্ঠীর অঙ্গন-মুক্তমঞ্চে নাট্য প্রযোজনা
উল্লেখ করার মতো। গত ২০২২ এর ১৩ থেকে ১৬ অক্টোবর ডোভার লেন-এ ‘আলপনা পরব’
শিরোনামে চারদিনের নাট্যোৎসবের আয়োজন করে বিসর্গ নাট্যগোষ্ঠী (তাদের সপ্তম বর্ষে)। এতে
অংশ নেয় বেশ কিছু নাট্যগোষ্ঠী। ১৫ই অক্টোবর আয়না নাট্যগোষ্ঠী করে অমর মিত্রের ‘নিরুদ্ভিষ্টের

উপাখ্যান’ অবলম্বনে রচিত নাটক ‘না’। ১৪ই অক্টোবর রূপ ও রঙ থিয়েট্রিকালস প্রযোজনা করে নভেন্দু সেন এর ‘মল্লভূমি’ অবলম্বনে রচিত নাটক ‘চক্রবর্তী সহাবস্থান’। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নাট্যগোষ্ঠী গত ২৮শে অগাস্ট, ২০২২ তৃপ্তি মিত্র প্রেক্ষাগৃহে অন্তরঙ্গ নাট্যযাপনের আয়োজন করে। সেখানে শতাব্দী করে বাদল সরকারের ‘ভোমা’, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রযোজনা করে বাদল সরকারের ‘বীজ’ নাটক। নির্দেশনায় ছিলেন সুনয়ন মুখোপাধ্যায়। বিসর্গ নাট্যগোষ্ঠী গত ২৩ ও ২৪ জুন ২০২২ তাদের তিনটি নাটক — ‘বাঘচাল’, ‘কৌটো’, ‘সমীকরণ’ নিয়ে দুদিনের গ্রাম পরিক্রমা করে। গন্তব্য ঝাড়গ্রাম। ‘অন্যকণ্ঠ’ নাট্যগোষ্ঠী নন্দন চত্বরে প্রতি মাসের প্রথম তৃতীয় রবিবার নিয়মিত মুক্তমঞ্চের অভিনয় করে চলছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২, অন্যকণ্ঠ নাট্যগোষ্ঠী করে বাদল সরকারের ‘ভুল রাস্তা’। বিসর্গ প্রযোজনা করে তাদের ‘কৌটো’ নাটক। লক্ষ্য একটাই বাদল সরকারের নাট্যদর্শকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রসারিত করা। বিসর্গ নাট্যদলের সাম্প্রতিকতম সংযোজন ‘থিয়েটারের হোম ডেলিভারি’। অর্থাৎ আমন্ত্রণ করলেই যে কেউ থিয়েটার দেখার সুযোগ পেতে পারেন। গত ৯ অক্টোবর ২০২২, এল ১/২৬ বিদ্যাসাগর, কলকাতা ৪৭, ১৭ বি বাসস্ট্যান্ডের জনৈক বাসিন্দা অনিন্দিতা দাশগুপ্তের বাড়ির ছাদে বিসর্গ প্রযোজনা করে তাদের ‘বাঘচাল’ নাটক।

আসলে বাদল সরকারের নাট্য দর্শনের মূলে রয়েছে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন। যেটাকে তিনি বলেছেন ‘নন পার্টি লেস্ট’। তাঁর কোন পার্টি পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট ছিল না। একটা সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তিনি তাঁর নাটকের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের কথা বারবার বলেছেন। তিনি সত্যকে উদঘাটন করতে চেয়েছেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অব্যবস্থাকে সুস্পষ্টভাবে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। একই সঙ্গে কোন ব্যবস্থা থেকে অনড়াবস্থা তৈরি হচ্ছে, সেটা জানিয়ে দেওয়া এবং তার মধ্য দিয়ে কেবল জানিয়ে দেওয়াই নয়, একটা সম্ভাবনাকে প্রকাশ করাই বাদল সরকারের থিয়েটারের মূল লক্ষ্য। বাদল সরকারের সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই বহু নাট্যদল আজ পথে নেমেছে। এইভাবে বাদল সরকারের নাট্যদর্শ বর্তমান প্রজন্মের নাট্যচর্চার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলছে। এখানেই নাট্যকর্মী বাদল সরকারের সার্থকতা। বাদল সরকারের নাট্যদর্শের মূল্যায়ন করতে গিয়ে গিরিশ কারনাড যথার্থই বলেছেন—

“...আধুনিক অর্থে নাট্যকার আসলে এক উপনিবেশিক আমদানি। যে-থিয়েটার তাঁকে তাঁর যশ এনে দিয়েছিল, সেই থিয়েটার খারিজ করে বাদলদা ফিরে গিয়েছিলেন প্রাক-উপনিবেশিক সেই থিয়েটারে যেখানে অভিনেতা ও দর্শকের প্রত্যক্ষ মুখোমুখি সংযোগ থেকে আমাদের পারিপার্শ্বিক বাস্তবের বোধ নতুন হয়ে ফিরে আসত। সারা ভারত পরিক্রমা করে কর্মশালার মধ্য দিয়ে এই

থিয়েটারের চর্চায় ও বিকাশে তিনি পথের থিয়েটারে আঙ্গিকের এক বিচিত্র
জটিল সম্ভার নিয়ে আসেন... আমাদের পরে যে প্রজন্ম থিয়েটারে এসেছে,
তাদের উপর তাঁর প্রগার ও প্রভাব পড়েছে।”^{২৯}

তথ্য সূত্র:

১. রায়চৌধুরী, দেবাশিস : ভারতীয় নবনাট্যের স্বর্ণযুগ বারোজন যুগনায়ক, ‘মুখবন্ধ’
অংশ থেকে উদ্ধৃত, পরম্পরা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ,
মার্চ ২০২১, কল-০৯, পৃ. ১৪
২. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা-১৬, প্রতিভা অগ্রবাল-র,
‘প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নাটককার বাদল সরকার’, শীর্ষক
প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি
বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৬৫
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা
২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬,
পৃ. ২৩৪
৪. রায়চৌধুরী, দেবাশিস : ভারতীয় নবনাট্যের স্বর্ণযুগ বারোজন যুগনায়ক, ‘মুখবন্ধ’
অংশ থেকে উদ্ধৃত, পরম্পরা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ,
মার্চ ২০২১, কল-০৯, পৃ. ৮৫
৫. তদেব : পৃ. ৯৫
৬. তদেব : পৃ. ৯৫-৯৬
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা
২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬,
পৃ. ২৩৭
৮. বসু, ব্রাত্য : ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, শোভন গুপ্ত-এর ‘ভারতবর্ষের
থিয়েটার : একটি সন্দর্ভ’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, ২য়
সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০১০, পৃ. ১৬৭
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা
২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬,

- পৃ. ২৪০
১০. তদেব : পৃ. ২২৬
১১. তদেব : পৃ. ২৪১
১২. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহাসুশীল: অনুষ্ঠাপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, চতুস্ত্রিংশ:
২য় ও ৩য়, যুগ্ম সংখ্যা ২০০০, অনুষ্ঠাপ, অরুণ সেনের
'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা: সাম্প্রতিক ও পটভূমি' শীর্ষক
প্রবন্ধ থেকে গৃহীত, পৃ. ১৮০
১৩. তদেব : পৃ. ১৮০
১৪. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা-১৬, নিশাত জাহান রানা-র
লেখা 'স্বর্ণময় স্মৃতি এবং বাদল সরকার' শীর্ষক প্রবন্ধ,
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১২৫
১৫. নিশাত ইশরাত : 'বাদল সরকার-এর ঢাকায় সাময়িক বসবাস' শীর্ষক প্রবন্ধ,
বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, অমৃতলোক, জানুয়ারি
১৯৯৬, পৃ. ৭৫
১৬. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহাসুশীল: অনুষ্ঠাপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, চতুস্ত্রিংশ:
২য় ও ৩য়, যুগ্ম সংখ্যা ২০০০, অনুষ্ঠাপ, অরুণ সেনের
'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা: সাম্প্রতিক ও পটভূমি' শীর্ষক
প্রবন্ধ থেকে গৃহীত, পৃ. ১৮১
১৭. সাহা, নৃপেন্দ্র : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, দশম সংখ্যা, সৌমিত্র
বসু-র 'আজকে অথবা আগামীকালের থিয়েটার' শীর্ষক
প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, ২০০৪, পৃ. ৮৫
১৮. তদেব : পৃ. ৮৬
১৯. তদেব : পৃ. ৮৭
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা
২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬,
পৃ. ২৬২
২১. তদেব : পৃ. ২৬১

২২. চক্রবর্তী, দেবাশিস : ‘পরিক্রমা তিন দশক’, মীরা প্রকাশন,পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৮, পৃ.১২০
২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ.১৮
২৪. চক্রবর্তী, দেবাশিস : ‘পরিক্রমা তিন দশক’, মীরা প্রকাশন,পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৮, পৃ. ১২১-২২
২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ.২৫৩-৫৪
২৬. চক্রবর্তী, দেবাশিস : ‘পরিক্রমা তিন দশক’, মীরা প্রকাশন,পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৮, পৃ. ১২৯
২৭. তদেব : পৃ. ১৩৭
২৮. তদেব : পৃ. ১৪৩-৪৪
২৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ.২৩৫

উপসংহার

বাদল সরকার সম্পর্কে, তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটার তথা তাঁর নাট্যাদর্শ সম্পর্কে চর্চার শেষ নেই, বিতর্কেরও শেষ নেই। একটা সময় এ প্রশ্ন উঠেছিল যে বাদল সরকারের তৃতীয় ধারা থিয়েটারের গ্রহণযোগ্যতা কী? যখন আজকের দিনেও প্রসেনিয়াম থিয়েটার স্বমহিমায় বিরাজমান, তখন এই সময় দাঁড়িয়ে বাদল সরকারের নাট্যাদর্শ কী প্রাসঙ্গিক? আমরা গবেষণার এই উপান্তে এসে এই নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো। এটা ঠিক যে, যে উন্মাদনা নিয়ে বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার একটা সময় প্রবলভাবে বাংলা তথা সর্বভারতীয় থিয়েটারে প্রভাব বিস্তার করেছিল, যে উন্মাদনা তৈরি করেছিল, শেষ পর্যন্ত সেই উন্মাদনা কিন্তু আর থাকেনি। বিশেষ করে সন্তর-আশির দশকের উন্মাদনা নব্বইয়ের দশকের পর কেমন জানি থেমে যায়। শেখর সমাদ্দার বলেছেন—

“সন্তর ও আশির দশকে বাদল সরকারের নেতৃত্বে তৃতীয় থিয়েটারের যে অন্বেষণ দাপিয়ে বেড়িয়েছে আমাদের প্রচলিত থিয়েটারের ধারণা জুড়ে— নব্বইয়ের দশকেই তা একরকম ফসিলে পরিণত।”^১

সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন রাজ্যের বাইরে বাদল সরকারের নাট্যাদর্শের প্রবল প্রভাব দেখা গেলেও নিজের মাটিতে তুলনায় বাদল সরকার প্রায় উপেক্ষিতই থেকে গেছেন। তাহলে কেন এই রাজ্যে বাদল সরকারের থিয়েটার সেই অর্থে সমাদর পেল না? তিনি লিখেছেন,

“আমরা আক্ষেপ করছিলাম রবীন্দ্রনাথের পর সবচেয়ে আধুনিক সবচেয়ে সক্ষম নাট্যকারকে হারাবার জন্য। ‘স্পার্টাকুস’ ‘মিছিল’ ‘ভোমা’ ‘সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস’ ‘হট্টমালার ওপারে’ ‘বাসিখবর’ ‘গঞ্জী’— এই কয়েকটি নাটকের মধ্যেই যতদূর মনে পড়ে বাদলবাবুর নাগরিক ‘মেন্টর’রা তাঁর সম্পর্কে আস্থা হারিয়েছিলেন। তাঁর নাটক না দেখেই তাঁকে অস্বীকার বা শ্রদ্ধা জানানোর একটা ‘কালচার’ গড়ে উঠেছিল— যা তাঁকে একটা সময়ে প্রায় ‘সিনিক’ করে তুলেছিল।.... তার এই থিয়েটার হল গ্রাম ও শহরের একটি ‘সিনথেসিস’ গড়ে তোলার প্রয়াস কিন্তু কথাটা কলকাতা শহরেই সবচেয়ে কম গুরুত্ব পেয়েছে।”^২

অধ্যাপক, নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরী বাদল সরকারের নাট্যাদর্শ তথা তৃতীয় ধারার থিয়েটার শেষ পর্যন্ত একটি ব্যর্থ নাট্যকর্ম বলে প্রতিপন্ন করেছেন এবং তিনি এর অনেকগুলি কারণ উল্লেখ করেছেন। দর্শন চৌধুরী একজন নাট্যবিষয়ক প্রাজ্ঞ সমালোচক। সুতরাং বাদল সরকার তথা তাঁর

থিয়েটার সম্পর্কে দর্শন চৌধুরীর মূল্যায়নের গুরুত্ব আছে বৈকি। আমরা তাঁর বক্তব্যকে এখানে গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। তিনি প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন, বাদল সরকারের নাট্যভাব ও ভাবনার মধ্যে কোনো স্থিরবদ্ধ ও বিশ্বস্ত রাজনৈতিক মতামত নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন “কোনো দলীয় সংগঠনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েও, রাজনৈতিক মতবাদ লালন করা যেতেই পারে। কিন্তু এই মতবাদ ও আদর্শবাদ যদি নির্দিষ্ট ও স্থিরবদ্ধ না হয়, তাহলে তা পদে পদে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।”^{৩৩} এই কারণে বাদল সরকারের নাটক অধিকাংশ দর্শকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়ত: তিনি বলেছেন, তাঁর অনেক নাটকেরই বিষয় যেন মোটামুটি একই। সেই যুদ্ধ, হত্যা মারণযন্ত্র এবং অবশ্যম্ভাবী রূপে ইতিহাসে মৃত্যুর বীভৎস মুখচ্ছবি। একই শব্দের পুনরাবৃত্তি সেচ, খাল, চাষ, পাম্পসেট, শ্যালো পাম্প, সার, বীজ বারবার নাটকের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসে। বিষয় এবং বলবার ধরন ক্রমে ক্রমে দর্শকদের কাছে একঘেয়ে হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত: তিনি বলেছেন, বাদল সরকারের নাটকে অভিনয়ের সময়ে অভিনেতার অভিনয়গত শরীরী কলাকৌশল এত বেশি প্রয়োগ করা হয় যে, দর্শকের দৃষ্টি সেইদিকেই চলে যায়। নাট্যভাবনার ও নাট্যবিষয়ের সংযোগ হয় না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শারীরিক নানা কৌশল, শরীর দিয়ে নানা বস্তুর উপস্থাপনা, মুখের আওয়াজে নানা শব্দ, আবহ সংগীত অনুষ্ণ তৈরি করার চেষ্টা, সহজেই দর্শককে সেদিকে আকৃষ্ট করে ফেলে। ফলে কি বলছে, তার চেয়ে কেমন কায়দা করে বলছে- দর্শকের কাছে তাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

দর্শন চৌধুরী আরও বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা উল্লেখ করলাম। বাদল সরকারের নাটকের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে দর্শন চৌধুরীর এই অভিমতের সঙ্গে আমরাও কিছুকিছু ক্ষেত্রে সহমত। কিন্তু আর যাইহোক বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার পুরোপুরি ব্যর্থ এরকম সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি না। এটা ঠিক যে এ রাজ্যে বাদল সরকার সেই অর্থে কোন ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারেননি। এবং পারেননি বলেই তিনি আপাতত দৃষ্টিতে খানিকটা হলেও ব্যর্থ। কিন্তু এগুলিই তার একমাত্র কারণ হতে পারে না। আসল কারণটি অধ্যাপক দর্শন চৌধুরীর একটি বক্তব্যের সূত্র ধরেই আমরা অনুসন্ধান করতে পারি। তিনি লিখেছেন—

“প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিকল্প হিসেবে এই থিয়েটারকে দাঁড় করাতে চেয়ে স্বভাবতই যারা প্রসেনিয়ামে অভিনয় করেন, তাদের বিরাগ ভাজন হয়ে, প্রতিস্পর্ধী শত্রুতা সৃষ্টি করেন।”^{৩৪}

এই দিকটি অনেকেই উল্লেখ করেছেন। আমরা তাঁদের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। অসিত

বসু লিখেছেন, “...রাজনৈতিক ধান্দানীতির অঙ্গ রূপেই মিডসেভেনটিজ থেকে শুরু হয়েছে এই কাণ্ডটা-বাদলদাকে সরিয়ে রাখ, কোণঠাসা করে রাখ।”^৫

বাদল সরকারের সহকর্মী তীর্থঙ্কর চন্দ এই একই কারণের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, “আসলে বাদলবাবু প্রতিমুহূর্তে সেই ‘চাক্কা ঘুরিয়ে’ দেবার সক্ষমতা-র দর্শনকে লালন করেছেন আর অস্বীকার করেছেন প্রশ্নহীন আনুগত্যকে কারণ তিনি জানেন, এই আনুগত্য ওই দর্শনের বিপরীত, ভয়ংকরতম বিপদের সামনে নিয়ে ফেলে এই সব কিছুতেই সমর্থনের চর্চা। অথচ চারদিকে যখন সব কিছুতেই অন্ধ সমর্থনের চর্চায় নানাবিধ ‘সুবিধা’ লাভের চেষ্টা, তখন বাদলবাবু এর থেকে দূরে থাকলে কুৎসায়, স্বার্থপূর্ণ সমালোচনায় তাঁকে অস্তিত্বহীন করে দেবার পদ্ধতি তো ব্যবহৃত হবেই।”^৬ এক্ষেত্রে বাদল সরকার খানিকটা ষড়যন্ত্রের শিকার বলেই তাঁর অভিমত। প্রায় এই একই কথা বলেছেন সৌমিত্র বসু। তিনি লিখেছেন—

“থিয়েটারের এই একটাই রূপ, তার বাইরে আর যা কিছু নাট্যপ্রচেষ্টা, তাদের গায়ে নাট্য নামক অভিধাটি লাগানোই যাবে না, এই মতটার মধ্যে এক ধরনের সুচিন্তিত রাজনৈতিক মতলব আছে বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।”^৭

সৌমিত্র বসু অবশ্য সেইসঙ্গে যুগের চাহিদার কথাও উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে আমরা তাঁর সঙ্গে সহমত না হয়ে পারছি না। বর্তমান টিভি সিরিয়ালের জমানায় এই ধরনের থিয়েটার যে হোঁচট খাবে এটাই স্বাভাবিক। পরিবারের পুরনো কাঠামো এখন ভাঙছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেকোনো সামর্থ্য মানুষের কাছ থেকে পরিবার অর্থ উপার্জন দাবি করে। এই ধরনের থিয়েটার থেকে অর্থ উপার্জন যে সম্ভব নয় এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আরেকটি কারণের কথাও উল্লেখ করেছেন সৌমিত্র বসু। তিনি লিখেছেন—

“প্রোসিনিয়মের বৈভব থেকে বেরিয়ে আসতে না চাওয়ার আর একটা বড় কারণ মিডিয়া নামক সোনার হরিণ প্রত্যাখ্যান করল এই থিয়েটারকে, ফলে এর আর কোনো দাম রইল না, একে থিয়েটার বলে স্বীকার করার মানসিকতাই গড়ে উঠলো না আমজনতার মধ্যে।”^৮

অনেকে মনে করেন বাদল সরকারের নাটক রচনার ধারাকেও এই প্রজন্মের অনেকেই গ্রহণ করেননি। এ প্রসঙ্গে সৌমিত্র বসু মন্তব্য করেছেন—

“বাদল সরকারের চমৎকার কমেডির ঐতিহ্য এই সময়ের কোনো লেখক গ্রহণ করেননি। তাঁর এবং ইন্ডিজিৎ সাররাত্তির ঘরানাও এখন রুদ্ধ, অঙ্গন বা মুক্তমঞ্চার জন্য এখনো বাদল সরকারই প্রধান নাটককার, তাঁর কোন উত্তরসূরী প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে বলে জানি না। বরং বলা যেতে পারে পরের দিকের মোহিত চট্টোপাধ্যায়

এবং মনোজ মিত্রের পথকেই প্রধানত গ্রহণ করেছেন এই প্রজন্ম।”^{৯০}

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় একই কথার পুনরুক্তি করে বলেছেন সেই অর্থে বাদল সরকারের নাট্যদর্শকে বাংলা থিয়েটারের পরবর্তী নাট্যকারেরা মূল্য দিল না বরং পেশাদারির লক্ষ্য ও অভিনেতার একক মর্যাদাকে তারা এমনই এক উচ্চ মূল্য দিয়েছেন যে ঘুরপথে ক্রমেই ফিরে এসেছে সেই “মনোহীন, মতাদর্শহীন বিলিতি রেপার্টারির ঘরানার উপমান-.... যার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে হরেক রকম পণ্য সাজিয়ে দর্শকদের সবারকম চাহিদার জোগান দেওয়ার ব্যবসায়িক আয়োজনের বাণিজ্যিকতা।”^{৯১}

অভিনেতা, নাট্যকার, অধ্যাপক শিবব্রত চট্টোপাধ্যায় বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটারের ইমপ্যাক্ট কী? এই প্রশ্নে এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আমাদের জানিয়েছেন, বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটারে শরীরটাই মুখ্য। সেই শরীরের যে মুভমেন্ট সেটা আয়ত্ত করতে প্রচুর অনুশীলন দরকার, অধ্যবসায় দরকার হয়। আজকের দিনে যারা থিয়েটার চর্চা করছেন তাঁরা মূলত শৌখিন মজদুর। তাদের পক্ষে বাদলবাবুর ওই প্রকরণ গ্রহণ করা মানে, বেশিরভাগের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেননা ওই ধরনের অনুশীলন, ওই ধরনের অধ্যবসায় এখনকার দিনের থিয়েটার কর্মীরা সাধারণভাবে দিতে প্রস্তুত নয়। এখন অনেক বেশি টেকনোলজির উপর নির্ভরশীল, আর টেকনোলজির উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠার ফলে ব্যবসায়িক ব্যাপারটা অনিবার্যভাবে এসে যায় এবং এই কারণেই বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার খানিকটা হলেও বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এটা তো ঠিক যে এ সময়ের তরুণ প্রজন্মের নাট্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে যাঁদেরকে আমরা জানি তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রসেনিয়াম থিয়েটারকেই বেছে নিয়েছেন। যেমন ব্রাত্য বসু, কৌশিক সেন, গৌতম হালদার, সুমন মুখোপাধ্যায়, মনীষ মিত্র, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের মতো তরুণ নাট্যকাররা প্রসেনিয়াম থিয়েটারেই অভ্যস্ত।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো সত্যিই কী আজকের দিনে বাদল সরকারের থিয়েটার অপ্রাসঙ্গিক? বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের উন্মাদনা কিছু সময়ের জন্য ভাঁটা পড়লেও তাতে প্রমাণ হয় না যে বাদল সরকারের নাট্যদর্শন তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় চল্লিশের দশকের গণনাট্যের উন্মাদনা পঞ্চাশের দশকে গিয়ে বিস্মৃত হয়ে যায়। কিংবা শত্ৰু মিত্রের পঞ্চাশের দশকের নবনাট্যের ধারণা পরের দশকে গিয়ে থিতু হয়ে যায়। কিন্তু তাতে একটি দর্শন ব্যর্থ হয়ে যায় না। বেশ কিছু নাট্যদল আজও থার্ড থিয়েটার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। অঙ্গন মঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চ নিয়মিতভাবে তাদের নাট্যাভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে। তার পরিসংখ্যান আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তুলে

ধরেছি। আমরা এই বিষয়ে কথা বলেছি নাট্যব্যক্তিত্ব দেবশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে। যিনি বর্তমানে ‘বাদল সরকার নাট্যচর্চা কেন্দ্র’-র ফাউন্ডার মেম্বর। এই কেন্দ্র তৃতীয় ধারার থিয়েটারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা সংযোগের কাজ করে চলছেন। তাঁর কাছেও আমরা জানতে চেয়েছি বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের প্রাসঙ্গিকতা কী? বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার ব্যর্থ না সফল? আজকের দিনও কী তাঁর থিয়েটার গ্রহণযোগ্য? এর উত্তরে আমাদের তিনি জানিয়েছেন, বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার এখনো প্রাসঙ্গিক। শহর এবং শহরের বাইরে থার্ড থিয়েটার আন্দোলন এখনো চলছে। যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন। যারা জানেন না, যেহেতু এই সব কিছুর জানার মূলে হচ্ছে সংবাদ মাধ্যম। যেহেতু তাঁরা সংবাদমাধ্যমে নেই, ফলে সেই অর্থে তাঁদের প্রচার হয় না। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, যদি হিসেব করা যায়, এখন যে নাট্যদলগুলো আছে-আয়না, পথসেনা, শতাব্দী তাদের কোনো শনি, রবিবার আগামি প্রায় ফেব্রুয়ারির শেষ অবধি খালি নেই। সব আমন্ত্রিত না হলে স্ব-উদ্যোগে অভিনয় নিয়ে প্যাক্ট হয়ে আছে। তাছাড়া উইক-ডে-তে প্রচুর শো হচ্ছে। এছাড়া আয়না প্রতি বছরই দু’বার বা তিনবার একদিনের কিছু পরিদ্রুম, মানে একটা গ্রামে গেল, সকালে গিয়ে একটা শো করল, সেখান থেকে আরেকটা গ্রামে চলে গেল, দুপুরে একটা শো করল, সন্ধ্যায় একটা শো করল, রাতের বেলা ট্রেন ধরে ফিরে এলো— এরকম ভাবে কাছাকাছি জায়গায়, দূরে বলতে শান্তিনিকেতন বোলপুরে— এই কাজগুলো চলছে। আর দর্শক সংখ্যা মানে কিছু না হলেও সবচেয়ে কম দর্শক সংখ্যা হয় পাঁচশ জন। একটা হলে যা সাধারণত পাওয়া যায় না। এখন সেই নিরিখে এটা যদি সবাই জানতেন বা প্রচার মাধ্যমে আসত তখন তারা বিচার করতে পারতেন যে তৃতীয় ধারার থিয়েটার আছে কি নেই। অর্থাৎ থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের যে মাত্রা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্রত ছিল তা হয়তো খানিকটা কমেছে কিন্তু বিলুপ্ত হয়নি। শুধু থার্ড থিয়েটারের দলই নয়, এর বাইরেও অনেকেই এখন সেই পথে হাঁটছেন। যেমন সৌমিত্র বসু তাঁর নতুন নাট্যদল ‘অন্তর্মুখ’ নিয়ে গত কয়েক বছরে কিছু নাট্য প্রযোজনা করেছেন মূলত মুক্তমঞ্চ অভিনয়ের জন্য। ইতিমধ্যে সেইসব প্রযোজনা তিনি কিছু অঙ্গন মঞ্চ নাট্যোৎসব এবং বহু স্কুল-কলেজে অভিনয় করেছেন। সুতরাং বর্তমান সময় দাঁড়িয়েও বাদল সরকারের থিয়েটারের দর্শন ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। বরং বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বাধামঞ্চ তথা প্রসেনিয়াম মঞ্চের থিয়েটারের জনপ্রিয়তা একেবারে তলানিতে। বিশেষ করে কোভিড পরবর্তীকালে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ভবিষ্যৎ প্রায় অন্ধকারের মুখে। বর্তমান প্রসেনিয়াম থিয়েটারের যা অবস্থা তাতে আগামী দিনে এই ধরনের থিয়েটার কতটা টিকে থাকবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। সেক্ষেত্রে বাদল সরকারের অঙ্গন-মুক্তমঞ্চের থিয়েটারই যে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ

প্রসঙ্গে আমরা বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক কাবেরী বসুর সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলতে পারি—

“.. বাংলা থিয়েটারে তিনি একমাত্র তাত্ত্বিক প্রয়োগবিদ— একমাত্র তিনিই নিজের থিয়েটারি দর্শনের প্রতিপাদ্যে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর নাটককে, তাঁর থিয়েটারকে— তাঁর সময়ের জটিল সংকেতের অর্থবিচারে— চালু কাঠামোর সংস্কারে নয়, অন্যগমনে।.... তাঁর তীর্থযাত্রা-র পদচিহ্নকে স্বীকার করা ছাড়া থিয়েটার-কর্মীর গত্যন্তর নেই।”^{১১}

একটা সময় নানা বিতর্ক হয়েছিল বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার নিয়ে। তাঁর প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিকল্প থার্ড থিয়েটার নিয়ে এ রাজ্যের অনেকেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করেছেন। এমনকি তিনি নাকি ‘ভুলরাস্তা’ বেছে নিয়েছেন এমন সিদ্ধান্তেও অনেকে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু ঠিক, ভুলের মানদণ্ড কী? কোনটা ঠিক? তাঁর থার্ড থিয়েটার? না প্রথাগত প্রসেনিয়াম থিয়েটার? এই প্রশ্ন তোলা আমাদের মনে হয় অবাস্তব। মোহিত চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—

“- আমি নিজে মনে করি যে থিয়েটার নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে— নানাভাবে। এখানে, ঠিক-বেঠিকের প্রশ্নটা তোলা ঠিক হবে না। শ্রেষ্ঠ কি শ্রেষ্ঠ নয় এই প্রশ্ন তোলাও ঠিক হবে না। অর্থাৎ প্রোসিনিয়াম ঠিক না বাদলদা যে পন্থা নিয়েছেন থিয়েটারের, সেটা ঠিক এ-প্রশ্ন তোলা ঠিক হবে না। আমার মনে হয় এটা একটা থিয়েটারের প্রকাশভঙ্গি, ওটা আর একটা প্রকাশভঙ্গি।”^{১২}

দেবশিশু চক্রবর্তী লিখেছেন, “নাট্যকারদের নাট্যকার ছিলেন তিনি। এককভাবে তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। আপসহীন এই নাট্যকার পরিচালক, অভিনেতা, এক বিকল্প নাট্যধারার জনক এই মানুষটি ছিলেন প্রতিষ্ঠানবিরোধী এক বিতর্কিত নাট্যজন। বাধা এসেছে বহু। সব বাধাকে অবজ্ঞা করে তিনি এগিয়ে গেছেন তাঁর অঙ্গন মঞ্চ, মাঠ মঞ্চকে সঙ্গে নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।”^{১৩} এটা ঠিক যে জীবৎকালে তিনি অন্ততঃ এ বঙ্গের নাট্যজনের থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে সেই সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে প্রত্যেকেই তাঁর থিয়েটারের গভীরতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। এই থিয়েটার যে একমাত্রিক নয় বহুমাত্রিক এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নানা দেশে নানাভাবে এর প্রয়োগ চলছে। প্রতিটি কাজই নিজের জায়গায় অনন্য। আমাদের বিশ্বাস আগামী দিনের মানুষের মুক্তির থিয়েটার বাঁচিয়ে রাখতে গেলে, প্রতিবাদের থিয়েটার করতে হলে, বাদল সরকারের কাছে ফিরে আসতেই হবে। প্রবীর গুহ লিখেছেন—

“মঞ্চ-থিয়েটারে তো এখন তৃতীয় থিয়েটারের আঙ্গিকের দাপাদাপি। সে তো

সুলক্ষণ। সব ধরনের থিয়েটারই এখন বাদল সরকারের গুরুত্ব বুঝতে আরম্ভ করেছে।”^{১৪}

আসলে বাদল সরকারের থিয়েটারের আসল জোর দর্শক অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সংযোগে। তথাকথিত থিয়েটারের বাজারবাদের ভিত্তি নাড়িয়ে দিতে পারে তাঁর থিয়েটার। তাই আগামী দিনে তাঁর থিয়েটারের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে ছাড়া কমবে না। নাট্যকার অসিত বসু নিজে প্রসেনিয়াম থিয়েটার করলেও একসময় স্বীকার করে নিয়েছেন, আগামী দিনে বাদল সরকারের দেখানো পথ ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই তিনি লিখেছেন—

“.. এখন হলের যে ভাড়া, টেকনিকাল কস্ট, রিহারসাল কস্ট, প্রোসিনিয়ামে করব কেন? এই পুরো যে-খরচটা বহন করতে হয়, সেটা টেনে চলা খুবই শক্ত— আর যদি যথার্থই আদর্শগত পোলিটিকাল থিয়েটার করতে হয় যদি মনে করি, আমার কিছু বক্তব্য বলতে চাই, তাহলে একমাত্র পথ ওই বাদলদার থিয়েটার, অন্য কোনো রাস্তা নেই।”^{১৫}

আশা জাগে বাদল সরকারের নাট্যদর্শন হারিয়ে যাবে না। তিনি যে থিয়েটার বেছে নিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ রচনার আন্তরিক চাহিদা। সেই চাহিদায় তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে মঞ্চের বাইরে মুক্তমঞ্চে, নাগরিক পরিবেশ থেকে গ্রামে, শহরের শৌখিন নাট্যরসিকদের চৌহদ্দি থেকে গ্রামের অনভ্যস্ত নব্য দর্শকদের কাছে। বাদল সরকার বিশ্বাস করেন নাটকে বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ সংরূপের কথা আসে পরে। কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক বার্তার বাহন না হলে থিয়েটার অবাস্তব, এই বিশ্বাসে তিনি আজীবন বিশ্বাসী ছিলেন। আর তার জন্য শিল্পের যাবতীয় শৈল্পিক প্রথাকে অস্বীকার করতেও তিনি এতটুকু দ্বিধা করেননি। তাতে নাগরিক শিল্পবিলাসীর যতই অস্বস্তি হোক না কেন, বাদল সরকার সেসবে গুরুত্ব দেননি। তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছেন তাঁর নিজের দর্শকসমাজকে। এখানেই বাদল সরকার সমকাল এবং পরবর্তীকালীন নাট্যকারদের থেকে পৃথক। তাই আপাততভাবে মনে হতে পারে বাদল সরকারের নাট্যদর্শন ব্যর্থ। কিন্তু তিনি যেভাবে এক নির্দিষ্ট মতাদর্শগত লক্ষ্য অনুসরণ ও তার সঙ্গে শিল্পকে একাত্ম করে নেবার ঘনিষ্ঠ সাধনায় বিফলতার ঝুঁকি নিয়েছেন, ‘এমন বিফলতা আসলে আশ্চর্য্য কীর্তি।’^{১৬} এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি সুদৃষ্টি দেশপাণ্ডে-এর একটি মূল্যবান বক্তব্য দিয়ে—

“বাদল সরকারের থিয়েটার মননগত দিক থেকে বা নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে কখনই বন্ধ্যাত্মক নিমজ্জিত হয়নি। আপনি বাদলবাবুর মত মানতে পারেন, নাও মানতে পারেন, কিন্তু আপনি তাঁর থিয়েটারকে খারিজ করতে পারবেন না।”^{১৭}

বাদল সরকার সেই বিশ্বাসের উপর ভর করে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করে বলেছেন—

“—তাই গভীর প্রত্যয় রাখি— সদর্থক যদি কিছু করি, দেশ-সমাজ-মানুষের সম্পর্কে যদি দায়িত্ববোধ না হারাই, যদি নাট্যমাধ্যমকে ভালবেসে থাকি— তবে এই আন্দোলন, এই প্রচেষ্টা এই মুক্ত থিয়েটার Third Theatre কোন দিন তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে না। বরং আরও ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে।”^{১৮}

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাদল সরকারের এই প্রত্যয় যে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক তা আমরা বিশ্বাস করি। বাদল সরকারের থিয়েটার প্রাসঙ্গিকতা কোনদিনই হারায়নি এবং ভবিষ্যতেও হারাবে না।

তথ্য সূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহা, সুশীল: অনুষ্ঠান, নাট্যবিষয়ক সংখ্যা, চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ২০০, শেখর সমাদ্দারের ‘এই সময়ের থিয়েটারে নবীনের অভিব্যক্তি’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৭
২. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকারস্মারক সংখ্যা, শেখর সমাদ্দারের ‘বাদল সরকার ও তাঁর থিয়েটার: কোনো এক বিপন্ন বিস্ময়’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ২১৯
৩. চৌধুরী, দর্শন : নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃ-২০৭
৪. তদেব : পৃ. ২০৮
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ০২৬, পৃ. ২১১
৬. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকারস্মারক সংখ্যা, তীর্থঙ্কর চন্দ-এর ‘এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৫৭

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ২৫৬
৮. তদেব : পৃ. ২৬১
৯. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহা, সুশীল: অনুষ্ঠাপ, নাট্যবিষয়ক সংখ্যা, চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ২০০, সৌমিত্র বসুর 'বাংলা নাটকের সাহিত্য মূল্য: '৬৩-৯৯' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৬০
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ০২৬, পৃ. ২১৪
১১. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকারস্মারক সংখ্যা, কাবেরী বসুর 'নাটককার বাদল সরকার 'এবং ইন্দ্রজিৎ' থেকে 'ভোমা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতপশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৯৫
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ০২৬, পৃ. ১৮৯
১৩. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, দেবশিস চক্রবর্তীর 'প্রসঙ্গ বাদল সরকার' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতপশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১২৪
১৪. তদেব : প্রবীর গুহ-র 'বাদল ধারায়' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে, পৃ. ১১০
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ০২৬, পৃ. ২১২
১৬. তদেব : পৃ. ২৩২
১৭. তদেব : পৃ. ২৩৮

১৮. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহা, সুশীল: অনুষ্টুপ, নাট্যবিষয়ক সংখ্যা, চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য়
সংখ্যা, ২০০, ‘বিষয়নাট্য সৃজন: নির্মাতার মুখোমুখি’
শিরোনাম দিয়ে বাদল সরকারের সাক্ষাৎকারের ভাষ্যটি
প্রকাশিত হয়। এখানে প্রকাশিত বাদল সরকারের মন্তব্যটি
উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, পৃ. ২২৪

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

ক. বাংলা আকর গ্রন্থ :

- ঘোষ, ঋতদীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১৪, ডিডি ১৮/১১
সল্টলেক, কল-৬৪
- ঘোষ, ঋতদীপ (অনুবাদ ও সম্পাদনা) : ভয়েজেস ইন দা থিয়েটার, নাট্যচিন্তা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ৩১ জানুয়ারি, ২০১২, ডিডি ১৮/১১
সল্টলেক, কল-৬৪
- সরকার, বাদল : নানামুখ, প্রকাশক-অঞ্জলি বসু, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮৮, ২৬৮ যোধপুর পার্ক, কল-৬৮
- : পুরোনো কাসুন্দী, লেখনী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৬, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮
- : পুরোনো কাসুন্দী (২য় খণ্ড), লেখনী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৭, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮
- : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৬, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮
- : নাটক সমগ্র (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩
- : নাটক সমগ্র (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪১৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩
- : নাটক সমগ্র (৩য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৪১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩
- : চারটি নাটক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১০, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-০৯
- : এবং ইন্দ্রজিৎ, প্রকাশক-অঞ্জলি বসু, নব মুদ্রণ, আষাঢ়

১৪০২, ২৬৮ যোধপুর পার্ক, কল-৬৮।

- : নাট্যসংগ্রহ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য
সংসদ সংস্করণ, ১ লা বৈশাখ, ১৪১৪, ভারতী বুক
এজেন্সি, ৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-০৯
- : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৩৯০,
২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রিট, কল-০৯

খ. ইংরেজি আকর গ্রন্থ :

- সরকার, বাদল : The Third Theatre, first published by Badal
Sircar on August, 1978
- : THE CHANGING LANGUAGE OF THEATRE
Maulana Abdul Kalam Azad Memorial lecture,
1982, published by Badal Sircar, printed by BIT
BLITS 30b/1 Sarat Ghosh Garden Road,
Calcutta-31

গ. বাংলা সহায়ক গ্রন্থ :

- আচার্য, অনিল (সম্পাদিত) : সত্তর দশক, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, অনুষ্ঠাপ, ২ই নবীন কুণ্ডু
লেন, কল-০৯
- করুণাপ্ত, অভিজিৎ : থিয়েটার থিয়েটার, প্রকাশক-কালিন্দী ব্রাত্যজন, প্রথম
প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪, পি ৬৫, কালিন্দী হাউজিং স্কিম,
কল-৮৯
- ঘোষ, অসিতকুমার : বাংলা নাটকের রূপ-রীতি ও আঙ্গিক (১৮৫২-১৮৭২),
করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ১৯৯৮, ১৮এ,
টেমার লেন, কল-০৯
- চক্রবর্তী, দেবাশিস : পরিক্রমা তিন দশক, মীরা প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয়
সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, ৪২২, গড়ফা মেন রোড,

কল-৭৫

- চক্রবর্তী, রথীন : রঁম্যা রলঁয়ার পিপলস্ থিয়েটার, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯
- চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ : ভারতের নাট্যশাস্ত্র একটি সহজ পাঠ, শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, হেরাসিম লেবেদেফ সরণি, কল-৭১
- চট্টোপাধ্যায়, মোহিত : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৪০৮, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩
- চৌধুরী, দর্শন : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৬, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪
- চৌধুরী, দর্শন : গণনাট্য আন্দোলন, অনুষ্ঠাপ, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯, ২ই নবীন কুণ্ড লেন, কল-০৯
- চৌধুরী, দর্শন : বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৭, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯
- চৌধুরী, দর্শন : নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩
- চৌধুরী, দর্শন : রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার ভাবনা এবং থিয়েটারে রবীন্দ্র নাট্যাভিনয়, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৫, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে শিক্ষা সচিব শ্রী বীরেন্দ্র মোহন সেন কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশ কাল, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, ৫ চিত্তামণি দাস লেন, কল-০৯

- : রবীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী, ১২৫-তম
রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ,
পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪১০, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড,
কল-১৭
- ড. ঘোষ, অজিতকুমার : নাটক ও নাট্যকার, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল
২০০০, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩
- : বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ
সংস্করণ, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৫, ১৩
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩
- : বাংলা নাট্যভিনয়ের ইতিহাস, সাহিত্যলোক, ৩২/৭
বিডন স্ট্রিট, কল-০৬
- ড. ঘোষ, অরুণপরতন : বাংলা অ্যাবসার্ড থিয়েটার, একটি অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প,
প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৩, দুলমি-নডিহা, পুরুলিয়া
- ড. ঘোষ, জগন্নাথ : রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম
প্রকাশ, বইমেলা, ২০০৯, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,
কল-০৯
- ড. দে (সরকার), গীতশ্রী : দুই দশকের বাংলা নাটকের বিবর্তন (১৯৪৭-১৯৬৭),
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৪,
১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কল-৭৩
- ড. বিশ্বাস, অনিরুদ্ধ : ছয়ের দশকে নাটক ও অভিনয়, এস.এস. পাবলিকেশন,
প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৪, ৫ বি কলেজ রো, কল-১২
- ড. পাল, সঞ্জয় : বাংলা নাটকে গণ-আন্দোলন নির্বাচিত চিরায়ত নাটক,
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ২২ শ্রাবণ, ১৪১৮,
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-০৯
- ড. মণ্ডল, বিভাসকান্তি : বাদল সরকার, নাটকে আগমন এবং হাসির নাটক,
প্রকাশক, অরিন্দম ভৌমিক, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ১৪১৯,
গিরিনগর, ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক-০৮৫

- : থার্ড থিয়েটার এবং বাদল সরকার, আগস্টক, প্রথম প্রকাশ,
ফাল্গুন ১৪২১, ৩৪০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
(দোতলা), ঢাকা-১০০০
- : এবং বাদল সরকার এবং ভিন্ন ধারার নাটক, দীপ প্রকাশন,
প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, ০৬ বিধান সরণি, কল-০৬
- ড. মণ্ডল, তপন : উনিশ শতক সামাজিক নাটক ও প্রহসনে নারী, বঙ্গীয়
সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ২০১০, ৬/২
রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-০৯
- দত্ত, উৎপল : আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয়
প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৯, ১০ বি ক্রিক লেন,
কল-১৪
- : গদ্য সংগ্রহ ১, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ,
সেপ্টেম্বর ২০০৪, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩
- : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি.,
চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কল-৭৩
- : নাটক সমগ্র (পঞ্চম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রা:লি., দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, ১০ শ্যামাচরণ দে
স্ট্রিট, কল-৭৩
- দত্ত, সুনীল : নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর ১৯৪২-১৯৮৬, জাতীয়
সাহিত্য পরিষদ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১ জানুয়ারি ১৯৮৭, ১৪
রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-০৯
- দাশ, ভবেশ (সম্পাদিত) : অজিতেশ, পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৭, ২০এ
বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯
- দে, সন্ধ্যা : অন্য ধারার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম
প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১৪, ৫১ সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুর,
কল-৩২

- বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ,
নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮, ডিডি ১৮/১১
সল্টলেক, কল-৬৪
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক (সম্পাদিত) : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা,
প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬
: থিয়েটারের জলহাওয়ায়, প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ,
ফেব্রুয়ারি ২০০৭, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কল-০৪
: থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র বিশেষ
সংকলন সংখ্যা, প্রকাশক - উত্তম দে, প্রথম প্রকাশ,
২০১১, ৫এ রাজ্য রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কল-০৬
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য : বেটোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য
আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯, ১/১
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০
: ব্রেখট ও তাঁর থিয়েটার, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশকাল,
জানুয়ারি, ২০০২, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০২, ১৮/এ
গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কল-০২
: শেকস্পীয়র ও তাঁর থিয়েটার, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ,
অগাস্ট, ২০১২, ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কল-০২
- বসু, বিষ্ণু : থিয়েটার ভাবনা, গণমন প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি
১৯৯৯, ৩৩এ/১এ, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কল-৫০
- বসু, সৌমিত্র : বাকি ইতিহাস অন্য ভাবনায়, রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ,
শুভ দীপাবলি, কার্তিক ১৪২১, ৫৫ ডি, কেশব চন্দ্র সেন
স্ট্রিট, কল-০৯
- বসু, স্বপন ও দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত) : বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি,
প্রথম প্রকাশ, ১১ মার্চ, ২০০০, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন,
কল-০৯
- বসু, গঙ্গাপদ : নাটক ও নাট্যবস্থা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম সংস্করণ,
জানুয়ারি ২০১০, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯

- বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গরুচণ্ডাল ৯ প্রকাশনা,
দ্বিতীয় সংস্করণ, বইমেলা ২০১৮, ৯/২ বলরাম বোস
ঘাট রোড, কল-৩২
- বিশ্বাস, দেবব্রত (সম্পাদিত) : বাংলা নাট্যচর্চা ঐতিহ্য উত্তরাধিকার, বাঙলার মুখ
প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, মধ্যমগ্রাম,
কল-১২৯
- : বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম
প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১১, এ-৬৪ কলেজ স্ট্রিট
মার্কেট, কল-০৭
- ভট্টাচার্য, বিজন : রচনাসংগ্রহ ১, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ
১৪১৫, ১৩ বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩
- ভট্টাচার্য, সাধনকুমার : নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম
দে'জ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০২, ১৩ বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কল-৭৩
- মজুমদার, স্বপন : সাত দশকের থিয়েটার ও অন্যান্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম
প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৮, ১৩ বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩
- মিত্র, কুন্তল : অ্যাবসার্ড নাটক মাতৃভাষায় বিভাষায়, অফবিট
পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পি-৩১৮,
লেকটাউন, কল-৮৯
- মিত্র, শম্ভু : নাট্যভাষা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম আনন্দ
সংস্করণ, অগাস্ট ২০০৮, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন,
কল-০৯
- : প্রসঙ্গ নাট্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর
১৯৭১, ৩৮ বিধান সরণি রোড, কল-০৬
- মিত্র, তৃপ্তি : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা, প্রথম জানুয়ারি ২০০১,
১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪
- মুখোপাধ্যায়, অশোক : শম্ভু মিত্র উৎপল দত্ত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি
প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ২০১৮, ৮০/১ মহাত্মা

- গান্ধী রোড, কল-০৯
- : প্রসঙ্গ নির্দেশনা, প্রয়াগ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫,
৪/৫ নীলাম আবাসন, রবীন্দ্র সরণি, কল-৪৯
- রায়, কুমার : কবির অভিঘাত ও কবির নাটক, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা
আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা পুস্তকমেলা, ১৯৯৯,
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০
- রায়চৌধুরী, দেবশিস : ভারতীয় নবনাট্যের স্বর্ণযুগ বারোজন যুগনায়ক,
পরম্পরা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০২১, ২০এ
বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯
- রায়, দেবশিস : থিয়েটারি তর্ক থিয়েটারি বিতর্ক, প্রকাশক কালিন্দী
ব্রাত্যজন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, পি ৬৫, কালিন্দী
হাউজিং স্কিম, কল-৮৯
- রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার: অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ,
বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬
- রক্ষিত মলয় : বাংলা থিয়েটার অন্য ইতিহাস, সিগনেট প্রেস, প্রথম
সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৭, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন,
কল-০৯
- সরকার, পবিত্র : নাটকের সন্ধানে, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৮,
১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কল-০২
- সিকদার, অশ্রু কুমার : সাহিত্যের সমাজ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর
২০০৫, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯

ঘ. ইংরেজি গ্রন্থ :

- Grotowski, Jerzy : Towards a Poor Theatre, edit by Eugenio
Barba, Routledge A Theatre arts Book,
New York, First Routledge edition, 2002
- Pradhan, Sudhi : Marxist Culture Movement in India,
Chronicles and Documents, Vol-I, Pustak

ঙ. পত্র-পত্রিকা :

- আচার্য, অনিল (সম্পাদিত) : নাট্যবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, অনুষ্ঠাপ, ৩৫ বর্ষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, ২০০১, ২ই নবীন কুণ্ড লেন, কল-০৯
- : নাট্যবিষয়ক সংখ্যা, অনুষ্ঠাপ, চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় যুগ্ম সংখ্যা, ২০০০, ২ই নবীন কুণ্ড লেন, কল-০৯
- চক্রবর্তী, দেবাশিস (সম্পাদিত) : অঙ্গন নাট্যপত্র, অন্য রীতির মুখপাত্র, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৬, ২৬/২ গল্ফ গ্রীন আরবান কম্প্লেক্স, কল-৪৫
- : অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, নবপর্যায়ে ২য় সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুন ১৯৮৭, ২৬/২ গল্ফ গ্রীন আরবান কম্প্লেক্স, কল-৪৫
- : অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, নবপর্যায়ে ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৭, ২৬/২ গল্ফ গ্রীন আরবান কম্প্লেক্স, কল-৪৫
- : অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, নবপর্যায়ে ৬-ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৯৮৮, ২৬/২ গল্ফ গ্রীন আরবান কম্প্লেক্স, কল-৪৫
- : অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, বিশেষ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, ২৬/২ গল্ফ গ্রীন আরবান কম্প্লেক্স, কল-৪৫
- : অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নবপর্যায়ে ৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৮, ২৬/২ গল্ফ গ্রীন আরবান কম্প্লেক্স, কল-৪৫
- : অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, ৯ম, ১০ম যুগ্ম ও বিশেষ সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৯, ২৬/২ গল্ফ গ্রীন আরবান কম্প্লেক্স,

কল-৪৫

- : অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, ১১-১২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯, ২৬/২ গল্ফ গ্রীন আরবান কমপ্লেক্স, কল-৪৫
- : অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, ১৩-১৭ বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯০, ২৬/২ গল্ফ গ্রীন আরবান কমপ্লেক্স, কল-৪৫
- : অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, নবপর্যায়ে প্রথম সংখ্যা, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭, ২৬/২ গল্ফ গ্রীন আরবান কমপ্লেক্স, কল-৪৫
- চ্যাটার্জী, সৌমিত্রকুমার : প্রসঙ্গ বিজন, নাট্যকথা, ১৩ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৯, ২১ বিরাধানাথ বোস লেন, কল-০৬
- ড. ঘোষ, অরুণপরতন (সম্পাদিত) : অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প, ২০০৪, আমডিহা, পুরুলিয়া
- ড. বেরা, মদনমোহন (সম্পা.) : এবং মল্লয়া, ২২ বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২০, কে. কে. প্রকাশন, গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর-১০১
- দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত) : বইয়ের দেশ, ৬ বর্ষ, ২ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০১০, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল-০১
- : দেশ, ৬০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল-০১
- দে, উত্তম (সম্পাদিত) : নাট্য বক্তৃতামলা ৯, সায়ক নাট্যপত্র, নবপর্যায়, সংখ্যা ১, নভেম্বর ২০০১, ৫এ রাজা, রামকৃষ্ণ স্ট্রিট, কল-০৬
- বড়ুয়া, সাধন (সম্পাদিত) : শব্দ সাহিত্য পত্রিকা, উৎপল দত্ত বিশেষ সংখ্যা, ২৫ জানুয়ারি ২০১০, ১৪১-এ বান্ধবনগর, দমদল, কল-২৮
- বসু, ব্রাত্য (সম্পাদিত) : ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১০, পি-৬৫, কালিন্দী হাউজিং স্কিম, কল-৮৯
- ভাদুড়ি, সত্য (সম্পাদিত) : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ১৬, বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০
- ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ, শারদ

- ১৪২০, ইএ ১/৮ বাগুইআটি, খালধার, কল-৫৯
- মজুমদার, সমীরণ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, অমৃতলোক ৭৫, জানুয়ারি ১৯৯৬, ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর-১০১
- মহেশ্বরী, রমন (সম্পাদিত) : গ্রুপ থিয়েটার, ৩৩ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১০, সি এফ ২০৪ সল্টলেক, কল-৬৪
- : গ্রুপ থিয়েটার, ৩১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ২০০৯, সি এফ ২০৪ সল্টলেক, কল-৬৪
- রায়, কুমার (সম্পাদিত) : বহুরূপী বিশেষ সংখ্যা, প্রযোজনা ২, সংখ্যা ৭০, ১০ অক্টোবর, ১৯৮৮, ৭ লোয়ার রেঞ্জ, কল-১৭
- সাহা, নৃপেন্দ্র (সম্পাদিত) : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৬, স্বাধীনতার উত্তরাধিকার বাংলা থিয়েটার সংখ্যা ৯৯, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মার্চ ১৯৯৯, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রোড, কল-২০
- : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৩, নাট্যসাহিত্য-নাটক বিশেষ সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, সেপ্টেম্বর ২০০৯, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০
- : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১০, সাধারণ সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০
- : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১১, সাধারণ সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ডিসেম্বর ২০০৫, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর রোড, কল-২০
- : নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা/২ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, নভেম্বর ১৯৯৭, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০
- সেনগুপ্ত, গৌতম, সেন, যুগল : ঋতম, ভিন্ন প্রথার থিয়েটারের মুখপত্র, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম ও অন্যান্য (সম্পাদিত) সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮০, পি ২৯১ বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

- : ঋতম, ভিন্ন প্রথার থিয়েটারের মুখপত্র, নবপর্যায়ে ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮৫, পি. ২৯১ বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা
- : ঋতম, ভিন্ন প্রথার থিয়েটারের মুখপত্র, ৯ম সংখ্যা, এপ্রিল/জুলাই, ১৯৮২, পি ২৯১ বসুনগর, মধ্যমগ্রাম ২৪ পরগণা
- : ঋতম, ভিন্ন প্রথার থিয়েটারের মুখপত্র, ১৪তম সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৮৫, পি ২৯১ বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা
- : ঋতম, ভিন্ন প্রথার থিয়েটারের মুখপত্র, ষষ্ঠ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮১, পি ২৯১ বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা
- : ঋতম, ভিন্ন প্রথার থিয়েটারের মুখপত্র, ১৬তম সংখ্যা, নবপর্যায়ের দশম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৬, পি ২৯১ বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা।

টেলিফোনিক সাক্ষাৎকার:

১. নাট্যকার অধ্যাপক শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়, বধূর্মান বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, তারিখ- ১৬ নভেম্বর ২০২২।
২. নাট্যব্যক্তিত্ব দেবশিস চক্রবর্তী (বাদল সরকার নাট্যচর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য), তারিখ-১৬ নভেম্বর, ২০২২।

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তি নাম:

অ

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি - ২

অমৃতলাল বসু - ২, ২১৮

অমর গাঙ্গুলী - ১৭৭

অমর মিত্র - ৩৪৯

অশ্বিনীকুমার সরকার - ৭

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৯৯

অসিত বসু - ৩৬০

অনন্ত চেখভ - ১৯৮

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় - ৩, ৪, ৯৯, ১৬৫,

১৬৬, ১৯৬

অহীন্দ্র চৌধুরী - ১০

অদ্রীশ বিশ্বাস - ১১৯

অভিষেক বসু - ১১৩

অমিয় দেব - ১১৮

আ

আগাস্তো বোয়াল - ১০৫

অ্যালডাস লিওনার্ড হাঙ্গলি - ১২

ই

ইউজিন গ্ল্যাডস্টোন ওনিল - ১২

ইবসেন - ১৮১

ইশরাত নিশাত - ৩৪২

ইউজিনো বারবা - ৭০

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ - ১

উ

উৎপল দত্ত - ৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৮৬, ১৮৭

ঋ

ঋত্বিক ঘটক - ১৭২, ১৭৮

এ

এইচ (হৈন্সাম) কানহাইলাল - ৩৩৬, ৩৩৯

ক

কনস্তান্তিন সিমনভ - ১৮৮

কাবেরী বসু - ৩৫৯

কালী সরকার - ১৭৮

কল্যাণী ভট্টাচার্য - ১২৬

কেয়া চক্রবর্তী - ১৯৭

কৌশিক সেন - ৩৫৭

গ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ - ২, ৯, ৪৬

গিরিশ কারনাড - ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৫০

গঙ্গাপদ বসু - ৩

গৌতম হালদার - ৩৫৭

গোবিন্দ গাঙ্গুলী - ৩৭

চ

চণ্ডীচরণ সেন - ১৪

চৈতন্যদেব - ১১২

জ

জর্জ থ্রোটোস্কি - ২৪, ৬০

জে বি প্রিস্টল - ২২

জোয়েন শেখনার - ৬৪

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর - ২১৯

জুলিয়ান বেক - ৬৫, ১০২

জুডিথ ম্যালিনা - ৬৫, ১০২

জ্যোৎস্না ঘোষ দস্তিদার - ১৮৮

ড

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য - ১০৬

ত

তাপস মুখোপাধ্যায় - ৯৪, ৯৫

তৃপ্তি মিত্র - ৩

দ

দীপঙ্কর দত্ত - ১১৬, ১৪৬

দীনবন্ধু মিত্র - ২১৮

দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত - ২০৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় - ২, ৯

দুলাল কর - ৩৮৪

দেবেশ চট্টোপাধ্যায় - ৩৫৭

দেবশঙ্কর হালদার - ৪

দেবশিশি মজুমদার - ১১৬, ১১৯৮, ২০১

দেবশিশি চক্রবর্তী - ২৯৭, ৩৫৮, ৩৫৯

দর্শন চৌধুরী - ২৯, ৭৩, ১০৫, ৩৫৪

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় - ১০

ধ

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় - ১৮৯

ধীরেন্দ্র বাস্ক - ১৩৭

ন

নরেশ মিত্র - ১০

নির্মলেন্দু লাহিড়ী - ১০

নিশাত জাহান রানা - ৩৪২

নাসিরউদ্দিন ইউসুফ - ৩৪১

প

পঙ্কজ মুন্সী - ৪১, ৪৩, ৪৫

প্রেমেন্দ্র মিত্র - ৩১০

প্রভাতকুমার দাস - ২০৪

প্রসন্ন রামস্বামী - ৩৩৬

প্রতাপচন্দ্র সিংহ - ১

প্রসন্নকুমার ঠাকুর - ১, ৩১

প্রতিভা অগ্রবাল - ৩৮

প্রবীর গুহ - ৩৫৯

ফ

ফিদেল কাস্ত্রো - ২৪০

ব

ব্রাত্য বসু - ৩৫৭

বিধায়ক ভট্টাচার্য - ২

বিজন ভট্টাচার্য - ৩, ১৬৫, ১৬৬

বার্টোল্ট ব্রেখট - ১০৪

বিশাখা রায় - ১২৪, ১২৫, ১৩৪

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - ৮৭

বিনয় ঘোষ - ১৭৫

বিজয় তেগুলাকর - ১৮৩, ৩৩৬

বিভাস চক্রবর্তী - ১৯৭

ব্রজেন্দ্রকুমার দে - ২০৩

ভ

ভরত মুনি - ২৯

ভবেশ দাশ - ১৬৫

ভূমেন রায় - ১০

ম

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য - ৩, ১৬৮

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - ৮৭

মণিকুন্তলা সেন - ১৬৮

মুকুন্দ দাস - ১১২

মহেন্দ্রলাল সরকার - ৭

ম্যাক্স ফিৎস্ - ২০০

মধুসূদন দত্ত - ১৮৮

মহেশ এলকুঞ্জওয়ার - ৩৩৬

মনীষ মিত্র - ৩৫৭

মোহিত চট্টোপাধ্যায় - ৭২, ৭৩, ১১৮, ৩৫৯

র

রতন থিয়াম - ৩৩৬

রামনারায়ণ তর্করত্ন - ২১৮

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত - ১৯৭

রথীন চক্রবর্তী - ২০১, ২০৮

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র - ৩৪, ২১৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ১১৩

রবার্ট ব্রুস্টাইন - ৭০

রিচার্ড শেখনার - ৬৪, ১০০, ১০১, ১০২

ল

লুইগি পিরানদেল্লো - ১৯৭

লীলা মজুমদার - ৩১০

য

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত - ১৮৮

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী - ২০৪

শ

শ্যামল ঘোষ - ১৬৯

শিশিরকুমার ভাদুড়ী - ২, ১০

শিশির দত্ত - ৩৪৩

শিবব্রত চট্টোপাধ্যায় - ৩৫৭

শঙ্কু মিত্র - ৩, ৩৮, ৩৯, ১৭৩

শোভা সেন - ১৮৮

শোভা সরকার - ১১

শিবরাম চক্রবর্তী - ১৪

শেক্সপীয়র - ১৬

শেখর সমাদ্দার - ২০৫, ৩৫৪

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় - ৩৩, ৩৪

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় - ৩৭, ১০১, ১৪৭, ১৬৭

স

সফদার হাশমি - ২০৯

সর্গে আইজেনস্টাইন - ৮৫

সুধী প্রধান - ১৬৮

সুধন্ব দেশপাণ্ডে - ২০৮, ৩৬০

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় - ৬৩

সন্ধ্যা দে - ১৬৮, ১৮২

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৮৭

স্ট্রিভবার্গ - ২০০

সত্যদেব দুবে - ৩৩৬, ৩৩৮

সেলিম আল দীন - ৩৪১

সৌমিত্র বসু - ৩৪৩, ৩৫৬

সুনয়ন মুখোপাধ্যায় - ৩৫০

সুমন মুখোপাধ্যায় - ৩৫৭

সমরেশ বসু - ২৩

স্বপন মজুমদার - ২৪১

সুরজিৎ ঘোষ - ১২৬, ১২৯

সুপ্রকাশ রায় - ১৩৭

হ

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৯০

হেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ - ১

হেমাঙ্গ বিশ্বাস - ১৮৯

ক্ষ

ক্ষীরোদপ্রসাদ - ২, ৯

ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী - ২

গ্রন্থনাম:

অ

অচলায়তন - ১৮৮

অঙ্গার - ১৮৯

অতিথি - ১৭

অঙ্গনারা - ৩৪৭

অবরোধ - ১৬৮

আ

আবু হোসেন - ৫৪, ২৯১

আগুন - ১৬৭

আন্তিগোনে - ২০০

উ

উলুখাগড়া - ১৭৪

এ

একেই কি বলে সভ্যতা? - ১৮৮

এ ডলস্ হাউস - ১৮১

এবং ইন্দ্রজিৎ - ২৩, ৪৬, ৬৬, ২৪২, ২৪৩

ক

কচ ট ত প - ৩৪৬

কলঙ্ক - ১৬৮

কৃষ্ণপক্ষ - ১৬৯

কিং লিয়ার - ১৬

কুলীনকুলসর্বস্ব - ২১৮

কবি কাহিনী - ২২, ৪১, ২১৭, ২৩৩

কিত্তনখোলা - ৩৪১

কেরামত মঙ্গল - ৩৪১

ক্যাপ্টেন হুরবা - ৮৯

খ

খাট্‌মাট্‌ ক্রিং-৮৮

গ

গাধায়ন-৩৪৭

গোত্রান্তর- ১৬৮

গঙ্গী-৩১২

চ

চলো সাবরে - ১৭০

চার অধ্যায় - ১৮০

চাঁদ বণিকের পালা - ১৮৩

জ

জন্মভূমি আজ - ৮৭

জীৱন কন্যা - ১৬৮

জীবনরঙ্গ - ৩

জবানবন্দী - ১৬৮

জুলিয়াস সিজার - ১৬

জামাইবারিক - ২১৮

ট

টিনের তলোয়ার - ১৯১

ড

ডাকঘর - ১১৩

ত

ত্রিংশ শতাব্দী - ২৩, ২৭৫

তিন পয়সার পালা - ১৯৯

তুঘলক - ৩৩৭

তপতী-১১৪

তীর - ১৯০

থ

থিয়েটারের ভাষা - ৭৪, ১২২

দ

দুঃখীর ইমান - ৩

দি থার্ড থিয়েটার - ৭০, ৯৯

দাও ফিরে সে অরণ্য - ১৯৬

দ্রৌপদী - ৩৪০

দেবীগর্জন - ১৬৯

ন

নাট্যকারের সন্মানে ছটি চরিত্র - ১৯৭

নানা রঙের দিন - ১৯৮

নটী বিনোদিনী - ২০০

নবান্ন - ১৬৯

প

পদ্মানদীর মাঝি - ৮৭, ৮৮

প্রস্তাব - ৬৭

পাণ্ডবানী - ৮৮

প্রলাপ - ৩৮, ৩৯

পাগলা ঘোড়া - ৩৯, ২৮১

পুরোনো কাসুন্দি - ৯, ৩৬

পাপপুণ্য - ২০১

পথিক - ১৭৮

পুতুল খেলা - ১৮১

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস - ১৯৩

ফ

ফেরারী ফৌজ - ১৯০

ব

বন্ধু - ১৩

বড়ো পিসীমা - ৩৬, ২২৩, ২২৪

বাঘ - ২৩, ২৪

বাকি ইতিহাস - ২৩, ২৪, ৩৯, ২৩১

বিবর - ২৩

বল্লভপুরের রূপকথা - ২২, ৬১, ২৩১

বিবাহ বিভ্রাট - ২১৮

বিচিত্রানুষ্ঠান - ২২

বিদেহী - ১৯৬

বাঘচাল - ৩৫০

বেহুলা - ৩৪৬

বীজ - ৩৫০

বাসি খবর - ১২৫, ১৩৬

বিভাব - ১৭৯

বর্ষর বাঁশি - ১৮৩

ব্যারিকেট - ১৯২

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ - ১৮৮

ভ

ভুল রাস্তা - ৮৮, ৯০

ভোমা - ১১৮, ৩০৩

ভানুমতীকা খেল - ১১৮

ভাঙা মানুষ - ১২৫

ম

মুক্তমেলা - ৬৭

মিছিল - ৬৭, ৮৯, ২৯৮, ২৯৯

মানময়ী গার্লস স্কুল - ২১৮

মুক্তি আশ্রম - ৬৮

মঞ্জরী আমার মঞ্জরী - ১৯৮

মাদার কারেজ - ১০০

মানুষে মানুষে - ১২৫

মরাচাঁদ - ১৬৮

মুক্তধারা - ১৮১

য

যদি আর একবার - ২৩, ২৭১

যযাতি - ৩৩৭

র

রাম শ্যাম যদু - ২২, ৩৬, ২৩০

রাবণ - ২০৪

রূপকথার কেলেকারী - ৮৯

রাজা অয়দিপাউস - ১৮২

রক্তকরবী - ১৮০

ল

লাল পাঞ্জা - ১৩

লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী - ৩০২

শ

শনিবার - ২২৮

শেষ নেই - ৪৪, ৬১, ২১৭

শের আফগান - ১৯৯

শরতের মেঘ - ২০১

শারদোৎসব - ১১৩

স

সাগিনা মাহাতো - ২৫, ৪৫, ৬৩, ২৯১

সার্কাস - ২৮৭

স্পার্টাকুস - ২৫, ৫৪, ৬১, ২১৭, ২২১

সওদাগরের নৌকা - ২০১

সন্জেন্নাহ - ৩৩৯

সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস - ৩০৭

হ

হয়বদন - ২৩৭

হাতহুদাই - ৩৪১

‘এবং মল্লয়া’-বিশ্ববিদ্যালয় যপ্তুরী আরোগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত

তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা ত্রাণিক নং-৯৬, ২০১৯।

এবং মল্লয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ২০২০

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প. বঙ্গ।

'Ebong Mahua'--UGC - CARE Approved listed Journal.
Journal Serial No.-96 (Indian Languages out of 114), Bengali, Faculty of

Arts journal Serial No.--32

EBONG MAHUA

**Bengali Language, Literature, Research and Referred with
Peer-Review Journal**

22th Year, 117 Volume

Feb,2020

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

সূচী পত্র

১. মনোজ বসু ও মানুষ গড়ার কারিগর	
:: কৌশিক কুমার মাজী.....	৯
২. ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্রম প্রসারণ	
:: শক্তিপদ শীট.....	১৬
৩. ভারতে ই-গভর্নেন্স : একটি পর্যালোচনা	
:: স্বরূপ রাণা.....	২৪
৪. মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ	
:: স্বপ্নদীপা গান্ধী.....	৩২
৫. রবীন্দ্র ভাবনায় আলপনা	
:: কৌশিক দাশগুপ্ত.....	৩৭
৬. বাংলা ভাষা আন্দোলনে সৈয়দ মুজতবা আলী	
:: সিমুম খান.....	৪৩
৭. রাখাল সিংহের উপন্যাস ও উদ্দেশ্যমূলকতা	
:: অনিমেঘ পাল.....	৫১
৮. গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'আকাশ সীমা নাই' : নারীর দৃষ্টিকোণে নগর	
:: প্রিয়মিতা ঘোষ.....	৫৫
৯. বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের ইন্দ্রজিৎ : তীর্থপথের চিরপথিক	
:: অমর চন্দ্র রায়.....	৬০
১০. সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে প্রান্তিক শ্রেণীর চরিত্র : একটি অধ্যয়ন	
:: বর্ণালী ব্যানার্জী.....	৬৬
১১. কথাসাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য	
:: প্রসেনজিৎ মণ্ডল.....	৭২
১২. পরিবেশ চিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের	
গান : একটি তুলনামূলক নিরীক্ষা	
:: সম্মিতা ভট্টাচার্য.....	৭৬
১৩. মেদিনীপুরের শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণে (১৮৩৫-১৮৫৭) —	
অগ্রগতি পর্যালোচনা	
:: শক্তিপ্রসাদ দে.....	৮৬

বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের ইন্দ্রজিৎ : তীর্থপথের চিরপথিক

অমর চন্দ্র রায়

নাট্যকর্মী বাদল সরকারের বহু আলোচিত এবং বহুচর্চিত একটি নাটক ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বহুরূপী পত্রিকায় (২২সংখ্যা, জুলাই ১৯৬৫) নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৬৮তে। প্রথম অভিনয় করে শৌভনিক, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫, মুক্তাঙ্গন। নাটকটির মুখবন্ধে বাদল সরকার জানিয়েছেন—

“নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৩, কিন্তু আসলে কবিতায় আর ডায়েরীতে এটি রচিত হয়ে গিয়েছিলো লন্ডনে ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সালে। বস্তুত একটা ছাড়া সবকটি কবিতাই ঐ সময় লেখা। তখনকার ডায়েরীতে কিছু অংশ হুবহু তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। ... এই নাটকটির জন্য নিন্দা আর প্রশংসা দুইই জুটেছে আমার কপালে। অনেক অপব্যাক্যাকেও দেখেছি। আর কিছু না হোক, এটাকে সেইসব কারণেই বিতর্কিত বলা যেতে পারে।”

খ্যাতি বলতে এই নাটক পশ্চিমবঙ্গে শুধু নয় হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, কানাড়া, তামিল এবং আরো কয়েকটি ভাষায় অনূদিত ও অভিনীত হয়ে এখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। এই নাটক ইংরেজি ভাষায় অভিনীত হয়েছে মাদ্রাজে, অনুবাদ ও পরিচালনা করেছেন নাট্যকার শমসী গিরিশ কারনাড। মূলত এই নাটকের জন্যই রাতারাতি নাট্যকার বাদল সরকার ‘ভারতবর্ষের নাট্যসাহিত্যের অধীশ্বর’ হয়ে গেলেন, পেলেন ভারতের সংগীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার।

‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ বাংলা নাটকের পালাবদলের ক্ষেত্রে এক নবতর সংযোজন। বিষয় উপস্থাপন, নাট্য নির্মাণ সবক্ষেত্রেই সনাতন ঐতিহ্যকে এখানে নস্যাত্ন করে এক নতুন আঙ্গিকে নাটকটি নির্মাণ করা হয়েছে। এই নাটকে তথাকথিত কোন প্লট নেই। তথাকথিত কাহিনি নির্মাণেও নাট্যকার গুরুত্ব দেয়নি। এই নাটকের চরিত্রগুলিও চিরপ্রচলিত নাট্য চরিত্রের মতো নয়। নাটকে কোন চরিত্রই একটি মাত্র চরিত্রের মধ্যে আটকে থাকেনি। এরা কখনও ছাত্র, কখনও শিক্ষক, কখনও মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী। নাট্যকার প্রথম অঙ্কই লেখক চরিত্রের মাধ্যমে নাটকের সব চরিত্রেরই কিছু কিছু পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন— “১৯৬১ সালের আদমশুমারীর হিসাবে কলকাতার লোকসংখ্যা ২৯,২৭,২৮৯। এর শতকরা প্রায় আড়াই ভাগ গ্র্যাজুয়েট বা আরো উচ্চশিক্ষিত। বিভিন্ন নামে এঁদের। এঁরা মধ্যবিত্ত, যদিও এঁদের মধ্যে বিত্তের তারতম্য যথেষ্ট। এরা শিক্ষিত, যদি ডিগ্রীকে

শিক্ষা বলে ধরে নেওয়া চলে। এঁরা ভদ্রলোক, ছোটলোকদের থেকে নিজেদের পার্থক্যটা বোঝেন বলে। এঁরা অমল বিমল কমল।”^{১১} এবং ইন্দ্রজিৎ।

এই চারটি চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার এর মূল লক্ষ্য হলো ইন্দ্রজিৎ। তার নামই নাটকের নাম। লেখকের নাটকের নাম ‘অমল, বিমল, কমল, ইন্দ্রজিৎ ও মানসী’ দিতে চাইলে বিমল তাদের মত মানুষদের টানার কোনো দরকার নেই বলে আপত্তি জানায়। কারণ তারা ‘কাটা সৈনিক’। আসলে এই নাটকে নাট্যকার অমল-বিমল-কমলের সঙ্গে নির্মল পরিচয়ের আড়ালে এক ইন্দ্রজিৎ-এর অন্বেষণ করেছেন। যিনি অমল-বিমল-কমলদের মত ‘কাটা সৈনিক’ নয়।

তিন অঙ্কের এই নাটকের প্রথম অঙ্কে মধ্যবিত্ত শ্রেণির তরুণ বয়সের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে তাদের প্রৌঢ় ও পরবর্তী জীবন চর্চা এবং শেষ তৃতীয় অঙ্কে লেখক ও ইন্দ্রজিৎ চরিত্রায়নের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মসমালোচনা ও সত্যপথের সন্ধান প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দ্রজিৎ চরিত্রায়নে জীবনের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা এবং শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত প্রথা বা গতানুগতিক জীবন থেকে উত্তরণের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে।

নাটকের ইন্দ্রজিৎ রায় চতুর্থ দর্শক। যে নিজেকে প্রথমে সবার সঙ্গে মিলিয়ে নির্মল পরিচয় দিয়েছে। কেন এই গোপনীয়তা? তার উত্তর দিতে গিয়ে সে বলেছে ‘অশান্তির ভয়’। ‘হৃদয় খুঁড়ে’ বেদনা জাগাতে সে চায়নি। সে জানে নিয়মের বাইরে গেলেই অশান্তি। কিন্তু ‘লেখক’-এর বিশ্বাস সবাই অমল-বিমল-কমলের মতো ‘নির্মল’ হতে পারে না। ‘লেখক’-এর অন্তর্গত সত্তার আহ্বানে ইন্দ্রজিৎ যেন পথ খুঁজে পায়। তাই শেষে স্বীকার করে সে নির্মল নয় ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রজিৎ-এর ব্যক্তিগত জীবনের যে পরিচয় ‘লেখক’ দিয়েছেন তা হল ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের হিসেব অনুযায়ী তার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। জন্ম, লেখাপড়া এবং কর্মস্থল কলকাতা। আর পাঁচজনের মতো সেও ভালোবেসে দেখেছে ‘মেয়েমানুষেরে’। মানসী তার সেই ভালোবাসা। কিন্তু সেই সম্পর্ক পূর্ণতা পায় না সামাজিক নিয়মের গোড়ায়। ভারতীয় দর্শন, প্রাচীন সাহিত্য, বিজ্ঞান থেকে শুরু করে রাজনীতির জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে ইন্দ্রজিৎ বৃদ্ধ। ইন্দ্রজিৎ একটু খামখেয়ালি প্রকৃতির। তার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ‘সব ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে’ পড়তে। কিন্তু পারে না; কারণ ‘মা’ এবং ‘পরীক্ষা’র জন্য। এই আলাদা স্বভাবের ইন্দ্রজিৎ-কে নিয়ে কমলরা ব্যঙ্গ করে বলেছে— ‘চাপা নয়- ডাঁট। নিজেকে উঁচু স্তরের জীব মনে করে। ওসব টাইপ চেনা আছে আমার।’^{১২}

নিজের ‘মুদ্রাদোষ’ই ইন্দ্রজিৎকে অমলদের থেকে আলাদা করেছে। সে সবার সঙ্গে একরকম ভাবে একসঙ্গে থাকলেও একই রকম জীবন যাপন করে না। একই রকম করে ভাবেনা। সে জীবনকে অমল-বিমল-কমলদের অবস্থান থেকেও যেমন দেখে, তেমনি দেখে নিজস্ব অবস্থান থেকে। সে পূর্ণ জীবনকে দেখতে চায়। অমলদের মতো মানুষেরা নিজেদের বাঁধা জীবনের ছাঁচে জীবনকে দেখে। নাটকের প্রথম সংস্করণে যে ছবি রয়েছে, তাতে দেখা যায় চারজনের মতো একজন মাত্র বৃন্ত বা গপ্তির বাইরে পা রাখতে চেষ্টা করেছে।

একটি পা বৃত্তের বাইরে এনেও ফেলেছে এবং গতি দেখে বোঝা যায় সে বৃত্ত থেকে এবার বেরিয়ে যাবে। বাড়িয়ে দেওয়া পায়ের মধ্যে সেরকম একটা ইঙ্গিত রয়েছে। বুঝতে পারি এই গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আসা ব্যক্তি হলো ইন্দ্রজিৎ।

অমলরা একটি নির্দিষ্ট স্থান- অবস্থানে ধৃত। তাঁরা বাঁধা ছকের বাইরে পা ফেলতে সাহস করে না। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ প্রতিটি অবস্থানে উপস্থিত হয়ে জীবনকে অন্যরকম ভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে। তাই সে স্বপ্ন দেখে,— “একটা বহিমান জ্বলন্ত উল্কার মতো দিগন্ত ভেদ করে উঠেছি— আকাশ চিরে এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত চিরে, শুধু উঠে যাচ্ছি, যতোকক্ষণ না উল্কার আগুনে নিঃশেষ হয়ে ভস্ম হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি। শুধু আকাশে থাকছে একটা ক্ষণিক চোখ-ঝলসানো আলোর জ্বালা।”^{৩০}

স্ববির, জড়ত্ব নিয়মকে ভেঙ্গে ফেলার সংকল্প নিয়ে ইন্দ্রজিৎ এগিয়ে চলতে চায়। ইন্দ্রজিৎ নিয়মের গণ্ডিটাকে ঘেরা করে, নিয়মের সেই প্রথাসিদ্ধ গণ্ডিকে ভেঙে ফেলতে চায়। যে দড়ি দিয়ে আঁটে পিঠে বাধা সব মানুষ, সেই দড়িটাকে পূজা না করে ইন্দ্রজিৎ দড়িটাকেই ছিঁড়তে চায়। ইন্দ্রজিৎ বলে— “দড়িটাকে ছিঁড়তে চাই। চারপাশে এই যে বদ্ধ কানা দেওয়ালগুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিতে চাই।”^{৩১}

এটা ঠিক যে সমাজের চারপাশের বদ্ধ কানা দেওয়াল গুলো ভেঙে গুঁড়ো করে দিতে চাইলেও তা ইন্দ্রজিৎ করে উঠতে পারে না। কিন্তু যে নিয়মে স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়িতে লীলার জায়গা হয়না, যে নিয়মে একটা সাত-আট বছরের ছেলেকে জুতো পালিশ করতে হয়, যে নিয়মে মানসীর সঙ্গে তার বিয়ে হয় না, সমাজের সেই নিয়মগুলির বিরুদ্ধে তার তীব্র প্রতিবাদী সত্তাই তাকে নির্মলদের মতো হতে দেয়নি, সে হয়ে উঠেছে ইন্দ্রজিৎ। অমল-বিমল-কমল-মানসীরা নিয়ম খুঁটিয়ে দেখে। নিয়মের ভিতরেই তারা চলতে অভ্যস্ত। ইন্দ্রজিৎের লড়াই তাদেরও বিরুদ্ধে। কার সঙ্গে তার লড়াই মানসীর এই প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্রজিৎ তাই বলেছে— “দুনিয়ার সঙ্গে। চারিপাশের লোকগুলোর সঙ্গে। তোমাদের ঐ যাকে সমাজ বলো-সেইটার সঙ্গে, তার ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে।”^{৩২}

এই চিন্তা-চেতনা ও দর্শনের জন্যই ইন্দ্রজিৎ বাকিদের থেকে স্বতন্ত্র। ইন্দ্রজিৎ অমল-বিমল-কমলদের দলে ভিড়ে নিজের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বকে বিসর্জন দিতে পারেনি। তাই অমল-বিমল-কমলদের পদক্ষেপে উন্নাসিক স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকলেও ইন্দ্রজিৎ-এর চোখে যন্ত্রণা ও পদক্ষেপে ক্লান্তি।

ইন্দ্রজিৎ রক্তমাংসের মানুষ। নানা ঘটনায়, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সে ক্ষত-বিক্ষত। কখনো কখনো ক্লান্তি-নৈরাশ্য-অবসাদ-হতাশা ইন্দ্রজিৎকে গ্রাস করেছে। নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে ইন্দ্রজিৎ-এর গতানুগতিকতা ভঙ্গে বৃত্তচ্যুত হবার যে স্বপ্ন বা ইচ্ছা; দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ক্ষান্ত হতে চেয়েছে এবং তৃতীয় অঙ্কে সেই ক্লান্তি আরও চরমে উঠেছে— তার স্বপ্ন শেষ হতে চলেছে এবং তার যন্ত্রণাও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সে বিধবস্ত ও ক্ষত-বিক্ষত। তার এখন ধারণা— “বর্তমানটাও একটা না-জানা ভবিষ্যতের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে অনির্দিষ্ট হয়ে

না থেকে সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট বিন্দু হয়ে যেতে পারে। অন্য ভাষায় তার নাম মরে যাওয়া।”^৬

স্বপ্নহীন ইন্দ্রজিৎ নেমে আসে সাধারণের স্তরে। সে এখন আর বোঝাবার বা বোঝাবার জন্য কথা বলেনা, অভ্যাসে বলে। তার স্বপ্ন যে ব্যর্থ-মরুভূমির মরীচিকা তা সমান্তরাল রেললাইনের দৃষ্টান্তে ব্যক্ত হয়েছে। ইন্দ্রজিৎ উপলব্ধি করে— “যতটা হাঁটছি বিন্দুটা সরে সরে যাচ্ছে। পেছনেও যা সামনেও তাই।”^৭

ইন্দ্রজিৎ যে আর স্বপ্ন দেখেনা, আগে দেখত— সেই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে তৃতীয় অঙ্কে হাজারীবাগের মানসীর প্রতি তার উক্তি— “আমার ক্ষমতা নেই। কোনো দিন ছিল না। শুধু ক্ষমতার স্বপ্ন দেখতাম। আমি সাধারণ। স্বীকার করতে যতোদিন পারিনি— স্বপ্ন ছিল। আজ স্বীকার করি।”^৮

ইন্দ্রজিৎ বুঝতে পারে না সে কি করবে। নিজের জীবন নিয়ে সে আজ দ্বিধাগ্রস্ত— “কী করবো? ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বো? না, হেসে জীবনটাকে উড়িয়ে দেবো?”^৯

শেষে দেখা যায় ইন্দ্রজিৎ উদভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। সে শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করে আলো ঝলসানো তো দূরের কথা, দিগন্ত ছেড়েই সে উঠতে পারেনি। তার স্বীকারোক্তি— “আলো ঝলসানো না। আকাশে জ্বালা রইল না। আমি দিগন্ত ছিঁড়ে উঠতেই পারলাম না।”^{১০}

অসহায় ইন্দ্রজিৎ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করে— “জানি না। আমি অনেক ভেবেছি। অনেক যুক্তি তর্ক বিচার মনে মনে করেছি। সব কিছুর উত্তর— জানি না। কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যুক্তি তর্ক আর ভাল লাগে না। কিছু করতেও পারছি না। শুধু ক্লান্ত লাগছে। ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।”^{১১}

ইন্দ্রজিৎ-এর এই পরাজয় দেখে কোনো কোনো সমালোচক বাদল সরকারের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন— “এবং ইন্দ্রজিৎ নাটকে ইন্দ্রজিৎ এবং লেখক। উভয়ের সংলাপে এই জীবন প্রত্যয়ই ঘোষিত হয়েছিল যে, আমরা সবাই অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা। আলব্যের ক্যামুর The Myth of Sisyphus-এর কথা অবশ্যই মনে ছিল বাদল সরকারের। এই জীবনের মূল্য সম্পর্কে এই বই-এ ক্যামু বলেছিলেন, যুক্তি দিয়ে যে জগতের কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করা যায় তা যত ক্রটিপূর্ণই হোক, আমাদের পরিচিত জগৎ। কিন্তু যে জগতে মানুষ অকস্মাৎ তার সমস্ত মোহ ও আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে, সেখানে সে নিজেকে মনে করে একজন বহিরাগত। তার এই নির্বাসনের যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেই।”^{১২}

কিন্তু সত্যিই কি ইন্দ্রজিৎ শেষ পর্যন্ত জীবনের কাছে হেরে যাওয়া পরাজিত নায়ক? কোনো দেবত্ব বা অতি মানবত্ব ইন্দ্রজিৎকে উত্তীর্ণ করেননি নাট্যকার। ইন্দ্রজিৎ-এর হতাশা, ক্লান্তি, নৈরাশ্য অবসাদ তাই স্বাভাবিক। আকাঙ্ক্ষা নিয়েও আকাঙ্ক্ষা না পূরণের নৈরাশ্য নিয়ে সে মানুষ। সেই জন্য যন্ত্রণা ও হতাশায় সে আবার নির্মলকুমার বলে নিজেকে পরিচয় দিতে চেয়েছে, সাধারণ হতে চেয়েছে। কিন্তু চেষ্টা করেও ইন্দ্রজিৎ নির্মল হতে পারেনি। কারণ অমল-বিমল-কমলদের মতো তার প্রমোশন নেই, বাড়ি করা

নেই, ব্যবসার স্কিম নেই। কী করে সে নির্মল হবে। চেষ্টা করেও তাই সে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে পারেনি। ইন্দ্রজিৎ একা এবং নিঃসঙ্গ। জীবনানন্দ দাশের ‘বোধ’ কবিতার মানুষটির মতো এক ‘বোধ’তাকে তাড়িত করেছে। তাই সকলের মধ্যে থেকেও সে নিঃসঙ্গ। বারে বারে নির্মল হতে চায়। কিন্তু পারে না। ইন্দ্রজিৎ ‘বোধ’এর মানুষটার মতই যেন বলতে চেয়েছে—

“সকল লোকের মাঝে ব’সে

আমার নিজের মুদ্রাদোষে

আমি একা হতেছি আলাদা ?

আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ?

আমার পথেই শুধু বাধা ?

... ..

তাদের হৃদয় আর মাথার মতন

আমার হৃদয় না কি ? তাহাদের মন

আমার মনের মতো না কি ?”^{১০}

ইন্দ্রজিৎ গতানুগতিকতার স্রোতে বদ্ধ হতে চায় না। অন্য সবার মতো হয়েও সে এগিয়ে চলার স্বপ্ন দেখে। “তার তো অন্য সবার মতো ছকে বাঁধা জীবন নেই। তাই অন্য এক তাড়নায় সে এগিয়ে চলে।”^{১১} ইন্দ্রজিৎ অমল-বিমল-কমলদের মতো আরও অগণন সংখ্যার মানুষের মতো হারেনা, হেরে যায় না। এই অগুণতি মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়েও ইন্দ্রজিৎ জীবনের জন্য লড়ে যায়, জীবনকে ভালোবেসে পাঞ্জা কষতে যায়। সে টিকে থাকার জন্য লড়েনা, জীবনে বেঁচে থাকার জন্য লড়ে। অমল-বিমলদের সাপেক্ষে ইন্দ্রজিৎ তাই ‘হিরো’। জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যবোধ ইন্দ্রজিৎকে গ্রাস করলেও শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পারে ‘তবু ঠেলতে হবে’, ‘তবু বাঁচতে হবে’। ‘সিসিফাস-এর মতো নিয়মিত ঘেরাটোপের চেতনায় আক্রান্ত হলেও তার থেকে বেরিয়ে আসার একটা চেতনা জাগিয়ে রাখতেই হয়।’^{১২} শূণ্যতার দমবন্ধ করা পরিসর থেকে প্রতিমুহূর্তে উঠে যাওয়া ধাপে ধাপে অস্তিত্বের খোঁজে এগিয়ে চলে ইন্দ্রজিৎ। মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়লেও জীবনের প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ নয়। জীবনকে গভীরভাবেই সে উপভোগ করতে চায়। জীবন থেকে সে পালিয়ে যায়নি। ইন্দ্রজিৎ জানে ‘জীবন। মহামূল্যবান জীবন’। এই জীবন নিয়েই এতো বিবেচনা, এতো হিসেব। জীবনের প্রতি তার গভীর অনুরাগ। তাই সে মানসীকে বলেছে— “রাত্রে আকাশ-ভরা তারার দিকে তাকিয়ে বইয়ে পড়া অ্যাস্ট্রনমি যদি ভাবিস, এর ছোট্ট সৌরজগতের ছোট্ট পৃথিবীটার কোনো মূল্য থাকে ? এই কীটগুণীট মানুষগুলোর কোনো মূল্য থাকে ? তাই বলে সেই কথা যদি সব সময় ভাবি, বেঁচে থাকা যাবে ?”^{১৩}

জীবনের পথে তাকে চলতেই হবে। সাধারণ হলেও তার সেই অমল-বিমল-কমলদের সঙ্গে একই সারিতে চলার উপায় নেই। লেখক ইন্দ্রজিৎকে তাই বলেছে—

“তুমি নির্মল নও। আমিও সাধারণ। তবু আমি নির্মল নই। তোমার আমার নির্মল হবার আর উপায় নেই।”^{১৭} কারণ— “আমাদের তীর্থ নেই, শুধু যাত্রা আছে। তীর্থযাত্রা।”^{১৮}

এ পথ শেষ নয়, পূর্ণ হয়না মনোরথ। উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন হয়েও এগিয়ে চলার লড়াই-ই একমাত্র পথ। উদ্দেশ্যহীনতা, তার মধ্যবিত্ততা আর তা অতিক্রমণের স্বপ্নই ইন্দ্রজিতের সংগ্রাম। জীবনে অনেক গ্লানি, পরাজয় ও অর্থহীনতা সত্ত্বেও ইন্দ্রজিৎ জীবনের কাছে হেরে যায়নি। তাই ‘তীর্থযাত্রা’তেই শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস রেখেছে। এ বিশ্বাস ‘নেতি’-র নয়, ‘ইতি’-র, শূন্যের নয়, অলীক হলেও এক প্রত্যাশার। ইন্দ্রজিৎ ‘তীর্থপথ’কে জীবনের ‘ধ্রুবতারা’ করেই জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে—

“জীবনের প্রথম প্রভাতে
বিনা দ্বন্দ্বের বিনা প্রশ্নে উন্মুক্ত দু’হাতে
তীর্থপথ মহাদীক্ষা করেছি গ্রহণ।
দিবসান্তে আজ যেন মন
নাহি ভোলে সেই দীক্ষা। তীর্থ নয়,
তীর্থপথ আমাদের- মনে যেন রয়।”^{১৯}

তথ্যসূত্র :

১. সরকার, বাদল, এবং ইন্দ্রজিৎ, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, কলকাতা- ১৫, নবম মুদ্রণ-
আষাঢ় ১৪০২, জুলাই ২০০৬, পৃ. ৫।
২. তদেব, পৃ. ১৬। ৩. তদেব, পৃ. ৭৯। ৪. তদেব, পৃ. ২৬।
৫. তদেব, পৃ. ২৬। ৬. তদেব, পৃ. ৬৫। ৭. তদেব, পৃ. ৬২।
৮. তদেব, পৃ. ৬৫। ৯. তদেব, পৃ. ৬৬। ১০. তদেব, পৃ. ৭৯।
১১. তদেব, পৃ. ৬২।
১২. মুখোপাধ্যায়, বিমল কুমার, নাট্যকর্মী বাদল সরকারকে একটি খোলা চিঠি, পৃ. ২৬।
১৩. দাশ, জীবনানন্দ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা- ৭৩, সপ্তম
মুদ্রণ- আশ্বিন ১৩৯৫, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ২০।
১৪. মিত্র, কুন্তল, অ্যাবসার্ড নাটক মাতৃভাষায় বিভাষায়, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা-
৯, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৫২।
১৫. চৌধুরী, দর্শন, নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয়
সংস্করণ ২০১০, পৃ. ৪০।
১৬. সরকার, বাদল, এবং ইন্দ্রজিৎ, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, কলকাতা- ১৫, নবম মুদ্রণ-
আষাঢ় ১৪০২, জুলাই ২০০৬, পৃ. ৫৪।
১৭. তদেব, পৃ. ৮০। ১৮. তদেব, পৃ. ৮১। ১৯. তদেব, পৃ. ৮২।

‘এবং মল্লয়া’-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত

তালিকাভুক্ত। ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা আইন নং-৯৬, ২০১৯।

এবং মল্লয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২১ সংখ্যা, মে, ২০২০

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

‘Ebong Mahua’--UGC - CARE Approved listed Journal.
Journal Serial No.-96 (Indian Languages out of 114), Bengali, Faculty of

Arts journal Serial No.--32

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with

Peer-Review Journal

22th Year, 121 Volume

May, 2020

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera@gmail.com

Rs 500

১৫.বিজন ভট্টাচার্যের জবানবন্দী,নবান্ন, দেবীগর্জন : প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকার করুণ সংগ্রাম	
:: টিটু ঘোষ.....	১১১
১৬.শৈশবকালীন শিশুদের অপসংগতিমূলক আচরণের উপর একটি সমীক্ষা	
:: লালকৃষ্ণ খাঁড়া.....	১১৮
১৭.স্বদেশী আন্দোলনে বাংলা সঙ্গীতে স্বদেশী ভাবনা (১৯০৫-১৯১১) : একটি ঐতিহাসিক আলোচনা	
:: প্রসেনজিৎ রায়.....	১২২
১৮.বিশ শতকের শেষের দিকের নারী কবিদের দৃষ্টিতে ধর্ম : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা	
:: সেখ পারভেজ হোসেন.....	১৩১
১৯.ভিন্নধর্মী মাতৃসত্তার আলোকে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্য	
:: জয়ন্ত ঘোষ.....	১৩৭
২০.শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের চোখে নরেন তথা বিবেকানন্দ	
:: মৌসুমী দাস.....	১৪২
২১.বাংলার গ্যারিক গিরিশচন্দ্রের নাট্য জগত থেকে থিয়েটার মধ্যে পদার্পণ	
:: সঞ্চয় মণ্ডল.....	১৪৬
২২.বাদল সরকারের নাটকে লোকনাট্যের প্রভাব:প্রসঙ্গ 'ভুল রাস্তা'	
:: অমর চন্দ্র রায়.....	১৫৫
২৩.সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প উত্তরাধিকার :এক আত্ম বংসী আদিম প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা	
:: চিন্ময় কুমার মাইতি.....	১৬২
২৪.গান্ধীজী ও বিপ্লবীরা : প্রেক্ষিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন	
:: শচীন চক্রবর্তী.....	১৬৯
২৫.মানবাধিকার রক্ষায় ভারতীয় সংবিধানের ভূমিকা	
:: জয়দেব নায়েক.....	১৭৯
২৬.লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বাস্তবতা—প্রসঙ্গ ঔপনিবেশিক বাংলার লোককীর্তি	
:: মহঃ আবু নাসিম.....	১৮৬
২৭.অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের বয়ন শিল্পীদের দুর্দশা নিরসনে আবেদন, প্রতিরোধ ও তার পরিণাম	
:: কাজী আক্তার আলি	১৯৬

বাদল সরকারের নাটকে লোকনাট্যের প্রভাব : প্রসঙ্গ ‘ভুল রাস্তা’ অমর চন্দ্র রায়

লোকনাট্যের সঙ্গে বাদল সরকারের কোনদিনই কোন আঙ্গিক যোগ ছিল না। একজন নগরের লোক হিসেবে তিনি নগরনাট্য তথা প্রসেনিয়াম থিয়েটারকেই বেছে নিয়েছেন। থিয়েটার বলতে তিনি সেজের বাইরে কিছু জানতেন না। একটি সাক্ষাৎকারে তাই বাদল সরকার বলেছেন—

“আমি নগরনাট্যটা মেনে নিয়েছি, যাকে পরে দ্বিতীয় থিয়েটার বলেছি। কারণ আমি নগরের লোক যেখানে থিয়েটার বলতে সেজই বোঝায়...”^১

লোকনাট্যের বিষয় সম্পর্কে বাদল সরকারের সেই অর্থে কোন ধারণাও ছিল। তার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন—

“লোকনাট্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ভীষণভাবে কম। সুযোগ পেলেই দেখি, আজও দেখি, সেটা অন্য কারণে। কিন্তু পরিচয়টা ভীষণ কম।”^২

লোকনাট্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা আর পাঁচজন শহুরে মানুষের থেকে আলাদা নয়। তিনি মনে করেছেন এগুলি রাজরাজার কাহিনি, বড় বেশি মধ্যযুগীয়। লোকনাট্য সম্পর্কে এই স্বল্প ধারণার কারণেই তিনি লিখেছেন—

“...প্রথম থিয়েটার- লোকনাট্য, গ্রামাঞ্চলের থিয়েটার। আশ্চর্য এক আকর্ষণী ক্ষমতা গ্রামবাসীর কাছে। অথচ দু-একটি তিল পরিমাণ ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই নাট্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আজকের দরিদ্র গ্রামবাসীর জীবনের কোনও যোগাযোগ তো নেই-ই, উপরন্তু সেই সব দেবদেবী-রাজা-রাজড়ার কাহিনি মানুষকে বলে— যা হয় তাই হয়, যা হয় তাই হবে।”^৩

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে বাদল সরকার লোকনাট্য সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করেছেন, তিনিই আবার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারে সেই লোকনাট্যের আঙ্গিককেই ব্যবহার করেছেন। আসলে লোকনাট্যের বিষয় সম্পর্কে তিনি যা’ই ধারণা থাকুক না কেন এর আঙ্গিক সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ। কিন্তু সেই আঙ্গিক যে থিয়েটারে ব্যবহার করা সম্ভব এটা তাঁর ধারণায় ছিল না। এই চিন্তা প্রথম আসে বিদেশে ‘থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড’ পদ্ধতিতে নাটক দেখে। এই থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড আমাদের দেশের লোকনাট্য, যাত্রার মতো মাঝখানে চতুরে হয়, চারিদিকে দর্শক বসে। তিনি উপলব্ধি করলেন এই মাধ্যমেই দর্শককে বেশি করে নাড়া দেওয়া যায়। প্যারিসে সেই থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড দেখার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে মানুষকে ১৬.১২.১৯৬৪

সালের একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

“এবার মনে হোলো, প্রচলিত সেক্সের থেকে এই মাধ্যমে দর্শকদের অনেক বেশি নাড়া দেওয়া যায়। সেট নেই, সাজসজ্জা নেই। তিনটে কেঠো টেবিল, ছ’টা কেঠো চেয়ার, দু’চারটে কাগজ ছাড়া আর কিছু নেই। অথচ মনে হোলো কয়েকটা জীবন্ত লোককে দেখছি। ...অভিনেতাদের দর্শকের এতো কাছে আসা যে সম্ভব, আগে যেন ধারণা ছিল না।”^৪

বলা যায় এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে লোকনাট্যের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। যে কারণে আমরা দেখি কলকাতায় ফিরে এসে এর অল্প কিছুকাল পরে জওহরলাল নেহরু ফেলোশিপ (জুন ১৯৭১ - মে ১৯৭৩) নিয়ে ‘থিয়েটার অফ সিন্থেসিস অ্যাজ এ রুরাল আরবান লিঙ্ক’ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ লোকনাট্যের কাছাকাছি চলে আসেন। বাদল সরকার চেয়েছেন গ্রামীণ লোকনাট্য ও প্রসেনিয়াম থিয়েটার— এই দুই থিয়েটারের রীতিকে বর্জন না করে দুটি থিয়েটারের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বিকল্প একটি নাট্য। দুটি থিয়েটারেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারে গ্রহণ করেছেন। এই দিকটি লক্ষ্য করে নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় এক আলাপচারিতায় তাই জানিয়েছেন—

“...উনি নিজের *The Third Theatre*-এ যে আলোচনাটা করেছেন তাতে ফাস’ থিয়েটার বলে তিনি লোকনাটকের যে কথাটা বলেছেন এবং সেটাকে ছেড়ে দ্বিতীয় নাটককে ছেড়ে তিনি যে *Theatre of Synthesis*-এর কথা বলছেন— মানে ঠিক ছেড়ে তো আর সিন্থেসিস হয় না। এক অর্থে এইটা নয়, ওটা নয়, আমি একটা নাটক করছি, এর মধ্যে দুয়ের কিছু কিছু সম্পর্ক রয়েছে। তার একটা *Synthesis ...*।”^৫

সুতরাং বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার তথা তাঁর অঙ্গন-মঞ্চ মুক্তমঞ্চের ভাবনায় কিংবা নাটকের বিষয়বস্তুতে লোকনাট্যের প্রভাব যে থাকবে এটা স্বাভাবিক। লোকআঙ্গিক যেমন তিনি থিয়েটারে ব্যবহার করেছেন, তেমনি লোকনাট্যের বহু বিষয় এবং উপাদানকে বাদল সরকার তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন। অনেক ক্ষেত্রে লোকনাট্যের বিষয়টাকেই তিনি নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন দর্শকের সামনে। বিশেষ করে তাঁর শেষের দিকের নাটকগুলির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যেমন— ‘লক্ষীছাড়ার পাঁচালী’ (১৯৭৪), ‘ভানুমতীকা খেল’ (১৯৭৪), ‘রূপকথার কেলেঙ্কারী’ (১৯৭৪) এবং সর্বোপরি ‘ভুল রাস্তা’ (১৯৯২)। এই প্রবন্ধের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ‘ভুল রাস্তা’ নাটক। এই নাটকে বাদল সরকার কীভাবে লোক আঙ্গিক, লোকনাট্যকে ব্যবহার করেছেন এবং সেই আঙ্গিকের মাধ্যমে কীভাবে তাঁর নিজস্ব নাট্যদর্শনকে তুলে ধরেছেন তার একটা মূল্যায়ন করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

‘ভুল রাস্তা’ নাটকটির প্রথম প্রকাশ ‘দেশ’ ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২। প্রথম অভিনয় ২ মার্চ ১৯৮৯, সিন্ধু ভবনের অঙ্গন মঞ্চে। অভিনয় করেন বাদল সরকারের নাট্যদল

শতাব্দী। এরপর অঙ্গন মঞ্চ ছাড়িয়ে মুক্তমঞ্চে, খোলা আকাশের নিচে বহুবার ‘ভুল রাস্তা’ নাটকটি অভিনীত হয়। ১৯৯০ সালের ২৫-২৬ মার্চ শতাব্দী নদীয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রাম পরিক্রমা সময় ‘ভুল রাস্তা’ নাটকটি অভিনয় করে। ১৯৯৬ সালের ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি একই ভাবে হুগলির সীতাপুর ও জঙ্গিপাড়ার বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা কালে শতাব্দীর একটি অন্যতম সহযোগী দল শতকও ‘ভুল রাস্তা’ অভিনয় করে। নাটকটি যে লোকনাট্য আঙ্গিক থেকে নেওয়া এটা নাটকের শুরুতেই নাট্যকার আমাদের স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি লিখেছেন—

“এটি একটি ‘গল্প-বলা নাটক’। এই ধরনের নাট্যাভিনয় আমাদের লোকনাট্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত। তার মধ্যে ‘পাণ্ডবানি’ বাঙালি দর্শকের কাছে পরিচিত। একটি ‘পাণ্ডবানি’ অনুষ্ঠান দেখেই এই নাটক লেখার কথা প্রথম মাথায় আসে।”^৬

অর্থাৎ নাটকের বিষয়বস্তু এদেশের দেশজ লোকনাট্য থেকে নেওয়া এটা তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন। শুধু তাই নয় নাটকের অভিনয়ের যে নির্দেশনা বাদল সরকার দিয়েছেন তা আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত লোকনাট্য, যাত্রার মতই। তিনি বলেছেন—

“অভিনয়-প্রাঙ্গনের চারিপাশে দর্শকরা, এক কোণে চার-পাঁচজনের একটি গান-বাজনার দল। ঢোলের বাজনার মধ্যে অভিনেতা ঢুকবে নাচতে নাচতে। তারপর যা বলবার, সে একাই বলবে, গানের সময়ে সহায়তা করবে গান-বাজনার দল। হাতের বড়ো রেশমি রুমালটিকে বিভিন্ন বস্তু হিসাবে ব্যবহার করবে অভিনেতা।”^৭

নাটকটির এই অভিনয় আঙ্গিক একেবারে লোকনাট্যের মতো। লোকনাট্যে খোলা মঞ্চে, চারিদিকে দর্শক রেখে মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটিতে অভিনয় চলে। অনেক লোকনাট্যে একজন মূল গায়ন থাকেন, তার সঙ্গে থাকেন দোহারী। মূলত নৃত্য-গীত সহযোগে লোকনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবহৃত হয় নিজস্ব তৈরি নানান রকম বাদ্যযন্ত্র। দর্শক এবং অভিনেতার একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে লোকনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। অভিনেতা এবং দর্শক এর মধ্যে চলে একটা পারস্পরিক সংলাপ। আর এভাবেই লোকনাট্যের কাহিনি এগিয়ে যায়। বাদল সরকার এই নাটকে সেই লোকআঙ্গিকেই অনুসরণ করেছেন।

‘ভুল রাস্তা’ নাটকের একটিই চরিত্র একজন ফুটপাতবাসী ভিক্ষুক; যিনি নানারকম গল্প শুনিতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পেট চালায়। গল্পকথক ভিক্ষুক দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছে—

“একটা গল্পো, এক कहानी- কানে শুনবেন, মনে ধরবেন- হাঁ হাঁ বাংলা গল্পো, হামি তো বংগালি আছি! তবু ভি এখুনি রাষ্ট্রভাষা হোলো না? তাই থোড়া কুছ হিন্দী বুলি- খিচড়ি খান না? খিচড়ি? এ ভি খিচড়ি আছে। মাফ করে লিবেন বাবুজী লহিম মাস্ট- লিখাই পড়াই শিখলাম না বিলকুল, কাজকাম জানলাম না, তাই এই খিচড়ি ভাষা খিচড়িকি कहानी- এহি হামার রুজি-রোজগার! যদি শুনে ভালো লাগে, যদি দিল খুশ হো যায়, তোবে- না না, সোনাচাঁদি মাঙবো না, সিরফ দো-চার পয়সে সিকি

আধলি দোয়া করে গরিবকে- আরে হেই, ঝননন নননন ঢাম্ কুড়কুড় ঢাম্ কুড়কুড়
ঢাম্ কুড়কুড় ঢাম্ কুড়কুড় ঝননন নননন ঢাম্ কুড়কুড় ঢাম্ কুড়কুড় ঢাম্ কুড়কুড়
ঢাম্ কুড়কুড় বাঃ!”^৮

একেবারেই লোকনাট্যের আঙ্গিকে নাটকটি শুরু হয়। নাটকের বিষয়বস্তু সঙ্গে
দর্শকের এই সংযোগ সাধন প্রক্রিয়া লোকনাট্যের মতো। কথকতার ঢঙে নাচ-গানের
মধ্য দিয়ে আসর জমিয়ে নাটকের বিষয় দর্শনের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু
উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে ফুটপাথ নিবাসী সাধারণ মানুষের সামনে নাটক অভিনীত হচ্ছে ফলে
ভাষা ব্যবহারে কোথাও কোনো নাগরিকতার ছাপ নেই। হিন্দি, বাংলা মিশিয়ে এমন
এক মিশ্র ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা সহজেই দর্শকের অনুভূতির মধ্যে পৌঁছায়।
নাটকের একমাত্র চরিত্র সেই ভিক্ষুক বলে চলে এক গল্প। ঠিক রূপকথার গল্পের
মতো— এক ছিল রাজা, তার ছিল এক রাজপুত্রের গল্প। কেমন দেখতে সেই রাজপুত্র ?
‘যেমন হোয় আর কী- রূপকথাতে শুনিয়েছেন না? অমনি রাজার বেটা খুবসুরৎ
নওজওয়ান যুবরাজ!’^৯

সেই রাজপুত্র একদিন দূর দেশে পাড়ি দেয়। কেননা তার মায়ের ইদানিং
সবরকম খাবারে অরুচি দেখা দিয়েছে। কোন কিছুই তিনি খেতে পারছেন না।
অবশেষে সেই অরুচি অসুখ দূর করার এক উপায় জানা গেল যে ‘জম্বুস্থানকা
অম্বুফল’^{১০} খাওয়াতে পারলে রাজমাতা সুস্থ হবেন। তাই রাজপুত্র দেরি না করে
বেরিয়ে পড়লো সেই ফলের সন্ধানে। রাজকুমার বনের পথে পথে ঘুরে অম্বুফলের
সন্ধানে। বনের পথে চলতে চলতে একদিন সে পথ হারিয়ে ফেলে। ভুল রাস্তায় সে
চলে যায়। শেষেষে সে আশ্রয় পায় বনের এক কাঠুরিয়ার কাছে। সেখানে এক
কাঠুরিয়াকে ভাই, কাঠুরিয়ার মাকে মা বলে। সে ক্রমে ক্রমে অতীত জীবন ভুলে
নতুন জীবনে নিজেকে মানিয়ে নেয়। ভুলে যায় অম্বুফলের কথা। ফেলে আসা
রাজত্বের অতুল সম্পদ ও বৈভব, সেখানকার রাজস্ব প্রথা, আর তাকে ভাবায় না।
বলা যায় এতো সে-ই রূপকথার গল্প। একেবারেই নির্ভেজাল কথকতার ঢঙে
আগাগোড়া নাটকটি রচিত এবং সেইভাবে অভিনীত হয়।

রূপকথার মতো শুনতে লাগলেও এই নাটকের গল্প আসলে শ্রমজীবী সাধারণ
মানুষের গল্প, বাস্তবের গল্প। সেই ‘কহানী’ বলার জন্যই নাট্যকার লোকনাট্যের
আঙ্গিককে বেছে নিয়েছেন। চিরকালই সাধারণ মানুষ বঞ্চিত, তাদের বঞ্চিত করে
রাখা হয়। তারা শাসকের অন্নসংস্থানের জন্যই যেন জন্মগ্রহণ করেন। নাট্যকার
নাটকের মধ্যে সমাজের সেই শ্রেণিবৈষম্যকেই তুলে ধরেছেন—

“রাজা হোবে খানেওয়ালা খিলানেওয়ালা কোন্

বোলে খিলানেওয়ালা কোন্

এ তো সহজ কথা বাবুজী, সিধী বাৎ। খানেওয়ালা রাজা তো খিলানেওয়ালা
পরজা। হাঁ, রাজা খাবে তো খাওয়াবে পরজা।”^{১১}

বাদল সরকার এই শ্রেণিবৈষম্যকে ভাঙতে চান। তাই লোকনাট্যের রাজরাজার কাহিনি অন্তরালে তিনি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। লোককথার মধ্যেই যুক্ত করে দেন দেশকালের ঘটে চলা নানা দুর্নীতির প্রসঙ্গ। যে কারণে রাজার কোৎওয়ালের সঙ্গে ফুলের ব্যবসাদারদের বন্দোবস্তকে বলেন, “আরে সমঝে নহী? কমিশন কমিশন, দস্তুরী, বোফোর্স!”^{১২} গল্প বলতে বলতে কথক এত সাবলীলভাবে প্রসঙ্গটি যুক্ত করে দেন যে নাট্যকারের সচেতন সমাজ ভাবনার যোগ থাকলেও তা বিন্দুমাত্র অসঙ্গত মনে হয় না। এভাবেই নাট্য কাহিনির গল্পটির সঙ্গে সাম্প্রতিককালের সংযোগ সাধিত হয়েছে।

সামাজিক শ্রেণি বৈষম্যের পাশাপাশি নাট্যকার বাদল সরকার এখানে গ্রাম-শহরের বৈষম্যকে খুব চমৎকার করে তুলে ধরেছেন। আমরা জানি বাদল সরকারের বহু নাটকে এই দ্বন্দ্বটো বারবার উঠে আসে। এই নাটকেও তিনি সেই দ্বন্দ্বটাকে তুলে ধরেছেন—

“শহর ছাড়কে গাঁও-গ্রাম। গ্রামে বড়ো বড়ো বাড়ি না আছে, চণ্ডা চণ্ডা রাস্তা না আছে, না আছে দোকান না আছে বাজার, না আছে গাড়ি না আছে ঘোড়া, খালি ক্ষেতি-হি-ক্ষেতি। আর ইখানে উখানে বীচ-বীচমে জমাট-বান্ধা গাছগাছালি পেড় বাগ্যায়রহু কুঁড়ে ঝোপড়ি গরিব কিসানকা ঘর।”^{১৩}

বাদল সরকার থিয়েটারের মাধ্যমে সেই বৈষম্যের অবসান চেয়েছেন। ‘ভুল রাস্তা’ নাটকের রাজপুত্রকে গরীব ঘরে শ্রেণিবৈষম্যের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন।

সুনশান জঙ্গলের পথে রাজকুমারকে নিয়ে গিয়ে রূপকথার আবহ রচনা করা হলেও তারপর রাজকুমারের যে জীবন যাপনের কথা নাটকের কথক গল্পের আকারে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন তা একেবারেই বাদল সরকারের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। দর্শন চৌধুরী এ প্রসঙ্গে যে মূল্যায়ন করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

“এখানে বাদল সরকার অনেকাংশে কার্ল মার্কস-এর শ্রম-অর্থনীতির চিন্তায় বক্তব্যকে সাজিয়েছেন। তবে বলার ভঙ্গিটি তথ্যভারাক্রান্ত নয়— লোককথার আঙ্গিকে, কথকতার ঢঙে শ্রমজ অর্থনীতির কথা এখানে তুলে ধরা হয়।”^{১৪}

রাজপুত্রকে ‘ভুল রাস্তা’য় এনে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নাট্যকার এভাবেই মিশিয়ে দিয়েছেন। চিরকাল যা চলে আসছে— রাজার ছেলে রাজা, এই মিথকে বাদল সরকার ভাঙতে চেয়েছেন। তাই খুব সহজেই কাঠুরিয়ার ছেলে রাজপুত্র কে বলতে পারে ‘তুম কৌন্ হো? ... রাজা? যুবরাজ? উও সব ক্যায়া হোতা হায় রে?’^{১৫} এ যেন সাধারণ মানুষের সুমধুর প্রতিশোধ। নাট্যকারের স্বর এখানে গল্প কথকের স্বরে মিশে গেছে। রাজপুত্র যে ভুল রাস্তায় এল নাট্যকারের মতে ‘... ওহি ছিল ঠির রাস্তা...’^{১৬} এই রাস্তা খুঁজে পাওয়ার নাটকই হল ‘ভুল রাস্তা’।

লোকনাট্যের মতোই এখানে নাটকের কথক অভিনয় চলতে চলতে দর্শকের

সঙ্গে মত বিনিময় করে নেন। নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে দর্শককে জুড়ে দেন। যেভাবে নাটকের কথক অভিনেতা বারবার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘জেরাসা ভাবিয়ে দেখবেন বাবুসাব, শোচ লীজীয়ে মাদ্জী,’^{১৭} তখন বাবুসাব, মাদ্জী আর দর্শক থাকে না, নাটকের চরিত্র হয়ে ওঠে। নাটকের কথক চরিত্র রাজপুত্রের রাস্তা ভুল ছিল না ঠিক ছিল তা বিচার করার ভার সেই দর্শকদের উপরেই ছেড়ে দেন, দর্শক কি বলে সেটা শুনে নিতে চান। তবে সেই সঙ্গে কথক একটা সুতীর তীরভেদী প্রশ্ন রেখে শেষ করেন তার রুজি-রোজগারের জন্য বলা গল্প— “জেরা এক বাৎ শোচিয়ে বাবুমশাই, একটা কথা একটু ভাবিয়ে দেখেন লছিম মাদ্জ-ঐ যে রাস্তা, জঙ্গলকা রাস্তা, কাঠুরিয়াকা ঝোপড়ি-তক, উও ভুল রাস্তা ছিল, কি ওহি ছিল ঠিক রাস্তা? ভাই বোলনেকা রাস্তা, মা বোলনেকা, দোস্তু বোলনেকা রাস্তা ঠিক হয়। কি লাথ মারনেকা রাস্তা ঠিক হয়।”^{১৮}

এরপরেই ভিক্ষুক উপস্থিত দর্শকদের সামনে একটা কাপড় পেতে ধরেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দর্শক বা শ্রোতার কাছ থেকে অর্থ সাহায্যের জন্য। দর্শকেরা খুশিমনে যে যার সাধ্যমত পয়সা দিয়ে চলে যায়, নাটক শেষ হয়। এই শেষ আঙ্গিকটিও একেবারেই লোকনাট্যজাত, যা বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারের দর্শনের সঙ্গে এক করে দিয়েছেন। বাদল সরকার বলেছেন—

“...দর্শক অভিনয়ের পর যে পয়সাটা দিচ্ছে সেটা কিন্তু দামও নয়, দানও নয়। সেটা তাদের অংশগ্রহণ। ...এটা না করে জমিদারি সুলভ মনোভাবে যদি ভাবতাম তাদের পয়সা নেই তাই পয়সা নেব না— তাহলেই কিন্তু ওদের আর আমাদের মধ্যে একটা স্তর বিভেদ চলে এল। ওরা নিম্নস্তর, আমরা উচ্চস্তরে। আমরা সমান পর্যায়ে সবাইকে দেখি, দেখতে চাই, যেহেতু তা ফ্রি। এটাই মানবিক ক্রিয়া। এর সঙ্গেই দর্শনটা এসেছে।”^{১৯}

এভাবেই ‘ভুল রাস্তা’ নাটক ঠিক রাস্তা দেখায় আর তার আঙ্গিকেও বোনা হয়ে যায় বাদল সরকারের নাট্য আন্দোলনের দর্শন।

আসলে বাদল সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল জনসংযোগ। তাই নাটকের গঠনে বা আঙ্গিকে এবং বিষয়ে বিন্যাসের বুদ্ধিগ্রাহ্য কৌশল ছেড়ে বেছে নিয়েছেন লোককথার আঙ্গিকে, লোকজীবনের পরম্পরাকে। সাধারণ মানুষের অতি চেনা বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়েই তিনি তাদের সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। লোকনাট্যের আঙ্গিকের ভেতরেই তিনি বুনে দেন তাঁর দর্শন এমনভাবে যা তাঁকেই অতিক্রম করে ভিন্ন নাট্যমাত্রা আনে। আর এখানেই বাদল সরকারের টেক্সট থাকে অক্ষতথ্যসূত।

তথ্যসূত্র :

১. বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, সুরজিৎ ঘোষ, দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৩, পৃ. ৪০।

২. বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, বিভাস চক্রবর্তী, সাক্ষাতকারটি ০১.০৯.৯১-এ নেওয়া হয়, পরবর্তীতে নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ১৯৯৯ প্রকাশ করেন, পৃ. ২৫৬।
৩. ঘোষ, ঋতদীপ; বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, তৃতীয় থিয়েটারের বাঙালি দর্শক, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, কলকাতা ১৪, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ৬৯।
৪. সরকার, বাদল; প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, কলকাতা ৭৮, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ২২৮।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক; বাদল সরকার : এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, প্রকাশক থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, কলকাতা ২৬, পৃ. ২০৩।
৬. সরকার, বাদল; ভুল রাস্তা, দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৩, পৃ. ৩১।
৭. তদেব, পৃ. ৩১।
৮. তদেব, পৃ. ৩১।
৯. তদেব, পৃ. ৩২।
১০. তদেব, পৃ. ৩২।
১১. তদেব, পৃ. ৩৩।
১২. তদেব, পৃ. ৩২।
১৩. তদেব, পৃ. ৩২।
১৪. চৌধুরী, দর্শন; নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, প্রকাশক একুশশতক, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ১৯০।
১৫. সরকার, বাদল; ভুল রাস্তা, দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৩, পৃ. ৩৪।
১৬. তদেব, পৃ. ৩৫।
১৭. তদেব, পৃ. ৩৫।
১৮. তদেব, পৃ. ৩৫।
১৯. বিশ্বাস, অদ্রীশ; মিছিলে বাদল সরকার, গুরুচণ্ডা প্রকাশনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বইমেলা, ২০১৮, কলকাতা ৩২, পৃ. ১৯।

ICSSR Sponsored International Seminar

27th - 29th January, 2020

Combating Child Trafficking: Vulnerability, Efforts and challenges



Organized by :
Department of Geography
Maynaguri College

In Collaboration with
Department of Lifelong Learning and Extension
University of North Bengal



Enlightenment to Perfection

Certificate

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Mrs./MS. *Anwar Chandra Ray*
of *Susmita Mahavidhyabagya*

attended in ICSSR Sponsored International Seminar on 'Combating Child Trafficking: Vulnerability, Efforts and Challenges', organized by the Department of Geography, Maynaguri College, University of North Bengal, held during 27th-29th January, 2020. He/She Participated/Presented a research paper/delivered Special Lecture/Chaired a Session entitled *শিশু বাণিজ্যের প্রতিরোধ*

..... *সুদীপ চাকরবর্তী*
Sudip Chakraborty
Patron
Seminar Organizing Committee

..... *সুমিতা পন্ডি*
Susmita Pandit
Teacher-In-Charge
Maynaguri College

..... *ডাঃ মধুসূদন কার্মাকার*
Dr. Madhusudan Karmakar
Convener
Seminar Organizing Committee

..... *প্রফ. মাহবুব উল আলম*
Prof. Mahbub Ul Alam
Co-Convenor, Department of
Lifelong Learning
and Extension
University of North Bengal

একদিনের জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র

বিষয়ঃ

কেন রবীন্দ্রনাথ?

প্রসঙ্গঃ শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি

শংসাপত্র

তারিখঃ ১৬ জুন, ২০১৯ || স্থানঃ বিশ্বামিত্র ভবন, দিহাটা || সময়ঃ সকাল ১০ টা

Our Online News
Partner:



একলব্য গবেষণামূলক বিচারিত পত্রিকার উদ্যোগে, একলব্য প্রকাশনী, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, উত্তরায়ণ কলেজ অফ ল এবং দেওয়ানহাট মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগিতায়—
“কেন রবীন্দ্রনাথ ? প্রসঙ্গঃ শিক্ষা- শিল্প- সাহিত্য- সংস্কৃতি” শীর্ষক একদিনের জাতীয়স্তরের আলোচনাচক্রে প্রবন্ধপত্র উপস্থাপনার জন্য/ আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য—

শংসাপত্রটি প্রদান করা হল।
পঠিত প্রবন্ধের শিরোনামঃ *রবীন্দ্রনাথ এক সাদৃশ্য সন্ধ্যায়:*
সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে


আস্থায়ক
জাতীয় আলোচনাচক্র ২০১৯


সভাপতি
জাতীয় আলোচনাচক্র ২০১৯


আমন্ত্রিত বক্তা
জাতীয় আলোচনাচক্র ২০১৯

সহযোগিতায়



দিনহাটা মহাবিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ



উত্তরায়ণ কলেজ অফ ল



দেওয়ানহাট মহাবিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ



Gov. of INDIA M.S.M.E. & ISO 9001:2015 Certified
নজিরগঞ্জ, দিনহাটা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৩৪
মোবাইল- ৭৬০২৭২১৮১০
ইমেইল- ekalavyajournal@gmail.com
www.ekalavyaprakashani.co.in

